

বনফুল

রচনাবলী ০৪

বনফুল রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী :
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ :
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক :
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

বনফুল

সে ও আমি

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২

তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক

ডাক্তার শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি.

শ্রীচরণকমলেষু—

✻ ✻ ✻ ✻ সে ও আমি

লিখতে শুরু করব, এমন সময় দেখি, সামনের চেয়ারে সে বসে আছে। এ রকম আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল, চিনি, কিন্তু কোথায় কবে দেখেছি মনে পড়ল না। কিন্তু চেনা হলেও—এমন সময়ে হঠাৎ—

সে। কি দেখছেন অবাক হয়ে ?

আমি। দেখছি আপনাকে। ভাবছি, এত রাত্রে এই তেতলার ঘরে আপনি কি করে এলেন ?

সে। এসেছি যখন, তখন বুঝতেই পারছেন, আসাটা অসম্ভব নয়।

একটু চুপ করে রইলাম। অর্থাৎ আশা করে রইলাম যে, তার এই অপ্রর্ত্যাশিত আবির্ভাবের কারণটা সে ব্যক্ত করবে। কিন্তু সে-ও চুপ করে রইল।

আমি। এসেছেন কেন, কোনও দরকার আছে ?

সে। সেটা এখন নাই বা শুনলেন।

আমি। আমাকে আগে চিনতেন কি ?

সে। খুব। যদি বলি, আপনিই আমার একমাত্র পরিচিত লোক, তা হলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ? দেখুন তো ভালো করে।

আমি। মনে হচ্ছে চিনি, অথচ—কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সে। কোথাও দেখেন নি, অথচ—

একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

আমি। অথচ?

সে। অথচ সর্বদাই দেখছেন। আমার কথা থাক, আপনি কি করছেন এত রাত্রে একা বসে?

আমি। লিখছি।

সে। লিখছেন! আপনি যে লেখক তা তো জানা ছিল না আমার!

আমি। না, লেখক বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে, আমি ঠিক তা নই। তবু লিখছি।

সে। কি লিখছেন?

আমি। কাহিনী।

সে। প্রেমের? আজকালকার ছেলেরা—

আমি। দেখুন, আজকালকার ছেলেদের সমালোচনায় সবাই পঞ্চমুখ। দেশসুদ্ধ গোরু ওই একই জাবর কাটছে। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও হয়তো ভালো নয়, কিন্তু সেটা বার বার বলে লাভ কি!

সে। কারও স্বাধীন মতামত শুনতে ভয় পান? ডেমোক্র্যাসির যুগ এটা জানেন?

আমি। বিলক্ষণ জানি। স্বাধীন মতামত অনেক শুনেছি। কিন্তু এই নির্জন রাত্রে আপনার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে না ও কথা। আপনি আপনার পরিচয়টা দিন আগে।

চোখ দুটি হাসতে লাগল তার।

সে। যদি বলি, কৌতূহল সম্বরণ করুন।

আমি। কেন?

সে। আগেই পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই, দ্বিতীয়ত পুরো পরিচয় দেবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়, আমি নিজেই নিজেকে জানি না ভালো করে।

আমি। যতটুকু জানেন, ততটুকু শুনি না।

সে। শোনবার দরকার কি। খানিকটা পরিচয় তো পাচ্ছেন। দেখছেন, এই তো যথেষ্ট পরিচয়। বেশী কৌতূহল ভালো নয়।

আমি। কিন্তু আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমার ঘরে এমন রাত-দুপুরে এসে—

সে। এটা আপনার ঘর নয়, এটা আপনার বাবার ঘর—

আমি। তার মানেই—

সে। না, তার মানেই তা নয়। বিশেষত আপনার বাবা যখন আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন ঠিক করেছেন, তখন—

আমি। কি করে জানলেন আপনি?

আবার একটু হাসল সে।

সে। আপনার সব খবর রাখি আমি। মিনতিকে বিয়ে করছেন না কেন?

আমি। মিনতিকে চেনেন নাকি?

সে। একটু একটু।

আমি। আপনি আমার সম্বন্ধে এত কথা জানেন, অথচ আমি আপনাকে চিনতেই পারছি না ভালো করে। কোথায় দেখা হয়েছিল বলুন তো—রমেশের বাড়িতে?

সে। না।

আমি। তবে? আচ্ছা, বিলেতে কি?

সে। কোথাও না। যাবার সময় বলে যাব, কে আমি। আগে থাকতেই অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। কি লিখছেন বলুন?

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মেয়েটি সুন্দরী। ফরসা নয়, তবু সুন্দরী। মুখশ্রী ভাষাময়, দৃষ্টিতে মাদকতা আছে। মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়, একেই তো খুঁজছিলাম এতকাল্। শুধু মুগ্ধ নয়, প্রলুব্ধও করে। এত রাত্রে হঠাৎ আমার কাছে কেন?

সে। কি লিখছেন বলুন।

আমি। লিখছি আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী।

সে। আপনার জীবন ব্যর্থ! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না এ কথা।

আমি। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরই জীবন ব্যর্থ।

যাদের জীবন সার্থক, তারা ব্যতিক্রম। আমি ব্যতিক্রম নই, আমি সাধারণের দলে।

সে। হলেনই বা, জীবন ব্যর্থ হল কেন বুঝতে পারছি না। সামান্য পশুরও জীবন সার্থক, আর আপনার জীবন ব্যর্থ?

আমি। নিছক পশু হলে আমার জীবনও হয়তো সার্থক হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিছক পশুও নই, নিছক দেবতাও নই, উভয়ের সংমিশ্রণে হয়েছি মানুষ, তাই এই দুর্দশা।

সে। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি। দেবোচিত আদর্শ বজায় রেখে পশু-জীবন যাপন করবার সামর্থ্য নেই বলেই আমার জীবন ব্যর্থ।

সে। সামর্থ্য নেই? কেন? যুবক আপনি, শক্ত সমর্থ দেহ আপনার, শিক্ষা পেয়েছেন—

আমি। এর পরেই ঠিক কি করবেন বুঝতে পারছি।

সে। কি?

আমি। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে লম্বা একটা বক্তৃতা দেবেন। বেশ, দিন, ছাড়বেন না যখন। কেবল আশ্চর্য লাগছে, ঠিক এ সময়ে কি ক'রে আপনি নাগাল পেলেন আমার!

সে। একালের ছেলেদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা শুনবেন?

আমি। বলুন।

সে। তারা খুব ভালো ছেলো। কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় 'আদর্শে যে সত্য মানে', কিন্তু—

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখ দুটিতে।

আমি। কিন্তু?

সে। কাজের বেলায় তারা অপদার্থ।

আমি। মেনে নিলাম। আর কিছু বলবার আছে আপনার?

সে। আপনি রাগ করছেন! উঠি তা হলে।

আমি। না না, বসুন। রাগ করা উচিত, কিন্তু চেষ্টা করেও রাগ করতে পারছি না বলে নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছে।

সে। আজকালকার ছেলেরা আর কিছু না পারুক, বেশ বাগিয়ে কথা বলতে শিখেছে।

আমি। কেন অন্যায় কিছু বললাম কি?

সে। রাগ করা উচিত, অথচ রাগ করতে পারছেন না—এই নপুংসক মনোবৃত্তিই তো আপনাদের দুর্দশার কারণ। সত্যি যদি রাগ হয়ে থাকে, প্রকাশ করুন না সেটা।

দুজনেই চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা তার মুখে-চোখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

সে। আসল কথা কিন্তু আমি টের পেয়েছি—উঃ, কি ভণ্ড আপনি!

আমি। কি কথা?

সে। রাগ নয়, আপনার অনুরাগ হচ্ছে এবং সেটা প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন। এত ভয় কেন?

আমি। ভয় নয়, ভদ্রতা।

সে। ভদ্রতা মানেই ভীরুতা আর ভণ্ডামির মুখোশ।

আমি। সমাজে থাকতে গেলে ও মুখোশ পরতেই হবে।

সে। রাত-দুপুরে তেতলার এই নির্জন ঘরে সমাজ কোথায়?

আমি। রাত্রি কিন্তু প্রভাত হবে, তেতলার এই ঘরেও সারাজীবন বসে থাকা যাবে না।

সে। ও, তা হলে ওই পুরিয়াটার কোনো অর্থ নেই?

আমি। কোন পুরিয়াটা?

সে। যেটা আপনার প্যাডের তলায় চাপা রয়েছে।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

কে এ!

আমি। আপনি কে?

সে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন রমণী। এর বেশি কোনো পরিচয় নেই আমার, থাকলেও তা অবান্তর।

আমি। আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে?

সে। আমি জাদু জানি। দেখবেন?

আলোটা নিবে গেল। অন্ধকারে বসে রইলাম দুজনে। তারপর ক্রমশ স্বচ্ছ হতে লাগল অন্ধকার। তারপর—

২

শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি, বাড়ির চারপাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা কচি কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা। একটু দূর দিয়ে নদী বয়ে গেছে একটা। দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে নদী, ওপারের বালুচর এবং তারও ওপারে দিগ্বলয়রেখা দেখা যায়। পূর্বদিকের দৃশ্যও মনোরম, সারি সারি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নির্মল আকাশ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে টেনিস-খেলবার জায়গা, তকতকে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো, দু ধারে ঘন নীল রঙের পরদা ঝুলছে বল আটকাবার জন্যে। তার থেকে কিছু দূরে ঘাসের সবুজ "লন", রোলার চালিয়ে মালীটা ঘাস ছাঁটছে। গেটের সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচ-ঢালা পরিষ্কার রাস্তা শহরের দিকে। যে রাস্তাটা গেট থেকে বাড়ির দিকে এসেছে সেটা পিচ-দেওয়া নয়, সুরকির। চারদিকে সবুজ রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। গেটের ওপর ছোট একটি পিতলের ফলকে নাম লেখা রয়েছে—পি. এস. ডাট, আই. সি. এস.। পি. এস. ডাট—আমারই নাম, কিন্তু—

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড একটা হল। হলের একদিকে সোফা-সেটি। আর একদিকে শ্বেতপাথরের বড় গোল টেবিল একটা, তার চারদিকে

শৌখিন দামী কুশন-দেওয়া কয়েকটা বেতের চেয়ার, এক কোণে পিয়ানো একটা, হ্যাটর‍্যাক, দ্বারের দু পাশে সুদৃশ্য গোটা দুই গোল টেবিলের উপর পিতলের গোটা দুই বড় বড় সারস পাখি, চার দেয়ালে চারটে বড় বড় ছবি—একটা রাজা-রানীর, একটা দিল্লীর দরবারের, আর দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্য। এত জিনিস সত্ত্বেও প্রচুর জায়গা। হলের ভিতর কেউ নেই। কুচকুচে কালো বড় বড় লোমওয়ালা কানঝোলা একটা কুকুর এসে ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে, তার পিছু পিছু একজন খানসামা, খানসামার হাতে শিকল। খানসামাকে দেখে কুকুরটা ছুটে পালাল আর একটা দরজা দিয়ে। বিরক্ত হল না খানসামা, বরং তার মুখে ফুটে উঠল স্নেহকোমল একটা মৃদু হাসি, যেমন ফুটে ওঠে নিজের ছেলেকে দুষ্টুমি করতে দেখলে। বেরিয়ে গেল সে কুকুরের পিছনে পিছনে।

হলের আর একটা খোলা দরজা দিয়ে চওড়া বারান্দার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল, দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা। তারই এক ধারে একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, টেবিলের সামনে হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা পি. এস. ডাট, আই. সি. এস. বসে ফাইল ক্লিয়ার করছেন। আমিই। অদূরে বসে আছে মালতী একটা শৌখিন মোড়ায়, নীল রেশমের সুতো দিয়ে ফুল তুলছে বাসন্তী রঙের একটা রেশমী কাপড়ে। একটা কার্ড নিয়ে চাপরাসী প্রবেশ করল। পি. এস. ডাট বাঁ হাতের

তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে কার্ডখানাকে ধরে দেখলেন একবার, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল, তারপর বললেন, আচ্ছা, সেলাম দাও। প্রবেশ করলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্করবাবু। নমস্কার নয়, সেলামই করলেন—বেশ একটু ঝুঁকেই। ঢিলা-ঢালা গলাবন্ধ তসরের কোটের জন্য দেখা যাচ্ছে না তাঁর বিসদৃশ ভুঁড়িটা, কাঁচাপাকা চুল-ভরা বুকটাও দেখা যাচ্ছে না। খোলা গায়ে তাঁকে দেখলে অপরিচিত ছোট শিশুর ককিয়ে কেঁদে ওঠা অসম্ভব নয়। গৌরীশঙ্করবাবু চারটি বড় বড় মিলের মালিক, ধনবান লোক। বেশ কিছু খরচ করে সম্প্রতি চেয়ারম্যান হয়েছেন কংগ্রেসের টিকিটে। কিন্তু কোনও ছুতোয় হাকিমদের কাছে আসতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যান এবং হাকিমদের ঠিক অনুরোধ নয়, ইঙ্গিতমাত্র পেলেই এমন কাজ নেই যা করতে পারেন না, অবশ্য সে কাজ যদি অর্থসাধ্য হয়। বাইরে অবশ্য পরিষদমহলে বলে বেড়ান যে, হাকিমদের তোয়াক্কা করেন না তিনি। "ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের মুখের ওপর শুনিয়ে দিলাম কড়া কড়া কথা,—সেদিন কমিশনার সায়েব বললেন, এ কাজটি করে দিতে হবে ; আমি বললাম, মাপ কর সায়েব, কংগ্রেসের লোক আমি"—এই সব।

গৌরীশঙ্করবাবু প্রবেশ করতেই মালতী নিঃশব্দে উঠে গেল।

বসুন।

গদগদ মুখে বসলেন গৌরীশঙ্করবাবু। কিছুক্ষণ কোনো বাক্যই নিঃসৃত হল না তাঁর মুখ থেকে। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবই কথা কইলেন।

"আপনাদের মেথর-স্ট্রাইকের ঝামেলা মিটল ?"

"হ্যাঁ, মিটে গেল বইকি, হুজুর যখন পড়েছেন ওতে, তখন আর না মেটে, বড় পাজি ব্যাটারা, ছোটলোক কিনা।"

"ওদের মাইনে কিছু কিছু বাড়িয়ে দিন এবার, সত্যিই বেচারারা ইল-পেড—"

"নিশ্চয়। এবারকার বাজেটে প্রভিশন করতে হবে তার। কিন্তু কি করে যে করব, হুজুরের পরামর্শ নিতে হবে একদিন এসে আর কি—"

"বাজে খরচগুলো কমিয়ে নিন।"

"যে আজ্ঞে—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখের সামনে মেথরদের দুরবস্থার চিত্রটা ফুটে উঠল। তিনি স্বয়ং মেথর-পল্লীতে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। কি ভীষণ নোংরাভাবে থাকে ওরা! শুয়ার, মুর্গি, পচা ফ্যানের ডাবা, ময়লা কাপড় কাঁথা খাটিয়া, পাশেই পচা ডোবা একটা, রুক্ষমাথা এক পাল উলঙ্গ ছেলেমেয়ে—সমস্ত চিত্রটা যেন আবার দেখতে পেলেন তিনি। আবার বললেন, ওদের ব্যবস্থাটা আগে করা দরকার।

যে আজ্ঞে। আমি কিন্তু এখন আর একটা দরকারে এসেছি হুজুরের কাছে।

কি, বলুন?

ফাউন্টেন পেনটা নামিয়ে রেখে যেন মন দিয়ে কথাটা শুনবেন, এমনই একটা ভঙ্গী করলেন পি. এস. ডাট। যদিও গৌরীশঙ্কর লোকটার উপর মনে মনে হাড়ে চটা তিনি এবং ইচ্ছে করলেই এঁকে 'ক্রাশ' করতেও পারেন, তবু এঁর কথা মন দিয়ে শুনবেন তিনি। ব্যক্তিগত আক্রোশ অনুসারে চলবার লোক তিনি নন। তিনি জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট, সকলের কথা শুনে সুবিচার করতে চান। করেনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে গৌরীশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন।

"যুগলের ব্যাপারে এসেছি—"

"যুগল কে?"

"আমার আপিসের হেড ক্লার্ক—"

"কি ব্যাপার কি?"

"তার এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে। ছটফটে ছোকরা, এসেই এক কাণ্ড করে বসেছে—"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্কর ঢোঁক গিললেন।

হঠাৎ পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল। মালতী কথা কইতে লাগল কার সঙ্গে ইংরেজীতে।

গৌরীশঙ্কর বলতে লাগলেন, "যুগলের একটা বন্দুক আছে, সাধারণ একনলা বন্দুক, ননকু—মানে যুগলবাবুর ভাইপো, বন্দুকটা নিয়ে বুঝি হনুমান তাড়াতে যায়, যতদূর শুনেছি, একটা হনুমানের দিকে ফায়ারই করেছিল বুঝি জানলা দিয়ে—"

"আমি সব জানি। এস. পি. ফোন করেছিল আমাকে। একজন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমাকে কি করতে বলেন?"

গৌরীশঙ্করবাবু কিছু বললেন না, কেবল অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন পি. এস. ডাটের মুখের দিকে। এই অসহায় চাউনিটা তাঁর পোষা, যখন তখন ফুটিয়ে তুলতে পারেন চোখে এবং তা দেখলে যে কোনো ভদ্রলোক বিচলিত না হয়ে পারেন না। ব্যক্তিগত আক্রোশ সত্ত্বেও পি. এস. ডাট বিচলিত হলেন। সহজে বিচলিত হন বলেই পি. এস. ডাট এত জনপ্রিয়। বিচলিত হবার আর একটা গোপন কারণ অবশ্য ছিল। পি. এস. ডাটের আক্রোশ থাকলেও এই গৌরীশঙ্কর রায় কমিশনার সাহেবের প্রিয়পাত্র। তাঁর অনুরোধে প্রকাশ্যে গোপনে অনেক কিছু করে থাকেন তিনি টাকার জোরে। শহরের একজন নামী লোক, ধনী তো বটেনই।

"দেখুন, কেসটা সিরিয়াস—"

"একটা ব্যবস্থা করতেই হবে হুজুর—"

"বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা—যুগলবাবু এসে ধরেছেন আপনাকে—"

জিব কাটলেন গৌরীশঙ্করবাবু।

"যুগলের সাহসই হবে না, তা ছাড়া সে এখানে নেইও, সে থাকলে তার বন্দুকে হাত দিতে দেয় না কাউকে। আমি ছুটে এলুম তার বউটার কান্না দেখে, ছেলেমানুষ বউ, ঘন ঘন ফিট হচ্ছে তার, হুজুর গরিবের মা-বাপ, হুজুর যদি দয়া করেন এই ভেবে—"

শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়ে এল গৌরীশঙ্করের চোখ দুটি।

"আইনত যতটা সম্ভব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু বে-আইনী কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি যদি খুন করি, ওই একই আইন দিয়ে বিচার হবে আমার।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিকই হুজুর।"—থেমে গেলেন গৌরীশঙ্করবাবু, ইতস্তত করলেন একটু, তারপর বললেন, "আচ্ছা, শুনছি, এখানে যে নতুন মেয়ে-হাসপাতালটা হচ্ছে তার টাকা কম পড়েছে কিছু। হুজুর যদি হুকুম করেন, তার ফাণ্ডে হাজার খানেক টাকা দিইয়ে দেব আমি যুগলের কাছ থেকে, হুজুর হুকুম করলে দিতে পথ পাবে না ও—"

"গরিব কেরানী, এক কথায় হাজার টাকা বার করতে পারবে?"

"না পারে, ওর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আমার হাতে আছে। তার থেকে লোন দিইয়ে দেব—"

"সেটা কি অত্যাচার করা হবে না তার ওপর ?"

"বেশ, আমিই নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেব না হয় ওর নাম করে।"

"দেখি—"

ফাইল একটা টেনে নিলেন পি. এস. ডাট।

গৌরীশঙ্করবাবু বুঝলেন, আর কথা কইবেন না সাহেব।

উঠলেন।

"মনে রাখবেন হুজুর, গরিবের কথাটা। করুণা বলছিল কমিশনারের কাছে যেতে, কিন্তু আমি হুজুরকে চিনি—"

হেসে ঝুঁকে সেলাম করলেন, তারপরে বেরিয়ে গেলেন। ফাইলে মন দিলেন পি. এস. ডাট একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে। একটু পরে মালতী এল, হাতে তখনও সেলাই রয়েছে।

"তুমি এবার ওঠ, তোমার ভেজিটেবল স্ট্যু হয়ে গেছে—"

"নিজেই করলে নাকি ?"

"ইলেকট্রিক স্টোভে ক মিনিটই বা লাগল! এবার থেকে তোমার খাবারটা আমি নিজের হাতেই করব, বাবুর্চীর রান্না সহ্য হচ্ছে না তোমার—"

"একেবারে নিছক নিরামিষ স্ট্যু ?"

"মেজর প্যাসরিচকা তাই তো বলে গেলেন। অত ইউরিক অ্যাসিড বেরুচ্ছে যখন—"

"ফোন করছিল কে ?"

"মিসেস মরিসন। বিকেলে টেনিসে আসবে বলছিল, কিন্তু আমরা তো বিকেলে থাকব না।"

"কোথা যেতে হবে?"

"বাঃ, স্কুলে প্রাইজ যে আজ, ভুলে বসে আছ, বেশ!"

"ও, তোমারই দেবার কথা, না? ঠিক তো। কাপড়টার চমৎকার রঙ তো, কার জন্যে হচ্ছে?"

"লিসির জন্যে করছি এটা—"

"লিসি কে আবার?"

"পি. এ.র ভাগনী—"

"ও, সেদিন যে মেয়েটি এসেছিল?"

চাপরাসী আবার প্রবেশ করল, হাতে এক বাক্স গ্রামোফোনের রেকর্ড।

"রেকাড় হুজুর—"

মালতী এগিয়ে গেল সাগ্রহে, বাক্সটা খুলে দেখতে লাগল।

"সত্যি বড্ড ব্যাকওয়ার্ড জায়গাটা। বুশ স্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট্ আর রেজিনাল্ড কেলের ব্রাম্‌স্ কুইন্টেট ইন বি মাইনারখানা থাকে যদি পাঠাতে লিখেছিলাম। এ কি অদ্ভুত রেকর্ড পাঠিয়েছে, সি স রাম্‌বা—ই নেহি লেগা, আপস দেও—"

"বহুত খুব হুজুর—"

বাক্স নিয়ে চলে গেল চাপরাসী। পি. এস. ডাট আফিসের কাজকর্ম নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন। অনেক ফাইল জমে গেছে

মালতী আবার গিয়ে বসল মোড়ায়। খানিকক্ষণ নীরবে সেলাই করবার পর বললে, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর আর এক জায়গায় যেতে হবে, এক জায়গায় কেন, দু জায়গায়। মানে, কালীবাড়িতে নারী-সমিতির একটা মীটিং হবে, সেখানেও যাব বলেছি। সেখান থেকে যাব ললিদের বাড়ি। ললির মেয়েটি কেমন হয়েছে দেখে আসব—ফ্রক করে রেখেছি তার জন্যে গোটা চারেক। এখানে অরগ্যাণ্ডি ভালো পাওয়া যায় না, জান—"

ডাট অন্যমনস্কভাবে বললেন, "তাই নাকি ?"

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মালতী আবার বললে, "সন্ধ্যেবেলা তোমার প্রোগ্রাম কি ?"

"আমাকে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর ক্লাব—"

"ক্লাবের সেক্রেটারিশিপ ছাড় তুমি। ইণ্ডিয়ান আর ইউরোপীয়ান নিয়ে ওসব ক্লিক ভালো লাগে না আমার।"

পি. এস. ডাট কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী মুখ টিপে হেসে তাঁর দিকে একটু চেয়ে আবার মন দিলে সেলাইয়ে।

হঠাৎ ডাট বললেন, "ব্রাউনকে যদি চায়ে নেমন্তন্ন করি আজ বিকেলে, অসুবিধে হবে কিছু ?"

"কিছুমাত্র না, অসুবিধে আবার কি ! টম্যাটোর জেলি, ব্রাউনের যেটা ফেভারিট, প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক পাঁচটায়, মনে থাকে যেন। তার আগেই চা

শেষ করতে হবে। গল্প পেলে তোমরা তো সব ভুলে যাও! আর যত ঝঞ্ঝাট এসে জুটবে কি আমারই ঘাড়ে! কমিশনারের স্ত্রীকে বললেই পারত ওরা—"

ডাট স্মিতমুখে বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন একবার মালতীর পানে, তারপর উঠে গেলেন এস. পি.কে ফোন করবার জন্যে। ফোনে খানিকক্ষণ কথা হল। উত্তেজিতভাবে রিসিভারটা নামিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাট।

"ব্রাউন আসতে পারবে না। মুরারিগঞ্জে হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা শুরু হয়েছে, আর্মড পুলিস নিয়ে এখুনি বেরোনো দরকার। আমাকেও যেতে হবে। কটা বেজেছে?"

রিস্ট-ওয়াচ দেখে মালতী বললে, "পৌনে এগারো। এখুনি বেরুতে হবে?"

"ইমিডিয়েট্‌লি—"

শঙ্কা ঘনিয়ে এল মালতীর চোখে।

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। একা যেতে দেব না তোমায়—"

ডাট হাসলেন একটু।

"পথি নারী বিবর্জিতা—"

"আমি সে রকম নারী নই।"

"নারীর আবার রকমফের আছে নাকি?"

হঠাৎ বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ল ডাটের।

কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে গেল মালতী, শোনা গেল, ফোনে

কথা কইছে। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বেশ খানিকক্ষণ কথা কয়ে বেরিয়ে এল।

"ব্রাউন চায়ে আসছে। প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের পর সে স্টার্ট করবে তোমাকে আমাকে নিয়ে।"

"কি রকম?"

"তার আগে রেডি হতে পারবে না সে।"

একটু মুচকি হাসল মালতী।

"সে কি করে হয়?"

আবার ফোন অভিমুখে অগ্রসর হতে চাইলেন ডাট।

"না, তুমি আর বাগড়া দিও না। আমি তোমার সঙ্গে যাবই এবং প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরে তবে যাব।"—আদুরে আদুরে আবদারের সুরে বললে কথাগুলো। ডাট নিরস্ত হলেন। ফাইল নিয়ে বসলেন আবার। চাপরাসী এল, বললে যে, গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া বাইরে এসে বসে আছেন। ডাট মালতীর দিকে চেয়ে বললেন, "লোকটা একটা প্রকাণ্ড গোশালা করেছে, তোমাকে দিয়ে তার দ্বারোদঘাটন করাতে চায়।"

"আমি ওসব পারব না।"

"লোকটা টাকার কুমির। একটু তোয়াজ করলে অনেক কাজ আদায় করা যেতে পারে।"

"বেশ তো, দিক না এখানকার মেয়েদের মাইনার স্কুলটাকে হাই স্কুল করে—"

"তা দেবার ক্ষমতা আছে ওর। সে উদ্দেশ্য যদি থাকে, তা হলে দ্বারোদ্ঘাটন করতে আপত্তি কোরো না।"

ঘণ্টা টিপলেন ডাট।

চাপরাসী এল।

"সেলাম দেও—"

প্রবেশ করলেন কালো লং-কোট গায়ে মাথায় হলদে পাগড়ি গম্ভীরদাস ঢনঢনিয়া।

অন্ধকার রাত্রি। কাঁচা মেঠো রাস্তা ভেঙে ছুটে চলেছে পি. এস. ডাটের মোটর মুরারিগঞ্জ অভিমুখে। এস. পি.র মোটর এগিয়ে গেছে। পিছনের সীটে বন্দুকধারী চাপরাসী বসে আছে। পি. এস. ডাট নিজেই মোটর চালাচ্ছেন, পাশে বসে আছে মালতী। হঠাৎ ভীষণ শব্দ হল একটা। টায়ার ফাটার শব্দ।

আই. সি. এস. হতে বিলেত গিয়েছিলাম কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। কিন্তু আমার স্বপ্নটা কি করে টের পেলে ও। এমনভাবে মূর্ত করলেই বা কি করে। আশ্চর্য।

৩

আলো জ্বলে উঠল।

সে আর আমি মুখোমুখি বসে আছি, তেতলার নির্জন ঘরে দ্বিপ্রহর রাত্রে।

সে। কেমন লাগল?

আমি। অদ্ভুত।

সে। পি. এস. ডাট আই. সি. এস. পরীক্ষা কেন দিতে পারলে না তা আমি জানি।

আমি। অনেকেই জানে, আপনার জানাও সম্ভব। কিন্তু আমার ধারণা, ঠিক কারণটা কেউ জানে না।

সে। দেখুন, প্রতি কথায় 'আমার ধারণা' 'আমার ধারণা' করাটা কেমন যেন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল আপনাদের! সবাই সবজান্তা!

আমি। আমি ইচ্ছে করেই সবজান্তা হবার চেষ্টা করে-ছিলাম, কারণ শুনেছিলাম, সবজান্তা না হলে আই. সি. এস. হওয়া যায় না।

সে। কিন্তু সবজান্তা হতে পারেন নি, হয়েছেন পল্লবগ্রাহী।

আমি। যা হয়েছি তা হয়েছি। বদলাবার উপায় নেই, ইচ্ছেও নেই আর। আই. সি. এস. পরীক্ষা না দেবার কি কারণটা শুনেছেন আপনি, জানতে পারি কি?

সে। নিশ্চয়ই পারেন। আমি কারও কাছে শুনি নি, নিজেই জানি।

আমি। কি বলুন তো?

সে। অসুখটা আপনার ছুতো, মালতীর বাবার কাছে নিজের মান বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি। ঠিক পরীক্ষার আগেই আমার যে অসুখ হয়েছিল, সেটা তাহলে আমার মিছে কথা বলতে চান? একজন এম. ডি., এফ. আর. সি. পি.র সার্টিফিকেট রয়েছে।

মুচকি হাসলে সে।

সে। মালতীর চিঠির মানে আপনি বোঝেন নি।

আমি। মালতীর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?

সে। না।

আমি। তা হলে এত কথা জানলেন কি করে?

সে। বললাম তো, জাদু জানি।

আমি। সত্যি, অবাক হয়ে যাচ্ছি—

সে। পরিচয় পেলে দেখবেন, অবাক হবার কিছু নেই।

আমি। পরিচয় দিন।

সে। আপনার স্বভাব দেখছি অনেকটা আপনার বোন টুকুর মতো।

আমি। কি রকম?

সে। কোনো একটা উপন্যাস আরম্ভ করে সে অধীর

হয়ে পড়ে, কিছুতেই তর সয় না, তাড়াতাড়ি আগেই শেষের কয়েক পাতা উলটে দেখে নেয়, নায়ক-নায়িকার কি হল।

আমি। কিন্তু এ উপন্যাসও নয়, আমরা নায়ক-নায়িকাও নই।

সে। গুছিয়ে লিখতে পারলে প্রত্যেক মানুষের জীবনই উপন্যাসে এবং ঠিক অবস্থায় পড়লে যে কোনো অপরিচিত যুবক-যুবতীই নায়ক-নায়িকায় রূপান্তরিত হতে পারে। নিদারুণ গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়েও আপনি যে একটু রসস্থ হয়েছেন, তা তো টেরই পাচ্ছি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মেয়েটির মুখের দিকে। এ আমাকে এমন করে চিনলে কি করে।

আমি। আপনি আমার জীবনের সব কথা জানেন?

সে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। জ্ঞাতসারে আপনি নিজেও যা জানেন না, আমি তা-ও জানি। শুধু তাই নয়, ফুটিয়ে তুলতে পারি সে সব সিনেমা দেখানোর মতো করে আপনার মানসপটে, এখন যেমন তুললাম।

আমি। কে আপনি?

সে। আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে মিছে সময় নষ্ট করছেন কেন? এখন পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই আমার।

হাসিমুখে চেয়ে রইল। আমিও চেয়ে রইলাম তার মুখের

পানে। দেখেছি, নিশ্চয় কোথাও দেখেছি একে। জাদু জানে নাকি সত্যি সত্যি ? এ কি অদ্ভুত ব্যাপার !

সে। মালতীর বাবাকে কিন্তু অমনভাবে ঠকানোটা ঠিক হয় নি আপনার।

আমি। আমি ইচ্ছে করে ঠকিয়েছি কি ?

সে। অনিচ্ছা সহকারে ঠকানোটাও ঠকানো। তিনি অত আশা করে অত খরচ করে আপনাকে বিলেত পাঠালেন আই. সি. এস. হবার জন্যে, আর আপনি স্বচ্ছন্দে পরীক্ষাটা দিলেন না।

আমি। দিতে পারা গেল না, কি করব ?

সে। দিতে পারলেও আপনি পাস করতেন কি না সন্দেহ। আপনার অসুখ হয়ে, মানে মালতীর চিঠিটা পেয়ে, আপনি যেন বেঁচে গেলেন।

আমি। পরীক্ষা দিলেও পাস করতে পারতাম কি না এ বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন কি করে।

সে। সেখানে মদ খেয়ে, মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে, ক্লাবে ক্যাবারেতে নেচে নাচ দেখে, ভারতবর্ষের হিতার্থে সভাসমিতির ভড়ং করে, সে দেশের হাব-ভাব শিখে যতটা সময় ব্যয় করেছিলেন, তার শতাংশের একাংশও কি পড়াশোনার জন্যে করেছিলেন ? আপনি তো বই ছুঁতেন না।

আমি। শিক্ষালাভ মানে কি শুধু পুঁথি মুখস্থ করা ?

সে। তা না হতে পারে। কিন্তু আপনি মালতীর বাবার

টাকা নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন একটা বিশেষ পরীক্ষায় পাস করবার জন্যেই। জামাইয়ের যাতে একটা ভালো চাকরি হয়, এই আশাতেই ভদ্রলোক অতগুলো টাকা খরচ করেছিলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে, আপনার মনের সংস্কার-সাধন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আমি। জুয়ো খেলতে বসলে হারজিত দুইই হবার সম্ভাবনা। মালতীর বাবা হেরে গেছেন, আমি কি করব, বলুন?

আবার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

সে। ওই কথা আউড়ে নিজের বিবেকের কাছে রেহাই পেতে চাইছেন বুঝতে পারছি—সত্যি, কি অদ্ভুত লোক আপনারা।

কথাটার মোড় কোন দিকে ঘুরবে তা বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। সেও চুপ করে গেল। খানিক-ক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মনে হল, ঠিক এই রকম একখানা মুখ যেন প্যারিসে থাকতে দেখেছিলাম। মনে হল, যেন Elysee's-এর একটা কাফেতে বসে আছি, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছি শ্যাম্পেনের গ্লাসে, চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্রোত—জীবন্ত নরনারীর স্রোত, ফেনিল আবর্ত তুলে, নানা রঙে নানা ভঙ্গিতে। স্রোতে নানা তরঙ্গ উঠছে, চটুল দৃষ্টির, মিষ্টি কথার, কলহাস্যের। পলকে প্রলয় ঘটছে। সেই ভিড়ে কি চকিতের জন্য দেখেছিলাম একে? না লণ্ডনে?

গ্রাভনার স্ট্রীটের আলোক-বাদ্য-পানীয়-নর-নারী-সমন্বিত ফ্যাশানদুরস্ত হোটেলের ছবি ফুটে উঠল একটা মনে। কিউ-টেক্সনখী, শ্বেত-দন্তী, রঞ্জিতাধরা, নব-ভীট-মর্দিনীর দল, যাদের শুধু দেহে নয় মনেও অতি-আধুনিক আর্ট-বিজ্ঞানের ছাপ মারা, যারা খ্যাতির উপাসিকা, কুবেরের সহচরী, সাময়িক পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় যাদের, সিনেমা স্টার হয়ে শেষ পর্যন্ত মোক্ষলাভ করে যারা, এ কি তাদেরই একজন? নিগ্রো-অধ্যুষিত কোনো নাইট ক্লাবের গোপন-বিহারিণী? যেই হোক, আমার এত কথা জানলে কি করে?

হঠাৎ সে কথা বললে আবার।

সে। সত্যিই অদ্ভুত আপনারা!

আমি। অদ্ভুত মানে?

সে। গোঁড়া হিন্দু বাবার আশ্রয় থেকে যখন সরে পড়লেন, তখন বিবেককে স্তোক দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলাটাই যথার্থ পৌরুষ, জাতিভেদ তুলে দিয়ে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে সমুদ্র-যাত্রা করে অন্য জাতের মালতীকে বিয়ে করাটাই যথার্থ সৎকর্ম, এখন কিন্তু আবার বলছেন যে, মালতীর বাবা জুয়া খেলতে গিয়ে হেরে গেছেন, আমি কি করব!

আমি। দুটোই সত্যি।

সে। সবচেয়ে বেশি সত্যি কি জানেন?

আমি। কি ?

সে। আপনার খামখেয়ালী অসংযত স্বভাবটা। যদি আপনার বাবার মতো শক্ত সমর্থ পুরুষ হতেন, তা হলে হয়তো—

আমি। বাবাকেও চেনেন দেখছি।

সে। শুধু চিনি না, শ্রদ্ধা করি।

আমি। শ্রদ্ধা করেন ? এ যুগে ওরকম জাত-মানা, পাঁজি-মানা, গোঁড়া, একগুঁয়ে লোককে শ্রদ্ধা করা যায় ?

সে। শক্তিশালীকে সব যুগেই শ্রদ্ধা করা যায়। তাঁরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পারেন আপনি অমন ?

আমি। কি ?

সে। একটানা দুদিন নিরম্বু উপবাসী থাকতে, সেবার যেমন তিনি ছিলেন জয়পুর যাবার সময় ?

আমি। ট্রেনে জলস্পর্শ করব না, কারও ছোঁয়া কিছু খাব না—এসব আজকালকার যুগে অচল।

সে। আপনার কাছে অচল, কিন্তু তিনি তো ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা তো কই তাঁকে বয়কট করতে পারেন নি। তিনিই বরং আপনাদের বলছেন, সরে থাক আমার কাছ থেকে তোমরা।

আমি। ওইটেই ঠিক পথ ?

সে। সেটা তর্কসাপেক্ষ। আমি সে তর্ক তুলতেও চাই না, কারণ, তুললেই আপনি পরের ধার-করা কতকগুলি বুলি আউড়ে

যাবেন। আমি শুধু বলছি, তিনি তাঁর নিজের নির্দিষ্ট পথ থেকে এক চুলও নড়েন নি, কিন্তু আপনি বার বার পথ বদলাচ্ছেন।

আমি। কারণ আমি কোনো শিকলে বাঁধা থাকতে চাই না, আমি স্বাধীন।

সে। এক কথায় উচ্ছৃঙ্খল—

আমি। হয়তো।

হঠাৎ অনুভব করলাম, ক্রমশ কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, ক্রমশ একটা নেশা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমাকে।

সে। একটা কথার জবাব দেবেন ?

আমি। বলুন।

সে। প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস আছে আপনার ?

আমি। না।

সে। তা হলে বিলেত থেকে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন কেন ?

আমি। মায়ের কাতর অনুরোধে।

সে। কিন্তু বিলেত যাবার আগে মালতীদের সঙ্গে মেশামিশি করতে বারণ করেও তো মা কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন বার বার। তখন সে অনুরোধ শোনেন নি কেন ?

আমি। মালতীকে এত ভালো লেগেছিল যে, মায়ের অনুরোধ রাখতে পারি নি।

সে। অথচ এখন তারই ওপর এত বিতৃষ্ণা। আচ্ছা, সত্যিই কি বিতৃষ্ণা ?

আমি। আপনি যখন সব কথাই জানেন, তখন—

সে। জানি বইকি। মালতীর চেয়ে বেশি জানি। আপনার বিলেতের অসুখের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা মালতী জানে না, আমি জানি।

মুচকি হাসলে।

আমি। একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে আমার।

সে। কি ?

আমি। কি করে জানি না, আপনি আমার চরিত্রের খারাপ দিকটার সব খবর টের পেয়েছেন আর তাই নিয়েই আলোচনা করছেন খালি। আপনাকে ছদ্মবেশিনী মিস মেয়ো বলে সন্দেহ হচ্ছে এবং তাতে আরও খারাপ লাগছে।

সে। বিলেতে আপনার অসুখের ইতিহাসটা আপনার চরিত্রের খারাপ দিক নয়।

আমি। ওটা আমার দুর্বলতার ইতিহাস, মোটেই গৌরবজনক নয়।

সে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে নেমেছিলেন, তখন সেটাকেও অনেকে দুর্বলতা আখ্যা দিয়েছিল, বলেছিল, নাটকীয় একটা কিছু করবার লোভ সামলাতে পারেন নি তিনি।

আমি। ছি ছি, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা দিচ্ছেন!

সে। আয়তনে এবং উদ্দেশ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হলেও খানিকটা মিল আছে বইকি।

আমি। কিছু মিল নেই।

সে। সত্যি? কিন্তু আমি যতদূর জানি—

আমি। আপনি জানেন না। নারী-প্রেম আর দেশ-প্রেম এক জিনিস হতে পারে না।

সে। এক জিনিস তো আমি বলছি না। আমি বলছি, এক জাতের জিনিস। নয়?

ফিক করে হাসলে একটু আবার।

আমি। আপনার হাসিটি কিন্তু শানিত তীরের মতো বিঁধল। ঠাট্টা করছেন? জীবনে নানাভাবে বিপথে গেছি তা ঠিক, কিন্তু এককালে আমার প্রাণেও স্বদেশপ্রেম ছিল। বিশ্বাস হয়তো করবেন না। যখন আমার সতের-আঠার বছর বয়স, তখন—

সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখ ছুটি। অদ্ভুত দীপ্তি! মনে হল যেন—

হঠাৎ আলোটা নিবে গেল আবার।

৫

অন্ধকার। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে ঘন মেঘ, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গুরুগুরু ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই দুর্যোগ মাথায় করেও কিন্তু এগিয়ে চলেছে ব্রিটিশবাহিনী ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশী অভিমুখে। নিঃশব্দে ভাগীরথী পার হল তারা, তারপর শুরু হল মার্চ—ডবল মার্চ। বৃষ্টি পড়ছে পড়ুক, বজ্রাঘাত হয় হোক, রাতারাতি পৌঁছতেই হবে পলাশীতে। মীরজাফর খবর পাঠিয়েছে। রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, ইয়ারলতিফ, উমিচাঁদ সকলেই আশ্বাস দিয়েছেন, সৈন্যদলে কালা আদমিরও অপ্রতুল হয় নি। মীরজাফরের নির্দেশমতো ঠিক সময়ে পলাশীতে পৌঁছতে পারলে যুদ্ধ জয় হবেই। নবাবের সেনা আগে থাকতে এসে পলাশী যেন না অধিকার করে—দ্রুতবেগে মার্চ করে চলল সৈন্যদল পলাশীর আম্রকানন লক্ষবাগ লক্ষ্য করে, পৌঁছতে হবে যেমন করেই হোক রাত্রের মধ্যে। মাত্র সাড়ে সাত ক্রোশ পথ, কতক্ষণ আর লাগবে! এগিয়ে চলল ব্রিটিশ-বাহিনী দুর্যোগ মাথায় করে।

•

দৃশ্য বদলাল।

ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের মতো বেঁকে গেছে ঠিক তার পূর্বদিকে সিরাজের শিবির। আষাঢ় মাসের গভীর রাত্রি,

চিন্তামগ্ন নবাব বসে আছেন একা, সম্মুখে কারুকার্যখচিত বহুমূল্য ফরসি, সুগন্ধি তামাকের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। এক কোণে স্বর্ণ-শামাদানে সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলছে, স্তিমিতালোক। ঘন সবুজ মখমলের গালিচাটা মনে হচ্ছে কালো রঙের। থমথম করছে পলাশীর বাতাস, আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ চিরে চিরে ফেলছে নক্ষত্রহীন মেঘাবৃত আকাশকে। সহসা বজ্রপাত হল, হু-হু করে একটা আর্দ্র বাতাস ঢুকল শিবিরের বাতায়নপথে। সিরাজ উঠে দাঁড়ালেন, পদচারণ করতে লাগলেন অস্থিরভাবে। স্তিমিতালোকে তাঁর কালো ছায়াটাও ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে। দ্বারপ্রান্তে সন্তর্পণে উঁকি দিল কে একজন, একবার নবাবের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর ফরসিটার দিকে। চিন্তামগ্ন নবাব দেখতে পেলেন না কিছু। শিবিরগাত্রবিলম্বিত পর্দার ছায়ায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল লোকটা, নবাবের দিকে চাইলে আর একবার, তারপর টপ করে ফরসিটা নিয়ে চুপিচুপি সরে পড়ল অন্ধকারে। চোর! সহসা নবাবের নজরে পড়ল, ফরসি নেই।

কোই হ্যায়?

কেউ এল না, কেউ সাড়া দিল না।

আবার দৃশ্য বদলাল।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ইংরেজ-সৈন্য আমবাগানের অন্তরালে, নবাব-সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে। নবাবের সনির্বন্ধ অনুরোধে মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ সৈন্যপরিচালনা করেছেন, অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, উদ্দেশ্য আমবাগানকে দু দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা। মধ্যস্থলে আক্রমণ করবেন মীরমদন, তাঁর এক পাশে ফরাসী বীর সিন্‌ফ্রেঁ, আর এক পাশে বাঙালী বীর মোহনলাল। সবিস্ময়ে দেখলাম, আমিই মোহনলাল। অদূরে একটা সরোবর, তার তীরে সারি সারি কামান সাজিয়েছেন মীরমদন। সহসা সংবাদ রটে গেল, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ, এঁরা কেউ অগ্রসর হলেন না, সসৈন্য দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতবৎ। সৈন্যদলে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা। গুম গুম গুম গুম—গর্জন করে উঠল মীরমদনের কামান। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সার বেঁধে এগুতে লাগল বিরাটকায় সজ্জিত হাতির দল বাজনার তালে তালে পা ফেলে শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে, দ্রুতবেগে ছুটে চলল অশ্বারোহিগণ, ঘড়ঘড় করে এগিয়ে গেল কামানের সারি উঁচু উঁচু চাকার উপর। গুম গুম গুম—ইংরেজরাও প্রত্যুত্তর দিলেন আম-বাগানের ভিতর থেকে। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ হতে লাগল, মুহুর্মুহু বাড়তে লাগল হতাহতের সংখ্যা দু পক্ষেই। আরও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন মীরমদন, মোহনলালের শিরা-উপশিরায় নাচতে লাগল শোণিতধারা। সমস্ত দিন যুদ্ধ হল—

ভীষণ যুদ্ধ। অবশেষে আমগাছের আড়ালে আড়ালে আত্ম-গোপন করে বসে পড়ল ক্লাইভের সৈন্যরা, উঁচু চাকায় বসানো নবাবের কামান বৃথাই গর্জন করতে লাগল, একটি গোলাও স্পর্শ করল না বিপক্ষদলকে। তাদের কামান কিন্তু চলতে লাগল সমানে—হঠাৎ একটা গোলা এসে লাগল মীরমদনের উরুদেশে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, দেখতে দেখতে পাণ্ডুর হয়ে এল তাঁর মুখচ্ছবি, ধরাধরি করে নিয়ে গেল তাঁকে শিবিরের মধ্যে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ইয়ারলতিফ দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলেন, এক পা-ও এগুলেন না। মীরমদনের পতনে ভীত হয়ে পড়ল নবাব-সেনা। নবাব হুকুম দিলেন, যুদ্ধ স্থগিত রাখ এখন। যুদ্ধ স্থগিত রাখ! সেনা ছত্রভঙ্গ হয়-হয়, গর্জন করে উঠলেন বাঙালী বীর মোহনলাল, সিরাজের প্রিয়পাত্র ভক্ত মোহনলাল—'দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে দাঁড়া রে যবন, দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ—' আকাশ প্রকম্পিত করে বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। পরস্পরবিরোধী অক্ষয় মৈত্র ও নবীন সেন সমস্ত বিরোধিতা ভুলে গলাগলি করে এসে দাঁড়ালেন, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আমার মানসক্ষেত্রে!

৫

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে। অদ্ভুত একটা ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চকমক করছে চোখ দুটিতে।

সে। একটা কথা জানেন?

আমি। কি বলুন?

সে। হিন্দু মোহনলাল মুসলমান সিরাজের এত প্রিয়পাত্র হয়েছিল কি করে?

আমি। সিরাজ ছিলেন গুণগ্রাহী।

সে। না, মোহনলালের ভগ্নী ছিলেন রূপসী। সিরাজের কামনা-বহ্নিতে ভগ্নী-আহুতি দিতে হয়েছিল মোহনলালকে।

হঠাৎ আলো নিবে গেল। মনের আলোটাও। নিবিড় নীরন্ধ্র অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে বিহ্বল হয়ে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আর একটি ছবি।

৬

ছোট একখানি ঘর। ঘরের একপাশে ছোট একটি চৌকি। চৌকিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছি আমি, সতেরো-আঠারো বছর বয়সের আমি, একটু একটু গোঁফ-দাড়ি উঠেছে, মসৃণ ললাট, চিবুকে অধরে অর্ধজাগরিত পৌরুষের আভাস, চোখে আদর্শের স্বপ্ন। মাথার শিয়রে ছোট কাঠের টেবিল, টেবিলের উপর বইয়ের শেল্‌ফ, তার একধারে ছোট টাইমপিস একটা। ঝনঝন করে অ্যালার্ম বেজে উঠল। উঠে বসলাম। বন্ধ করে দিলাম অ্যালার্মটা। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে এসে ডন-বৈঠক করলাম খানিকক্ষণ, স্নান করে এলাম চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা কনকনে জলে। স্নানান্তে মেরুদণ্ড ঋজু করে চৌকিরই উপর বসে প্রাণায়াম করলাম কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বেলে পড়তে বসলাম গীতা। গীতা পড়তে পড়তে রোমাঞ্চিত হল সর্বশরীর—মনে হতে লাগল, আমিই যেন অর্জুন, চোখের সামনে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছি—বহু মুখ, বহু চোখ, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর, দংষ্ট্রাকরাল মুখগহ্বর, চোখে সূর্য-চন্দ্র জ্বলছে, সর্বাঙ্গে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি, স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত অপ্রমেয় বিরাট পুরুষ অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। ভীত বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমিই যেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।

পড়ছি মনে হল না, মনে হল, সত্যিই যেন শুনছি—

"আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, এখন আমার সংহারমূর্তি, তুমি যুদ্ধ না করিলেও কেহ রক্ষা পাইবে না। অতএব যুদ্ধ কর—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রু ভুঙ্ক্ষ রাজ্য সমৃদ্ধং।"

দৃশ্য বদলাল।

প্রকাণ্ড প্রান্তর। জ্যোৎস্না উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে সরকারী খাজনার গাড়ি লুট হয়ে গেছে, অপহৃত ধনসম্ভারের ব্যবস্থা করবার জন্যে চলে গেছে জীবানন্দ একটু আগেই অনুচরবর্গ সমেত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নির্জন মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি। ভবানন্দ নয়, আমি। গান ধরেছি গলা ছেড়ে মল্লার রাগিণীতে—

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

পিছনে আসছে মহেন্দ্র সিং নয় বন্ধু যতীন। গানের ফাঁকে ফাঁকে সহসা যেন শুনতে পেলাম বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর —মহাকাশ থেকে ভেসে আসছে মহাকালকে এড়িয়ে। সত্যিই মনে হচ্ছে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' যতীনের

মুখে শুনছি বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর—"জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল এই সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমি—"

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ঝলমলে-জরি-দেওয়া একটা লাল পাড়ের ঝলকানিতে সমস্ত মিলিয়ে গেল নিমেষে। চোখের সামনে ভেসে উঠল—আধখোলা জানলায় এক ফালি রোদ এসে পড়েছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বেণী রচনা করছে টগর, কাঁধের উপর বুকের উপর জ্বলজ্বল করছে জরি টকটকে লাল পাড়ের কোলে, সরু মেয়েলী গলায় কে যেন গান গাইছে ছায়ানটে—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না, যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না—'। আমি নির্নিমেষে চেয়ে আছি, উৎকর্ণ হয়ে শুনছি···গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ, টগর, যতীন···

দৃশ্য বদলাল।

নির্জন পার্ক। আমি আর যতীন পাশাপাশি বসে আছি। দুজনেরই পকেটে রিভলবার—তিনটে রিভলভার। মালদা থেকে যে ছেলেটির আসবার কথা আছে আজ রাত্রে এখানে, তাকে দিতে হবে একটা। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে বসে আছি আমরা, প্রত্যেক গেটে নজর রাখছি, বিশেষ করে উত্তর দিকের গেটটায়। সাহেবী পোশাক পরে চকোলেট রঙের ফেল্‌ট্ ক্যাপ

মাথায় দিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ওই গেট দিয়েই তার ঢোক-বার কথা। দুজনেই নিঃশব্দে বসে আছি। যতীনের মনে কি জাগছিল জানি না, কিন্তু আমি ভাবছিলাম দেশের বাগদী আর সাঁওতালদের দলে টানবার কথা। ভাবছিলাম শিবাজী আর রাণা প্রতাপ সিংহের কথা। পার্বত্য মাওয়ালী আর ভীলদের সুশিক্ষিত করেছিলেন তাঁরা, আমরাই বা—হঠাৎ উত্তর দিকের গেটটা দিয়ে ঢুকলেন একজন মহিলা। এসে বসলেন ঠিক আলোর নীচেই যে বেঞ্চিটা ছিল তার উপরে। যতীন আমার গা টিপলে। চুপচাপ করে কাটল আরও কয়েক মিনিট। মহিলা চুপ করে বসে রইলেন, মনে হল, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছেন। সহসা পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে রঙচঙে লুঙ্গিপরা চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে দুটি লোক ঢুকল। একজনের হাতে বেলফুলের মালা, আর একজনের বগলে একটা কালো বোতল, খুব সম্ভব মদই আছে তাতে। মশমশ করে এগিয়ে এল কিছুদূর, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে মহিলাটিকে। দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে, চোখে চোখে কি একটা ইশারা হয়ে গেল যেন, চুপি চুপি কথা হল, হাসিরও আওয়াজ পাওয়া গেল একটু। তারপর দুজনেই মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল, সোজা গিয়ে তাঁর সামনাসামনি দাঁড়াল। কি কথা হল শুনতে পেলাম না, কেবল দেখা গেল, মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। ক্রমশ বচসা শুরু হল, মহিলা রোষভরে চলে যেতে উদ্যত

হলেন, লোক দুটো হাত বাড়িয়ে পথরোধ করলে, এমন কি একজন হাত ধরে আকর্ষণও করলে, মহিলা চিৎকার করে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, অসহায়ভাবে চাইতে লাগলেন চারদিকে। কেউ কোথাও নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল যতীন। চুপি-চুপি বললে, তুই বসে থাক, আমি দেখি ব্যাটাদের। চলে গেল, নিমেষে গিয়ে হাজির হল সেখানে। যতীনকে দেখবামাত্র লোক দুটো যেন ভয় পেয়ে পালাল মনে হল। মহিলা মূর্ছা গেলেন। যতীন দু হাত দিয়ে না ধরলে দড়াম করে পড়ে যেতেন মাটিতে। মূর্ছিতা মহিলাকে সামলাতে যতীনের দু হাত যখন ব্যস্ত, তখন আচম্বিতে লোক দুটো ছুটে এসে পিছন দিক থেকে জাপটে ধরলে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হুইশলের তীব্র ধ্বনি শোনা গেল, সহসা পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল লাল-পাগড়ি পুলিশ—যতীন ধরা পড়ল। সমস্তটাই পুলিশের সাজানো ব্যাপার, মহিলাটি ভাড়া-করা। যতীনের নামে হুলিয়া ছিল। যতীন যে সর্বদা রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, তা পুলিশের অবিদিত ছিল না। আজ রাত্রে পার্কে আসবার কথাও পুলিশ টের পেয়েছিল আগে থাকতে। পুলিশের আশঙ্কা ছিল, সামনাসামনি ধরতে গেলে বিনাযুদ্ধে যতীন আত্মসমর্পণ করবে না—তাই এই ফাঁদ।

হাতকড়ি পরিয়ে দিলে। চড়াত করে একটা শব্দ হল। চাপদাড়িওয়ালা একটা পুলিশ চড় মারলে যতীনের গালে।

৭

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, সে আমার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রয়েছে, চোখে আগুন জ্বলছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, নিদারুণ একটা ঘৃণায় সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার।

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। ভয় পেয়ে।

অপরূপ একটা মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখখানা।

সে। কিসের ভয়ে? পুলিশের? তবে তার পরদিন পুলিশের কাছে গিয়ে ধরা দিলেন কেন অকপটে সব কথা স্বীকার করে? ভাগ্যে পুলিশ-অফিসারটি আপনার বাবার বাল্যবন্ধু ছিলেন, তাই রক্ষে পেয়ে গেলেন, তা না হলে তো—

আমি। আপনি কে?

সে। ও কথা থাক, তাতে লাভ কি হয়েছিল জানেন?

আমি। শুনেছি, যতীনের—

সে। হ্যাঁ। যতীনের কেস আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আমি। আপনি স্পাই নাকি?

সে। এতক্ষণে যা হোক ঠিক ধরতে পেরেছেন।

আমি। সত্যি স্পাই ?

সে। সত্যি।

চাপা হাসি চিকমিক করতে লাগল চোখে।

আমি। কে আপনি, বলুন—

সে। বিলেতে এত মেয়ে নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, অথচ আমার মতো সামান্য একটা মেয়েকে দেখে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ?

আমি। রাত-তুপুরে এই তেতালার ঘরে আপনার আবির্ভাবটা সত্যিই একটু উত্তেজনাজনক—তা ছাড়া আপনি—

সে। আমি শুধু নয় আরও অনেক এসেছে হয়তো।

আমি। তার মানে ?

সে। আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে আসবার সময় সম্ভবত এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে—

মুচকি হাসি ফুটে উঠল অধরে তার।

আমি। যে ?

সে। যে, বাইরে থেকে তেতলায় ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথা মনে ছিল না আপনার।

আমি। সেই দরজা দিয়ে এসেছেন ? বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু আপনি কে ?

সে। নামটা শুনতে চান ?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি, আমার নাম অনীতা।

আমি। অনীতা?

সে। নামটা পছন্দ হচ্ছে না? ওই ধরনের নামেরই তো আজকাল চলন হয়েছে। ঝড়ঝড়ে মোটরবাসের নাম যদি মেনকা হয়, তা হলে—

আমি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন আপনার নাম কি?

সে। যদি বলি যজ্ঞেশ্বরী, তা হলে কি পিত্তি চটে যাবে আপনার?

ঠোঁটে হাসি নেই, চোখ ছুটি হাসছে।

আমি। আমার মনের যা অবস্থা, তাতে রসিকতা ভালো লাগছে না এখন। সত্যি বলুন।

সে। সত্যি কথা বলায় বিপদ—লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি। বিশ্বাসযোগ্য হলে কেন তা বিশ্বাস করবে না?

সে। বিশ্বাসযোগ্য হলেও তা বলা নিরাপদ নয়।

আমি। আপনার সত্য পরিচয় কি অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা আছে?

সে। আমি এমনভাবে কখনও নিজেকে প্রকাশ করি নি, সুতরাং আমার পরিচয় প্রিয় হবে কি অপ্রিয় হবে তা জানি না। পরিচয়ের প্রয়োজনটাই বা কি বুঝতে পারছি না। অপরিচয়ের অন্তরালটাই তো রোমান্টিক!

আমি। সব সময়ে নয়।

সে। ধরুন, যদি বলি, আমি আপনার দূরসম্পর্কের পিসী।

আমি। পিসী!

সে। হতে বাধা কি?

চোখের দৃষ্টিতে আবার ছড়িয়ে পড়ল হাসির আভা।

আমি। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে আপনি আমার সব কথা জানলেন কি করে!

সে। এ যুগে কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হওয়াটাই কি আশ্চর্যজনক নয়? এ যুগে আকাশ থেকে সৈন্যবর্ষণ হয়, সমুদ্রের তলায় টর্পেডো ছোটে, রেডিওতে বাণী বহন করে, টেলিভিশনে দেখাসাক্ষাৎ হয়, থিওরি অব রেলেটিভিটি পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট করে। এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন! ওগুলোর যেমন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, এটারও আছে।

আমি। কিন্তু—

সে। না তর্ক থাক, ওগুলোকে যেমন মেনে নিয়েছেন, আমাকেও তেমনই মেনে নিন। কথায় কথায় আসল কথাটা চাপা পড়ে গেছে।

আমি। কেন?

সে। আপনি পালিয়ে এলেন কেন?

আমি। বললাম তো, ভয়ে।

সে। পুলিশের ভয়ে, না প্রথম প্রণয়িনী টগরের বিচ্ছেদের

ভয়ে? ঝলমলে জরিদার লাল পাড়ের ঝলকানির মোহটাই কি আসল কারণ নয়?

আমি। পুলিশের ভয় একটু ছিল বই কি। স্বীকার করলাম না হয় মোহটাই আসল কারণ, কিন্তু মোহ সত্ত্বেও আমি পরদিন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলেছিলাম, এটার আপনি একটুও মূল্য দেবেন না?

সে। গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার কোনো মূল্য নেই তো সত্যি!

আমি। যতীনের মতো ধরা পড়তে পারি, এ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। এর কোনো মূল্য নেই?

সে। থাকত যদি আপনি বাঙালী এবং পিতৃবন্ধু পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে না গিয়ে সাহেব পুলিশ কমিশনারের কাছে যেতেন।

আমি। তার মানে?

সে। তার মানে সত্যি সত্যি যদি বিপদকে বরণ করতেন। আপনি যা করেছেন, তাতে সাপ মরেছে কিন্তু লাঠি ভাঙে নি।

আমি। বুঝতে পারছি না ঠিক। আমি যার কাছে গিয়েছিলাম, তিনিও খুব কড়া লোক। সবাই তাঁকে বাঘ বলে।

সে। ভাত-খেকো বাঙালী বাঘ। চাকরি বাঁচিয়ে সুযোগ-মতো বন্ধুর ছেলেকে বাঁচাতে পারলে বাঁচাতে ইতস্তত করেন না। করেনও নি।

আমি। আপনি কি বলতে চান, আমি এত কথা ভেবে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম?

সে। জ্ঞাতসারে না ভাবলেও অজ্ঞাতসারে হয়তো ভেবেছিলেন।

আমি। ছি ছি, এত হীন ভাবেন আপনি আমাকে!

সে। হীন-অহীনের প্রশ্নই ওঠে না এতে। কিন্তু বুদ্বুদকে পর্বত মনে করি কি করে, বলুন? বুদ্বুদ অথবা পর্বত কেউ হীন নয়।

আমি। দেখুন, রবি ঠাকুরের যুগে উপমার ফেরে পড়ে আমরা অনেক সময় আসল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছি। দোহাই আপনার, উপমা দেবেন না, একটা প্রশ্নের সহজ উত্তর দিন যদি পারেন। ব্যাপারটা আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি আজও।

সে। কি বলুন?

আমি। সেদিন আমি পুলিশের কাছে গেলাম কেন টগরকে ভালোবাসা সত্ত্বেও? বিশ্বাস করুন আমি কল্পনাও করি নি যে, তিনি আমায় বাঁচিয়ে দেবেন। আমি তখন জানতামও না যে, বাবার কাছে তিনি টাকা ধার নিয়েছেন। আমি ধরা দিতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন? আমার প্রথম প্রণয়ের আকর্ষণটা কিছু কম প্রবল ছিল না, নবোদ্ভিন্নযৌবনা টগর বাহুপাশে ধরা দেব-দেবও করছিল, তবু আমি কারাবরণ করতে ছুটলাম কেন?

সে। দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, টগরের চক্ষে

নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করবার জন্মে, যদিও তা বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর সামিল, আর দ্বিতীয়, হয়তো মানুষের বিবেক পশুর বিবেককে পরাভূত করেছিল ক্ষণিকের জন্য এবং তারই উত্তেজনায় হয়তো আপনি ছুটে গিয়েছিলেন দিগ্বিদিগ্জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঙালীসুলভ উচ্ছ্বাসবশত। সত্যি সত্যি ধরা পড়লে হয়তো দ্বীপান্তরে বসে অনুতাপ করতেন এর জন্য আজীবন।

আমি। অনুতাপ করতাম! ঠিক জানেন আপনি?

হঠাৎ আলো নিবে গেল।

৮

তালুকপুরের স্কুলের থার্ড মাস্টারের শয়নকক্ষ। থার্ড মাস্টার অবিবাহিত যুবক। গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন একা। ঠিক জানলার নীচেই বেলফুলের ঝাড়ে অজস্র বেলফুল ফুটেছে, খোলা জানলা দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশ দেখা যাচ্ছে খানিকটা, ধনুরাশির ঠিক নীচেই করোনা বোরিয়ালিস খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছায়াপথের খানিকটা দেখাচ্ছে ঠিক এক টুকরো ধবধবে সাদা মেঘের মতো। অন্যদিন হলে এমন পরিষ্কার আকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠত থার্ড মাস্টার। হয়তো ম্যাপ খুলে সমস্ত রাত্রি জেগে বসে থাকত ছাতে কুম্ভরাশির শতভিষা নক্ষত্র দেখার জন্য। আজ কিন্তু তার ওসব কিছুতে মন নেই। আজ তার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে একটি কথাই চিন্তা করছে—বাতাসী অন্তঃসত্ত্বা, জানাজানি হয়ে গেছে। গ্রামের বেওয়ারিশ মেয়ে বাতাসী, অন্তত এতকাল বেওয়ারিশ ছিল, সবার বাড়িতে ঝি-গিরি করে বেড়াত। থার্ড মাস্টারের বাসা-বাড়িতেও। কানাঘুষো চলছিল অনেক দিন থেকে, আজ কিন্তু আর সন্দেহ নেই, সত্যিই সে সন্তানসম্ভবা। শুধু তাই নয়, তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী হাজির হয়েছে হঠাৎ এসে। দশ বছরের বাতাসীকে বিয়ে করে যে লোকটা আড়কাঠিদের সঙ্গে আসাম অঞ্চলে চলে গিয়েছিল, আট বছর পরে সে সশরীরে ফিরেছে এবং দাবি করছে

তার স্বামিত্বের অধিকার মহাসোরগোল করে। বাতাসীকে মারধোর করেছে খুব। মার খেয়েও বাতাসী কিন্তু মাস্টারের নাম বলে নি। অন্ধকার ঘরে মাস্টার এপাশ-ওপাশ করছে একা বিছানায় শুয়ে। বাতাসীর মুখখানা মনে পড়ছে বার বার, বিশেষ করে বাঁ গালের উপর বেতের কালো তির্যক দাগটা। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে মাস্টার উঠে বসল, আলো জ্বেলে তোরঙ্গটা খুললে, তারপর তোরঙ্গর তলা থেকে বার করলে দুশো টাকার একতাড়া নোট, অর্থাৎ বছর খানেক চাকরি করে সে কায়ক্লেশে যে কটা টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিল তার সমস্তই। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নোটের তাড়াটা বুক-পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ল সে। গভীর রাত্রি, নির্জন পথ। ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল দু-একটা কুকুর, চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল দূরে। সাপে ব্যাঙ ধরলে যেমন একটা আওয়াজ হয়, তেমনই একটা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল,—মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর ভেকের আওয়াজ নয়, এক জাতীয় পেচক-দম্পতীর বিশ্রম্ভালাপ। মাস্টারের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সোজা গিয়ে উঠল সে বাতাসীর বাড়িতে। ডাক দিতেই বাতাসী বেরিয়ে এল। চোখে হরিণীর মতো ভীরু দৃষ্টি।

"তোর স্বামীকে ডেকে দে!"

"কেন—"

"দরকার আছে—"

ডাকতে হল না, আপনিই বেরিয়ে এল সে

দুশমনের মতো চেহারা। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরের উপরার্ধ, অনেকটা গরিলার মতো। মুখে গোঁফ দাড়ি ভ্রূ কিচ্ছু নেই, আছে কেবল ছোট ছোট এক জোড়া চোখ, প্রাণ-হীন দৃষ্টি তাতে। একমাথা বাবরি-করা চুল। নাকটা থ্যাবড়ানো, ডগের দিকটা একটু বাঁকাও। নাকের ঠিক নীচেই গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। মাস্টারের ফরসা জামা-কাপড়ের জন্যই হোক, কিংবা অভ্যাসবশতই হোক, লোকটা বেরিয়ে এসেই মাস্টারকে সেলাম করলে। মাস্টার নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এরই স্ত্রী বাতাসী! তারপর অতিশয় অবান্তর প্রশ্ন করে বসল একটা।

"তোমার নাকের ওখানটায় কি হয়েছিল?"

"ম্যানেজার সাহেব লাথি মেরেছিল।"

"কোথাকার ম্যানেজার?"

"চা-বাগানের।"

থতমত খেয়ে গেল মাস্টার। নিজেকে ওই ম্যানেজারের সমশ্রেণীর বলে মনে হতে লাগল। খানিকক্ষণ কোনো কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। লোকটাও হাঁ করে চেয়ে রইল। স্তব্ধতাকে সচকিত করে পাশের বৃহৎ বটগাছটায় কলরব করে উঠল কতকগুলো পাখি একযোগে, গ্রামপ্রান্তে ডেকে উঠল এক দল শেয়াল। যামিনীর দ্বিতীয় যাম শেষ হল। মাস্টারের চমক ভাঙল।

"শোন—"

"আমাকে ডাকছেন?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে লোকটা।

"হ্যাঁ, তোমাকেই। তুমি বাতাসীর স্বামী তো?"

"হ্যাঁ হুজুর—"

ঘাড় ফিরিয়ে বাতাসীর দিকে চাইতে গেল, কিন্তু বাতাসী ছিল না, ভিতরে চলে গিয়েছিল।

"তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার। এস আমার সঙ্গে।"

"এত রাতে কোথা যাব?"

"ভয় নেই তোমার, এস না!"

লোকটা দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর বললে, "একটু দাঁড়ান তা হলে, তালাটা লাগিয়ে আসি—"

মাস্টার কিছু বলবার আগেই চলে গেল। শব্দ হল কাকে যেন ভেতরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দড়াম করে কপাট লাগিয়ে শিকল তুলে দিলে। তালায় চাবি লাগানোর শব্দটাও পাওয়া গেল। মাস্টার নিঃশব্দে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

লোকটা বেরিয়ে এল।

"চলুন—"

খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠটায় এসে পৌঁছল দুজনে। চাঁদ উঠছে।

"বস—"

দুজনে মুখোমুখি হয়ে বসল। অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করলে মাস্টার, এতটুকু গোপন করলে না কিছু। সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে শেষে বললে, "বাতাসীর কোনো দোষ নেই, সব দোষ আমার, ওকে কিছু বোলো না তুমি। ইচ্ছে কর তো আমাকে খুন করতে পার।"

"খুন করব? আপনাকে? রাম রাম, কি যে বলেন, আপনি হলেন একটা মহাপুরুষ লোক—"

ছোটলোকদের কাছ থেকেও মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যঙ্গ-রসের নমুনা পাওয়া যায়। মাস্টার নীরবে হজম করলে খোঁচাটা। বরং আঘাত পেয়ে একটু যেন আরামই পেলে অপ্রত্যাশিতভাবে। এই কদর্য লোকটার অসহায় চাহনি এতক্ষণ যেন পীড়িত করছিল তাকে। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল নীরবে। হঠাৎ লোকটার মুখে ফুটে উঠল একটা কুৎসিত হাসি, নাকের নীচের ক্ষতচিহ্নটা কুঁকড়ে বেঁকে গেল, একটা কালো কেন্নো যেন নড়ে চড়ে উঠল।

"বেশ, আপনিই নিন তবে ওকে। আপনার কাছেই থাকুক ও।"

তালার চাবিটা বাড়িয়ে ধরলে। "গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেলেই আমি চা-বাগানে ফিরে যাব—"

"আমি ওকে নিতে চাই না। তুমিই নিয়ে যাও।"

বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে।

"পরের বোঝা ঘাড়ে করে কোথায় ঘুরব আমি ?"

মাস্টারের বলতে ইচ্ছে করল, "পরের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ানোটাই তো তোমার পেশা বাপু, চায়ের বাগানে যে বোঝা বয়ে বেড়িয়েছ এতকাল, তা কি তোমার নিজের ?" বলতে ইচ্ছে করল, কিন্তু বললে না।

বললে, "না, তুমিই নিয়ে যাও ! হাজার হোক, তোমার বিয়ে-করা বউ। খরচপত্তর যা লাগে, তা আমি দিচ্ছি—"

"কত দেবেন ?"

"দু শো—"

মাস্টারের অভিজ্ঞতা কম, তাই একবারেই সবটা বলে ফেললে, দরদস্তুর করবার কথা মনে হল না। পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বার করতেই লোকটা লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাতেও নোট চিনতে ভুল হয় নি তার। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে জিব বার করে ঠোঁট দুটো চাটলে, তারপর বললে, "দু শো টাকা বড় কম হয় হুজুর, এত বড় একটা ঝুঁকি ঘাড়ে করা, গরিব মানুষ আমি—"

বাঁ হাতের অনামিকায় দামী পাথর-বসানো একটা সোনার আংটি ছিল মাস্টারের। নির্বিকার চিত্তে সেটাও খুলে দিয়ে মাস্টার বললে, "বেশ, এটাও নাও, কালই কিন্তু চলে যেতে হবে এখান থেকে। আর কেউ যেন না এ কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে।"

"যে আজ্ঞে—"

টাকা আর আংটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর ঝুঁকে সেলাম করে চলে গেল। চুপ করে বসে রইল মাস্টার। কিছুদূর গিয়ে লোকটা আবার ফিরে এল।

"আপনি লোকটি কে, তা তো বুঝতে পারলাম না হুজুর—"

"আমি এখানকার স্কুলের থার্ড মাস্টার—"

"ও!"

রোমহীন ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

"ছেলেদের পড়ান আপনি?"

"হ্যাঁ—"

আরও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

"আচ্ছা আসি তবে—"

ঝুঁকে, একটু বেশি রকম ঝুঁকে, সেলাম করে চলে গেল। মাস্টার বসে রইল চুপ করেই, আকাশের দিকে চাইলে একবার। কুচকুচে কালো আকাশে মেঘের লেশ নেই, একেবারে নির্মল, মকর রাশির যুগ্ম নক্ষত্র দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

৯

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, তার চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটিতে ব্যঙ্গের হাসি।

সে। এত বড় পুণ্য কর্ম করে শেষে আপনি অনুতাপ করেছিলেন। এখনও করেন বোধ হয়।

আমি। সঙ্গত কারণ আছে তার। লোকটা যাবার সময় আংটি দেখিয়ে আমার নামে নালিশ করে গিয়েছিল স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছে, ফলে আমার চাকরি যায়। বাতাসীকেও সে দূর করে দিয়েছে শুনেছি। আগে সন্দেহ করলে, কিছু দিতাম না, তা ঠিক।

সে। দ্বীপান্তরে যাবার পরও অনুতাপ করবার অনুরূপ সঙ্গত কারণ জুটত আপনার। অনেকের জুটেওছে।

আমি। প্রত্যেক কাজের ফলাফল অনুসারেই লোকে আনন্দিত অথবা অনুতপ্ত হবে, এ আর বিচিত্র কি!

সে। প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামান আপনারা। ভিখারীকে একটা পয়সা দেবার আগেও গবেষণা করেন, লোকটা পয়সাটা নিয়ে কি করবে, গাঁজা খাবে, না ছাতু খাবে।

আমি। দূরদর্শিতা জিনিসটা তো খারাপ নয়।

সে। নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এক রকম হওয়াই ভালো। নিছক অদূরদর্শী লোককেও ভালোবাসা শক্ত নয়, কিন্তু যারা সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে কখনও দূরদর্শী, কখনও অদূরদর্শী হয়, তাদের শ্রদ্ধা করা যায় না। তা ছাড়া দু নৌকায় পা দিয়ে চলাও শক্ত, শেষ পর্যন্ত তাতে ডুবতে হয়।

আমি। আমি দু নৌকায় পা দিয়েছি ?

সে। দিয়েছেন বইকি !

আমি। নৌকো দুটোর নাম ?

সে। স্বার্থ এবং ত্যাগ। সাময়িক একটা উচ্ছ্বাসে আপনি ত্যাগী সেজেছেন, কিন্তু যেই স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, অমনিই আবার পেছিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, পেছিয়ে আসাটার একটা চমৎকার ব্যাখ্যাও বার করেছেন সঙ্গে সঙ্গে, এইটে আরও মজার। আপনার দেশপ্রেম নারীপ্রেম দুটো ব্যাপারেই দেখুন।

আমি। দুটো ব্যাপারেই আমি পেছিয়ে এসেছি তা ঘটনা হিসাবে ঠিক, গোলমাল হচ্ছে নামকরণ নিয়ে। আপনি ওটাকে বলছেন—পলায়ন, আমি যদি বলি—সংশোধন ? টেররিজ্‌ম্ বা বাতাসীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করা, এ দুটোর কোনোটাকেই আমি ভালো বলে মনে করি না।

সে। আমিও করি না। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা জিনিসটা তো ভালো নয়। আমার যতদূর মনে হয়, আপনার মনোভাব ঈশপের আঙুরলোভী শেয়ালটার মনোভাবের মতো অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চনা।

আমি। আত্মপ্রবঞ্চনা ?

সে। সারাজীবন তো তাই করেছেন! ধরুন না, যে কারণে আই. এ. পাস করবার পর আপনি তালুকপুরে গিয়ে হাজির হলেন, সেই কারণটা আপনার কাছে কত বড় মনে হয়েছিল প্রথম প্রথম, কিন্তু—

আমি। মুরগি খাওয়া এখনও আমি পাপ বলে মনে করি না।

সে। তা হয়তো করেন না, কেই বা করে আজকাল, কিন্তু তখন যেটাকে একটা মহৎ কর্ম বলে মনে হয়েছিল, জীবনের একটা প্রধান প্রিন্সিপ্‌লের মর্যাদা দিয়েছিলেন তাকে—এত বড় যে, জন্মদাতা পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে তালুকপুরে চলে যেতে বাধে না তখন আপনার।

আমি। বাবার ওসব সেকেলে গোঁড়ামি আমি এখনও সমর্থন করি না।

সে। কিন্তু প্রতিবাদের জোরটা কমে এল, যেই সেখানকার চাকরিটা গেল। সুড়সুড় করে ফিরে এলেন সেই বাবারই কাছে আবার।

আমি। তালুকপুর থেকে আমি বাবার কাছে ফিরি নি।

সে। ফিরেছিলেন মামার কাছে তা ঠিক কিন্তু আপনার মামা যে আপনার হয়ে আপনার বাবার কাছে ওকালতি করছিলেন, সে কথা আপনি জানতেন। এমন কি তিনি মিছে

করে আপনার অনুতাপের এবং গোবর খাওয়ার কথা বলেছিলেন তাঁকে, তাও আপনার অবিদিত ছিল না।

আমি। কিন্তু বাবা যতক্ষণ না নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেছেন, ততক্ষণ আমি যাই নি।

সে। আপনি তাঁর একমাত্র পুত্র, আপনার সম্বন্ধে দুর্বলতা থাকা তো খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে ঘরে স্থান দিতে রাজী হন নি, যতক্ষণ না আপনার মামা এসে তাঁকে মিছে কথা বলে বোঝালেন যে, আপনি অনুতপ্ত এবং গোবর খেয়েছেন।

আমি। বাবা আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসাও করেন নি একবার।

সে। তিনি না করলেও আপনার কি তাঁকে স্পষ্ট বলা উচিত ছিল না যে, আমি গোবরও খাই নি, অনুতপ্তও নই, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে আবার মুরগি খাব, এ শুনেও যদি আপনি বাড়িতে স্থান দিতে রাজী থাকেন তবেই যাব।

আমি। বাবা অবুঝ, যুক্তির কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে, ওসব কথা বলে লাভ কি তাঁকে ?

সে। ওইটেই আত্মপ্রবঞ্চনা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার চিবুকের গড়নটা বাতাসীর চিবুকের মতো, মালতীর মতো হাসবার ধরন, নাম-না-জানা বহুকাল পূর্বে দেখা সেই জেক মেয়েটির মতো গ্রীবাভঙ্গী। অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম

একটু। সেই জেক মেয়েটির কথাই মনে হতে লাগল বার বার। প্যারিসেরই একটা কাফেতে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, সমস্ত বিধি-বিধান অতিক্রম করে নিজেই এসে আলাপ করেছিল উপ-যাচিকার মতো। হেসে বলেছিল, সমাজের বিধি-বিধান মানতে মানতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, চতুর্দিকে কেবল ফর্ম, আর সেফটি ফার্স্ট! বিপদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি অ্যাডভেঞ্চার।

"তা হলে এখানে কেন, আফ্রিকায় যান—"

"ঠিক বলেছেন, এখানকার ভিড়টাও যেন ফ্যাকাশে গোছের, কেবল আপনাকেই একটু রঙিন মনে হচ্ছে, আপনার চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি পূর্বদিগন্তের রহস্যময় ওরিয়েন্টাল স্বপ্ন, আসুন আপনার সঙ্গে নাচি একটু।"

সোনালী রঙের অলক দুলিয়ে আহ্বান করলে। নৃত্যপরা সেই মোহিনীর দেহের উত্তাপ এখনও অনুভব করছি যেন, চোখের উপর ভেসে উঠছে তার হাসি, চাহনি, বিশেষ করে তার বেশের বর্ণ-বাহুল্য। মজবুত মোটা টকটকে লাল কাপড়ে তৈরী মাথার টুপি, প্রশস্ত মাফলার, চমৎকার কাজ করা তাতে সোনার সুতোয়। দুগ্ধধবল ঢিলে জামা, ঘন নীল স্কার্ট। তন্বী, সুন্দরী, যৌবনরসে টলমল করছে।

সে। একটা কথা মনে আছে ?

আমি। কি ?

সে। নাচের পর তাকে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার

শিকারের যে গল্পটা করেছিলেন, সেটা আগাগোড়া বানানো ? সুন্দরবনে আপনি কখনও যান নি। অথচ তাকে যখন গল্পটা বলছিলেন, তখন আপনার নিজেরও মনে হচ্ছিল যে, ঘটনাটা সত্যি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম।

সে। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে করতে মনের এমন নিদারুণ অবস্থা হয়েছে যে, আত্মহত্যা করাটাকেও বীরত্বের পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছেন শেষে।

আমি। প্রিয়তম জীবনকে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে বীরত্ব আছে বইকি।

সে। থাকত, যদি ভরা-ভোগের মাঝখানে স্বেচ্ছায় তাকে ছাড়তে পারতেন। বাতাসীর মতো একটা সামান্য মেয়েকেও ভালোভাবে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই যার—

আমি। বাতাসীকে ভোগ করি নি ?

সে। ওকে ভোগ করা বলেন ? একটু বিপদের আভাস দেখেই রাত্তিরে চোরের মতো গিয়ে তার স্বামীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে আসার নাম—ভোগ করা ? তার হাত ধরে সমস্ত বিঘ্ন বিপদ মাথায় নিয়ে সর্বনাশের অতলস্পর্শী গহ্বরে যদি নামতে পারতেন, তাহলেই তা ভোগের মর্যাদা পেত।

আমি। কিন্তু মজুরি পোষাত না।

কোনো উত্তর দিলে না সে।

বাতাসীর কথাই মনে পড়তে লাগল বার বার। শুনেছি, লোকটা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কোথায় গেল সে, কি হল তার সন্তানের ?

সে। ভাল কথা, আপনি তো খুব মার্জিতরুচি লোক, ওই ছোটলোকের মেয়েটাকে ছুঁতে আপনার প্রবৃত্তি হল কি করে ?

আমি। আমার মনের গুহায় যে অদম্য আদিম পশুটা বেঁচে আছে, টগর তাকে লোলুপ করে তুলেছিল, কিন্তু ধরা দেয় নি, শেষ পর্যন্ত হয়তো দিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় মুরগি খাওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, চলে যেতে হল তালুকপুরে, দেখা হল বাতাসীর সঙ্গে।

সে। টগর ধরা দিত না।

আমি। কেন ?

সে। কারণ তার বলিষ্ঠ স্বামী ছিল একজন। সতেরো-আঠারো বছরের একটা ছোঁড়ার মধ্যে বলিষ্ঠতর সে কিছুই দেখতে পায় নি।

আমি। হাব-ভাবে ইঙ্গিতে তবে সে আমাকে অমন লোলুপ করে তুলছিল কেন ?

সে। লোলুপ করে মজা দেখছিল।

আমি। মজা দেখছিল ! কেন ? উদ্দেশ্যটা কি ?

সে। উদ্দেশ্য বোধ হয় আত্মপ্রসাদ। বড় শিকারীরা অনেক সময় কাকবগের দিকে গুলি ছোঁড়ে কাকবগের মাংসে

তার লোভ আছে বলে নয়, হাতের লক্ষ্য ঠিক অব্যর্থ আছে কি না পরখ করবার জন্যে। তার আসল কাম্য বাঘ-সিংহ। আপনি তখন লোভনীয় ছিলেন না।

আমি। কিন্তু এত কথা জানলেন কি করে আপনি ?

সে। আপনি নিজে জানেন যে, যদিও সেটা স্বীকার করতে আত্মাভিমানে একটু ঘা লাগে আপনার। সেদিন শেয়ালদা স্টেশনে প্যাসেঞ্জারের ভিড় ঠেলে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সে আপনাকে ভালো করে চিনতেই পারলে না। স্যুট্‌কেস, হোল্‌ডল, গয়নার বাক্স, স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ব্যস্ত সে। পূর্বস্মৃতিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না কই তো!

আমি। আট বছর আগেকার কথা, তাই হয়তো—

সে। আট কেন, আটাশ বছর পরেও জ্বলজ্বল করত আপনার মুখখানা তার বুকের ভেতর, যদি সত্যিই সে আপনাকে ভালোবাসত কোনোদিন।

বিস্ময় বাড়তে লাগল আমার। কে এ ? সত্যিই কোনো জাদুকরী নাকি ?

আমি। আমার এত রকম দুষ্কৃতির খবর জেনেও তো আপনি একা এত রাত্রে আমার কাছে এসেছেন! আপনার সাহস আছে বলতে হবে।

মুচকি হাসলে একটু।

সে। আপনার সব খবর ভালোভাবে রাখি বলেই সাহস

হয়েছে। বিলেতে যে সব 'ক্যাসুয়াল অ্যাফেয়ারে' লিপ্ত হয়েছিলেন, সেইগুলিই আমার ভরসা যদি বলি ?

আমি। তার মানে ?

সে। বহুবার টিকে নেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ মারাত্মক রকম কিছু হবার সম্ভাবনা কম।

উত্তেজনাভরে উঠে বসতে গিয়ে মচকানো পা-টায় সমস্ত শরীরের ভার পড়ল, লাগল খুব। যন্ত্রণাটা বোধ হয় পরিস্ফুট হল চোখে-মুখে।

সে। দার্জিলিং থেকে নামবার সময় অত ঊর্ধ্বশ্বাসে না নামলেই পারতেন, ট্রেনের যথেষ্ট সময় ছিল। তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে পা-টা মচকে ফেললেন শুধু শুধু।

মনে হচ্ছে, এ জেন জাদুরও সীমা অতিক্রম করেছে।

সে। ব্যথাটা এখনও কমে নি ?

আমি। না।

সে। মিনতি বেচারী শেক দেবার জন্যে তো কতবার এল কেতলি হাতে করে, আপনি আমলই দিলেন না তাকে ! বেচারী !

কি বলব, চুপ করে রইলাম। তার চোখের কোণে একটা দুষ্টু হাসি উঁকি মারতে লাগল।

সে। চুপ করে আছেন যে ?

আমি। কি আর বলব বলুন ? আপনি বদ্ধপরিকর হয়ে

এসেছেন আমাকে অপমান করবেন বলে, প্রতিবাদ করা নিষ্ফল, কেন এসেছেন তাও বুঝতে পারছি না। কেবল ভাবছি, কখন শেষ হবে!

সে। একটাও মিছে কথা বলেছি কি? সত্যি যা জানি তাই বলেছি, তাও অপরের কাছে নয়, আপনারই কাছে।

আমি। আর কত বাকী আছে।

সে। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ভাবছি, রাগ করবেন, না বিস্মিত হবেন!

আমি। রাগ করলে তা প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হব। আপনি অসঙ্কোচে যা খুশি করতে পারেন, যা ইচ্ছে বলতে পারেন, কারণ আপনি মহিলা। আমার সে সুবিধে নেই। কি বলবেন, বলুন?

সে। আপনার আমন্ত্রণেই আমার অস্তিত্ব এখানে সম্ভব হয়েছে।

আমি। আমার আমন্ত্রণে?

সে। আমন্ত্রণে না বলে 'তাগিদে' বললে আরও ঠিক হয়। বস্তুত আপনিই আমাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছেন নিজের সামনে, অথচ সে কথাটা নিজেই ভুলে যাচ্ছেন।

আমি। বলেন কি! আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? একটুও মনে পড়ছে না তো! মালতীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আসতে রাজী হল না।

সে। সে যে এখন মিসেস গুপ্ত, যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে কি সে, হলই বা রমেশবাবু আপনার বন্ধু!

আমি। থাক তার কথা, আপনার কথা বলুন। কবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম? ইদানীং আমার স্মৃতিশক্তি কম হয়ে গেছে তা ঠিক, কিন্তু তবু এতবড় একটা ব্যাপার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া আজ রাত্রে আর কাউকে নিমন্ত্রণ করতেই পারি না যে!

সে। ন্যান্সি যদি আসে?

আমি। কোন ন্যান্সি?

সে। এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? পিকাডিলির হোটেলের সেই ওয়েট্রেস। মালতীর বাবা যখন আপনাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন, তখন যার উপার্জনে ভাগ বসিয়ে বিলাত-প্রবাসের শেষের দিন কটা কাটিয়েছিলেন, মনে নেই তাকে? সে হয়তো এখনও আপনার পথ চেয়ে আছে।

আমি। আমি তার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সে। সে কিন্তু টাকা চায় নি।

আমি। আপনি কে, বলুন, আপনি কে—।

সে। বিশ্বাস করবেন? যদি বলি, আমিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, যাকে আপনি নির্বিচারে সহ্য করে এসেছেন এতকাল, যে আপনাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, উদ্দীপ্ত করেছে, অবসন্ন করেছে—

আমি। তার মানে?

সে। মানে, যদি বলি, আমি আপনার অন্তরতম, বিশ্বাস করবেন? আজ সকালে মালতীর ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের ফাঁকে ফাঁকে যখন মালতীকে দেখছিলেন, তখন আপনি মালতীকে দেখছিলেন না, আমাকেই দেখছিলেন।

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। আমি কি একটা বলতে গেলাম। আলো নিবে গেল হঠাৎ।

১০

ধূ ধূ করছে মরুভূমি চারিদিকে। আরবের ঊষর মরুভূমি। ঊষর কিন্তু সুন্দর, ভীষণ কিন্তু মুগ্ধ করে। সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার স্বর্ণদীপ্তি জ্বলছে এখনও ক্ষুদ্র বৃহৎ বালু-গিরিশ্রেণীর শিখরে শিখরে। বেশিক্ষণ জ্বলবে না, এখনই নামবে অন্ধকার, গিরিশ্রেণীগুলির পূর্বসানুদেশে ছায়া ঘনাতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, বালি ছাড়া আর কিছুই নেই—উঁচু নীচু ছোট বড় বালির পাহাড় কেবল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল-তরঙ্গসমাকুল একটা মহাসমুদ্র যেন মন্ত্রবলে বালুময় হয়ে গেছে। উত্তাল তরঙ্গ, উত্তাল কিন্তু গতিহীন, নীল স্বচ্ছ নয়, ধূসর অস্বচ্ছ। স্তব্ধ স্তম্ভিত মূর্তি। এই স্তব্ধতাও বেশিক্ষণ থাকবে না, আঁধি আসবে, আসবে প্রলয়ঙ্কর সাইমুম, অবলুপ্ত হয়ে যাবে গিরিশ্রেণী দেখতে দেখতে, আকাশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার শান্ত হবে সব, আকাশ নির্মল হবে, নবীন সূর্য নবসৃষ্ট গিরিরাজির উপর বর্ষণ করবে নবময়ূখমালা।

দূরে উটের সারি চলেছে। বিরাট আকাশের উদার পটভূমিকায় চলেছে বণিকের দল। অতি মনোরম দেখাচ্ছে। কবির চোখে যত মনোরম দেখায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মনোরম দেখাচ্ছে আমার চোখে। শক্ত হয়ে উঠছে শরীরের পেশীগুলো,

চঞ্চলতর হয়ে উঠছে শোণিতপ্রবাহ, চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছে, তীক্ষ্ণ বর্শাটাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরছি।···উটের সারি চলেছে, বণিকের দল প্রবেশ করেছে আমাদের সীমানায় বিনা অনুমতিতে। মূল্য দিতে হবে, শুল্ক দিতে হবে, অমনই ছেড়ে দেব না। আমরা ধনী নই, বিলাসের কোলে লালিত আদুরে দুলাল নই, আমাদের সম্বল শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, নিষ্ঠুরতা। বেদুঈন আমরা, মরুচারী দস্যু। মরুভূমির মতোই শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত নির্মম, মরুভূমির মতোই প্রসারিত করে দিয়েছি নিজেদের জীবন ওই দূর দিগন্ত পর্যন্ত। কোথাও বাসা বাঁধি নি, কোথাও আটকা পড়ি নি। বাস করি তাঁবুতে, চারণভূমির সন্ধানে ঘুরে বেড়াই দিক হতে দিগন্তরে। মরুভূমিতেই আমাদের প্রাণ, মরুভূমিতেই আমাদের মরণ, এই আমাদের রাজ্য, এই আমাদের কবরস্থান। এখানে কারও প্রবেশ-অধিকার নেই। প্রবেশ করে কেউ যদি, মূল্য দিতে হবে, মূল্য আদায় করে নেব। বাহুর পেশীতে শক্তি আছে, বর্শাফলকে তীক্ষ্ণতা আছে।

আলোছায়া-খচিত মরুভূমির এই প্রদোষ-আলোকে তাই অশ্বারোহী বেদুঈন আমি ওই উটের সারির দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, সঙ্গীরা সবাই চেয়ে আছে। হঠাৎ দৃষ্টি-বিনিময় হল সকলের, ঘোড়ার লাগামে ইশারা সঞ্চারিত হল, তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, আকাশ জুড়ে বালি উড়ল। দেখতে দেখতে তাদের নিকটবর্তী হলাম, একপাল ক্ষুধিত নেকড়ের মতো ঘিরে

ফেললাম তাদের। উটের উপর থেকে গুলি করলে কে একজন. ক্ষেপে উঠলাম আমরা। শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুতে ফিরছি। সঙ্গে লুটের মাল, বন্দী-বন্দিনীর দল। বন্দিনী মাত্র একজন, সম্ভ্রান্তবংশীয় মিশরীয় রমণী বোধ হয় কোনো. মুখ দেখা যাচ্ছে না, মুখের সামনে দুলছে রেশমের ঘন-নীল জালিকা। মুখ দেখবার চেষ্টাও করি নি আমরা, ওকে চাই না, চাই অর্থ ওর বিনিময়ে। শেখ আজ খুশী হবেন খুব, অভিযান সফল হয়েছে। দলের মালিক কিন্তু ধরা পড়ে নি, একজন নিহত বেদুঈনের ঘোড়া নিয়ে তীরবেগে সে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়, ধরা গেল না। কিন্তু তার অনুচরদের বন্দী করেছি, বেগমকেও। কাপুরুষ যদি না হয়, ফিরতেই হবে তাকে। প্রচুর অর্থ দিয়ে উদ্ধার করতে হবে এদের।

অন্ধকার রাত্রি···দেহ ক্লান্ত। দূরে গাঢ়তর অন্ধকারপুঞ্জের মাঝখানে ছোট ছোট আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে, ওয়েসিসের মাঝখানে আমাদের তাঁবু। এখানে কাল আর তাঁবু থাকবে না, এখানকার ঘাস নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ঠিক বাইরে বসে প্রকাণ্ড চামড়ার মশকে দুধ ঝাঁকাচ্ছে

শেখের দুটি মেয়ে। দুজনেই নব-যৌবনা। আমাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একজনের মুখ, ঊর্ধ্বমুখী চোখের দৃষ্টিতে দপ করে জ্বলে উঠল খুশির আলো, আলোক বিচ্ছুরিত হল বিকশিত দন্তরাজি থেকে। সঙ্গিনী ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইছে দেখে সামলে নিলে নিজেকে। টকটকে লাল রুমালটা কপালে ফিতের মতো বাঁধা, আটকে রেখেছে কোঁকড়ানো চুলের রাশিকে। পরেছে কালচে-সবুজ রঙের মোটাসোটা কাপড়টা সর্বাঙ্গে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে। পাড়ের উজ্জ্বল সবুজ, প্রখর লাল, সোনালী হলুদ অদ্ভুত দেখাচ্ছে আলো-আঁধারিতে। এত বেশি দুধ ঝাঁকানো হচ্ছে, সম্ভবত বেশি মাখনের প্রয়োজন আজ। শেখ বোধ হয় অতিথিসৎকার করছেন। কফির সরঞ্জামও প্রস্তুত হচ্ছে তা হলে তাঁবুর ভিতরে।

দৃশ্য বদলাল।

তাঁবুর ভিতর ফরাশ বিছানো হয়েছে। খেতে বসেছি আমরা। অর্ধপক্ক মাংস আর ধূমায়িত ভাত পরম তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছি। ইয়োরোপীয়ান পর্যটক এসেছেন একজন, শেখের আতিথ্য স্বীকার করেছেন আর একজন শেখের পরিচয়পত্র নিয়ে। অতিথির সম্বর্ধনাকল্পে ওসমান বাঁশিতে গজল ধরেছে, গোলাপী আতর মেশানো হচ্ছে গরম কফিতে, শেখ অতিথির সঙ্গে আলাপ করবার বৃথা চেষ্টা করছেন ভাষার পার্থক্য

সত্ত্বেও। এমন সময় হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল তাঁবুর পিছন দিকে, পরদার ওপারে মেয়েরা চীৎকার করে উঠল। বিদ্যুৎবেগে দাঁড়ালেন শেখ, নিমেষের মধ্যে হাত চলে গেল আবার নীচে, সঙ্গে সঙ্গে চকমক করে উঠল বাঁকা ছোরাখানা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে, ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে গেলাম। সেই পলাতক মালিক ফিরেছে, আমাদের ঘোড়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। সে এসেই ছোঁ মেরে তার বেগমকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

আমরাও ছুটলাম। সমস্ত রাত পশ্চাদ্ধাবন করলাম তার। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল, আগুনের গোলার মতো সূর্য উঠল অগ্নিবর্ষণ করতে করতে। তবু ছুটছি। হঠাৎ তার ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ল একটা বালিয়াড়ির চড়াই ভাঙতে গিয়ে, ছিটকে পড়ল দুজনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে হাজির হলাম। তার মুখের জালিকা খসে পড়েছে, আতঙ্কে ক্লান্তিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি—এ যে মালতী আর রমেশ। প্রফেসার রমেশ গুপ্ত ও তার স্ত্রী মালতী দেবী।

"বাঁচাও আমাকে—"

মালতী আর্তনাদ করে উঠল।

বাঁচাব? কি করে? হিংস্র বেদুঈন আমি? ইচ্ছে হল

অট্টহাস্য করে সে কথাটা জানিয়ে দিই তাকে। ও কিসের শব্দ? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখি আকাশ অন্ধকার করে ঝড় আসছে, সাইমুম-দৈত্য ক্ষেপে উঠেছে সহসা। এল—এল—এসে পড়ল। বালির ঘূর্ণাবর্তে দিশাহারা হয়ে গেলাম, চোখে মুখে নাকে ভীমবেগে এসে লাগছে অসংখ্য বালুকণা নয়, অসংখ্য ছররা। দু হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মালতীরই পদপ্রান্তে।

১১

আলো জ্বলে উঠল।

নিগূঢ় রহস্যের মতো সে বসে আছে সামনে।

কোনো কথা বললে না।

আমি। রবীন্দ্রনাথের "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন" কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যিই আমি মরুভূমির স্বপ্ন দেখছিলাম আজ সকালে।

সে। কবিতাটির মতো স্বপ্নটাও পুঁথিগত।

আমি। তার মানে?

সে। মানে, ইংরেজী কেতাবে বেদুঈনদের বিষয়ে যা পড়েছেন, তাই ভাবছিলেন। আপনার কাছে রেড ইণ্ডিয়ান, এস্‌কিমো, জাপানী, ইহুদী, বেদুঈন, সমস্তই হয় কোনো কেতাবের কথা না হয় কোনো সিনেমার ছবি।

আমি। হলই বা—

সে। সুতরাং সব সময় সত্য নয়।

আমি। তাতেই বা ক্ষতি কি?

সে। ক্ষতি কিছু নেই। পরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আস্ফালন করা বা পরের দেখা স্বপ্নের চর্বিতচর্বণ করা আপনার মনের বিশেষ লক্ষণ, এই আর কি—অর্থাৎ সোফায় ঠেস দিয়ে যতটুকু হয়—

আমি। এ বক্রোক্তির অর্থ কি?

সে। অর্থ, সত্যের দিকে আপনার ততটা আগ্রহ নেই, যতটা আছে স্বপ্নবিলাসের দিকে। সত্যি আরবের মরুভূমিতে গিয়ে বেদুঈনদের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনযাপন করতেন যদি, তা হলে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো অন্য রকম হত, আপনার স্বপ্নে ভিন্ন রকম বর্ণ-সমাবেশ করতে পারতেন, অর্থাৎ তা কতকটা আপনার নিজস্ব দর্শন হত।

আমি। কতকটা?

সে। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ সমগ্ররূপে জানা সহজ নাকি? এই একই মালতীরই তো কত বিভিন্ন রূপ দেখলেন এই ক-বছরে, তার সবগুলোই আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কিন্তু প্রত্যেকটি কত বিভিন্ন!

আমি। মালতীর কথা ছেড়ে দিন, পরের অভিজ্ঞতা যে সত্য নয়, এ কথা কি করে বলছেন আপনি?

সে। ঠিক বলেই বলছি। আপনি বুঝতে পারছেন না, তার কারণ প্রক্সি দেওয়ার যুগ এটা, সিনেমার নির্জীব পরদায় অলীক ছায়াচিত্রকে জীবনের সত্য চিত্র বলে ভুল করবার যুগ। আপনার দোষ নেই।

আমি। জ্ঞান বলে আমরা যা কিছু আহরণ করি, তার অধিকাংশই তো পরের অভিজ্ঞতা।

সে। পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি যাচিয়ে না নেন, তা হলে তা নিরর্থক। ঝালের সম্বন্ধে যদি

সত্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তা হলে তা পরস্পরের মুখে খেলে চলে কি ?

আমি। কিন্তু বিজ্ঞানের বেলায় আমরা দেখছি যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা সত্য।

সে। বিজ্ঞান যে সব সত্য নিয়ে আলোচনা করে তা চিরন্তন সত্য, তা অবৈজ্ঞানিকের কাছেও প্রত্যক্ষ, ধরুন—আলো বা বিদ্যুৎ। থিওরি নিয়েই যত গোলমাল, আজকের থিওরি তাই কাল বাতিলও হয়ে যাচ্ছে। নূতন দ্রষ্টা পুরাতন সত্যের নূতন ব্যাখ্যা বার করছেন। ডারউইনের সঙ্গে যাঁরা একমত নন, তাঁদের দৃষ্টিও কম স্বচ্ছ বা তাঁদের যুক্তিও কম জোরালো নয়।

আমি। অধিকাংশের মতে ডারউইন কিন্তু এখনও—

সে। দেখুন, "অধিকাংশের মতে" এই বাক্যটা সত্যের বেলায় খাটে না। অধিকাংশ লোক বোকা, অধিকাংশ লোক স্বার্থপর, অধিকাংশ লোক অহঙ্কারী। তারা কোনো কথায় সায় দেয় হয় না বুঝে, না হয় স্বার্থের খাতিরে, কিংবা অহঙ্কারবশত। যিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে তপস্যা করে সত্যের সন্ধান করেন, তিনি অধিকাংশের কথা মানবেন কেন ? তাঁর কাছে তাঁর নিজের মতটাই একমাত্র সত্য, কারণ সে মত তিনি গঠন করেছেন পলে পলে কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।

আমি। অধিকাংশ লোকের মত হলেই যে তা মূল্যহীন

হতেই হবে, এ কথা স্বীকার করতে পারব না, মাপ করবেন।

সে। পারবেন কি করে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ যে? আচ্ছা, মালতীকে আপনার কেমন লাগে, তা কি আপনি ভোট নিয়ে ঠিক করবেন? মালতীর সম্বন্ধে আপনার সত্য মত কি আর কারও সহানুভূতি বা বিরুদ্ধতার অপেক্ষা রাখে? রবি ঠাকুরের কোন কবিতাটা ভালো, তা ভোট নিয়ে ঠিক করলে আপনার মনের মতো হবে কি?

আমি। ওসব তো ব্যক্তিগত কথা।

সে। সত্যও ব্যক্তিগত জিনিস। আপনার কাছে যা পরম সত্য, অপরের কাছে তা পরম মিথ্যা। মালতীকে আপনার ভালো লাগে, কিন্তু পুরন্দর সেন একটুও পছন্দ করে নি তাকে।

আমি। তা জানি। পুরন্দর সেন কিন্তু ব্যতিক্রম, অধিকাংশ লোকেরই মালতীকে ভালো লাগে। রমেশ তো ওর কথা বলতে পেলে আর কিছু চায় না। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বাস আর কারও দেখি নি।

সে। সেইজন্যেই সন্দেহ হয়, কোনোখানে কিছু গলদ আছে।

আমি। কেন?

সে। শূন্যকুম্ভই শব্দ করে, পূর্ণকুম্ভ করে না। কুম্ভটা যে শূন্য, আজই তো আপনি তার প্রমাণও পেলেন চাক্ষুষ।

আমি। আপনি কি করে জানলেন?

সে। সমস্ত কথা যা করে জেনেছি।

আমি। কিন্তু মালতীর মুখ দেখে একদিনও মনে হয় নি যে—

সে। ভুলে যাবেন না, মালতী মেয়েমানুষ। তার মুখ দেখে তার বয়সটা পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেন না, তার মনের কথা টের পাবেন? তার লেখা চিঠি পড়ে তার মনের কথা বুঝতে পারেন নি, মুখ দেখে পারবেন?

চিঠিখানার কথায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

সে। চিঠিখানা সর্বদা সঙ্গে দিয়ে ঘোরার মধ্যে যে কুসংস্কার প্রচ্ছন্ন ছিল, একটা মাদুলি হাতে বেঁধে ঘোরার মধ্যে তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। অথচ মায়ের কথাতেও আপনি মাদুলি পরতে রাজী হন নি, আশ্চর্য লোক আপনি!

মালতী সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছে নেই একেবারে। তাকে আমি মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে চাই। কথা-টার মোড় ফিরিয়ে দিলাম।

আমি। তর্কের আবর্তে কিন্তু একটা দরকারী কথা তলিয়ে গেছে।

হাসি চিকমিক করে উঠল তার চোখে।

সে। কি দরকারী কথা?

আমি। একটু আগে আপনি যা বলে নিজের পরিচয় দিলেন তা কি—

সে। অমনই বিশ্বাস করে বসে আছেন তো! উঃ, কি

বিশ্বাসপ্রবণ মন আপনাদের! যত অবিশ্বাস কেবল ধর্মের বেলা। কিন্তু ধর্মপুস্তকও তো ছাপার হরপে বেরিয়েছে আজকাল।

আমি। আপনাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

সে। চাণক্য পণ্ডিত মানা করে গেলে কি হবে, স্ত্রীলোকদের আর রাজপুরুষদের অবিশ্বাস করবার শক্তি বাঙালী-চরিত্রে নেই।

আমি। ঠাট্টা করবেন না, সত্যি করে বলুন, কে আপনি—

সে। সে কথা গোড়াতেই বলেছি, আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

আমি। কি?

সে। আমি জাদুকরী।

আমি। এ রকম জাদু কি সম্ভব এ দেশে?

সে। যে দেশে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী এসে একটা রাজ্য জয় করে ফেলতে পারে, সে দেশে কি না সম্ভব! অত দূরে যাবার দরকার কি, এখুনি তো অসম্ভব ঘটনা ঘটল একটা, ঘটছে এখনও—

আমি। কি?

সে। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে কখনও দেখেন নি বলছেন, অথচ সেই আমি যেই বললাম, আমি আপনার অন্তরতম, অমনই সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠল। এর চেয়ে অদ্ভুত জাদু আর কী হতে পারে?

আমি। অপরিচিতা নন আপনি, যদিও ঠিক করতে পারছি না, কোথায় আলাপ হয়েছিল। তা ছাড়া, অদ্ভুত রকম ভালো লাগছে আপনার কথাবার্তা, তর্ক করছি শুধু তর্কের খাতিরে, আপনার সঙ্গে সত্যি সত্যি কোনো মতবিরোধ নেই, বরং আশ্চর্য রকম মিলই আছে।

সে। সর্বনাশ! আর তো তা হলে থাকা চলে না, উঠি এবার।

আমি। সে কি ?

সে। আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সহজ আলাপের পথ আর সুগম থাকবে না।

আমি। কেন ?

সে। রস-পিচ্ছিল হয়ে যাবে। আপনি আপনার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী লিখুন। অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়েছি আপনার, যদিও সেটা আমার দোষ নয়, ডেকেছিলেন বলেই এসেছিলাম এবং ফের যদি ডাকেন আসতে হবে। লিখুন এখন, চললাম।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল এবং আমি কিছু বলবার আগেই খোলা দ্বার দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর লিখতে শুরু করলাম।

১২

নিজের জীবন-কাহিনী লিখছি কেন? যদি আর কেউ ঐ কাহিনী পড়ে শিক্ষালাভ করে? আমি তো কত লোকের জীবন-কাহিনী পড়েছি, কী লাভ হয়েছে তাতে আমার? তবে লিখছি কেন? হঠাৎ কণ্ঠস্বর ভেসে এল দ্বারপথে—"লিখছেন মালতী পড়বে এই আশায়"—তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু চেয়ে দেখলাম সে নেই। ভৌতিক কাণ্ড না কি! লিখতে বসে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। সত্যিই আমার জীবন সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমার পরিচয় মানুষ, কিন্তু আসলে আমি পশু-মানুষ, তার বেশি এক ধাপও উঠতে পারি নি। পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্যান্য পশুর আছে, তাও আমার নেই, তার জন্যেও প্রতি পদে অপরের করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছে। ভাবছি এমন কেন হল? এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি? আমাদের দেশে সকল ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য একটি—আমরা পরাধীন জাতি। আমরা যা ভাবি তা বলতে পারি না, যা করতে চাই তা করতে পারি না, ক্ষুধায় অন্ন পাই না, অসুখে ঔষধ পাই না মানুষের প্রধান সহায় যে শিক্ষা সে শিক্ষা আমরা পাই নি, তার বদলে পেয়েছি একটা ডিগ্রী, তার সঙ্গে খানিকটা অহমিকা এবং আদিম পশু-প্রবৃত্তিগুলোর বর্বরতাকে ঢাকবার জন্যে চটকদার

একটা আবরণ। বস্তুত মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্তে আমরা স্কুল-কলেজে ঢুকি না, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের অবিচ্ছিন্ন চর্চা করবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই ঢুকি। পাস করলেই চাকরি পাওয়া যাবে। একটা কান কেটে ফেললে যদি চাকরি পাওয়া যেত, দেশসুদ্ধ বাপ দেশসুদ্ধ ছেলের কান কেটে দিত বোধ হয়, স্কুল-কলেজে না ঢুকিয়ে।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ জাতীয় বইগুলো ছাড়া আর কোনো বই আগাগোড়া পড়ি নি, পড়বার দরকার হয় নি।

শেক্‌স্‌পীয়র, কালিদাস আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকে, কিন্তু সে সব পড়বার দরকার হয় না, নোট পড়লেই চলে। শিক্ষকেরা ক্লাসে ইম্পর্‌ট্যাণ্ট বলে যে অংশগুলো চিহ্নিত করে দেন, তাই পড়লেই অনায়াসে পাস করা যায়। পাস করাই উদ্দেশ্য। পাস করার জন্তে চুরি করতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, প্রাইভেট ট্যুশনির ব্যবস্থা করতে হয়, শিন্নি মানতে হয়, সুযোগ থাকলে পরীক্ষকদের খোশামোদ করতে হয়, করতে হয় না কেবল পাঠ্য বিষয়টা আয়ত্ত করবার চেষ্টা। করতে গেলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যে সব ছেলে বোকার মতো আগা-গোড়া সব পড়তে যায়, তারা পরীক্ষায় প্রায়ই ভালো করে না। বেচারা সন্তোষের কথা মনে পড়ে, হুমড়ি খেয়ে সে মোটা মোটা বইগুলো আগাগোড়া পড়ত। পাস করেছিল কিন্তু

কোনোক্রমে। যে সব চালাক-চতুর ছেলেরা মাস্টারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের তোয়াজ করে নোট আর সাজেসশন সংগ্রহ করে বেড়াত, তারা ঢের বেশি নম্বর পেয়েছিল সন্তোষের চেয়ে। আমি আই. এ-তে ফার্স্ট হয়েছিলাম। তার কারণ, যে যে প্রশ্নগুলো আমি তৈরি করতে পেরেছিলাম ঠিক সেইগুলোই পরীক্ষায় পড়েছিল। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, তাদের ছোট করবার জন্যে আমি এ কথা লিখছি না, আমার জীবনে যা ঘটেছিল, তাই শুধু লিখছি। এই ফার্স্ট হওয়াটাই আমার জীবনের কাল হল। ফার্স্ট হয়েছিলাম বলেই মালতীদের পরিবারে আমল পেয়েছিলাম এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মালতীর বাবা তাঁর একমাত্র মেয়ের পাত্র হিসেবে আমাকে মনোনীত করে বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই. সি. এস. পড়বার জন্যে। বিলেত যাবার আগে মালতীকে বিয়ে করে গেলেই বোধ হয় ভালো হত, কিন্তু উপায় ছিল না, আইনে বাধল। আমি তখনও আইনের চক্ষে মাইনার, যদিও তখন আমার জীবনে টগর বাতাসী এসে গেছে। মাইনার ব্যাপারের একটু ইতিহাসও আছে অবশ্য। আমি যখন বিলেত যাই, তখন আমার আসল বয়স তেইশ, কিন্তু কাগজে কলমে আমি তখনও একুশে পড়ি নি, স্কুলে ভর্তি করবার সময় আমার মামা কিছু হাতে রেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু ভবিষ্যৎটা যে এমন হবে, তা তখন কে জানত!…

..."আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে আমি চাই নি কোনো দান।" কে গাইছে এত রাত্রে? ঠিক যেন মালতীর গলা। মালতীকে দেখতে পাচ্ছি যেন—হ্যাঁ, মালতীই তো, আবেশময় চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত, পিয়ানো বাজাচ্ছে...

না, মালতীর কথা ভাবতে শুরু করলে লেখা এগুবে না। আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার মন ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তীব্রভাবে যে জিনিসটা মনে জাগছিল, তা পাঠস্পৃহা নয়, যৌনক্ষুধা। এই সুস্থ স্বাভাবিক ক্ষুধার আহার সমাজ আমাকে দেয় নি, এ ক্ষুধাকে দমন করবার কৌশল পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধু কেউ আমাকে শেখায় নি, বাতাসী টগর মালতীরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করেছে, আমি বাধা দিতে পারি নি, বাধা দিতে চাই নি। কামনার জয়গান শুনেছি সাহিত্যে, কামনার মূর্ত প্রকাশ দেখেছি আর্টে, ক্ষুধার অনলে ইন্ধন যুগিয়ে ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছে এরা। খাতার উপর পড়ল একি? দুটো টিকটিকি—একটা ছোট, একটা বড়। সরসর করে দেওয়ালে গিয়ে উঠল, নিস্পন্দ হয়ে দেওয়ালে লেগে রইল দুটোই কিছু দূরে দূরে, দুটোরই চোখের দৃষ্টি পলকহীন।

হ্যাঁ, কি লিখছিলাম? ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছিল।

সত্যিই হিতাহিতজ্ঞান ছিল না, কেবল মনে হত, 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'। কিন্তু যে বলিষ্ঠ পৌরুষ থাকলে ওই সকাম বৈরাগ্য জীবনে খাপ খায়, সে পৌরুষ, সে শক্তি ছিল না আমার। থাকবার কথাও নয়। কারণ প্রতি মাসে এক গাদা অর্থ ব্যয় করে হোস্টেলের অখাদ্য খেয়ে যে জিনিস লাভ করবার জন্যে আমরা দল বেঁধে উদ্বাহু হয়ে ছুটেছিলাম, তা শক্তিও নয়, পৌরুষও নয়, তা ডিগ্রী।

হাপরের মতো শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। হাসছেন গৌরীশঙ্কর রায়—"আজকালকার ছেলেগুলো, বোয়েছ করুণা, যাকে বলে হ্যাংলা—হে-হে।"

আমার বাবার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর রায়ের বন্ধুত্ব আছে। তাঁরা দুজনে একত্রিত হলেই একালের ছেলেদের মুণ্ডপাত করেন, মাঝে মাঝে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীও জোটেন এসে। সকলেরই বদ্ধ ধারণা, সেকালে তাঁরা সবাই রত্ন ছিলেন, একালে আমরা ঝুটো কাচ। আমরা যে ঝুটো কাচ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে কথা আমার চেয়ে বেশি কেউ উপলব্ধি করছে না এই মুহূর্তে। মনে হচ্ছে, আমি যেন এই যুগের আন্তরিকতাবর্জিত মেকি আধুনিকতার অতি উজ্জ্বল প্রতীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে, জাতিভেদ মানি নি,

দেশী কুসংস্কার বর্জন করে বিদেশী কুসংস্কার অর্জন করেছি, বিলেত গেছি, সেখানে নিজের ভাবপ্রবণতাবশত কোনো বিদ্যা বা ডিগ্রী আহরণ করতে না পেরে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা সম্বন্ধে অবজ্ঞা এবং যে কোনো ডিগ্রী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ-শোভন ঔদাসীন্যের ভান করেছি, নিজের অসংযত কামনাকে সংযত করবার চেষ্টা করি নি একটুও, বরং তার গুণগান করেছি শতমুখে—

কিসের শব্দ হচ্ছে? ঝড় আসছে নাকি? ও, মিনতি স্টোভ জ্বালছে বোধ হয় দোতলায়। কি বিরক্তিকর একটা আপদ এসে জুটেছে বাড়িতে! বাবাকে রাত তিনটের সময় উঠে চা করে দেয় বলে বোধ হয় বাবা খুব খুশী। যে কোনো একটা চাকরানীকে মাইনে দিলেই তো সে ভোরে এসে চা করে দেবে, সেই গৃহকর্মনিপুণাকে বিয়ে করতে হবে সেইজন্যে—

হ্যাঁ, কি লিখছিলাম? বিলেতে গিয়ে কিছু করি নি। স্বোপার্জিত অর্থে নয়, মালতীর বাবার টাকায় মদ খেয়েছি, খানা খেয়েছি, রিভিয়েরা গেছি, মন্টি কার্লো গেছি, প্রেম কিনেছি, প্রেম বিলিয়েছি, ফ্যাশনেব্‌ল দোকানের দামী স্যুট গায়ে চড়িয়ে ন্যান্সির কাছে নিজেকে বিবাগী রাজপুত্র বলে প্রচার করেছি। মাঝে মাঝে স্বদেশপ্রেমও জেগেছে। ভারতবর্ষের হিতার্থে সভা-সমিতির আয়োজন করে দু-চার-

জন সাহেবকে ডিনার খাইয়েছি এবং প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, সে খবরটা যাতে আমার নামসুদ্ধ (এবং সম্ভব হলে ছবিসুদ্ধ) ছাপা হয় স্বদেশ-বিদেশের কাগজে, শ্রমিকবাদ ধনিকবাদ নাৎসিবাদ নিয়ে বাদানুবাদ করেছি যেখানে সেখানে, এমন কি মদের ঝোঁকে সঙ্কল্পও করেছি মাঝে মাঝে যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। এ দেশের যে সব কর্মী সর্বস্ব বিসর্জন করে আজীবন দেশসেবা করছেন, তাঁদের 'শ্যাবি' কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছি ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে, যাঁরা বিলেত-ফেরত নন, তাঁদের প্রতি একটা অনুকম্পার ভাব পোষণ করেছি মনে মনে বাইরে অতি-মার্জিত মোলায়েম মুখশোভা রক্ষা করে এবং এই সমস্তটার ওপর অতি-আধুনিকতার লেবেল মেরে সাহিত্য সমাজ রাজনীতি সব জিনিসকে ব্যঙ্গ করেছি স্বাধীন-চিন্তুতার ছদ্মবেশে, গোপনে গোপনে কিন্তু একে ওকে তাকে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি একটা মোটা মাইনের চাকরির। বন্ধুদের মধ্যে রাজপুরুষদের নিন্দে করেছি, সফলকাম বিলেত ফেরতদের টিটকিরি দিয়েছি, কিন্তু তাদেরই দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়ে ফিরেছি বুভুক্ষু কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট প্রসাদের আশায়।

এই আমার সত্য চিত্র, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু যে সব প্রবীণ আমাদের দেখে নাক সেঁটকান, তাঁরা আমাদের চেয়ে কী হিসেবে ভালো? তাঁরা কি আমাদেরই পুরাতন সংস্করণ নন? তফাতের মধ্যে এই—

তাঁরা পুরাকালে যে সুবিধে ও সুযোগ পেয়েছিলেন, রাজনৈতিক কারণে আমরা তার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা সবাই কি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন? তাঁরাও তদানীন্তন ফ্যাশনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও হুজুগে উন্মত্ত হতেন, তাঁরাও চাকুরিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁদের আত্মম্ভরিতা বিশ্বাসঘাতকতা নীচতা নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। আমাদের মতো তাঁদেরও পদস্খলন হত। আমরা অর্থহীন বলে ভাঁওতার জোরে হঠাৎ-স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গে প্রায়-নিখরচায় প্রণয়-চর্চা করি; তাঁরা অর্থবান ছিলেন বলে টাকার জোরে বেশ্যাবাড়ি যেতেন এবং বহু-বিবাহ করতেন। সেকালের ছেলেরা ডেভিড হেয়ারের বাড়ির সামনে ভিড় করত, ডেভিড হেয়ারের পালকির পিছনে ছুটত; একালের ছেলেরা সিনেমার সামনে ভিড় করে সিনেমা-স্টারের সিনেমা-ডিরেক্টারের পিছনে ছোটে। কারণ কিন্তু এক—হঠাৎ আলোর ঝলকানি; উদ্দেশ্যও এক—যদি মনের খোরাক এবং পেটের খোরাক জোটে। বর্ষাকালে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বাললে যেমন দলে দলে নানারকম পোকা ছুটে আসে, আমরাও তেমনই ছুটে এসেছি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বর্তিকা লক্ষ্য করে। এই বর্তিকার নাম সেকালে ছিল—শিক্ষা, একালে তার অনেক নাম হয়েছে, দুটো যুগের বাইরের চেহারায় খানিকটা অমিল আছে, একই টাইফয়েড-

রোগীর ফার্স্ট উইক আর থার্ড উইকের চেহারায় যেমন অমিল থাকে। সেকালের লোকে ডিগ্রী পেলেই এবং অনেক সময় না পেলেও চাকরি পেত, তাই বিয়ে-থা করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কতকটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করবার সুযোগ পেত। একালে সে সুবিধে নেই, ডিগ্রী-আলেয়া একালের ছেলেদের যেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করছে, তা পঙ্কিল জলাভূমি, বিষ-বাষ্পে পরিপূর্ণ। দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে তারা। প্রবীণরা তাদের উদ্ধারের উপায় করেন না, ভেবে দেখেন না যে, তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ তাঁরা নিজেরাই। ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন করবার কোনও চেষ্টা কখনও করেন নি তাঁরা, ঠেলে ঠেলে কেবল স্কুল-কলেজে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা পাস করবার জন্যে চাকরির স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সে স্বপ্ন সফল হচ্ছে না একালে, সুতরাং একালের ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছেন সবাই মিলে। এটাও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। আসল গলদ যে কোথায়—

খুট করে শব্দ হল। চেয়ে দেখি, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সে। ফের ডাকছেন আমাকে?

আমি। কখন ডাকলাম!

সে। এখুনি। আর একটা ছবি দেখুন তাহলে। আলো নিবে গেল।

১৩

গং গং গং গং গং—

উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। পূর্বাকাশে উষার রক্তিম আভা দেখা যাচ্ছে সামান্য, রাত্রির অন্ধকার এখনও সম্পূর্ণ যায় নি। ছাত্রাবাসের ছোট ছোট ঘরগুলি আলোকিত হয়ে উঠছে একে একে। শিক্ষকদের ঘরগুলিও। গং গং গং গং—বেজে চলেছে ঘণ্টা গম্ভীর নির্ঘোষে, আহ্বান করছে সকলকে উপাসনা-মন্দিরে। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে সকলে সজ্জিত হচ্ছে নীরবে, যে সব বালকের ঘুম ভাঙে নি, শিক্ষকেরা তাদের নিদ্রাভঙ্গ করছেন, তাও নীরবে। নীরবতাই এখানকার নিয়ম। সকলেই মিতবাক্ মৃদুকণ্ঠ। বিনা প্রয়োজনে কথা বলা নিষেধ, কোলাহল করা একেবারে নিষেধ।···সজ্জিত হচ্ছে সবাই। খদ্দরের পরিধেয়, খদ্দরের উত্তরীয়—সব স্বহস্তে প্রস্তুত। ছাত্র, অধ্যাপক, আচার্য, পরিচালক সকলেরই এক সজ্জা—শুভ্র খদ্দর। এখানে পরিচ্ছদ-বৈষম্য নেই। আহার পরিচ্ছদ ধনী দরিদ্র সকলেরই সমান। গং গং গং গং গং—বেজে চলেছে—ঠিক পনেরো মিনিট বাজবে। এর মধ্যে সকলকে পৌঁছতে হবে উপাসনা-মন্দিরে।

উঠলাম। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কুশাসন এবং উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আমিই পরিচালক, নিয়ামক, স্রষ্টা—তাই আমি সর্বাপেক্ষা বেশি

নিয়মানুবর্তী, সর্বাপেক্ষা বেশি নিষ্ঠাবান, সর্বাপেক্ষা বেশি নীরব।

চলেছি। শেষ রাত্রের স্বল্প অন্ধকারে শ্বেত-খদ্দরমণ্ডিত মূর্তিগুলিও চলেছে আমার আশেপাশে নীরবে। পাঁচ বছরের শিশু ষাট বছরের শিক্ষক—সবাই। উপাসনা-মন্দির জাঁক-জমকশালী হর্ম্য নয়, মাটির ঘর, কিন্তু প্রশস্ত। সকলে নীরবে গিয়ে উপবেশন করলাম স্ব স্ব আসনে। চোখ বুজে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। সহসা আচার্যের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

মনে মনে আবৃত্তি করলাম সকলে। স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। চোখ বুজে বসে রইলাম আরও খানিকক্ষণ। ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ—ভালো করে চিন্তা করতে লাগলাম এর অর্থ। আবার আচার্য বললেন, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

পুনরায় আবৃত্তি করলাম মনে মনে, উপলব্ধি করলাম প্রার্থনার তাৎপর্য। স্তব্ধতা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে এল। তৃতীয় বার আচার্য বললেন, ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ আমার আদর্শ, হে ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি। তৃতীয় বার আমরা

আবৃত্তি করলাম। প্রণাম করলাম তারপর। প্রণামান্তে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়েছে। সম্মুখে আচার্য দাঁড়িয়ে আছেন—সৌম্য শান্ত সমাহিত মূর্তি। যতীন।

উপাসনার পর ব্যায়াম, তারপর স্নান, তারপর পড়াশোনা।

উপাসনা-মন্দির থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছাত্ররা ব্যায়ামের জন্য সারি সারি দাঁড়াল। প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

আমিও আমার ঘরে গিয়ে ব্যায়াম করব, স্নান করব। তার-পর আমাকেও অধ্যয়ন করতে হবে অধ্যাপনা করবার জন্যে।

দৃশ্য বদলাল।

জাপানী কবি নোগুচির বংশধরের সঙ্গে আলাপ করছি। তিনি এসেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠান দেখতে। অঙ্গে জাপানের জাতীয় পরিচ্ছদ, মুখে স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। চমৎবার বাংলা শিখেছেন।

“ভারি চমৎকার লাগল প্রতিষ্ঠানটি। সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানকার নীরবতা। সবই হচ্ছে, অথচ কোনো গোলমাল নেই।”

স্মিত মুখে চুপ করে রইলাম। বলতে ইচ্ছে হল যে কল-রব করবার সাধনা আমাদের নয়। নীরবতাই ভারতের ধর্ম। ইচ্ছে হল, কিন্তু বললাম না। অকারণ কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।

প্রশ্ন করলেন তিনি, "কত বছর বয়সের ছেলে নেন আপনারা ?"

"পাঁচ বছর, বড় জোর ছ বছর।"

"ক বছর থাকতে হয় এখানে—"

"বারো বছর।"

"কি কি পড়ানো হয় ?"

"প্রয়োজনীয় সবই। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রাথমিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু—"

"এ ছাড়া আরও শুনেছি অনেক জিনিস শেখান আপনারা ?"

"নিজের হাতে চাষ করতে, রান্না করতে, সুতো কাটতে, কাপড় বুনতেও শিখতে হয়। এ ছাড়া পশুপালন শিখতে হয়, গৃহশিল্পও শেখানো হয় কিছু কিছু।"

"প্রত্যেকের স্বাস্থ্য বেশ সুন্দর দেখলাম।"

"ব্যায়াম করা এখানে অবশ্যকর্তব্য—"

"পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে শুনেছি খুব কড়াকড়ি আপনাদের নাকি ?"

"নিজেরা না পড়ে কোনো বই আমরা ছেলেদের হাতে দিই না। বইটি নির্ভুল এবং আমাদের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া চাই—"

"আপনাদের আদর্শ কি ?"

"বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ তৈরি করা—"

"নাচ-গানের চর্চা নেই ?"

"না—"

"নাচ-গান কিন্তু সভ্য সমাজে শিক্ষার একটা অঙ্গ—"

"প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ করে তারা ওসব শিখতে পারে। যদি কারও মধ্যে আমরা সুকুমার-শিল্প-প্রতিভা লক্ষ্য করি, তা হলে প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হবার পর সমাজে ফিরে গেলে যাতে সে সেই বিষয়টির চর্চা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে থাকি। প্রতিষ্ঠান-জীবনে ওসব করলে চিত্তবিক্ষেপ হবার সম্ভাবনা—"

"আপনাদের প্রতিষ্ঠান কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় ?"

"না। আমাদের ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় না।"

"তারা কৃতবিদ্য হল কি না, কি করে বোঝেন ?"

"এক-একজন অধ্যাপকের অধীন পাঁচজন করে ছাত্র বারো বছর থাকে। অধ্যাপক সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে থাকেন, অধীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, কোনো ছাত্র কৃতবিদ্য হয়েছে কি না তা তিনি অনায়াসেই বোঝেন। তাঁর লিখিত অভিমতই এখানকার সার্টিফিকেট—"

"কিন্তু তা নিয়ে বাইরে চাকরি পাওয়া যাবে কি ?"

"প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার সময় শপথ করতে হয়, কখনও চাকরি করব না—"

"প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাসিক কত করে নেন?"

"কিছু নিই না। ছাত্রদের পরিশ্রমই আমরা মূল্যস্বরূপ মনে করি—"

"বুঝলাম না ঠিক—"

"আমাদের ছাত্ররাই এখানকার সবজিবাগানের, তাঁতের, পশু-বিভাগের, ফ্যাক্টরির, শিল্পশালার কর্মী। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক বিভাগে প্রথমে কিছুদিন কাজ শিখতে হয়, তারপর কাজ করতে হয়। সুতরাং তারা তাদের পরিশ্রমের পরিবর্তেই প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষা, আহার ও বাসস্থান পায়।"

"আপনাদের আয় কি?"

"প্রতিষ্ঠান-কর্তারা সকলেই অবিবাহিত কর্মী। তাঁরা তাঁদের সমস্ত উপার্জন এখানে দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরি প্রভৃতি থেকেও কিছু আয় হয়—"

"বাইরে থেকে চাঁদাও পান বোধ হয়—"

"না, কারও সাহায্য আমরা নিই না। নিলে দাতার সঙ্গে বাধ্যবাধকতা হবার সম্ভাবনা। টাকার জন্যে আমরা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানটি এমনভাবে করা, যাতে তার নিজের উপার্জনেই নিজের খরচ চালাতে পারে। যে সব অবিবাহিত কর্মী তাঁদের সমস্ত উপার্জন দিয়ে এটার আরম্ভ করেছেন, তাঁরা চিরকাল থাকবেন না—"

"ব্রহ্মচর্য পালন নিশ্চয় এখানকার নিয়ম—"

"হ্যাঁ, ছাত্রজীবনে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-জীবন শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্রকে বিয়ে করতে হবে—এই নিয়ম—"

"আপনাদের কোনো ছাত্রী তো দেখলাম না!"

"আমরা কো-এডুকেশনের পক্ষপাতী নই। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কো-এডুকেশন থাকলে তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীশিক্ষার আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু সেটা আলাদা প্রতিষ্ঠানে হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি—"

ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ—ফ্যাক্টরির বাঁশি বাজছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ডাকছে।

দৃশ্য বদলাল।

পাগলের মতো প্রত্যহ প্রত্যেক খবরের কাগজের কর্মখালি বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়াচ্ছি। সত্য মিথ্যা নানা রকম প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করছি নিজের বিষয়ে এবং সেগুলো কপি করে প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। খটখট খটখট দ্রুতবেগে টাইপ রাইটার চলছে। স্বপ্নে জাগরণে এক চিন্তা, চাকরি একটা যোগাড় করতে হবে। যোগাড় করতেই হবে যেমন করে হোক।

দৃশ্য বদলাল।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক। হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরে পিতৃবন্ধু মিস্টার হেরিংটনের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, বাবাকে লুকিয়ে। তাঁর হাতে ভালো একটি চাকরি আছে।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল আইরিশ টেরিয়ার একটা, লিসার কথা মনে পড়ল হঠাৎ, তারও একটা আইরিশ টেরিয়ার ছিল।...চাপরাসী এল, কার্ড দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, শেকলে বাঁধা কুকুরটা চিৎকার করতে লাগল। একটু পরে চাপরাসী ফিরল।..."আভি মোলাকাত নেহি হোগা হুজুর—"

দৃশ্য বদলাল।

সরু গলি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। বৃষ্টি পড়ছে; আশপাশের বাড়ির ছাত থেকে জল পড়ছে হুহু করে নল দিয়ে, আমার সাহেবী পোশাক কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেছে; হেমন্তবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছি; হেমন্ত দাশগুপ্ত একজন মাতব্বর লোক; তিনি যদি চেষ্টা করেন, সদাগরী আপিসের চাকরিটা হয়ে যায় আমার। ভয়ানক তোড়ে বৃষ্টি এল, কড়া নাড়ছি প্রাণপণে...

১৪

আলো জ্বলে উঠল।

বিচিত্র হাসির আভা ফুটে বেরুচ্ছে তার চোখ-মুখ থেকে। মেঘাবৃত চাঁদ যেন।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ কেউ কখনও চাকরি করবে না, কিন্তু তার হবু প্রতিষ্ঠাতা চাকরির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছিলেন কেন ?

আমি। ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয়, ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই। আশা করেছিলাম—

সে। জানি আমি। আশা করেছিলেন যে, নিজের জন্যে দৈনিক মাত্র ছ পয়সা খরচ করে বাকীটা ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে জমাবেন।

আমি। নিশ্চয়।

সে। অর্থাৎ চুরি-নিবারণী-প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিলেন চুরি করে!

আমি। চুরি তো চিরকাল করছি। একটা চৌর্যকে ভালো কাজে লাগাব ভেবেছিলাম, এতে ঠাট্টা করবার কিছু তো নেই।

সে। ঠাট্টা করছি না, বিস্মিত হচ্ছি।

আমি। আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই আর একবার।

সে। দিন—

আমি। আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আমার হাতে বেশি সময় নেই, আমার জীবন-কাহিনীর অনেকখানি লিখতে বাকী এখনও।

সে। আপনিও একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, অনুমতি দেন তো মনে করিয়ে দিই।

আমি। বলুন।

সে। আপনি ডেকেছেন বলেই আমি এসেছি।

আমি। মনে পড়ছে না, ডেকেছি কি না!

সে। সব সময়ে সব জিনিস মনে পড়ে না আমাদের। যে অক্সিজেন আপনার প্রাণবায়ু, তার কথা কতটুকু মনে পড়ছে আপনার এখন? সে যদি তার আধুনিক মলিকিউলার মূর্তি পরিগ্রহ করে বৃহদাকৃতি হয়ে দেখা দেয়, চিনতে পারবেন তাকে? হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠবেন।

আমি। অক্সিজেন মলিকিউল-মূর্তি পরিগ্রহ করে আসবে!

সে। এ আল্ট্রা মডার্ন যুগে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি। ওসব আজগুবি চিন্তা করবার সময় নেই এখন আমার।

সে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যে কল্পনাটা করেছিলেন, তার বেশি আজগুবি এটা?

আমি। কে আপনি বলুন—

সে। পরিচয় দিতে ভয় করে।

আমি। কেন?

সে। হঠাৎ সংযম হারালে রাত দুপুরে আপনার মতো উন্মত্ত পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠব না আমি। একটু আগে ঠাট্টার ছলে সামান্য একটু আভাস দিয়েই বুঝেছি আপনার দৌড় কতখানি।

আমি। আমার দৌড় কত, তা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানে বলুন? কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত এতবার দৌড়েছি যে, মসজিদের সম্বন্ধে মোহটা কেটে গেছে।

সে। সত্যি? তা হলে মালতীকে সকালে অত পেড়াপীড়ি করছিলেন কেন, লুকিয়ে আজ রাত্রে আপনার কাছে আসবার জন্যে?

আমি। কারণ, অনুভব করছিলাম, সে আমার এই অসম্ভব প্রস্তাবটার জন্যে মনে মনে ক্ষুধিত হয়ে আছে অনেক দিন থেকে।

সে।. ও, ক্ষুধিতের প্রতি অনুকম্পা! তা হলে, আর কিছু নয়? কিন্তু—

ইতস্তত করে থেমে গেল সে, দৃষ্টি আনত হল, চকিতে আড়চোখে চাইলে একবার আমার মুখের পানে, ছোট্ট একটি হাসি উঁকি দিতে লাগল অধরপ্রান্তে।

আমি। কি, বলুন?

সে। কিছুক্ষণ আগে সঙ্কোচবশত বলতে পারি নি কথাটা। বলেছিলাম, কিন্তু ঘুরিয়ে বলেছিলাম।

আমি। কথাটা কি ?

সে। একটু আগে আমি বলেছিলাম যে, আপনি প্রফেসার গুপ্তের ল্যাবরেটরি থেকে ফেরবার সময় এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে, ঘোরানো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করবার কথা মনে ছিল না আপনার। কিন্তু সত্যিই কি আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন ?

আমি। অর্থাৎ কি বলতে চান ?

সে। একাগ্রচিত্তে কি কামনা করেন নি যে, মালতী আসুক, এখনও কি প্রত্যাশা করছেন না তার আগমন ? দরজা খুলে রাখাটা সত্যিই কি নিছক অন্যমনস্কতা ?

আমি। মাপ করবেন, মালতী সম্পর্কে আমি কোন কথা আলোচনা করতে চাই না কারও সঙ্গে। আপনার নিজের পরিচয়টা দিন যদি বাধা না থাকে।

সে। বললাম তো, ভয় করে বলতে।

আমি। দেখুন, স্ত্রীলোক নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি জীবনে, সুতরাং কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সত্যি যদি আপনার ভয় করত তা হলে এত রাত্রে আপনি আসতেন কি আমার কাছে এমন ভাবে ? বুঝতে পারছি আমার পিছন পিছনই এসেছেন আপনি।

সে। উঃ, কি ভীষণ আত্মসংযম আপনার, প্রশংসা না করে পারলাম না।

আমি। কেন ?

সে। সব কথা জেনেও এতক্ষণ স্থির হয়ে আছেন!

আমি। কি কথা জেনে?

সে। যে, আমি একজন পথচারিণী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আপনাকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে আপনার পিছন পিছন এসেছি এবং এতক্ষণ ধরে আপনাকে গাঁথবার চেষ্টা করছি চার ফেলে ফেলে।

আমি। আমি ঠিক তা বলি নি।

সে। বলবেন কেন, ভাবছেন; আসল কথা যদিও ভাববার ভান করছেন এবং চমৎকারভাবে করছেন তা।

আমি। আপনার মতো মেয়েকে পথচারিণী ভাবব কোন্ সাহসে?

সে। বিপথচারিণী ভেবেছিলেন?

আমি। সবচেয়ে মুশকিল, আপনার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছুই ভাবতে পারছি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, আপনি আমার সব কথা জানেন, এমন কি আমার মনের কথাও। অথচ কিছুতেই আত্মপরিচয় দিচ্ছেন না।

সে। আপনার মতো অভিনেতা আমি দেখি নি। সব জানেন, অথচ ভান করছেন না জানার।

আমি। হেঁয়ালি নয়, স্পষ্ট করে বলুন।

সে। বিজ্ঞানের ভাষাই তো এ যুগের স্পষ্টতম ভাষা, সেই ভাষাতে বলব?

আমি। বলুন।

সে। যদি বলি আমি আপনার জীবনের ভিটামিন।

হাসি উপচে পড়তে লাগল চোখ দুটি থেকে।

আমি। এতে কিছুই স্পষ্ট হল না।

সে। যদি বলি, ক্যাটালিটিক এজেণ্ট ?

আমি। এ আরও অস্পষ্ট।

সে। তা হলে স্পষ্ট করি নিজেকে কি করে ? সশরীরে সামনে বসিয়ে রেখেছেন, তবুও স্পষ্ট হচ্ছে না ! কবির ভাষায় বলি তাহলে—

স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল যেন দৃষ্টি। অথচ কৌতুকও উঁকি দিতে লাগল তাতে।

আমি। বলুন।

সে। যদি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা সামান্য একটু বদলে বলি ?

আমি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সামান্য একটু বদলালেও অসামান্য রকম ক্ষতি করা হয় তার, তা জানেন আশা করি।

সে। 'তুমি'র জায়গায় 'আমি' বসাব খালি, অর্থাৎ—

হাসলে একটু। আমি চুপ করে রইলাম।

সে। অর্থাৎ ওই ভাষাতেই ভাবছেন কিনা আপনি, বুঝতে সুবিধে হবে।

আমি। বলুন।

সে

আমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
তোমার সাধের সাধনা
তব শূন্য গগন বিহারী
তুমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
আমারে করেছ রচনা
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

সবিস্ময়ে চুপ করে রইলাম। সে বলতে লাগল—

তব হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে মম
চরণ দিয়েছ রাঙিয়া
ওগো সন্ধ্যা-স্বপনবিহারী
মম অধর এঁকেছ সুধা-বিষে মিশে
তব সুখ-দুখ ভাঙিয়া
আমি তোমারি যে আমি তোমারি।

আমি। মনে হচ্ছে, যেন চিনেছি তোমাকে, মানে আপনাকে—

সে। তুমিই বলুন।

—চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। চুপ করে বসে রইলাম সেই নিগূঢ় অন্ধকারে। ক্রমশ যেন একটা সুর ভেসে এল, একটা নয় অনেক, বহু বিচিত্র সুরে ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠল অন্ধকার। বেণু, বীণা, বেহালা, সেতার, এস্রাজ, মৃদঙ্গ, মাদল, খঞ্জনী, পিয়ানো, ম্যাণ্ডোলিন, চেলো, গিটার, ক্ল্যারিওনেট, শ্রুত অশ্রুত নানা যন্ত্রের অপূর্ব সমন্বয়ে বাজতে লাগল কানাড়া বেহাগ জ্যাজ সোনাটা সিম্ফনি গজল কীর্তন। ক্রমশ একটা রামধনু ভেসে এল কোথা থেকে, সপ্ত বর্ণ বিস্তার করে দুলে দুলে বেড়াতে

লাগল সুর-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। আলোয় অন্ধকারে বর্ণে ছন্দে আবিষ্ট হয়ে এল মন। মনে হল, আমি যেন পৃথিবীর একজন বড় শিল্পী, ছন্দের বর্ণের আবেষ্টনীতে বসে স্বপ্ন দেখছি, তুলির টানে টানে রূপায়িত করব কোন্ অরূপ সুষমাকে। আচম্বিতে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল সব। নিস্তব্ধ সূচীভেদ্য অন্ধকার আবার জমাট হয়ে এল চতুর্দিকে। দেখলাম কয়লার খনির গভীর অন্ধকারে বসে কয়লা কাটছি আমি। কোথাও চাকরি পাই নি, প্রকাশ্য রাজপথে কুলিগিরি করতে পারি নি, রিক্‌শা টানতে লজ্জা হয়েছে। ভূগর্ভে আত্মগোপন করে কয়লা কাটছি, যা উপার্জন করছি তার থেকে সঞ্চয় করছি প্রত্যহ কিছু কিছু আধপেটা একবেলা খেয়ে কৃপণের মত, নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। আমি হতভাগ্য, আমি পাপী, কিন্তু আমি জানি, কোথায় গলদ, দুর্দশার মূল কোথায়। শিক্ষার অভাব। দেশের একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করে তুলতে পারি মনের মতন করে, তা হলেও সার্থক হয় আমার জীবন। দেশে মানুষ নেই, একটাও শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ সত্যসন্ধ পুরুষ নেই, সব নীচ স্বার্থপর, মুখোশ পরে অভিনয় করে চলেছে—হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হল, বিষাক্ত গ্যাসে আগুন লেগে বিস্ফোরণ হয়েছে কয়লার খাদে···ভীষণ শব্দ। সেই গগনবিদারী শব্দকে ব্যঙ্গ করে কলকণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন!

সে।

১৫

আলো জ্বলে উঠল।

দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। বেশবাস কবরী অসংবৃত, বিপুল হাস্যবেগ সম্বরণ করতে করতে এসে যেন দাঁড়িয়েছে।

সে। চলে যেতে পারলাম না, ফিরে আসতে হল। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ভারি।

আমি। বলুন।

সে। আবার 'বলুন' কেন?

আমি। বল।

সে। আই. সি. এস.-পরীক্ষা-বিমুখ যে কৃতবিদ্য যুবকটি নিজেকে কয়লা-খাদের কুলি কল্পনা করে স্বদেশের দুঃখ মোচনের জন্য মনে মনে কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলেন, তাঁর কি ধারণা, মা-বাপ স্বদেশের বাইরের লোক?

আমি। ও রকম অদ্ভুত ধারণা হতে যাবে কেন?

সে। তা হলে মা-বাপের দুঃখের কথা আগে না চিন্তা করে স্বদেশের দুঃখে বিচলিত হলেন কেন তিনি?

আমি। মা-বাবার কোনো দুঃখ ছিল না, এখনও নেই। বাবা ধনবান লোক।

সে। অর্থাভাবটাকেই একমাত্র দুঃখ বলে মনে করেন

বুঝি আপনি? সেকালের জ্ঞানতপস্বী নিঃস্ব ব্রাহ্মণরা তা হলে খুব দুঃখী ছিল বলুন!

আমি। তারা কি ছিল তা জানি না, তবে এটা ঠিক যে এ যুগের দুনিয়ায় টাকাটাই সুখ-সংগ্রহের প্রধান উপায়। টাকা না থাকলেই দুঃখ বাড়ে, আধিভৌতিক দুঃখটাও কম গ্লানিজনক নয়।

সে। এই যদি আপনার মত, তা হলে আপনার বাবার ব্যবসাতে ঢুকলেন না কেন?

আমি। চামড়ার ব্যবসা করা আমার ধাতে সইল না।

সে। যে ব্যক্তি কল্পনাতেও কয়লা-খাদে নেবে যেতে পারে, তার ধাত খুব নরম বলে তো মনে হয় না। কয়লা-খাদের তুলনায় নদীর ধারের সে ট্যানারি তো স্বর্ণপুরী।

আমি। হতে পারে। আমার কিন্তু ভালো লাগল না। আমার নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে।

সে। তা তো আছেই। কিন্তু আসল কারণ দুটি আপনি বলছেন না। বলব?

আমি। বল।

সে। প্রথম কারণ, আপনার বাবার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণা।

আমি। ভণ্ড লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়া স্বাভাবিক। যাঁর মতে—মুরগি খেলে জাত যায়, কিন্তু গোরুর চামড়ার ব্যবসা করলে যায় না তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারি না কিছুতে।

সে। কিন্তু একে তো ভণ্ডামি বলে না। ওই তাঁর মত এবং সে মত তিনি আঁকড়ে আছেন শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। একে ভণ্ডামি বলেন? এই তো শক্তির পরিচয়।

আমি। ও রকম মাড়োয়ারী-মনোবৃত্তি বরদাস্ত করতে পারি না।

সে। অথচ টাকা চান? সোনার পাথরবাটি হয় কখনও?

আমি। তোমার মতে তাহলে টাকা রোজগার করতে গেলেই নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী হতে হবে? ম্যামন ওয়ার্শিপ করাই আমার জীবনের লক্ষ্য নয়—

সে। তা ছাড়া আর কি লক্ষ্য আছে আপনার? ভালো-ভাবে যদি ম্যামন ওয়ার্শিপটাও করতে পারতেন, তা হলেও তো একটা কাজের মতো কাজ হত। কুবের দেবতাও বিনা সাধনায় তুষ্ট হন না। যাদের নিরঙ্কুশ মাড়োয়ারী বলে ঠাট্টা করলেন, পারেন তাদের মতো হতে? মাত্র লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে একাগ্র ব্যবসায়বুদ্ধি, দুঃখসহনশীলতা, লোকের হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা—এক কথায় তাদের চরিত্রবল কি তুচ্ছ করবার মতো?

ছুঁচটা ফুটল গায়ে।

আমি। কে বলছে, তুচ্ছ করবার মতো। কিন্তু সাধারণত মাড়োয়ারী বললে যা বোঝায়, তা হবার প্রবৃত্তি নেই। বাবা ঠিক ওই মাড়োয়ারী।

সে। মাড়োয়ারী-চরিত্রের অসৎ গুণগুলো বর্জন করে সৎ গুণগুলো নেবার তো কোন বাধা নেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়। আসলে গেলেন না আপনি মালতীর টিটকিরির ভয়ে। যদিও মালতী ঠাট্টা করেই বলেছিল—"তুমি তো অনবরত শ্রেণীর উন্নয়নের সপক্ষে থাকবেই, তুমি নিজে যে চামারের ছেলে"; তবু কথাগুলো কাঁটার মতো বিঁধেছিল আপনার বুকে। সেইজন্যেই আরও পেছিয়ে এলেন।

আমি। এ কথা খানিকটা ঠিক, কিন্তু পুরো নয়। কারণ দেশের কাজ করাই আমি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলাম, বাবার চামড়ার ব্যবসাতে যোগ দিলে তা সম্ভব হত না। তা ছাড়া, ওই ক্যাপিটালিস্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই আমার প্রধান বিরোধ, ওরাই দেশের শ্রমিকদের রক্তশোষণ করে নিজেরা পুষ্ট হচ্ছে, ওদের না জাগালে দেশের মুক্তি নেই।

সে। শ্রমিকদের জাগাবার সোনার কাঠি কি আপনি পেয়েছিলেন?

আমি। তোমার একটা মস্ত দোষ, তুমি হেঁয়ালি বা উপমা ছাড়া কথা বলতে পার না। সোনার কাঠি মানে কি?

সে। ভালোবাসা। ওদের কি সত্যিই আপনি আপন জনের মতন ভালোবাসেন?

আমি। কোথাও যখন চাকরি পেলাম না, তখন ওদের

হিতার্থে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কি পরিশ্রমটা যে করেছি, তা হয়তো জান না।

সে। জানি বইকি।

দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে বুকের কাপড়টা সংবৃত করে নিলে একটু। আগে ওকে দেখে আমার যে নেশার মতো হয়েছিল, মনে হল, হঠাৎ যেন সেটা বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে, ওকে চিনেছি আমি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নিজেরই কৃতিত্বে; তবু কৌতূহল আছে এখনও। অপরিচয়জনিত কৌতূহল নয়, ওর অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করবার কৌতূহল। ওর বিস্ময়-জনক আবির্ভাব, রহস্যময় আলাপ, আমার সম্বন্ধে ওর অদ্ভুত জ্ঞান আমায় আর বিস্মিত করছে না, আনন্দিত করছে, ওকে নিবিড় ভাবে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে; মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের "স্বপ্ন" কবিতাটি, পূর্বজন্মের সঙ্গে জড়াতে ইচ্ছে করছে ওকে।

দোতলায় স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যে যে পরিশ্রমটা আপনি করেছিলেন তা আমি জানি, ভালো করেই জানি। কিন্তু একটা খটকা আছে।

আমি। কি। বল?

সে। আপনি আপনার বাবার ট্যানারির শ্রমিকদের না

ক্ষেপিয়ে গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ক্ষেপাতে গেলেন কেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর যে উত্তরটা দিলাম, তাতে নিজেরই মনে বিস্ময় জাগল। ওকেও ঠকাতে চেষ্টা করছি !

আমি। কারণ গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের অবস্থা ট্যানারির কুলিদের চেয়ে ঢের খারাপ ছিল।

সে। ও !

এক ঝলক সকৌতুক হাসি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখে।

আলো নিবে গেল।

১৬

মফস্বলের ছোট একটি রেলওয়ে স্টেশন। অন্ধকার গভীর রাত্রি, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তবু চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। প্ল্যাট্‌ফর্মে তিল-ধারণের স্থান নেই। স্টেশনের বাইরে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাতে, সর্বত্র জনতা কিলবিল করছে, থিকথিক করছে। স্টেশন-মাস্টার, পুলিশ, ভলান্টিয়ার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে গোলমাল থামাতে। স্থানীয় নেতা সশঙ্কিত অবস্থায় বসে আছেন স্টেশন-মাস্টারের আপিসের এক কোণে মালা আর পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আগলে। ভিড়ে মালাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়—এই তাঁর মহাচিন্তা। ফুটফুটে ন-দশ বছরের যে মেয়েটির গান গেয়ে মালা পরিয়ে দেবার কথা, সে পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে—রাত তুটো পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে নি বেচারী।

বাইরে জনতার ভিতর থেকে অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট কলরব উঠছে—বিভিন্ন স্বরের সংমিশ্রণে অর্থহীন অস্পষ্ট একটা কোলাহল ; ননে হচ্ছে, নিবিড় অন্ধকারে ভারতবর্ষের ক্ষুধিত পীড়িত আত্মাই যেন বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে চলেছে।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে হুইস্‌ল বেজে উঠল। ট্রেন আসছে। হুড়মুড়িয়ে ঢুকলেন স্টেশন-মাস্টার নিজের আপিসে। স্থানীয় নেতাকে বললেন, "এখুনি মেসেজ পেলুম ডি. এস.-এর, পার্-মিশন দিলে না মশাই। ট্রেন তু মিনিটের বেশি দাঁড় করাতে পারব না, গান-টান হবে না, মালাটাই পরিয়ে দেবেন। ট্রেন এল,

আপনার সব ঠিক করে নিন। চাকরি, বুঝলেন মশাই, চাকরি—" বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ফুলের মালাটা সাবধানে নিয়ে মেয়েটিকে জাগিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্থানীয় নেতা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে।

"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়, জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—" চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গর্জন করে উঠল জনতা। শ্রমিক-নেতা প্রেমসিন্ধু দত্ত প্রথম শ্রেণীতে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন, অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, প্রতি স্টেশনে এ রকম করলে আর কাঁহাতক পারা যায়! ঘুম আর হবে না দেখছি। কাল সমস্ত দিন বক্তৃতা আছে, আর পারা যায় না—

জানালা খুলে মুণ্ডটা বাড়ালেন।

"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—"

স্থানীয় নেতা সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, মেয়েটি এগিয়ে এল মাল্য-হস্তে, প্রেমসিন্ধু দত্ত গলা বাড়িয়ে দিলেন, পেট্রোম্যাক্সের তীব্র আলোকে ক্লিক করে একটা শব্দ হল ফোটো নেওয়ার, মাল্য-ভূষিত প্রেমসিন্ধু দত্তকে দেখতে পেয়ে জনতা আর একবার চীৎকার করে উঠল—"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়"। গার্ডের হুইস্‌ল বাজল। নেবে পড়ুন, নেবে পড়ুন—"স্টেশন-মাস্টারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণামান্তে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন স্থানীয় নেতা, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর একবার জয়ধ্বনি উঠল—"জয় প্রেমসিন্ধুবাবুর জয়—"

দৃশ্য বদলাল।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় বসে আছে শ্রমিকের দল—ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকের দল। কাতারে কাতারে বসে আছে উন্মুখ প্রত্যাশায়। একটা সমুদ্র যেন, কিন্তু নিস্তব্ধ সমুদ্র, একটি তরঙ্গ উঠছে না, রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে সবাই। একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে বায়ুর স্তরে স্তরে। প্রেমসিন্ধু দত্ত বক্তৃতা করছেন আবেগময়ী ভাষায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, ঝুলে পড়েছে খদ্দরী আস্তিন উৎক্ষিপ্ত বাহুমূলে, প্রাণের জ্বালা জ্বলন্ত বাণীমূর্তি লাভ করছে প্রতি মুহূর্তে উদারা মুদারা তারায়, দরদর করে ঘাম পড়ছে, অস্তগামী সূর্যের রক্তিম কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল, অবাক হয়ে শুনছে সবাই, একটা তীব্র সুরা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে প্রত্যেকের শিরায় উপশিরায়, ক্ষুধিত নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকদের দুঃখের অবসান বুঝি হয় হয়…।

প্রেমসিন্ধু দত্ত থামলেন।

সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠল করতালিরবে, আনন্দের শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল যেন। থামতে চায় না।

সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে কিন্তু স্টোভের শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল—সোঁ-সোঁ সোঁ-সোঁ…।

১৭

আলো জ্বলে উঠল।

সে। আপনার এ স্বপ্নটা সফল হতে পারত, হল না কেবল নিজের দোষে।

আমি। কেন ?

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর সঙ্গে প্যাক্ট করলেই পারতেন, অন্য জেলায় শ্রমিক-আন্দোলন করবার জন্যে বেশ মোটা টাকা দিতে চাইছিলেন তিনি, অনায়াসে আপনি একজন নেতা হতে পারতেন।

আমি। ও রকম অসম্মানজনক প্যাক্ট করা যায় নাকি কখনো ?

সে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত অসম্মানজনক কাজই তো করলেন জীবনে, এটা করলে কি আর এমন বিশেষ ক্ষতি হত! গৌরীশঙ্করবাবুর কেবল একটি শর্ত ছিল, তাঁর মিলে হাত দিতে পারবেন না আপনি এবং অপরে যদি কেউ হাত দিতে চায়, তাকে বাধা দেবেন।

আমি। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের স্বার্থ বিদলিত করবার কোনো অধিকার নেই আমার।

সে। পরের স্বার্থ তো কত বার বিদলিত করেছেন নিজের

সুখের জন্য! ওই কুলিদের বেলাতেই হঠাৎ ধর্মভাব জেগে ওঠবার মানে কি?

আমি। কার স্বার্থ বিদলিত করেছি?

সে। আপনার বাবার, মালতীর বাবার।

আমি। ওসব নিতান্ত ব্যক্তিগত জিনিস, ওসবের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

সে। ও, চলে না বুঝি!

হাসি চিকমিক করতে লাগল তার চোখে।

আমি। ব্যক্তি আর সমাজ এক নয়।

সে। বুঝলাম না।

আমি। সমাজ-জীবনে স্বার্থ বলিদান দেওয়াতে যে পৌরুষ, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থ আঁকড়ে ধরাতে ঠিক সেই পৌরুষ। আমার ব্যক্তিগত মতামত, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়েই আমি, তুচ্ছ কারণে প্রতি পদে তা বিসর্জন দিতে গেলে নিজেকেই বিসর্জন দিতে হয়। তা হলে আর বেঁচে লাভ কি! বাঁচাটাই উদ্দেশ্য। বৃহত্তর সমাজের জন্যে আত্মবিসর্জন করলে অমরত্ব লাভ করা যায়, ছোটখাটো ব্যাপারের জন্যে করলে কিছুই লাভ হয় না, এক আত্মগ্লানি ছাড়া।

সে। বাবার সঙ্গে মতে মেলে নি তাই তাঁর সঙ্গে বিরোধ, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু মালতীর বাবার সঙ্গে?

আমি। মালতীর বাবার স্বার্থ আমি নষ্ট হতে দিতাম না—কিন্তু, থাক ও আলোচনা।

সে। মুখে বলছেন 'থাক', কিন্তু মনে মনে ওই আলোচনাই করছেন সারাক্ষণ। জিনিসটা মর্মমূলে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, তবু তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে করছে ব্যথা সত্ত্বেও।

সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে উঠল তার।

আলোটা নিবে গেল।

১৮

দুর্জয় শীত পড়েছে। তুষারপাত হচ্ছে। ল্যাচ কী ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। একটু আগেই যে মেয়েটির সঙ্গে নাচছিলাম, তার হাব-ভাব চলন-বলনে একটু আকৃষ্ট হয়েছিলাম যদিও কিন্তু মুগ্ধ হই নি। বরং ভাবছিলাম, ভাগ্যে আমাদের দেশে ঠিক এই জাতীয় মেয়ের আবির্ভাব হয় নি এখনও; ভাবছিলাম মালতীর কথা, ভাবছিলাম, সেদিন ইণ্ডিয়ান ওম্যানহুড নিয়ে বক্তৃতা করলে যে ছোকরা সায়েবটি, সে মালতীকে দেখে নি, সে দেখেছে রাস্তার ভিখারিণী অথবা বেশ্যালয়ের নর্তকীকে, কিংবা বড় জোর ভারী ভারী রুপোর গয়না-পরা, নাকে বেসর দোলানো নিম্নশ্রেণীর কোন বধূকে, মালতীকে দেখে নি। রেন-কোট ওভার-কোট খুলে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলাম ফায়ার-প্লেসের দিকে, এখনও আগুন আছে দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ল, টেবিলের উপর একখানা চিঠি রয়েছে, ল্যাণ্ডলেডি রেখে গেছে বোধ হয়, আজ যে 'মেল ডে' তা মনেই ছিল না। এ কি, এ যে মালতীরই চিঠি দেখছি! আরাম করে বসে পড়তে হবে, ঈজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম ভালো করে রাগটাকে পায়ের উপর টেনে নিয়ে। পড়তে লাগলাম চিঠিটা—

ভাই প্রেম দত্ত,

দোহাই তোমার, সত্যি সত্যি যেন আই. সি. এস. পরীক্ষাটি পাস করে ফেলো না, তা হলে বাবা নির্ঘাত তোমার সঙ্গেই

আমার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বাবা টাকা দিয়ে জীবনের অনেক শখ কিনেছেন, এখন টাকা দিয়ে আই. সি. এস. জামাই কেনবার শখ জেগেছে তাঁর। তাই তোমাকে এত খরচ করে বিলেত পাঠিয়েছেন। তুমিও দিব্যি চলে গেলে নিজের বাপ-মার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে। এটা আমার একটু ভালো লাগে নি। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি লোকটাকেই আমার মোটে পছন্দ হয় নি, তোমাকে ভালোবাসি নি একটুও, বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না। তোমার বিলেত যাওয়ার আগ্রহ দেখে, আমি বাবা-মাকে কিছু বলি নি। বরং ভান করেছিলাম যে, তোমাকে আমার ভালোই লেগেছে। ভেবেছিলাম, বাবার প্রচুর টাকা আছে, তার থেকে কিছু খসিয়ে যদি কোনো ছেলের বিলেত যাওয়া ঘটে, আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু? সাহায্যই বরং করা উচিত, বাবা বিনা স্বার্থে তো কাউকে পাঠাবেন না। কিন্তু এখন আর সত্যি কথাটা গোপন রাখা উচিত নয়, তোমাকে বিয়ে করব না আমি। ভালোবেসেছি তোমার বন্ধু রমেশকে, তাকেই বিয়ে করব। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি আই. সি. এস. পাস করে ফেল, বাবাকে ঠেকানো শক্ত হবে। দোহাই তোমার, ও কাজটি কোরো না। বাবার টাকায় তুমি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যারিস্টার যা খুশি হও, কেবল আই. সি. এস.টি হয়ো না।

আশা করি, এ প্রস্তাবে তোমার তরফ থেকেও ক্ষোভের

কোনো কারণ ঘটবে না। কারণ, আমার মতন একজন অতি-সাধারণ মেয়ে যে তোমার মতো ছেলের মনোহরণ করতে পেরেছে, এ কথা অবিশ্বাস্য। ও দেশে তোমার উপযুক্ত মেয়ে আছে, হয়তো এতদিন ভাবও হয়ে গেছে কারও সঙ্গে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না ; এবং দোহাই তোমার, আর যা-ই কর ভণ্ডামি কোরো না। ইতি—

মালতী

সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর ক্রমশ জাগল ডাক্তার রবিনসনের মুখখানা, রিসার্চ-স্কলার ডাক্তার রবিনসন। ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে আমাকে। পট করে ছুঁচটা ফুটল গায়ে—

১৯

আলো জ্বলে উঠল।

সে। মালতীর কথা পরে ভাববেন, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন।

আমি। কি বল ?

সে। শ্রমিকদের কষ্টে কি সত্যি দুঃখ হয় আপনার ?

আমি। হয় বইকি। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, শ্রমিকদের যতক্ষণ না আর্থিক উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা শিক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, ততক্ষণ এদেশের মুক্তি নেই।

সে। এটা আপনার ব্যক্তিগত মত, না সামাজিক মত ?

আমি। তার মানে ?

সে। মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আপনার আচরণ। আপনি গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিদের ধর্মঘট করিয়ে তাদের জন্য যে সব জিনিস দাবি করেছিলেন, আপনি নিজে তাদের সে সব দাবি গ্রাহ্য করেন কি ? আপনি কি আপনার চাকরের ওই দাবি অনুসারে মাইনে দেন, আপনার উনুন ধরাতে গিয়ে সে যদি পুড়ে যায়, কম্‌পেন্‌সেশন দেন তাকে, অসুখে পড়লে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করান তার ? তার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ? নিয়মিত ছুটি দেন ?

সেদিন যে আপনার চাকরটা আসে নি, তার একমাত্র কারণ তার জ্বর হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে না আসাতে আপনার জুতো বুরুশ করা হয় নি এবং যেহেতু কম চকচকে জুতো পরে মালতীদের বাড়ি যেতে আপনার লজ্জা করেছিল, সেই হেতু বেচারাকে এক কথায় আপনি ছাড়িয়ে দিলেন তার শোচনীয় দুরবস্থা জেনেও। এই একই ব্যক্তি কি করে মিলের শ্রমিক-দের দুঃখে বিগলিত হয় বুঝি না।

আমি। আমার আর্থিক অবস্থা আর গৌরীশঙ্করবাবুর আর্থিক অবস্থা এক নয়।

সে। নিশ্চয়ই নয়, অনেক তফাত। আপনি একজন বেকার হতভাগা, আর তিনি নিজের চেষ্টায় চার-চারটে মিল স্থাপন করেছেন। দেশের বহু নিরন্ন লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেছেন, অর্থোপার্জনের একটা স্বাধীন ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন, উপার্জিত অর্থ দিয়ে দেশের অনেক সৎকার্যও করেছেন। কংগ্রেসের লোক, গবর্মেণ্টের লোক সবাই খাতির করে তাঁকে সেজন্য। আপনি সে সব কিছুই করেন নি, আপনার একমাত্র চেষ্টা, কিসে তাঁর ব্যবসা পণ্ড হয়, কিসে তিনি জব্দ হন।

আমি। শ্রমিকদের উন্নতি করলে ব্যবসা পণ্ড হয় না, ব্যবসার উন্নতি হয়।

সে। শ্রমিকদের মারফত আপনি দাবির যে ফর্দটা পেশ করিয়েছিলেন, তা মেনে নিলে গৌরীশঙ্করবাবুর মাসিক বিশ

হাজার টাকা খরচ বেড়ে যায়। এই প্রতিযোগিতার দিনে বিশ হাজার টাকা খরচ বাড়ালে তাঁর ব্যবসা টিকতে পারে? আপনি নিজে মাসে পাঁচ টাকা খরচ করে আপনার দুঃস্থ চাকরের দুঃখ দূর করতে অপারগ, আপনি বক্তৃতা করে অপরকে বিশ হাজার টাকা খরচ করবার ফরমাশ দেন!

আমি। গৌরীশঙ্করবাবু লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। যে শ্রমিকদের পেশীর শক্তি নিঙড়ে তিনি ওই টাকা উপার্জন করেছেন, সেই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে সেই উপার্জনের ন্যায্য অংশীদার হবার।

সে। হয়তো আছে। কিন্তু তা নিয়ে বোঝাপড়া করুক গৌরীশঙ্করবাবু আর তাঁর শ্রমিকরা, আপনার স্থান কোথা এর মধ্যে? আপনি ওপর-পড়া হয়ে আসেন কি হিসেবে?

আমি। এর উত্তর কবি দিয়েছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—

সে। সে ভাষা দিতেই বা পারলেন কই? গৌরীশঙ্কর-বাবুর এক চালেই তো মাত হয়ে গেলেন।

আমি। হ্যাঁ, রমেশের জন্যেই শেষকালে—

সে। মালতীর জন্যে বলুন।

একটা ক্ষুরধার হাসি চকমক করে উঠল চোখে মুখে। আলো নিবে গেল।

২০

শ্রমিক-সঙ্ঘের · আগামী অধিবেশনের আয়োজনকল্পে বেরুচ্ছিলাম। তাতে গৌরীশঙ্কর রায়কে সংঘের তরফ থেকে চরমপত্র দেবার যে আয়োজন হচ্ছিল, আমিই তার একমাত্র নেতা,—এ শহরে ধনী গৌরীশঙ্করবাবুর বিরুদ্ধতা করবার সাহস আর কারও নেই। বেরুচ্ছিলাম, এমন সময় ফোন এল—মালতীর ফোন—"বড় জরুরী দরকার, একবার এস।" মালতীর আমাকে দরকার ? আমাকে ? ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ভাবলাম এলোমেলো কত কি ! তারপর সহসা মনে হল, বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যেতেই যখন হবে অবিলম্বে যাওয়াই ভালো।

এসেছি। এসেই মালতীর সঙ্গে দেখা হয় নি, হয়েছিল তারিণীবাবু আর লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী দুজনেই পেন্‌শনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। চাকরি নেই, ভদ্রভাবে অবসর বিনোদন করবার মত মানসিক সংস্কৃতি নেই, শরীরও অপটু নয় যে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটবে, তাই এঁরা পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়ান হিতৈষীর ছদ্মবেশে। প্রত্যেকের বৈঠকখানায় এঁদের অবাধ গতিবিধি। প্রত্যেকের মনের খবর, দেহের খবর, হাঁড়ির খবর, চাকরির খবর, মকদ্দমার খবর, চিকিৎসার খবর—সমস্ত খবর এঁরা রাখেন এবং তাই

নাড়াচাড়া করে সময় কাটান। কথা চালাচালি করে মজাও দেখেন মাঝে মাঝে। এই নিরীহ বুড়ো দুটিকে শত্রু বলে চিনতে দেরি লাগে এবং চেনবার পরও তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ঘুরিয়ে বললে এঁরা না-বোঝার ভান করেন, বুঝলেও গায়ে মাখতে চান না। সোজাসুজি কটু কথা বলা যায় না, কারণ মফস্বলে পক্বকেশ ব্যক্তি মাত্রেই বিজ্ঞ, সুতরাং পূজনীয়। আমি যদিও এঁদের অপমান করি নি কোনোদিন, কিন্তু আমাকে এঁরা ভয় করেন, এড়িয়ে চলেন। মালতীর সম্বন্ধে শহরে নানারকম গুজব প্রচলিত আছে, তারই আকর্ষণে এঁরা আসেন এখানে রমেশের রিসার্চ কতদূর এগোল এই খবর নেবার অজুহাতে। টুকরো-টাকরা যা দু-একটি খবর সংগ্রহ করতে পারেন—রিসার্চ নয়, মালতীর সম্বন্ধে—তারই উপর রঙ চড়িয়ে আনন্দলাভ করেন বোধ হয় অন্য কারও বৈঠকখানায় বসে এবং অন্য কারও খরচায় তামাক টানতে টানতে। আমাকে হঠাৎ প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন দুজনেই, মনস্কামনা সিদ্ধ হল সম্ভবত, আমার এখানে আসাটা নিয়েই বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটবে।

তারিণীবাবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললেন, "প্রেমসিন্ধু যে, তারপর খবর সব ভালো? তোমার পিতা কেমন আছেন?"

"ভালো—"

সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্ষুণ্ণ হলেন বোধ হয় তিনি। জগৎ লাহিড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "চল হে, চাটুজ্জেদের মেয়েটি কেমন আছে খবর নিয়ে আসি। রমেশের ফিরতে দেরি হবে আজ দেখছি, রিসার্চের খবরটা আর নেওয়া হল না আজ।"

"চল—"

"সিবিল সার্জেন ব্যাটা মারবে দেখছি মেয়েটাকে। চাটুজ্জেকে বলছি কবরেজি করাও, কিন্তু কিছুতে শুনবে না ও।"

"চল, আর একবার বোঝাই গিয়ে—"

"তাই চল—"

চলে গেলেন দুজনে।

আমি সোজা উপরে উঠে গেলাম। মালতী বাথরূমে ছিল। আমার সাড়া পেয়ে বাথরূম থেকেই চেঁচিয়ে বললে, "বোসো একটু, আমার হয়ে গেছে—"

গদি-আঁটা স্প্রিঙের চেয়ারটায় বসলাম। এতক্ষণ মনে পড়ে নি, কিন্তু এইবার মনে পড়ল, এটা আষাঢ় মাস। মেঘ-মেদুর আষাঢ়-অপরাহ্ণ! অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া ভাব। হলদে দেওয়ালগুলোতে নীলাঞ্জনের আবেশ লেগেছে, পিতলের টবে বন্দী বামন তালগাছটা যেন স্বপ্ন দেখছে মেঘমল্লারের। মালতী ঠিক পাশের ঘরেই স্নান করছে, সাবান মাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।...রমেশকে মনে পড়ল, বেঢপ চেহারা, মনে হয় শরীরে কোনো হাড় নেই, সর্বাঙ্গ থলথল করছে। তবু বিলেতে অনেক

মেয়ে ওর প্রেমে পড়েছিল শুনেছি, মালতীরও লাভ-ম্যারেজ। রমেশের চেহারা যেমনই হোক, প্রতিভা আছে এবং সে প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার চোখমুখ দিয়ে। কোন একটা জিনিস নিয়ে তন্ময় হয়ে যাবার ক্ষমতা আছে ওর। নীরস কেমিস্ট্রিতে কি রস পেয়েছে ওই জানে, কেমিস্ট্রিই ধ্যান-জ্ঞান, ওইতেই ডুবে আছে। বাড়িতেও শোবার ঘরের পাশে ছোট খাটো ল্যাবরেটরি করেছে একটা। বিলেতেই আমার সঙ্গে ভাব হয়েছিল, আমি বিলেতে পৌঁছবার কিছুদিন পরেই ও দেশে ফেরে। তার পরের ডাকেই মালতীর চিঠি পাই।

বাথরুমের কপাট ঠেলে মালতী বেরিয়ে এল। ঠিক যে শাড়িটি পরলে ওকে সবচেয়ে বেশি মানায়, সেই শাড়িটিই পরেছে—টকটকে লালপেড়ে কমলা-রঙের শাড়ি। সুন্দরী, যুবতী বা তন্বী বলতে যা বোঝায়, মালতী ঠিক তা নয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, মাজা-মাজা রঙ, একটু মোটাসোটা গোছের। দেখবামাত্রই মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়বার মতো চেহারা নয়। কিন্তু ওর সঙ্গে কিছুদিন মিশলে, ওর দৃষ্টির, ওর হাসির বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর অর্থ বুঝতে পারলে, ওর অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পেলে, ওর আর একটা যে রূপ চোখে পড়ে, তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হলেও অনন্যসাধারণ।

দেখা হলে সাধারণত লোকে হাসে, মালতীও হাসে, আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলাম। আজ কিন্তু আমাকে দেখেই মালতী

কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, ভুরু দুটো ঈষৎ কুঁচকে অপাঙ্গে আমার পানে একবার চেয়ে একটি ছোট মোড়া টেনে বসল একটু দূরে। তারপর যা বললে, তা এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। "এই যদি তোমার মনে ছিল তা হলে সেটা খোলাখুলি বললেই পারতে, আমি নিজেই চলে যেতাম এখান থেকে। ওঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি করার কোনো দরকার ছিল না।"

আমি কিছু বলবার আগেই বাঘিনীর মতো দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো, সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অদৃশ্য অগ্নিশিখা লকলক করে উঠল যেন। "আমি যদি না যাই, সাধ্য আছে তোমার আমাকে এখান থেকে তাড়াবার? আমি কারও চাকর নই, আমার বাপের বাড়ি এখানে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকবারও সঙ্গতি আছে আমার নিজের। তোমার বন্ধুর টাকার তোয়াক্কা করি না আমি—"

"কি বলছ বুঝতে পারছি না—"

"নিজের প্রয়োজনমত কোনো জিনিস বুঝতে না পারাটাই তো তোমার বিশেষত্ব। বিলেতে তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটাও তুমি বুঝতে না পারার ভান করেছ। তিন মাস থেকে যে আমাদের বাড়িতে আসছ না, তাও একটা ভান তোমার—একটা পোজ। পাছে আমার সুনামে তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ী কলঙ্ক রটায়—এই ভয়ে আস না।

যেন কত বড় হিতৈষী আমার। তুমি কি মনে কর, তোমার ভান নঝতে পারি না আমি?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, কারণ জানি, উত্তর দিলে উত্তাপ বেড়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরল আবার এবং আমার দিকে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কুড়িয়ে দেখি, একখানা চিঠি। প্রফেসার চক্রবর্তী রমেশকে ইংরেজীতে লিখেছেন। তার বাংলা মর্মার্থ এই।—"রমেশবাবু, গোপনে আপনাকে একটা খবর জানাচ্ছি। আগামী একুশে তারিখে কলেজ-কমিটির যে মীটিং হবে, তাতে আপনাকে পার্মানেণ্ট করা হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা হবে। আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু গৌরীশঙ্করবাবু প্রত্যেক মেম্বারের বাড়ি গিয়ে এই কথা বলে এসেছেন—প্রেমসিন্ধু দত্তের মতো ডেঞ্জারাস ক্যারাক্টারের লোকের সঙ্গে যার অত মাখামাখি, তাকে কিছুতেই পার্মানেণ্ট করা চলবে না। আপনি জানেন নিশ্চয়, প্রেমসিন্ধুবাবুর প্ররোচনাতেই গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের কুলিরা ধর্মঘট করেছিল। শোনা যাচ্ছে, প্রেমসিন্ধু দু-চার দিনের মধ্যেই নাকি কুলিদের তরফ থেকে একটা আলটিমেটাম পাঠাবেন গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করে প্রেমসিন্ধুবাবুকে এ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন, তা হলেই গৌরীশঙ্করবাবুর মত বদলাতে

পারে হয়তো, অর্থাৎ তা হলেই আপনার চাকরিতে পাকা হবার আশা আছে, নতুবা নেই। কারণ, জানেনই তো, গৌরীশঙ্করবাবু কলেজে একলাখ টাকা দান করেছেন, তাঁর কথা কোনো মেম্বারই ঠেলতে পারবে না। আপনি চেষ্টা করে দেখুন, যদি প্রেমসিন্ধুবাবুকে রাজী করাতে পারেন। আজকাল বাজারে চাকরি গেলে যে কি অবস্থা হয়, তা আশা করি প্রেমসিন্ধুবাবু বুঝবেন, যতদূর জানি, তিনি সহৃদয় লোক…"

চিঠিখানা হাতে করে বিমূঢ়ের মতো বসে রইলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, আষাঢ়ের নব-জলধর স্তূপীকৃত হচ্ছে ঈশান কোণটায়, মাঠের ওপাশে পুষ্পিত কদমগাছটা নুয়ে নুয়ে পড়ছে পুবে-হাওয়ার বেগে। মালতী হঠাৎ এল আবার। হাতে একটা রুপোর ট্রে, ট্রের উপর কাচের পান-পাত্র, তাতে টলমল করছে রঙিন সুরা। হুইস্কি।

"তোমার আগামী জন্মদিনে এইটে উপহার দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি যা আয়োজন করছ, তাতে হয়তো আর দেখা হবে না আমাদের। এখনই নাও, অবশ্য নিতে যদি আপত্তি না থাকে।" বাঁ হাত দিয়ে একটা তেপায়া আমার সামনে টেনে এনে তার উপর ট্রেটা রাখলে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

"হুইস্কিতে কিছু মেশানো হয় নি, সোডা আনতে পাঠিয়েছি—"

চিঠির সম্বন্ধে আলোচনা কি ভাবে করব ভাবছি, এমন সময় সে নিজেই বললে, "তোমার বন্ধুটিও কম আশ্চর্য লোক নন। চিঠিখানার কথা আমাকে বলেনই নি। আমি ল্যাব-রেটরি-ঘরটায় ঢুকে হঠাৎ ওটা আবিষ্কার করলাম একটু আগে, টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক চাপা ছিল—"

দুজনেই চুপ করে রইলাম। একটু পরে মালতীই আবার কথা বললে, "আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য, তুমি মনে কোরো না যে, উনি আমার মারফত তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। তা জানাচ্ছেন না, আমি নিজের দিক থেকেও কিছু বলছি না, কারণ জানি, তোমাকে কিছু বলা বৃথা, তুমি যা করবার ঠিকই করবে, মাঝ থেকে পোজ করবে একটা নতুন রকম—"

আমি ওর দিকে চেয়ে ছিলাম না, আমি চেয়ে ছিলাম খোলা জানালা দিয়ে দূর ঈশান কোণে, যেখানে পুঞ্জীভূত মেঘমালা কৃষ্ণতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ, দেখেছিলাম বায়ুবিস্রস্ত কদম গাছটাকে, কিন্তু মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছিলাম, ওর জ্বলন্ত দৃষ্টিটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললাম, "দেশলাই দাও তো একটা—"

পাশের টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেশলাই বার করে দিলে, ভাবলে, সিগারেট ধরাব বুঝি। গৌরীশঙ্করবাবুকে দেবার

জন্যে যে চরমপত্রখানা রচনা করেছিলাম, সেখানা পকেটেই ছিল। সেটা বার করে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বেশ করে ভিজিয়ে নিলাম।

"কি করছ? কি ওটা?"

"শ্রমিক-সঙ্ঘের আল্‌টিমেটাম—"

বাকী হুইস্কিটা এক নিশ্বাসে পান করে ফেললাম নির্জলাই। কাগজখানা ট্রের উপর রেখে ধরিয়ে দিলাম আগুন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কুঁকড়ে কালো হয়ে উঠল, তারপর দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল। মালতী নিস্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখলে সব। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তার চোখের আগুনও নিবে গেছে, পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাগিনীর মতো তর্জন করে উঠল, "I hate you, I hate you, I hate you!" দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

২১

আলো জ্বলে উঠল।

সে। মালতীর চেয়ে মিনতি মেয়েটি কি ঠাণ্ডা নয়? নিরীহ ভালোমানুষ বেচারী, মুখে কথাটি নেই।

আমি। মালতীর সঙ্গে মিনতির তুলনা কোরো না, তুলনা হয় না।

সে। তুলনা করছি না, কে কি রকম তাই শুধু বলছি। মালতী মুখরা, মিনতি নীরব।

আমি। আর একটু সরব হলে ক্ষতি ছিল না।

চুপ করে রইলাম দুজনেই খানিকক্ষণ।

স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যাঁর মাথায় ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এসেছিল এবং সেই প্রতিষ্ঠানে যিনি নীরবতাকেই উচ্চ আসন দিয়েছিলেন, তাঁর মুখে এ কথা শুনে একটু বিস্ময়বোধ করছি।

আমি। ছাত্রের আচরণে যেটা শোভন, প্রিয়ার আচরণে সেটা শোভন নাও হতে পারে।

সে। মিনতিকে প্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন তা হলে!

সমস্ত মুখখানা হঠাৎ হাসিতে ভরে উঠল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আবার নীরবতা ঘনিয়ে এল, আবার স্টোভের আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে। যে মেয়ে খুব বকবক করতে পারে তাকেই আপনার পছন্দ যদি, তা হলে বিলেত যাবার মুখে মার্‌সেল শহরে নেবে মাদাম ডি'কস্টার ওখানে যে মেয়েটির সঙ্গে রাত্রি-বাস করেছিলেন তার ওপর তত প্রসন্ন হতে পারেন নি কেন, তার খিলখিল হাসি আর গলগল বকুনির তো অন্ত ছিল না।

আমি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় আমরা মেয়েদের মধ্যে কি চাই।

সে। বোঝা অসম্ভব হত না, যদি চাহিদাটা রোজ রোজ না বদলাত।

আমি। কি রকম ?

সে। প্রথম যৌবনের কথা ভেবে দেখুন। লাজনম্রা তন্বী কিশোরী মূর্তিই তখন আপনার স্বপ্নকে মধুর করে তুলত। এই মিনতিই যদি ঠিক দশ বছর আগে আসত, তা হলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এখন কিন্তু ত্রিশ বছরের মুখরা মালতীই আপনাকে উতলা করে তুলেছে, মিনতিকে নেহাত বিস্বাদ ঠেকছে এবার।

আমি। একটু ভুল হল বোধ হয়। হিসেবটা ঠিক বয়সের নয়, গুণের এবং রুচির। আমি সুক্তো ভালোবাসি না, ঝাল-ঝাল মাংসই আমার প্রিয় খাদ্য। বিষধর সাপ যখন ফণা তুলে গ্রীবাভঙ্গীসহকারে দুলতে থাকে, আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ; কিন্তু কেঁচো দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে।

সে। সত্যি গা ঘিনঘিন করে? কালই তো আপনি মিনতির দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন!

আমি। ঠিক মিনতির দিকে নয়, মিনতির নবোন্মেষিত যৌবনের দিকে। মিনতিকে বাদ দিয়ে যদি তার নবোন্মেষিত যৌবনটাকে বিয়ে করা চলত, আমি বিয়ে করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু বাঙালী মেয়ের দেহে যৌবন তো বেশি দিন থাকবে না, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে, পড়ে থাকবে ওই হাঁদা মিনতি, যে একটা রসিকতা বোঝে না, ধমকালে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্না-ঘর ভঁাড়ারঘরের বাইরে যার অস্তিত্ব নেই—ওই পড়ে থাকবে। ওকে নিয়ে কি করব আমি সারাজীবন?

সে। আপনার মাকে আপনার কেমন লাগে?

আমি। খুব ভালো লাগে।

সে। সত্যি? খুব আশ্চর্য তো! যতদূর জানি, বিছানা মশারি কাঁথা বালিশ রান্নাঘর ভঁাড়ারঘরের বাইরে তাঁরও তো অস্তিত্ব নেই!

আমি। কিন্তু তিনি মা।

সে। অর্থাৎ তিনি আপনার সব রকম উপদ্রব সহ্য করেন। নয়?

আলো নিবে গেল।

২২

নোংরা বস্তি। খুব ছোট একটা খোলার ঘর, বর্ষাকালে চাল দিয়ে জল পড়ে, অন্যকালে আকাশ দেখা যায়, পাশেই পচা নালা দুর্গন্ধ বিকিরণ করছে। অসংখ্য মশা, চীৎকার করছে মাতাল, আর্তনাদ করছে প্রহৃত নারী, কাঁদছে পীড়িত শিশু। তার সঙ্গে মিশছে পেঁয়াজ-ভাজার গন্ধ, রামায়ণ-পাঠ, বেশ্যার সঙ্গীত, উনুনের ধোঁয়া, পুলিশের হুমকি। খোলার ঘরের এক কোণে দড়ির একখানি খাটিয়া, খাটিয়ার সামনে উপর্যুপরি সাজানো দুটি কেরোসিন কাঠের বাক্স টেবিলের অভাব পূর্ণ করছে। তার একধারে মিটমিট করে জ্বলছে কালিঝুলি-মাখা সস্তা লণ্ঠন একটা, আর একধারে রয়েছে আধখানা-খাওয়া শুকনো একটা পাঁউরুটি, মাঝখানে তন্ময় হয়ে বসে লিখে চলেছে একজন, মাথায় দীর্ঘ রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল, চোখে শিল্পীর স্বপ্ন।

ব্যাল্‌জাক নয়···আমি।

সাহিত্য-সেবা করছি।

দেশকে জাগাতে হবে।

দৃশ্য বদলাল।

অভিজাত পল্লী। চমৎকার সুসজ্জিত একটি কক্ষ, পাশেই সুন্দর বাগান সৌরভ বিকিরণ করছে, অসংখ্য ফুল ফুটেছে, চীৎকার করছে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর একটা, মোটরটা আর্তনাদ

করছে গ্যারেজে, কাঁদছে ক্ল্যারিঅনেট পাশের পাশের বাড়ির জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে, বাজছে তাতে 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে', তার সঙ্গে মিশছে বিলিতি এসেন্সের গন্ধ, এজরা পাউণ্ডের কাব্য-পাঠ, রেডিওর সঙ্গীত, সিগারেটের ধোঁয়া, সম্পাদকের বকুনি। কক্ষটির একধারে সোফা সেটি, আর এক ধারে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রেক্সিন দিয়ে মোড়া। তার ওপর আছে সুদৃশ্য তুটি কাচের দোয়াত, এক টুকরো দামী মার্বেলের ওপর বসানো, চমৎকার কাগজ-চাপা গোটা তুই, চায়ের পেয়ালা, কয়েকটা অ্যাশ-ট্রে। টেবিলে পা তুলে সাহিত্য আলোচনা করছি, আশেপাশে এসে জুটেছে তরুণ সাহিত্যিকেরা—বুভুক্ষু, তিক্ত-চিত্ত, সন্দিগ্ধমনা, অসমর্থ, মুখে বিদ্রোহপন্থী। মাসিক-পত্রিকার আপিস। আমি সম্পাদক। স্বপ্ন দেখছি,—চোখের উপর ভাসছে রবীন্দ্রনাথ, উত্তরায়ণ, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি, অটোগ্রাফ, শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, দেশসেবা, নোবেল প্রাইজ…

২৩

আলো জ্বলে উঠল।

সে। শ্রমিক-আন্দোলনের শিখা মালতীর এক ফুৎকারেই নিবে গেল ?

আমি। নিজেও ভেবে দেখলাম, আমি ঠিক ওর উপযুক্ত নই। আমি রাজনৈতিক নই, আমি সাহিত্যিক, আজীবন সাহিত্য-চর্চা ছাড়া আর কিছু করি নি।

সে। কিন্তু ব্যাল্‌জাক ডিকেন্সের মতো কৃচ্ছ্রসাধন করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি ভাড়া করে বসলেন যে ?

আমি। মা লুকিয়ে যখন কিছু টাকা দিলেন, তখন কৃচ্ছ্রসাধন করবার দরকার হল না। সাহিত্যিকেরা স্বভাবত বিলাসপ্রবণ, বিলাসের আবেষ্টনীতেই তাদের কল্পনা স্ফূর্ত হয়। শখ করে কেউ কৃচ্ছ্র সাধন করে না, করে দায়ে পড়ে। আমার দরকার হয় নি।

সে। কিন্তু তবু আপনার কল্পনা স্ফূর্ত হল না কেন ?

আমি। আমার কল্পনা স্ফূর্ত হয়েছিল কিন্তু একা একটা কাগজ চালানো যায় না, একজনের লেখা পড়ে পাঠক-পাঠিকার পিপাসা মেটে না।

সে। কিন্তু আপনার কাগজে যৌন-পিপাসা ছাড়া আর কোনো পিপাসার খোরাক ছিল না।

আমি। আমার দলে যে সব লেখক জুটলেন, তাঁদের কলম দিয়ে অন্য আর কিছু বেরুল না, বেরুনো সম্ভবও ছিল না, কারণ সত্যিই ওঁরা সবাই যৌনক্ষুধায় ছটফট করছিলেন—

সে। ভালো লেখক পেলেন না?

আমি। প্রথমত পয়সা দেবার ক্ষমতা ছিল না, দ্বিতীয়ত ভালো লেখক নেই।

সে। নিজে কাগজ বার না করে প্রতিষ্ঠিত কোনো পত্রিকায় লিখলেই পারতেন।

আমি। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার লেখা কেউ ছাপতে চাইলে না—সর্বত্রই ক্লিক।

চুপ করে বসে রইলাম দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে। স্টোভটা এখনও জ্বলছে।

একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেল জানালাটা। ওর মাথার কাপড় সরে গেল, অলক উড়তে লাগল।

সে। প্রেসের বিল শোধ করতে পেরেছেন?

মুচকি হাসলে একটু। আলো নিবে গেল।

২৪

"ওহে করুণাসিন্ধু, তোমার ছেলেটা যে একেবারে অধঃপাতে গেল, সামলাও ওকে—"

"কি করে সামলাব বল, পরামর্শ দাও, শাসন করতে তো ত্রুটি করি না—"

"তোমার শাসনের দৌড় বোঝা গেছে; শাসনকর্ত্রী আমদানি কর টুকটুকে দেখে একটি, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

হাপরের মতো একটা শব্দ হল, গৌরীশঙ্করবাবু হাসলেন।

"তারও চেষ্টা করছি। মিনতিকে আনিয়েছি—"

"মিনতিটি কে?"

"আমার এক বাল্যবন্ধুর মেয়ে। বেচারা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে, মেয়েটির বিয়ে দিয়ে যেতে পারে নি—"

"মেয়েটি কেমন?"

"ভারী লক্ষ্মী, যেমন স্বভাব, তেমনই সংসারের কাজকর্মে, মুখে কথাটি নেই—"

"আরে, দেখতে কেমন?"

"দেখতে অবশ্য ডানাকাটা পরী নয়, গেরস্ত-ঘরের মেয়ে সাধারণত যেমন হয়, তেমনই—"

"কিন্তু ও মেয়ে তোমার বিলেত-ফেরত ছেলের মনে ধরবে কি?"

"ধরতেই হবে।"

"যদি না ধরে, কি করবে তুমি?"

"বাড়ি থেকে দূর করে দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব, মিনতির পাত্রের অভাব হবে না।"

"তুমিই খরচ করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে বলছ ?"

"নিশ্চয়ই। মৌখিক বন্ধুত্ব করি না আমি কারও সঙ্গে। অখিল আমার 'ফ্রেণ্ড' ছিল না, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।"

"কিন্তু মেয়ে কি তোমার ছেলের উপযুক্ত ?"

"আমার ছেলে ও মেয়ের উপযুক্ত কি না তাই আমি ভাবছি।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা চিরকালই স্বল্পভাষী, বেশি কথা বলেন না। গৌরীশঙ্করবাবুই আবার কথা বললেন।

"ওই মালতীই ওর মাথা খেলে। তারিণীবাবু আর জগৎ-বাবুর মুখে যা শুনি, তাতে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় আমার। মাগী একটা পাবলিক নুইসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে হে, অথচ কিছু বলবার জো নেই, রেস্‌পেক্‌টেবল ভদ্রলোকের স্ত্রী—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

বাবা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা প্রফেসার গুপ্তকে পার্মানেণ্ট করলে নাকি ?"

"করতে হল, মানে করতামই। লোকটা তো খারাপ নয়, সত্যিই বিদ্বান লোক। আমি অবশ্য এই উপলক্ষ্যে নিজের কাজ খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছি মাগীর মারফত ;

ভাবলাম, তোমারও হয়তো খানিকটা উপকার হবে তাতে।"

"কি কাজ?"

"তোমার ছেলে আমার মিলের কুলিগুলিকে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিল না? অবশ্য শেষ পর্যন্ত হত না কিছুই, আমি সর্দারদের সব হাত করে নিয়েছিলাম ; কিন্তু আমি ভাবলাম এই উপলক্ষ্যে তোমার ছেলের মতিগতিটা যদি ঘুরিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি! দেখা করলাম মাগীর সঙ্গে একদিন গোপনে, তার হাতে প্রফেসার চক্রবর্তীর জবানিতে লেখা একখানা চিঠিও দিয়ে এলাম, চিঠিখানা অবশ্য লিখেছিল আমার কেরানী যুগল। মাগীকে বললাম, আপনি যদি প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এই চিঠিখানা দেখান তাকে, তা হলে হয়তো ছোকরা সামলে যেতে পারে, অমন একটা ভালো ছেলে অনর্থক বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করছে তো বেফয়দা, আমরা বললে শোনে না, আপনি বললে শুনবে, বিশেষত আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে জানলে ঠিক শুনবে, এ শহরে আপনার কথাই ও মানে কেবল। রমেশবাবু পার্মানেণ্ট নিশ্চয়ই হবেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজে ক্যান্‌ভাস্‌ করছি তাঁর জন্যে। তারপর মাগীকে মিনার্ভাখানায় বসিয়ে বেশ লম্বা এক চক্কর দিয়ে নিয়ে এলুম—"

আবার হাপরের শব্দ হল।

বাবা বললেন, "আমার আর তাতে কি লাভ হল বল?"

"হ্যাঁ, এখন দেখছি কিছুই লাভ হয়নি। ও যে কলকাতায় গিয়ে কাব্যি করবে, তা তো ভাবতে পারি নি। মাসিক-পত্রের কি নাম হে—অঁ্যা—টর্চ! আর ওতে গুষ্টির পিণ্ডি কি যে লেখে ওরা, তার তো কোনও হদিসই পাই না! দেখেছ তুমি?"

"না। শুনেছি, উঠে গেছে কাগজটা।"

'অঁ্যা! উঠে গেছে! ফিরেছে নাকি প্রেমসিন্ধু কলকাতা থেকে? আবার আমার মিল নিয়ে না পড়ে।"

"ফেরে নি বোধ হয়। দেখি নি তো!"

আমি কিন্তু একটু আগেই ফিরেছিলাম, পাশের ঘরে চোরের মতো দাঁড়িয়ে শুনছিলাম সব।

হঠাৎ কপাট ঠেলে একজন ঢুকল।

"এইটেই কি করুণাসিন্ধুবাবুর বাড়ি?"

গলার স্বরে চিনলাম, প্রেস-ওলা।

"আমিই করুণাসিন্ধু। কি চান?"

"ও আপনিই? নমস্কার। প্রেমসিন্ধুবাবু আপনারই ছেলে?"

"হ্যাঁ। কি দরকার?"

"তিনি আমার প্রেস থেকে একখানা কাগজ বার করতেন। কাগজখানা উঠে গেছে, কিন্তু আমার বিল এক পয়সাও পাই নি এখনও।"

"সে তো কলকাতাতেই আছে, তার কাছেই যান।"

"তিনি কলকাতায় নেই—"

"নেই ? আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা হলে বলব আপনার কথা। আপনার নামঠিকানা রেখে যেতে পারেন।"

"কিন্তু যতদূর শুনেছি, তাঁর হাতে একটি পয়সা নেই। আপনি যদি পেমেণ্টটা করে দিতেন, বড় উপকৃত হতাম।"

"আমি পেমেণ্ট করব কেন ? আমি তো আপনার প্রেস থেকে কিছু ছাপাই নি।"

"তা জানি। কিন্তু আপনার নামের খাতিরেই আমি ধার দিয়েছিলাম আপনার ছেলেকে।"

"আমার নামের খাতিরে ! আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই, শোনা নেই, কিছু নেই, অথচ—"

"আপনি একজন বিখ্যাত ব্যাবসায়ী—"

"মাপ করবেন, আমি দিতে পারব না—"

প্রেস-ওলা চলে যাচ্ছিল, বাবা ডাকলেন তাকে।

"একটি শর্তে আপনার বিল শোধ করে দিতে পারি।"

"কি বলুন ?"

"যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ওর সঙ্গে বা ওর মতো কোনো ভ্যাগাবণ্ডের সঙ্গে ধারে আর কখনও কারবার করবেন না—"

"এ রকম প্রতিজ্ঞা করা কঠিন। কারবার করতে গেলেই ধার দিতে হয়—"

"লোক বুঝে দেবেন।"

"বোঝা যায় না সব সময়। প্রেমসিন্ধুবাবুকে দেখে কারও

বোঝবার সাধ্যি নেই যে, তিনি টাকা মেরে দিতে পারেন। অথচ দেখুন—"

"সে কোথা আছে জানেন ?"

"আমার যতদূর খবর, তাঁর এখানেই আজ আসার কথা। কদিন থেকে অবশ্য তিনি সিনেমায় ঢোকবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু সেখানে কিছু হয় নি শুনলাম।"

"আপনি এ শর্তে রাজী নন তা হলে ?"

"যে শর্ত পালন করতে পারব না, তাতে রাজী হই কি করে বলুন ? আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

"শুনুন, কত টাকার বিল আপনার ?"

"পাঁচ শো বত্রিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা—আমার যাতায়াত-খরচা সুদ্ধ ধরেই বলছি।"

ড্রয়ার টানার শব্দ পাওয়া গেল।

বাবা চেক লিখে দিলেন।

"এই নিন। আপনাকে আমি টাকাটা দিতাম না, দিলাম কেবল আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে। এ রকমটা প্রায় দেখা যায় না এ দেশে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিদায় নিলে প্রেস-ওলা। হ্যাপরের শব্দ হল।

"তোমার কাজকর্মই সব আলাদা রকম দেখছি। আচ্ছা, উঠি এবার।"

দৃশ্য বদলাল।

সকাল হয়েছে, অন্য দিনের চেয়ে একটু যেন বেশি গরম লাগছে আজ। ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। অদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনস্পর্শী তুষার-প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে যতদূর দৃষ্টি চলে। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, কাছে দূরে তুষার-প্রপাতের শব্দ শুনেছি সারারাত ধরে, কেমন যেন একটা নিরুদ্ধ গম্ভীর গর্জন, আমাদের আগমনে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন অবরুদ্ধ রোষে গজরাচ্ছে। অস্পষ্ট একটা আশঙ্কা সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে সারারাত কাল তন্দ্রার মধ্যে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম চারিদিকে, একটা ঘন কুয়াশা মন্থর গতিতে বিস্তৃত হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে, সূর্য উঠেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

এখুনি বেরুতে হবে, আরও খানিকটা উঠে তিন নম্বর তাঁবু গাড়বার কথা আজ, ওই উঁচু ফালি বারান্দার মতো জায়গাটায়। সঙ্গীরা সব বেরিয়ে পড়েছে, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের, ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো শুভ্র তুষারের বিরাট পটভূমিকায়। আমাকেও বেরুতে হবে এইবার। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকতে যাব, নিদারুণ একটা গর্জন শুনে ফিরে দাঁড়ালাম।

এ কি দৃশ্য! কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনচুম্বী তুষার-প্রাচীরের বিরাট একটা অংশ ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্যের মতো হিমানী-স্তূপ হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ছে একসঙ্গে, লক্ষ লক্ষ বিচূর্ণিত

তুষারকণা মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলছে চতুর্দিক, গগন-বিদারী শব্দে চরাচর প্রকম্পিত হচ্ছে, ভয়ঙ্কর ভীম গর্জনে যেন নেমে আসছে রুষ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার শব্দায়িত শাসন অনিবার্য করাল বেগে, নেমে আসছে একসঙ্গে কঠিন তরল বাষ্পীয় হিমানী-সম্ভার প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্য করতে করতে...

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছি। মনে হচ্ছে, সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পেয়েছে, চোখের সামনে দেখতে দেখতে অবলুপ্ত হয়ে গেল ছোট ছোট কালো বিন্দুগুলি, অগ্রগামী সঙ্গীরা বিরাট বরফস্তূপে চাপা পড়ে গেল নিমেষের মধ্যে, জড়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদের জীবন্ত সমাধি। সহসা চেতনা হল, ক্যাম্পের ভিতর থেকে বরফ-কাটা কোদাল বার করে ছুটলাম, বরফ সরিয়ে ওদের তুলতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে ওদের—উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি—স্মাইদ নয়, আমি।

দৃশ্য বদলাল।

নীরব নিথর চতুর্দিক। নির্মল নিখুঁত কালো আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলছে যেন কষ্টিপাথরে বসানো মণির মতো, অসংখ্য উজ্জ্বল মানিক জ্বলছে, আমার মনের গহন অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছে তাদের শুভ্র নির্মল কিরণস্পর্শে। অনুভব করছি, আমি ছোট নই, হীন নই, তুচ্ছ নই, ওই জ্যোতিষ্কদের সগোত্র

আমি। হিমালয়ের উপত্যকায় শুয়ে আছি, চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পর্বতমালা নিশ্চল বিরাট গাম্ভীর্য নিয়ে, অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে তাদের আকাশের দিকে চেয়ে। নির্নিমেষে চেয়ে আছি মহাশূন্যে, তারার মিছিল চলেছে অনাদিকাল থেকে, আমিও চলেছি তাদের সঙ্গে, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছু নেই, অনন্ত অনাদি অখণ্ড কালের প্রবাহে নিখিল বিশ্ব ভেসে চলেছে, আমাদের সৌরজগৎ তার মধ্যে এক বিন্দু কিরণ-কণিকা মাত্র, হিমালয় দেখা যাচ্ছে না। অথচ কি বিরাট বিপুল বিশাল এই হিমালয়!

শুয়ে শুয়ে ভাবছি। তপস্বীর সাধনাক্ষেত্র, তাপিতের তীর্থস্থান, ভারতবর্ষের মহিমার প্রতীক এই হিমালয়, স্বয়ং মহাকাল এখানে ধরা দিয়েছেন উমার কোমল বাহুবন্ধনে, এই হিমালয়ের শীর্ষে পদার্পণ করে সদম্ভে পতাকা রোপণ করবার মতো ধৃষ্টতার কল্পনাও করতে পারি না আমরা ইয়োরোপীয় নাস্তিকদের মতো···ভাবছি, কত কি ভাবছি, ফ্রান্সিস ইয়ংহাস্‌-ব্যাণ্ড নয়, আমি।

আলো জ্বলে উঠল।

হাসিমুখে বসে আছে সে।

সে। সিনেমা থেকে বিফলমনোরথ হয়েই বুঝি হিমালয়ে বিবাগী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখলেন!

আমি। ভারতবাসীর পক্ষে বৈরাগ্যটা নতুন জিনিস নয়, বৈরাগ্যই আমাদের বৈশিষ্ট্য।

সে। তাই নাকি!

আমি। আমাদের রক্তের মধ্যে ওর বীজ নিহিত আছে, তাই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক ছুঁচোটাকে গলাধঃকরণ করেও আত্মসাৎ করতে পারছি না। বিপদে পড়েছি কেবল।

সে। আপনার হিমালয়-অভিযানের প্রথম স্বপ্নটা কিন্তু খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক স্বপ্ন।

আমি। স্মাইদের কাঞ্চনজঙ্ঘা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বইখানা মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, হিমালয়ের কথা মনে হতেই আগে ওই ধরনের স্বপ্ন মনে জাগল। তারপর মনে হল, না, ইয়ংহাসব্যাণ্ডের মতটাই ঠিক। সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে হিমালয়ের মহত্ত্বে অভিভূত হতে পারলে হিমালয় অমৃত দান করেন, কৈলাস-পর্বতে স্বয়ং দত্তাত্রেয় সশরীরে দেখা দেন,

ভগবান শ্রীহংসকে যেমন দিয়েছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের মাথায় পা তুলে দেবার স্পর্ধা করলে পাওয়া যায় কেবল দুঃখ, হতাশা আর মৃত্যু। ভারতবাসী হিন্দু হিমালয়কে যে চোখে দেখে তাই প্রকৃত হিমালয়-দর্শন। ইংরেজদের ছোঁয়াচ লেগে আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

সে। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন কেন?

আমি। আর একটা স্বপ্ন দেখে।

সে। স্বপ্নে যদি মিনতি আসত, ফিরতেন?

আমি। বলতে পারি না।

সে। স্বপ্ন বলছেন কেন, বলুন মালতীর জন্যে ফিরেছি।

আমি। তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি, মালতীই বা কম কিসে? হিমালয়ের তুষারমৌলি উচ্চতা ওর আছে কি না জানি না, কারণ এখনও ওর মনের শিখর অনাবিষ্কৃতই আছে, কিন্তু হিমালয়ের লতা-গুল্ম-বনস্পতি-শোভিত পশু-পক্ষী-পতঙ্গ-সরীসৃপ-সমন্বিত নিবিড় অরণ্য-রহস্য মালতী-চরিত্রে আছে। সত্যি যদি ওই অরণ্যে কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে, সে আনন্দ পাবে নিশ্চয়।

সে। আপনি পেয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত তা হলে তিব্বতী নাল্‌জোরপার ভয়াবহ তান্ত্রিক স্বপ্ন দেখতে হল কেন আপনাকে আত্মবিলোপ কামনা করে?

আমি। আমি ভীরু, একটা সরীসৃপ দেখে ভয়ে ঘৃণায় পালিয়ে এলাম। তা ছাড়া আত্মবিলোপেও কি আনন্দ নেই ?

সে। আছে। কিন্তু তা পদাহত কুকুরের গ্লানিকর আত্মবিলোপ নয়। তা ছাড়া আপনি তিব্বতী চয়েদের স্বপ্ন দেখেছেন ডেভিড নীলের কেতাবখানা পড়ে। সত্যি সত্যি তা করবার সাধনা বা সাধ্য আপনার নেই। অতি সাধারণ রাসায়নিক পন্থাই অবলম্বন করতে যাচ্ছেন তাই সস্তা নাটকীয় ভঙ্গীতে।

মনে হল, তার চোখের দৃষ্টি যেন অগ্নিশলাকার মতো আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করছে।

আলোটা নিবে গেল।

২৬

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ঘরে ঢুকে দেখলাম, জানালা দিয়ে এক ফালি সোনালী রোদ এসে পড়েছে মালতীর কাঁধে, বাহুমূলে, বুকে। খোলা বই একখানা পড়ে আছে কোলের উপর, কিন্তু পড়ছে না সে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে আছে ঋজু বলিষ্ঠ ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে।

আমাকে দেখে তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, মনে হল, যেন একটু আনন্দও।

"একি, তুমি দার্জিলিং থেকে ফিরেছ কবে ?"

"কাল—"

"তুমি দার্জিলিং যাবে জানলে আমিও যেতাম তোমার সঙ্গে। ডক্টর মজুমদার চেঞ্জে যেতে বলছেন কতদিন থেকে, সঙ্গী অভাবে যেতে পারছি না, ওঁর মোটে অবসর নেই—"

ক্ষণিকের জন্যে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল অধর-প্রান্তে। বেশবাস সম্বৃত করে সোফার এক ধারে সরে বসল।

"বোসো—"

"রমেশ কোথা ?"

"তিনি তো নেই, লক্ষ্ণৌ গেছেন, বি. এস-সির পরীক্ষক হয়ে—"

বসলাম। বইটা তুলে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথের কাব্য। 'দুরন্ত আশা' কবিতাটা খোলা রয়েছে। ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুঈন—কবিতাটা যেন পেয়ে বসল আমাকে। পড়তে লাগলাম।

হঠাৎ দার্জিলিং চলে গেলে যে? শুটিং ছিল নাকি?"

"শুটিং? না।"

"তবে?"

"আমি সিনেমায় ঢুকতে পারি নি।"

তাই নাকি? কেন, কি হল?"

"বললে, যোগ্যতা নেই।"

"যোগ্যতা নেই? বল কি? তোমার চেয়ে ভালো অভিনেতা তো বড় একটা দেখা যায় না—"

"ভালো নাটক বা ভালো অভিনেতা হলেই যে সিনেমায় স্থান পাবে, এমন কোনো কথা নেই। অন্য গুণও থাকা দরকার--"

"আবার কি গুণ?"

"রাম-শ্যাম-হরি-যদুকে মুগ্ধ করতে পারার গুণ।"

"সে গুণও তো তোমার আছে। শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা হতে পেরেছিলে যখন—"

"থাক, ওসব আলোচনা করতে ভালো লাগছে না—"

বইটা রেখে দিলাম। তার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম ক্ষণকাল নির্নিমেষে, তারপর বললাম, "মালতী, তোমার কাছে এসেছি আমি—"

"চা আনতে বলি?"

"না থাক—"

"অন্য কিছু?"

"না—"

মালতী একটু নড়ে-চড়ে বসল। গায়ে গা ঠেকল। হঠাৎ কেমন যেন আত্মসংযম হারিয়ে ফেললাম, ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ল এক মুহূর্তে। আবেগভরে তার হাত দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত গদগদকণ্ঠে বললাম, "কাল সমস্ত দিন আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু পারলাম না, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে আসতেই হল, তুমি আমাকে যেতে দিলে না—"

"আমি যেতে দিলাম না মানে?"

"হ্যাঁ, তুমিই। আমার এই ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে না পেরে বিবাগী হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, বিশ্বাস কর, নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলাম হিমালয়ের দিকে—"

"একটা উদ্দেশ ছিল তা হলে, একেবারে নিরুদ্দেশ নয়—"

ঘাড় বেঁকিয়ে চাইলে আমার দিকে স্মিতমুখে

"নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার মুখে আমাকে দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছিলে যখন—চিঠিও অদ্ভুত চিঠি, প্রকাণ্ড একটা কাগজে মাত্র একটি লাইন—আমি এখানে এসেছি।"

"পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলতে পারতাম। রমেশের ভয়ে পারি নি—"

চুপ করে রইলাম ক্ষণকাল, এই ইঙ্গিতটা ওর মনে কোনো রেখাপাত করল কি না, তা দেখবার জন্যে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"তারপর?"

"তারপর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন তুমি আমাকে ডাকছ—"

"তাই ফিরে এলে?"

ভ্রূযুগল উত্তোলন করে বিস্ময় প্রকাশ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু চাপা হাসি ফুটে উঠল চোখের কোণে।

"আমি সত্যিই অতি হতভাগ্য মালতী, উপহাস কোরো না আমাকে।"

"সত্যি স্বপ্ন দেখে ফিরে এসেছ?"

"সত্যি—"

"নিছক স্বপ্নকে এতটা মূল্য দেওয়ার মতো কুসংস্কার তোমার আছে, তা তো জানতাম না।"

"স্বপ্ন কুসংস্কার নয়, স্বপ্নতত্ত্ব আজকাল বিজ্ঞানের অঙ্গ। টেলিপ্যাথি—"

"টেলিপ্যাথি মানো ?"

"মানি। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিই মনে মনে তুমি ডাকছিলে আমাকে—"

"তুমি নিজের সুবিধেমত যখন যেটা খুশি বিশ্বাস কর। বিলেতে আমার চিঠিটাই তুমি বিশ্বাস করেছিলে টেলিপ্যাথিটা কর নি—"

"চিঠির ভাষা এত স্পষ্ট ছিল যে, তা অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না কোনও—"

"ভালো করে পড়েছিলে চিঠিটা ?"

"বহুবার। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছি কবচের মতো—"

"অত না করে শেষের প্যারাগ্রাফটা যদি মন দিয়ে পড়তে, তা হলেই বুঝতে পারতে। তুমি বুঝেও ছিলে, কিন্তু— যাক।"

"কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারি নি, মিথ্যে করে ওরকম চিঠি তুমি লিখলে কেন !"

"একটা উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ প্রত্যাশা করে। দিনের পর দিন কাটিয়েছি তোমার উত্তরের আশায়। রমেশের নামটা পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলাম উত্তরটা ফেরত ডাকেই পাব এই ভেবে। উত্তর এসেছিল, অনেকদিন পরে, এবং এক কথায়— 'তথাস্তু'। মনে হল তুমি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলে।"

"রমেশকে ভালোবাস না তুমি ?"

"খুব। তোমার কি বিশ্বাস, জীবনে একবারের বেশি ভালোবাসা যায় না ?"

চুপ করে রইলাম।

মালতীও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললে "তোমাকে কিন্তু বাহাদুরি দিই। পরীক্ষা না দেওয়ার যে ওজু-হাতটা বার করেছিলে, তা সত্যিই চমৎকার। শুধু অসুখ নয়, একজন নামজাদা খাঁটি বিলিতি এম. ডি. এফ. আর. সি. পির সার্টিফিকেট সুদ্ধ পাঠিয়ে দিলে বাবার কাছে। 'স্লীপিং সিকনেস' অসুখটার নামই শুনি নি আমরা তার আগে। ও দেশের অত বড় ডাক্তারও যে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে পারে, তাও ধারণাতীত ছিল।"

"সত্যি আমার স্লীপিং সিকনেস হয়েছিল—"

'সত্যি ? কি করে হল ও অদ্ভুত অসুখ ?"

"ডাক্তার রবিন্‌সন বলে একজন ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল। স্লীপিং সিকনেস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। কথায় কথায় একদিন তিনি বললেন জানোয়ারের উপর একস্‌পেরি-মেণ্ট করে তৃপ্তি হচ্ছে না তাঁর, একজন সুস্থ সবল মানুষের ওপর একস্‌পেরিমেণ্ট করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কেউ রাজী হচ্ছে না। ঠিক তার দু দিন আগে তোমার চিঠিখানা পেয়েছিলাম, আমি রাজী হয়ে গেলুম। একটি শর্ত ছিল

কেবল, কোনো কারণেই আমার নাম বা ছবি সে প্রকাশ করবে না কারও কাছে—"

সভয় বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখের দৃষ্টিতে—মেকি নয়, আন্তরিক। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"এ কথা তো বল নি একদিনও!"

"প্রয়োজন ছিল না—"

"এ অসুখে লোক মারা যায়?"

"যায় বইকি। রবিনসনের চিকিৎসানৈপুণ্যেই বেঁচে উঠলাম আবার। কিন্তু মনে হচ্ছে মারা গেলেই ছিল ভালো।"

"এ গোঁয়ারতুমি করবার কি দরকার ছিল? আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করা শক্ত, ফেল করা তো সোজা—"

"সোজাসুজি ফেল করলে এ দেশে মুখ দেখাতে পারতাম না, বিশেষত তোমার বাবার কাছে—"

"আমাকে এ কথা বল নি কেন এতদিন?"

মনে হল, গলার স্বরটা কাঁপল একটু।

"বললাম তো, প্রয়োজন মনে করি নি। তা ছাড়া আমার বন্ধু রমেশেরই সঙ্গে যখন সত্যি সত্যি তোমার লাভ-ম্যারেজ হল তখন প্রয়োজনটা আরও কমে গেল—"

"আজ বলছ কেন?"

"আজ তোমার প্রণয় ভিক্ষা করতে এসেছি, নির্লজ্জের

মতো এসেছি, রমেশের প্রতি অবিচার করছি, তা জেনেও এসেছি। বুঝেছি, তুমি ছাড়া আমার কোথাও আর আশ্রয় নেই। সত্যি সত্যি আশ্রয় দিতে যদি না-ও পার, ভান কর অন্তত, তাতেই আমি কৃতার্থ হব—”

হঠাৎ চোখের দৃষ্টিতে একটা জ্বালা ফুটে উঠল তার, মনে হল যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চকমক করে উঠল।

“ভানের কথা উঠছে কেন ?”

“কারণ তোমায় আমি ভালোবাসি, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। রমেশের চাকরি সম্পর্কে প্রফেসার চক্রবর্তীর যে চিঠিটা আমাকে দেখিয়েছিলে, সেটা যে জাল চিঠি তা তুমি জানতে। গৌরীশঙ্করবাবু নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে তোমাকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন, খুব সম্ভবত তোমার সম্মতিক্রমেই।”

“কি করে জানলে তুমি ?”

“স্বকর্ণে শুনেছি গৌরীশঙ্করবাবুর নিজের মুখ থেকে।”

“তোমার সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি এ নিয়ে ?”

“আর একজনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।”

চুপ করে রইল ; কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে মনে হল, জ্বলছে চোখ দুটো।

দরজা ঠেলে একজন বেয়ারা ঢুকল। হাতে প্রকাণ্ড একটা

ট্রে, রুপোর মিনে-করা, সুদৃশ্য দামী তোয়ালে দিয়ে কি যেন ঢাকা দেওয়া রয়েছে তাতে।

গৌরীশঙ্করবাবু ভেট পাঠিয়েছেন।

তোয়ালেটা তুলে দেখালে, এক ট্রে ভরতি বড় বড় লাল লাল আপেল।

অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে মালতী বললে—"হঠাৎ ভেট কেন!"

ট্রেটা সামনের তেপায়ার উপর নামিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল নীরবে।

আমি বললাম, "গৌরীশঙ্করবাবুর কাছে আমাকেও যেতে হবে। তাঁর মিলগুলোর জন্যে একজন ম্যানেজার রাখবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম আজকের কাগজে। ওই চাকরিটার জন্যে যাব তাঁর কাছে।"

"তুমি! গৌরীশঙ্করবাবুর অধীনে চাকরি নিতে যাবে?"

"না গিয়ে উপায় নেই। এ শহরে থাকতেই হবে আমাকে। নিজের বাড়িতে থাকতে পারব না, কারণ বাবা নোটিশ দিয়েছেন—মিনতিকে বিয়ে না করলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের চাকরিটা নিতেই হবে যেমন করে হোক—"

"যদি না পাও?"

"না পেলে কি করব, তা এখনও ঠিক করি নি। তবে মিনতিকে বিয়ে করব না, এটা ঠিক।"

মালতী মুখ টিপে হাসলে একটু।

স্টোভের আওয়াজটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মালতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ক্ষণকাল পূর্বে তার চোখে-মুখে যে জ্বালা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, হাসির স্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে সেটা।

"মিনতিকে বিয়ে করতে এত আপত্তি কেন? মেয়েটি তো ভালো শুনেছি, খুব গৃহকর্মনিপুণা—"

"হ্যাঁ, খুব। তার অতি-ব্যগ্র সেবার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আরও পালিয়ে এলাম আমি তোমার কাছে—"

"কেন, কি হয়েছে?"

"দার্জিলিং থেকে নামবার সময় অসাবধানে পা-টা মচকে গেছল হঠাৎ। বাড়িতে এসে চাকরটাকে বললাম, একটু গরম জল করে দিতে শেক দেবার জন্যে। মা থাকলে মা-ই সব করতেন, কিন্তু তিনি এখানে নেই, বদ্যিনাথ গেছেন। খানিকক্ষণ পর দেখি, গরম জলের কেতলি, ফরসা ন্যাকড়া, ফরসা তোয়ালে হাতে করে মিনতি এসে উপস্থিত—আমার পায়ে শেক দেবে বলে। শুধু একবার নয় কাল থেকে ক্রমাগত তিন চার ঘণ্টা অন্তর আসছে তার মায়ের ইঙ্গিতে আমার পদসেবা করবার জন্যে, যাতে আমি ওকে পছন্দ করি। সিকেনিং!"

"ওর মা সুদ্ধ এসেছে নাকি!"

"হ্যাঁ, মা পিসীমা কাকীমা মামা কাকা সবাই। বাবা আনিয়েছেন। মিনতির বিয়ে দিয়ে তবে যাবে সব।"

"বাড়ি তা হলে সরগরম বল।"

"একতলা দোতলায় তিল ধরবার স্থান নেই। ভাগ্যে তেতলার ঘরটা ছিল, আর ভাগ্যে বাইরে থেকে তাতে ওঠবার সিঁড়ি ছিল, তা না হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।"

"চাকরিটা যদি না পাও কি করবে?"

"আর যা-ই করি ও বাড়িতে আর থাকব না। ও বাড়িতে আজ রাত্রেই বোধ হয় শেষ থাকা—"

"আমার এখানে থাকতে পারতে, কিন্তু সেটা কি একটু বেশি দৃষ্টিকটু হবে না? তোমার বন্ধুটি থাকলে কোনো কথাই ছিল না।"

"না, আমি এ বাড়িতেও থাকব না। তারিণী মিত্তির আর জগৎ লাহিড়ীরা এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে—"

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তার চোখের দৃষ্টিতে আমি যে কি দেখতে পেলাম জানি না, হঠাৎ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

"একটা অনুরোধ রাখবে আমার?"

"কি বল—"

"চাকরিটা যদি না পাই, হয়তো এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়, হয়তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না আর

আমার জীবনে, কিন্তু তার আগে তোমাকে একবার পেতে চাই—মাত্র একবার। আসবে তুমি আমার তেতলার ঘরটায় আজ রাত্রে ? দরজা খুলে রাখব আমি, বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কেউ টের পাবে না।”

“ছি ছি, কি মনে কর তুমি আমাকে ! হাত ছাড়—”

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দৃশ্য বদলাল।

হাপরের মতো হাসিটা যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে অশরীরী প্রেতের মতো।

“তোমাকে আমার মিলের ম্যানেজার করব ? তোমাকে ? অ্যাঁ, বল কি ? আশা কর তুমি ? কি আপদ !”

দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

দৃশ্য বদলাল।

শ্মশান। অন্ধকার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি একা।

হাতে বাঁশি—হাড়ের বাঁশি—উরুতের হাড় থেকে তৈরী তিব্বতী নাল্‌জোরপার কাংলিং। সজোরে ফুৎকার দিয়ে বীভৎস তান তুলেছি তাতে, ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজছে তার তালে তালে। আত্মবিসর্জন দিতে এসেছি। সাগ্রহে আহ্বান করছি—কোথায় আছ, ক্ষুধিত তৃষিত প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-

যোগিনীর দল, এস, নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর আমার, নিঃশেষ কর আমাকে···আমার অন্তরের আগ্রহ সহসা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল আমার মাথা ভেদ করে। জ্বলন্ত শিখার মতো খড়্গ-ধারিণী নারীমূর্তি। খড়্গের এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেললে আমার মস্তক, ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হল শোণিত-ধারা। রক্তপিপাসু প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল ভিড় করে এসে দাঁড়াল চারিদিকে। খড়্গধারিণী আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিতরণ করতে লাগলেন তাদের। ছিন্ন করলেন হস্তপদ, ছাড়িয়ে ফেললেন গায়ের চামড়া, উৎপাটিত করলেন চক্ষু, বিদীর্ণ করলেন উদর, অন্ত্রগুলো বেরিয়ে ঝুলতে লাগল, বইল রক্তের স্রোত, প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীরা আহারে প্রবৃত্ত হল লুব্ধ আগ্রহে, তাদের সশব্দ চর্বণে অন্ধকার মুখরিত হতে লাগল।

২৭

আলো জ্বলে উঠল।

সে। গৌরীশঙ্করবাবুর আপিস থেকে বেরিয়ে আপনি শ্মশানে চলে গেলেন কোন্ আশায় ?

আমি। কোথা যাব আর ?

সে। ধাপে ধাপে যখন নাবতেই শুরু করেছিলেন, তখন এর পরের ধাপে বাবার কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল আপনার অনুতপ্তচিত্তে।

চুপ করে রইলাম।

সে। শ্মশানের বাঁধানো চাতালে বসে তিব্বতীয় কল্পনা-বিলাস করতে করতে হঠাৎ উঠে পড়লেন কেন ?

আমি। ভয় করতে লাগল।

আবার ওকে ঠকাবার চেষ্টা করছি।

সে। ভয় করছিল অবশ্য একটু একটু, কিন্তু আপনি উঠে পড়লেন টেলিপ্যাথির প্রতি বিশ্বাসবশত। আপনার মনে হতে লাগল, মালতী আপনাকে ডাকছে। এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ঠিক হত, না ?

আলো নিবে গেল।

২৮

অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠছি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা, শব্দ হচ্ছে না। ভাবছি, মালতীর কাছে মুখ দেখাব কি করে; ভাবছি, মালতী কি বলবে; ভাবছি, মালতীকে ছেড়ে যাব কি করে! কিন্তু যেতেই হবে, এ শহরে আর মুখ দেখাতে পারব না। ভাবছি, মালতীকে ক্ষণিকের জন্যও একবার চাই; ভাবছি, আর একবার বলব তাকে আমার তেতালার ঘরটাতে যেতে, পায়ে ধরব তার···

ওপরে উঠে দেখি, মালতীর ঘরে কেউ নেই। পাশেই রমেশের ল্যাবরেটরি, কপাট ভেজানো, কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কপাট ঠেলে ঢুকলাম। ঢুকেই মনে হল, ভূমিকম্প হচ্ছে, বিশ্বাস হচ্ছে না কিছু, দৃষ্টি প্রলাপ দেখছে। মালতী আর গৌরীশঙ্কর! মালতী গৌরীশঙ্করের গলা জড়িয়ে আদর করছে। খানিকক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙল, দেখলাম, ভূতের মতো আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি···ঘরে কেউ নেই···তুজনেই বেরিয়ে গেছে···

মনে হল, এ যেন ল্যাবরেটরি নয়, শ্মশান। শ্মশানে সেই প্রেত-প্রেতিনী-ডাকিনী-যোগিনীর দল আবার ঘিরে ধরেছে আমাকে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার কষ্ট হচ্ছে না, আমি যেন সাগ্রহে বলছি—খাও, খাও, আমি পাপী, আমি মূর্খ, আমি ঋণী, আমার জীবন নিয়ে মুক্তি দাও আমাকে···হঠাৎ দেখলাম, সামনে একটা শেল্ফ রয়েছে। তার ওপর ছোট একটা শিশি। তার গায়ে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা—সোডিয়ম সায়ানাইড।

২৯

আলো জ্বলে উঠল।

সে। সায়ানাইড খেলে সত্যিই কি মুক্তি পাবেন আপনি? সত্যিই কি অঋণী হয়েছেন?

চুপ করে রইলাম।

হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল সে হাসি, ক্রমশ একটা জ্যোতির্মণ্ডলের মতো হয়ে উঠল দেখতে দেখতে, সে তার মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসেই রইলাম।

হঠাৎ দেখি, দ্বারপ্রান্তে শীর্ণকান্তি দীর্ঘদেহ কে একজন দাঁড়িয়েছে এসে।

"কে?"

"আমি যতীন—"

"যতীন? কোথা থেকে এ সময়ে?"

"কয়েকদিন হল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমায় একটু জায়গা দিতে পারিস ভাই?"

"জায়গা? কেন, কি হয়েছে তোর?"

"টি. বি.।"

"বাড়ি যাস নি?"

"বাড়ি ফেরবার আর মুখ নেই। আমার জন্যে বাবার চাকরি গেছে, দাদার চাকরি গেছে, ভাই নজরবন্দী হয়ে আছে, অবিবাহিত বোনটা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"কোথা আছিস তুই এখন ?"

"এখন কোথাও নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। জেল থেকে বেরিয়ে চেনাশোনা একটা মেসে এসে উঠেছিলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে তারা আর রাখতে চাইলে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। একটু জায়গা দিতে পারিস আমাকে, বেশি নয়, শুধু মরবার মতো জায়গা একটু—"

বাইরে কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"বাইরে কেউ আছে নাকি ?"

"ছোট একটা ভিখিরীর ছেলে। কদিন আগে ওর মা মারা গেছে রাস্তায় অনাহারে। ছেলেটা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল, আমি এক পয়সার মুড়ি কিনে দিয়েছিলাম, সেই থেকে সঙ্গ ছাড়ছে না কিছুতেই। আয়, ভেতরে আয়, কাঁদছিস কেন, আমি যদি জায়গা পাই, তুইও পাবি, আয়।"

এল—

জীর্ণ-শীর্ণ সাত-আট বছরের ছেলে একটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার চুল রুক্ষ, কটা। গা-ময় খোস, চোখ উঠেছে, গালের উপর চোখের জলের দাগ। যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে পিচুটি-ভরা অশ্রুপূর্ণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে সভয়ে। পাশাপাশি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি তাদের বসতে পর্যন্ত বললাম না।

অন্ধকার হয়ে এল।

নিবিড় অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলাম।

৩০

আলো জ্বলে উঠল।

সে বসে আছে।

সে। চিনতে পারলেন ছেলেটি কে?

আমি। না।

সে। বাতাসীর ছেলে হয়তো।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। বাতাসীর ছেলে?

সে। ভাবছেন কি?

আমি। বাতাসীর ছেলে কি করে আসবে?

সে। আপনার দরজা খোলা আছে যে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল আবার। মনে হল, আবার আসছে তারা। সে উঠে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মালতী। হু-হু করে একটা কনকনে বাতাস ঢুকল জানলা দিয়ে, আমার ব্যর্থ জীবন-কাহিনীর-পাতাগুলো উড়তে লাগল এলোমেলো হয়ে ঘরের চারিদিকে।

মাথার খোঁপাটা দু হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে মালতী এসে বসল আমার সামনে। হাওয়ার বেগে লালপেড়ে কমলা-রঙের শাড়িখানা আঁটসাট হয়ে বসে গেল তার নিটোল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি তুলে সে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার পানে। আমিও চেয়ে রইলাম।

"তুমি ডেকেছ বলে আসি নি, আমি এসেছি আমার

নিজের গরজে। আমাকে তুমি কোনোদিন বুঝতে পার নি, আজও হয়তো পারবে না। তবু সরল সত্যি কথাটা বলতে এসেছি, ইচ্ছে হয় বিশ্বাস না-ও করতে পার। এই নাও—"

বুকের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে আমার হাতে। হাতের স্পর্শ পেলাম। আঙুলগুলো ঠাণ্ডা কনকন করছে। পড়ে দেখলাম, গৌরীশঙ্করবাবু মাসিক আড়াই শত টাকা বেতনে আমাকে তাঁর মিলের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা নিয়োগ-পত্র।

"তুমি জান, আমার টাকার অভাব নেই, আমাকে যদি কিছুমাত্র বুঝে থাক, তা হলে এও তোমার জানা উচিত, ওই জরদ্গব জরাগ্রস্ত মাংসপিণ্ডটার উপর কিছুমাত্র লোভ থাকবার কথা নয় আমার। যুগলবাবুর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে উনি আমার পিছু নিয়েছেন, কিন্তু আমল পান নি এতদিন। আজ স্বচক্ষে তুমি যা দেখেছ তা সম্ভব হয়েছে কেবল তোমারই জন্যে, ও ছাড়া তোমার চাকরি পাবার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি চললাম—"

উঠে চলে গেল কিছুদূর—তারপর আবার ফিরে দাঁড়াল—"আর একটা কথা বলে যাই তোমাকে। সেদিন যখন মদে ভিজিয়ে শ্রমিক-সঙ্ঘের আল্টিমেটামটা পুড়িয়ে ফেলেছিলে, একটুও খুশী হই নি আমি। গৌরীশঙ্করবাবু যখন ওই জাল

চিঠিখানা নিয়ে এসে সাধ্যসাধনা করছিলেন আমাকে, তখন আমি রাজী হয়েছিলাম বটে ; কিন্তু খুব বড় গলা করে তাঁকে বলেছিলাম—'দেখবেন, প্রেমসিন্ধু কিছুতেই রাজী হবে না। সে রকম ছেলেই নয় ও।' তুমি আমাকে হতাশ করেছ সেদিন। তোমরা জান না, আমরা কি চাই। জান না তুমি, আমার কি সর্বনাশ করলে। জীবনে বহু পদলেহী কুকুরকে প্যাট করেছি ; পুজো করতে চেয়েছিলাম একটি মাত্র যে মানুষকে, তুমি পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করলে তাকে—"

চলে গেল।

কতক্ষণ বসে ছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ দেখলাম, সে বসে আছে সামনে।

সে। মালতী যা-ই বলুক, আমি জানি, আপনি সত্যিই একজন আদর্শবাদী ভালো ছেলে। ভুল পথে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন কেবল।

আমি। একটু পরেই যে লোক জন্মের মতো পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে, ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তাকে ?

সে। সত্যি ছেড়ে যাবেন ? আর তো যাবার কোনো কারণ নেই। বেঁচে থাকবার যথেষ্ট হেতু তো পেলেন।

আমি। কি ?

সে। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে, মালতী আপনাকে ভালোবাসে এবং সে অসতী নয়।

আমি। কিন্তু আমার এই ব্যর্থ ক্ষতবিক্ষত জীবন নিয়ে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।

সে। আপনার জীবন? আপনার জীবন শুরুই তো হয় নি এখনও। এতদিন তো শুধু গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ করলেন কখন যে ক্ষতবিক্ষত হবেন?

আমি। এতদিন তা হলে যা করলাম, সেটা কি?

সে। কিছুই নয়। অপরের শোনা কথা কপচেছেন, অপরের দেখা স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন। লেনিনের কথা শুনে কমিউনিজ্‌ম করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখে কাব্য করেছেন; কিন্তু ভুলে গেছেন, আপনার নিজের মূলধন একটি কানা কড়ি নেই।

আমি। মূলধন মানে?

সে। চরিত্র, মনুষ্যত্ব—যা না থাকলে কিছুই হয় না পৃথিবীতে। আপনি কি সত্যিই আপনার দেশকে ভালোবাসেন?

আমি। বিলেত গিয়ে আর কিছু না শিখি, দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি।

সে। সত্যিই যদি দেশকে ভালোবেসে থাকেন, শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকুন জীবনকে। মাটি দেশ নয়, দেশবাসীই দেশ, আপনিই দেশ। আপনার মৃত্যু মানে দেশেরই একটা অংশের মৃত্যু।

আমি। কি করতে বল তুমি তা হলে? এই ঘৃণিত

অস্তিত্বটাকে লাঞ্ছনা-অপমানের মধ্যে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে বল আমরণ ? মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি আছে ?

সে। আছে।

আমি। কি ?

সে। বলতে পারি, যদি ওই সায়ানাইডের পুরিয়াটা জানলা দিয়ে ফেলে দেন আগে।

প্রদীপ্ত চক্ষু দুটি নিবদ্ধ হয়ে রইল আমার মুখের উপর। মনে হল, অমৃতবর্ষণ করছে। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম মোহাবিষ্টের মতো, ধীরে ধীরে গেলাম জানলার কাছে, পুরিয়াটা ফেলে দিলাম।

স্টোভের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা থেমে গেল হঠাৎ। নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। চেয়ে দেখলাম, সে বসে আছে, একটা মহিমা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। গিয়ে বসলাম।

আমি। এইবার বল।

সে। বিয়ে করুন।

আমি। বিয়ে করব! এই তোমার মুক্তির বার্তা ?

সে। আগে মানুষ হোন, তারপর মুক্তির পথ আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন।

আমি। মানুষ হবার জন্যে বিয়ে করতে হবে ?

সে। তার মানেই দায়িত্ব নিতে হবে।

আমি। তোমার মতে তাহলে বিবেকানন্দ বিয়ে করেননি বলে মানুষ ছিলেন না?

সে। তিনি অতি-মানুষ ছিলেন। ওঁদের নকল করতে গিয়েই সাধারণ মানুষ আপনারা দু-কূল হারিয়েছেন।

আমি। আমাদের কি করতে হবে তাহলে?

সে। সংসার করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। আমার একটা পেট কোনোরকমে চালিয়ে নেব—এ মনোবৃত্তি পশুর, মানুষের নয়। সমাজের দায়িত্ব ঘাড়ে করে সমাজের সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে সৎপথে জীবন যাপন করার নামই মনুষ্যত্ব, তাই দেশ-সেবা।

আমি। কতকগুলো দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড সৃষ্টি করলেই দেশ-উদ্ধার হবে?

সে। আপনি হয়তো দেশ-উদ্ধার করতে পারবেন না, আপনার বংশধর করবে, সে না পারলে তার সন্তানেরা করবে। কিন্তু আপনার পরে আর যদি কেউ না থাকে, আপনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে কে? আর সবাই যে দরিদ্র অক্ষম অপোগণ্ড হবে, তাই বা কে বললে আপনাকে? পৃথিবীর অধিকাংশ বড়লোকই তো দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন। ঠাকুরদাস যদি দারিদ্র্যের ওজুহাতে বিয়ে না করতেন, বিদ্যাসাগরের জন্ম হত? আপনি দেশকে ভালোবাসেন বলছেন, দেশের জন্যে কি করেছেন আপনি?

আমি। কিছুই করতে পারিনি।

সে। কিন্তু সে কাজ করবার জন্যে কি রেখে যাচ্ছেন, কাকে রেখে যাচ্ছেন?

আমি। কাকে বিয়ে করব, মালতীর যে বিয়ে হয়ে গেছে।

সে। মিনতিকে বিয়ে করুন।

আমি। মিনতিকে?

সে। হ্যাঁ, মিনতিকে। ওই আপনার মতো লোকের আদর্শ পত্নী। ও কিছু বলবে না, কোনো প্রশ্ন করবে না, শুধু সহ্য করবে। যে পা দিয়ে ওকে লাথি মারবেন, সেই পা ও পুজো করবে ভক্তিভরে নীরবে। ও মূর্খ, ও অশিক্ষিত, কিন্তু ও মূর্তিমতী ক্ষমা, মূর্তিমতী সেবা, যে ক্ষমার যে সেবার আপনার প্রয়োজন জীবনে। মালতী আপনার কাব্যের নায়িকা হতে পারে, কিন্তু মিনতি হবে আপনার গৃহশ্রী।

হঠাৎ ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল।

খুট করে শব্দ হল দ্বারপ্রান্তে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, গরম জলের কেতলি হাতে নিয়ে মিনতি এসে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

"বনফুল"

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

মূল্য চার টাকা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫১, অগ্রহায়ণ ১৩৫২, পৌষ ১৩৫৪

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২০. ১২. ৪৭

সহযাত্রী সুহৃৎ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

ভাগলপুর
৪. ৪৩

জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

১

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভিড়। সেই ভিড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের বেশি সময় নাই। হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় স্লো ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভিড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়!

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরিও হইয়া গেল, পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্যন্ত নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু-হাতে দেখা করিতে পারে না তো! বাহিরের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জনতার মত তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর-জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি আসিয়া

দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছন দিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং এক ফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য সৃজন করিয়াছিল—এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি-উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়!

এই গ্যানৃঢঅ—গ্যানৃঢঅ—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভন্টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভন্টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যানৃঢ' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্তা ভন্টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভন্টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান-বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াই শঙ্কর ভন্টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে শুরু করিবে, এমন সময় আবার ডাক আসিল—

চাম গ্যানৃঢঅ—

শঙ্কর আবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, হ্যারিসন রোডের একটি অতি সংকীর্ণ গলির অন্ধকারে ভন্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিক্‌ল, ডান হাতে

ছোট একটা প্যাকেট—নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি-গোছের কিন্তু আগাইয়া যাইতেই ভন্টু তাহাকে বলিল, বাইকটা একবার ধর্ তো। এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে।

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল, তুই এখানে হঠাৎ?

দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।

ভন্টুর চোখ দুইটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, দাড়ি?

দাড়ি। চরম লদ্‌কালদ্‌কি!

এই এক পুঁটুলি দাড়ি!

জটাও আছে। জটিল লদ্‌কালদ্‌কি!

শঙ্কর বলিল, তুই আজকাল কলেজে যাস না কেন? থিয়েটারে ঢুকেছিস নাকি?

ভন্টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্বেই শঙ্কর বলিল, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ, জানিস না?

তাই নাকি? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই? যা, আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যান্‌থার আমাকে খেয়ে ফেলবে।

প্যান্‌থার কে?

ছোটবাবু।

ছোটবাবু কে?

আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি, সেই আপিসের ছোটবাবু। ইয়া চোয়াল, ইয়া লাল চোখ, চাম লদ্! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যান্‌থার রসিক আছে। যাক, চললাম ভাই আমি।

ওঁকে ব'লে দিস, বিলেত যাচ্ছে যাক—দক্‌চে না যায়। চললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল, তুই চাকরিতে ঢুকেছিস নাকি? কিছু জানি না তো! পড়াশোনা ছেড়ে দিলি?

আসছে বছর আবার শুরু করা যাবে।

ভন্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভন্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়তো দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভন্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আড়ময়লা-বুক-খোলা-জামা-পরা হাস্যমুখ ভন্টুকে সে যেদিন প্রথম ক্লাসে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভন্টু তেমনই নোংরা আছে। কিন্তু আর তো তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না। শঙ্কর ভন্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়ার পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল, উৎপলের কথা নয়, ভন্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভন্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানারকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটাতে এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভন্টুর বাসা। যাওয়াই মুশকিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে, ভন্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভন্টুর বাসার দূরত্ব নহে; অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের

পর হইতেই শঙ্কর ভনুটুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরের অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব। সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা আছে। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ। মফস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই. এস-সি., বি. এস-সি.-টাও মফস্বলের কলেজেই কাটিয়াছে।

সুরমার মত মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলাত যাওয়াটাকে উপলক্ষ্য করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌঁছিল, তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশি বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকি ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল, উৎপল একদল নর-নারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল, এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হ'লে! আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হ'ল না। ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। 'স্লিপিং' স্যুটটা বাক্সের ভেতরেই থেকে গেছে। সুরমা, বার ক'রে ফেল না—ওই বড় স্যুটকেসটায় আছে, এখুনি তো দরকার হবে।

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল বড় বড় লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত স্বরে বলিল, এ কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ, এত সেণ্টিমেণ্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট-কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল তো একটু পরে শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করেছে দেখ।

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিত মুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল, বিছানার এক ধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক ক'রে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্যন্ত।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ভালই তো।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যভরে উৎপল কহিল, তুমি কবি মানুষ, তুমি তো বলবেই। বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা—পথি নারী বিবর্জিতা—

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র-আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম্ তুই।

গাড়ির ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্‌লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন।

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন

করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন, তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। পরিপাটীরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না-পরিলে তাঁহাকে মানাইবে এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে, তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বইকি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার মত একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে তো। এইবার আসুন, আদব-কায়দামত আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়। আর ইনি হচ্ছেন মিসেস মিত্র—প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী, আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টিদিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসছেন, উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন, ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়; ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন; ডাক-নাম ওঁর সোনাদিদি। আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন মিস মিত্র—বেথুনে বি. এ. পড়ছেন; ওঁর ডাকনাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ, সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া, পরোপকারী এবং সর্বোপরি কবি।

শেষের কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

উৎপল তাহার পর দণ্ডায়মান পুরুষ দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিল, আর এই দুটি হচ্ছেন আমার বড় কুটুম্ব। এ দুজনকে তুই দেখিস নি শঙ্কু। এঁরা দুজনেই আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। বিয়ের সময়ও

শুনতে পারেন নি এঁরা—এত এঁদের পড়ায় মন। ইনি হচ্ছেন অশোক, আর উনি হচ্ছেন প্রবীর। দুজনেই এঞ্জিনীয়ারিং পড়েন রুড়কিতে।

শঙ্কর সকলকেই নমস্কার করিল।

শঙ্কর এবং উৎপল একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিল। তাহার পর কিন্তু উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়।

উৎপল কলিকাতায় চলিয়া আসে—শঙ্কর মফস্বলের কলেজে যায়। সেইজন্য উৎপলের কলিকাতাবাসী পরিচিতদের সহিত শঙ্করের পরিচয় ছিল না। এতগুলি অপরিচিতা তরুণীর মধ্যে শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা।

মিষ্টিদিদি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুমিষ্ট হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপানার কবিতার বই কোন বেরিয়েছে নাকি?

না, কোন কবিতাই ছাপা হয় নি আমার।

ইহা শুনিয়া সোনাদিদি আগ্রহের সুরে বলিলেন, নিয়ে আসবেন আপনার কবিতা একদিন আমাদের বাড়িতে। এত ভাল লাগে আমার কবিতা! বিশেষ যে কবিতা ছাপা হয় নি। আসবেন একদিন। দিদি, ওঁকে চায়ে আসতে বল না একদিন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কবিতার নাম যেই শুনেছে, অমনই সোনার মন উসখুস করছে। আসবেন আপনি শঙ্করবাবু একদিন। তা না হ'লে জ্বালিয়ে মারবে ও আমাকে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, যাব একদিন। ঠিকানাটা কি আপনাদের?

মিষ্টিদিদি ঠিকানা বলিলেন।

শঙ্কর উৎপলকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী কাউকে দেখছি না যে?

বাবা মা বর্ধমানে দেখা করবেন, আর সুরমার বাবা মা উঠরেন

আসানসোল থেকে। শ্বশুর মশায়কেও এইবার কাজে জয়েন করতে হবে তো।.

উৎপলের শ্বশুর বম্বেতে চাকুরি করিতেন।

ঢং ঢং করিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল।

উৎপল ও সুরমা গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

উৎপল বলিল, তুইও একটা বিয়ে ক'রে চ'লে আয় বিলেতে, বুঝলি শঙ্কর?

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল, শোন্, রিনি মেয়েটিকে কেমন লাগছে তোর? বিয়ে কর্ না ওঁকে। প্রফেসার মিত্র বলছিলেন যে, ভাল পাত্র পেলে বিলেত পাঠাবেন।

চুপ কর্ তুই।

গার্ডের হুইস্‌ল বাজিল।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

সুরমা হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শঙ্করকে বলিল, চিঠি লিখবেন আমায় বম্বেতে। মিষ্টিদির কাছে ঠিকানা আছে। লিখবেন তো?

শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ট্রেনের গতি-বেগ বাড়িল। উৎপল জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যথারীতি রুমাল নাড়িতে লাগিল।

যতক্ষণ রুমাল দেখা গেল, সকলেই সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশ রুমালও অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিষ্টিদিদি তখন শঙ্করকে বলিলেন, এইবার আমরাও যাই, চলুন। আপনি থাকেন কোথায়?

হস্টেলে। হস্টেলের ঠিকানা সে দিল।

চলুন না নাবিয়ে দিয়ে যাই আপনাকে। গাড়ি আছে আমাদের সঙ্গে।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন হস্টেলে ফিরব না। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে। ভুলবেন-না।

যাব।

মিষ্টিদিদিরা চলিয়া গেলেন।

উৎপলের শ্যালক দুইটিও তাহাদের গাড়িতে উঠিল।

সকলে চলিয়া গেলে শঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল, ভন্টুর বাড়ি যাই। ভন্টু হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া চাকুরিতে ঢুকিল কেন? ভন্টুর বউদিদির মুখখানা একবার মনে পড়িল। এত রাত্রে ভন্টুর বাড়ি হাঁটিয়া যাওয়াই মুশকিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যে পরিচিত টিকিট-কালেক্টারবাবুটির অনুগ্রহে শঙ্কর বিনা মাশুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল, তিনি আসিয়া বলিলেন, এইবার আপনি বাইরে যান সার্। আর একখানা ট্রেন ইন করবে এক্ষুনি। আমার ডিউটিও ওভার হ'ল।

শঙ্কর বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তাহার চোখে পড়িল, কিছু দূরে কতকগুলি লোক কি একটা বস্তুকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য শঙ্করও আগাইয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি রমণী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এবং সেই মূর্ছিতা রমণীর মাথা কোলে করিয়া লইয়া আর এক নারী বিলাপ করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কৌতূহলী জনতা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মতামত শঙ্করের কানে গেল।

একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিতেছিলেন, মৃগী রোগ, বড় সঙিন ব্যায়রাম মশাই। ভালর মধ্যে এই—ছোঁয়াচে নয়।

একটি পাতলা লম্বা-গোছের ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষাও পাতলা

ও লম্বা একটি ভদ্রলোকের কানে কানে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিতেছিলেন, টেনেছে—জোর টেনেছে—বুঝলে খুড়ো, দেখেই বুঝেছি আমি।

খুড়া কিছু না বলিয়া জিহ্বার প্রান্তটুকু তির্যকভাবে বাহির করিয়া বাম চক্ষুটি ছোট করিলেন। তাহা দেখিয়া পুলকিত ভাইপো খুড়ার পৃষ্ঠদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া ফেলিলেন। মোটা-গোছের বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোকও মূর্ছিতা নারীটির সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন দেখা গেল, তাঁহার থিয়োরি কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলিতেছেন, তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! সমস্ত দিনের কঠোর উপবাস!

শঙ্কর দেখিল, মেয়েটির যাহাই হইয়া থাকুক, অবিলম্বে উহাকে জনতার চাপ হইতে উদ্ধার না করিলে দমবন্ধ হইয়াই মারা যাইবে।

সে সোজা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল ও বলিষ্ঠ দুই বাহু দ্বারা অজ্ঞান মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া অপর মহিলাটিকে বলিল, আসুন, এঁকে কলের কাছে নিয়ে যাই। মাথায় মুখে জল দেওয়া দরকার আগে। শঙ্করের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল, শঙ্কর বোধ হয় ইহাদের নিজেদের লোক। সুতরাং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কলের কাছে লইয়া গিয়া চোখে মুখে জল দেওয়াতে মেয়েটির জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করিয়া লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শঙ্কর দেখিল, মেয়েটি অল্পবয়সী—সতরো-আঠারোর বেশি হইবে না। অপর মহিলাটি বয়স্থা। তিনি বলিলেন, বেঁচে থাক তুমি বাবা। মেয়েটির ফিটের ব্যায়রাম আছে। তুমি না থাকলে কি যে বিপদ হ'ত আজ আমার!

শঙ্কর বলিল, আপনারা কোথা যাবেন?

আমরা কলকাতাতেই যাব বাবা।

আপনাদের একটি গাড়ি ক'রে দিই তা হ'লে?

তাই দাও।

শঙ্কর তাহাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া দিল। বয়স্থা মেয়েটি শঙ্করকে আর এক দফা আশীর্বাদ করিয়া শেষে বলিল, তুমি একদিন যেও আমাদের ওখানে বাবা। যাবে?

কোন্‌খানে থাকেন আপনারা?

কেরানীবাগানে। ১৯ নম্বর কেরানীবাগান। যেও একদিন, কেমন?

যাব।

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কে ইহারা? ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু! জীবনে ইতিপূর্বে সে আর কোনদিন কোন যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল! তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না তো! ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও তো কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে! মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়ার পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি!

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভন্টু তাহার অপেক্ষায় কমন-রুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ঘোর জালে প'ড়ে ফের এসেছি ভাই।

কি হ'ল ?

ভীম জাল।

মানে ?

মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছে।

ভন্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, তাই নাকি ?

একেবারে থলথলে কাণ্ড! মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন! ইয়া নাদ্‌নেদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার!

শঙ্কর বলিল, তাই নাকি ?

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিস কেন ?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, মেজকাকা চাকরিটা যদি পায়, তবেই না ভাল ? সেইজন্যেই তো তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই যদি একটু বোস সায়েবকে অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হ'লেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি, মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্য কিছু। গুরুর আদেশ নেই।

শঙ্কর শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ ? তোকে তখন জিজ্ঞেসই করা হয় নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল ?

দাদাকে নিয়েই তো মুশকিল। দাদার আবার জ্বর শুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেইজন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হ'ল। পেয়েও গেলাম একটা। কি

করি বল্? দাদার হাফ পে-তে ছুটি। সংসার তো চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, তিনি পদ্মাসনে ব'সে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় প'ড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সায়েবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন? এই সময় বোস সায়েব বাড়িতে থাকে।

এখুনি?

দেরি ক'রে লাভ কি?

এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধ হয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চ'লে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।

আচ্ছা।

ভন্টু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভন্টু বলিল, গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস?

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল, ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। বলিল, কাছে তো নেই ভাই।

ওপর থেকে নিয়ে আয়।

কি করবি পয়সা নিয়ে?

কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তার পর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাই নি।

পেটে এ রকম আগুন জ্বলছে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট ক'রে নিয়ে আয় চারটে পয়সা।

শঙ্কর উপরে গিয়া ভন্টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভন্টু চলিয়া গেল।

শঙ্করও উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এখানে থাকেন?

হ্যাঁ, আমিই। কি চাই?

চিঠি আছে।

কই, দেখি! আমার নামে?

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারীহস্তে লেখা।

চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোট-খাটো একটা টী-পার্টি আছে। আপনাকে আসতে হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়তো আপনি কলেজে থাকবেন, কোথায় আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলেছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আনুন আর নাই আনুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আচ্ছা, যাব।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমন-রুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভন্টুর কথাই ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল, তাহার মায়ের পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্ছিতা যুবতীর কথা? না, কিছুই তো নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল, যখন টং টং করিয়া নয়টা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

২

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোওয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার উপরেই একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবমবর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলির একটি তরকারি হইবে। খোসা-চচ্চড়ি ভন্টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে, তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ওই স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক, তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছর এগারোর বালক হাঁটু গাড়িয়া দুই কান ধরিয়া সম্মুখস্থ মোড়ায় রক্ষিত উপক্রমণিকা হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছিল।

তাহার পড়া হয় নাই বলিয়া ভন্টু তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। বউদিদিকে দেখিয়া বোঝা দুষ্কর যে, তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁহার মুখখানি এত কচি যে, আবার তাঁহার বিবাহ দিয়া আনা যায়। বউদিদিকে সুন্দরী হয়তো কেহ বলিবে না, কারণ তাঁহার রঙ কালো। এত কালো যে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও হাস্যকর হইবে। কিন্তু রঙে কি আসে যায়? বউদিদির হাসিমাখা গোলগাল ঢলঢলে মুখখানিতে, ডাগর চোখ দুইটিতে, তাম্বূলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। যাহাকে করিবে না, তাহার রূপ দেখিবার চোখ নাই। বউদিদি কুটনা কুটিতে কুটিতে কন্যা ফন্তিকে আদেশ করিলেন, ফন্তি, আমার জন্যে একখিলি পান সেজে নিয়ে আয় তো আগে। দোক্তাও আনিস একটু।

ফন্তি চলিয়া গেল।

পানের রঙে বউদিদির ঠোঁট দুইটি সর্বদা টুকটুক করিতেছে। একবেলা না খাইয়া বরং বউদিদির চলিতে পারে, পান না হইলে তাঁহার একদণ্ড চলা মুশকিল। ওইটুকুই তাঁহার জীবনের একমাত্র শখ, যাহা তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। জীবনের কত শখই তো পূর্ণ হয় নাই, আর হইবে না বোধ হয়। পানের সরঞ্জামকে কেন্দ্র করিয়া তাই তাঁহার নানারূপ আয়োজন। নানারকম টুকিটাকি জিনিসে তাঁহার পানের বাটাটি পরিপূর্ণ। ভাজা মসলা, কমলালেবুর শুকনা খোলা, চুয়া-সুগন্ধি দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, রকমারি পানের মসলা, নিখুঁত চুন, ভিজা ন্যাকড়ায় জড়ানো পান, মিহি করিয়া কাটা সুপারি, ভাল খয়ের—অতি নিপুণভাবে তিনি পানের বাটাটিতে গুছাইয়া রখিয়াছেন। এই পিতলের বাটাটি কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই শঙ্কর-ঠাকুরপোর উপরে বউদিদি এত প্রসন্ন। ভন্টু-ঠাকুরপোর এই বন্ধুটি বেশ মানুষ।

ভন্টুর ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল।

এই, তোর পড়া হ'ল? নিয়ে আয় দেখি।

খানিকক্ষণ পরেই সপাসপ বেতের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বালক-কণ্ঠের আর্তনাদ। মার এবং আর্তনাদ সমান বেগেই খানিকক্ষণ চলিল। তাহার পর আবার সমস্ত চুপচাপ। বালক আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া শুরু করিল, নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

বউদিদি অবিচলিতভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতেছিলেন। পুত্রের এতাদৃশ নির্যাতনে তাঁহার কোন বিকারই লক্ষিত হইল না। এসব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে দরাজ-কণ্ঠে আদেশ আসিল, বউমা, চায়ের জল চড়াও, আটটা বাজল।

তাহার পরই একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। দীর্ঘাকৃতি ঈষৎ-কুব্জ দেহ, গৌর বর্ণ, গোঁফ দাড়ি কামানো, শুকচঞ্চু নাসা, চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পুরু লেন্সের চশমা পরা, হস্তে একখানি খবরের কাগজ—'বঙ্গবাসী'। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই বউদিদি উঠিয়া তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিলেন, ডালটা নাবিয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। বেশি দেরি নেই আর।

বৃদ্ধ বলিলেন, আচ্ছা।

সুরটা যেন অপ্রসন্ন।

বৃদ্ধ ভন্টুর পিতা। কানে কম শোনেন। বহুকাল হইতে বিপত্নীক। চায়ের দেরি আছে শুনিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং তামাক সাজিতে বসিলেন। ভোর তিনটায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হইতে শুরু করিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চা এবং তামাক লইয়া থাকেন। অবসরমত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পাঠ করেন। বৃদ্ধ চলিয়া

গেলে ভন্‌টু আসিয়া দর্শন দিল। কৌতুকপূর্ণ চক্ষু দুইটি বউদিদির মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে প্রশ্ন করিল, বাকু কি বলছিলেন—বৃদ্ধ বাকু ?

ভন্‌টুর ভাষায় বাকু মানে বাবা।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বাকুর আর কি অন্য কথা আছে এখন? আটটা বেজে গেছে, চা চাই।

ভন্‌টু গা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি থামো ঠাকুরপো, এখুনি হয়তো এসে পড়বেন।

ভন্‌টু ও বউদিদি সমবয়সী। বউদিদি যখন বধূরূপে এ বাটিতে আসিয়া প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স এগারো। ভন্‌টুরও বয়স তখন এগারো। তখন হইতেই দুইজনে এক সংসারে একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলায় দুইজনে মারামারি পর্যন্ত করিয়াছে। এখনও কথায় কথায় ইহাদের মনান্তর ও ভাব হয়। বাড়ির গুরুজন-স্থানীয় সকলের সম্বন্ধে ইহারা নিভৃতে যেসব আলোচনা করে, তাহা শুনিলে বিস্ময় হয়। মনে হয়, গুরুজনদের প্রতি বুঝি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা ইহাদের নাই। শ্রদ্ধার কথা বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধা জিনিসটা গুরুজনদেরও অর্জন করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসায় ইহারা কাহারও অপেক্ষা কম নয়। বৃদ্ধ বাকুর সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য ইহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিতে প্রস্তুত, করিতেছেও। বৃদ্ধ বাকুও বউমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও থাকেন নাই, থাকিতে পারেনও না।

বউদিদি বলিলেন, বাকুর তামাক ফুরিয়েছে, এনো আজ।

এই তো পরশু তামাক এনেছি।

কি জানি. বাবাজী আসার পর থেকে বাবা ভয়ানক ঘন ঘন তামাক

খাচ্ছেন।—বলিয়া বউদিদি ফিক করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিলেন। বাবাজী মানে ভন্‌টুর মেজকাকা।

ভন্‌টু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, এই নাও, আমার আজ আপিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। শণ্টুকে দিয়ে তামাকটা আনিয়ে নিও ওই মোড়ের দোকানটা থেকে। বাবাজীর জন্মে ঘিও আনিও কিছু। গাওয়া ঘির সঙ্গে অন্য ঘিও একটু মিশিয়ে চালাও না।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কাল চালিয়েছিলাম একটু।

আর এই নাও এক্‌স্ট্রা দু আনা। একটু ভাল মাছ আনিয়ে শণ্টুকে খেতে দিও। রাগের মাথায় বড্ড মেরেছি ছেলেটাকে। কাল ঘি খেয়ে কি বললে বাবাজী? ধরতে পারে নি?

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, পারে নি আবার! বললেন, মানুষের অধর্মাচরণের চোটে গাইগুলো পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে আর সেরকম গন্ধও নেই।

বাবাজী একেবারে চাম চামাটু! ফিরবে কখন বাবাজী?

গুরু-ভাইদের কাছে গেছেন, শিগগির কি আর ফিরবেন?

রান্নার কত দেরি?

ডালটা নাবিয়েই তরকারিটা চড়িয়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গেছে। খোসা-চচ্চড়ি ওবেলা খেও, কেমন?

আচ্ছা।

দুয়ারে কড়া নড়িল।

পিওন চিঠি দিয়া গেল।

ভন্‌টু চিঠিখানি পড়িয়া বলিয়া উঠিল, লুদুর, লুদুর—

বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি?

লুদুর, লুদুর—

রান্নাঘর হইতে একটা পোড়া-গন্ধ ছাড়িল।

বউদিদি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই যাঃ, ডালটা বুঝি পুড়ল! ফনতি পোড়ারমুখীকে সেই যে একটা পান সাজতে বলেছি, যুগযুগান্ত কাটাচ্ছে মুখপুড়ী তাই নিয়ে!

তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

ভন্টু বলিল, ফন্তিকে তো কান ধ'রে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি। পায়ে পা ঠেকে গেছল, পেন্নাম করে নি।

বউদিদি কোন উত্তর দিলেন না।

ভন্টু পত্রখানি পুনরায় পড়িতে লাগিল।

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ভন্টু প্রশ্ন করিল, ডাল গন?

'গন' কেন হবে? ফেনটা উথলে উনুনে পড়েছিল। ওটা কার চিঠি?

মোমবাতি আবার বিয়ে করেছে। এক পুলিস-অফিসারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে সি. আই. ডি. হয়েছে। লুদুর, লুদুর—

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, আবার বিয়ে করলে মৃন্ময়-ঠাকুরপো?

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, এ বউটাও পালাবে।

বউদিদি বলিলেন, আচ্ছা, বউটার কোন খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃন্ময়-ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা।

লুদুর, লুদুর—

ভন্টু ভঙ্গীভরে শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

ভালবাসত না?

নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, পুরুষরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।

দুত্তর, দুত্তর—

সত্যি, ভারি আশ্চর্য লাগছে কিন্তু—

হাসিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু হাঁকিল, এই ফন্তি, পান দিয়ে যা মাকে।

ফন্তি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন, বউমা, ডাল নামল তোমার?

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে, চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখে মুখে হাসি।

ভন্টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

৩

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সামান্য চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য-মফস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল।

কি পরিপাটী আয়োজন!

গৃহসংলগ্ন উদ্যান-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সুদৃশ্য আস্তরণ। তাহার উপর একটি ফুলদানি, প্রত্যেকটিতে দেশী-বিদেশী নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাট-করা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জিতরুচি পরিবারটির উপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল, তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া

পৌছান নাই। এমন কি, প্রফেসার মিত্র তখনও পর্যন্ত কলেজ হইতে ফিরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে আপনি এসে গেছেন—আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখিল—রিনি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়ারা, তাহার হাতে একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, চিনির পাত্র, ছাঁকনি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিনির হাত হইতে ট্রেটা লইবার জন্য হাত বাড়াইল—দিন, আমাকে দিন।

রিনি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের উপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ্ ততক্ষণ। দেখিস, আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিনির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না!

বউদি, সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেন নি কলেজ থেকে।

ইহার পর আর কি বলিবে, শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিনির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং-রুমে ঢুকিল। বেণী-দোলানো রিনি আর স্টেশনে-দেখা রিনি দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ একটা আটপৌরে রঙিন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এমব্রয়ডারি করা একটা ব্লাউস, হাতে

দুইগাছি করিয়া পাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী। এই অতি সাধারণ বেশেই রিনিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়া রিনি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দিই ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন?

এই যে—

শঙ্কর দেখিল, একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরা চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিনি বলিল, বেয়ারাটার হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেল টী-পটটা।

রিনি টেবিল হইতে একটা খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে শুরু করিল।

রিনি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিনি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুইজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিনি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তা হ'লে বসুন একটু। আমি বউদিদিদের খবর দিই।

রিনি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া বসিয়া ড্রয়িং-রুমের আসবাবপত্রাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামী 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট, কিন্তু দামী আয়না। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েল্‌পেণ্টিং ছবি, দুইখানিই নারীমূর্তি, এলিজাবেথান যুগের পোশাক-পরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়াল-

জোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য—সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতেই দেখা যাইতেছে, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র‍্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র‍্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি—পাথরের নয়, পিতলের। আয়নার দুই পাশে ছোট ছোট দুইটি কাঠের সুদৃশ্য ব্র্যাকেট। ব্র্যাকেটের উপর উন্মুক্তবক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী। অজন্তা-শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের উপর ফোন দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ঝনঝন করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছে-পিঠে বোধ হয় কেহ ছিল না, অন্তত ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি?

আমি? আমি অপূর্ব। আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না, চা খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা, কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস রিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু আই কান্‌ট হেল্‌প। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি ব'লে দেব।

শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ববাবু? মেয়েমানুষের মত গলার স্বর!

তাহার একা ড্রয়িং-রুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন, হুজুর। দিদিকে ডেকে দিই।

না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানাজাতীয় মরশুমী ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর-রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়িতেও ঠিক এমনই একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্নে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে, একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল? আমার জন্যে নাকি?

ভারি ব'য়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার। দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

শৈলর দুইটি দাদা পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে? সেই দুরন্ত বালকস্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারাগাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও তো আর বাঁচিয়া নাই। সেও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সাহেবের পত্নী, সে অন্য লোক, অতিশয় নকল. একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। শঙ্করের কবি-মন এই গেটটাকে

উপলক্ষ্য করিয়া বিগত কৈশোর-জীবনের স্মৃতি-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, সেই প্রশ্নটাই আবার তাহার মনে জাগিল—শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই, কোনদিন তো তাহাকে বলে নাই! কিন্তু সে তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল। কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোন উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বইকি। কমলারঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, শঙ্করের সে রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও তো শৈলকে কোনদিন কিছু বলে নাই! বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন-কেমন করবে শঙ্করদা?, ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়াছিল, ঘুম হবে না আমার। সত্যই তো ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমন ভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি।...শৈলকে ভুলিতেও দেরি হয় নাই তো! খল্‌সি আসিয়াছিল। শৈলর দূরসম্পর্কের বোন খল্‌সি। শৈল চলিয়া গেলে খল্‌সিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকার রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা—অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও ঘন গাঢ় অন্ধকার; শঙ্কর শ্মশানে বসিয়া ছিল—সম্মুখে খল্‌সির চিতা। খল্‌সিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও মিলিল

না। জ্যোৎস্না-স্নাত সাগরে, পর্বতে প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া উঠে—জ্যোৎস্না কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নববর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ূর পেখম মেলে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে, কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভাল কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওয়ালাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু। তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল, সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানালা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন, প্রসাধন করিতেছিলেন বোধ হয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল, ছি ছি, সে উপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন? কি মনে করিলেন উনি? দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িং-রুমে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি, বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর বলিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়।

সাড়ে তিনটের সময়।

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, তাই তো! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারিটা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে

বলিল, আরে, সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির হয়েছি!

তাতে আর কি হয়েছে? ভালই তো, আসুন না, একটু গল্প করা যাক।

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন?

কিনলাম রাস্তায়।

কিনলেন? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার? কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন তো! দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে হয়? আমার তো কমলালেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে ক'রে ব'সে থাকতেই বেশি ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই।

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না!

তিনি এইমাত্র স্নান ক'রে এলেন, আসছেন এখুনি।

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন।

আপনি খান আগে।

মিষ্টি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ

করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবিলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে তো? দেখেছ তুমি সোনাদি?

আমি বাইরে যাই নি, তুই দেখ্‌ গিয়ে।

শঙ্কর বলিল, অপূর্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্তায় রিনির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন।

ও। যাক, বাঁচা গেল। নিন, খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে।

আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি? কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে ক'রে ধ'রে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই তো বলেছেন উনি। কবির মত কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন? কই, দেখি!

না, আজ আনি নি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চ'লে এসেছি কিনা।

অভিমান-ভরা সুরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত ক'রে বললাম আপনাকে!

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা।

এই স্বল্পপরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না, আবার ভাল লাগিতেওছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরনের কথাবার্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা?

মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, না? বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভাল হয় নি।

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে! পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি পরিবার কি অপূর্ব ভঙ্গী, সর্বাঙ্গে তাঁহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবি-মন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধে হয় নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভাল হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোণটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতী ফুল একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন, এক্ষুনি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই, আয় সোনা।

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার স'রে থাকাই ভাল।

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুইটি উলটাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন্ কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা, দিন, নেবু খাচ্ছি। আপনিও তো আমার কথা রাখলেন না। একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হ'ত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অর্ধ নিমীলিত নয়নে মৃদু হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দু-একটা। সব খেয়ে ফেলছেন যে!

এই যে, নিন না। চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি, আপনিও নিন।

তিনজনে লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িং-রুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে রিনি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিনির মত খুঁতে মেয়ে আর যদি দুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে

থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্যন্ত পছন্দমত সাজানো হ'ল না!

হয়ে গেছে আমার।

এই বলিয়া রিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিনি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারীর এত যত্ন সাজ সব পণ্ড হ'ল। অপূর্ববাবু আজ আসবেন না, ফোন করেছেন।—বলিয়া তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ছদ্ম বিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেচারী!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরশুমী ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করিল। 'সুইট-পি'র বর্ণ-বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইট-পির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সম্মুখে অশোভন। অবিচল ভাবটা বেশিক্ষণ কিন্তু টিকিল না। সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, অপূর্ববাবু যে এসেছেন দেখছি!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন—একজন অপূর্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালী। অবাঙালী দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে

অবস্থানকালে ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজী—মিস্টার পিলে এবং অপরজন পাঞ্জাবী—সর্দার প্রতাপ সিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দুইজনেই ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের সম্বর্ধনা-কল্পে এই টী-পার্টির আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, ইতিপূর্বেই ইঁহাদের আলাপ-পরিচয় ছিল। কারণ পাগড়ি-মণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও হাস্যদীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইট-পির বেডগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বোধ করি এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল, সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশিক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন।

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সত্যই একটি দেখিবার মত বস্তু। খর্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট মাপের নয়। পায়ে জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুনকাম-করা। স্নো এবং পাউডারে

কিন্তু তাঁহার বহুক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি খাঁদা-খাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, দৃষ্টি কিন্তু লাজুক। অপূর্ববাবু কাহারও মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে, অপূর্ববাবু লোকটি বিদ্বান, সাহিত্যরসিক, মার্জিত-রুচি ও প্রগতিবাদী; সরকারী আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু চুপ করিয়া রহিলেন, বলিবার মত কথা তাঁহার যোগাইল না। চোখ দুইটি নীচু করিয়া সস্মিতমুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনারা দুজনে আলাপ করুন ততক্ষণ, আমি রিনিকে ডেকে নিয়ে আসি। সোনাদিদি চলিয়া গেলেন। ইহাদের আলাপ কিন্তু তেমন জমিল না। শঙ্কর মামুলী ভদ্রতাসূচক দুই-চারিটি কথা বলিল, এবং অপূর্ববাবু 'হাঁ' 'না' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই বিব্রত হইতে লাগিলেন। অপরিচিত লোকের কাছে অপূর্ববাবু বড়ই অস্বস্তিবোধ করেন। তাঁহার সর্বদাই মনে হয়, হয়তো এমন কিছু অনবধানতাবশত বলিয়া ফেলিবেন, যাহা অসঙ্গত; সুতরাং অপরিচিত লোকের সম্মুখে তিনি সাধারণত চুপ করিয়াই থাকেন।

শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনার কতদিন আলাপ এঁদের সঙ্গে?

বছর দুই হবে।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই কেন জানি না অপূর্ববাবু বলিলেন, মিস মিত্রকে পড়াতাম আমি।

ও

শঙ্কর সহসা চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ঠিক

কি যে মনে হইতে লাগিল, তাহা ঠিক বর্ণনীয় নয়। কিন্তু একটা পোকা একটা মর্মর-প্রতিমার গা বাহিয়া উঠিতেছে দেখিলে একটা শিল্পীর যে ধরনের ক্ষোভ উপস্থিত হয়, শঙ্করের তাহাই হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর আকস্মিকভাবে অপূর্ববাবুকে আবার একটি প্রশ্ন করিল, প্রশ্নটির অসৌজন্যে মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেও প্রশ্নটি না করিয়া সে পারিল না।

তখন আপনি ফোন করলেন যে, আসতে পারবেন না, আবার এসে পড়লেন যে?

প্রশ্ন শুনিয়া অপূর্ববাবু নারীসুলভ লজ্জায় শির অবনত করিলেন এবং পরে অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, বড়বাবু ছুটি দিতে চান নি প্রথমে, শেষটা অনেক বলা-কওয়ার পর ছুটি দিতে যখন রাজি হলেন, তখন দেখি, আর আসবার সময়ও নেই, শেষে—

শঙ্কর বলিল, আপনি এলেন তো প্রফেসার মিত্রের সঙ্গে দেখলাম—

অকারণে লজ্জিত অপূর্ববাবু বলিলেন, হ্যাঁ, উনি গাড়ি নিয়ে ভাগ্যিস আমার মেসে গিয়েছিলেন, তাই আসতে পারলাম।

কোথায় থাকেন আপনি?

নেবুতলায় একটা মেসে।

প্রফেসার মিত্র কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিনি ও সোনাদিদিও আসিলেন। মিষ্টিদিদি সর্দার প্রতাপ সিং ও মিস্টার পিলেকে লইয়া হাস্যপরিহাসে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রফেসার মিত্র কাছে আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার শঙ্করের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। তিনি অভিভাবকী সুরে শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, আসুন না শঙ্করবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সুইট-পিগুলো দেখছিলাম আর একবার অপূর্ববাবুর সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রফেসার মিত্রকে শঙ্কর ইতিপূর্বে দেখে নাই, নাম শুনিয়াছিল। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে ভদ্রলোকের নাম আছে। দেখিলেই লোকটিকে ভাল লাগে, সদা-হাস্যমুখ, উপরের দন্তপাঁতি সর্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। শঙ্করের সহিত পরিচয় হইতেই তিনি উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলেন, ভারি খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে। উৎপলের বন্ধু তুমি, উৎপল আমাদের বাড়ির ছেলেদের মত ছিল। সেদিন আমি একটা মিটিঙে আটকে পড়লাম, তাই উৎপলকে 'সি-অফ' করতে আর যেতে পারলাম না। ব'স ব'স।

এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মোটরে আরও কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজন আধুনিক মহিলা ও তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষমানুষ।

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়া ছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন রিনি ও অপূর্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগতা একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, একটা খুব ভাল ফিল্ম হচ্ছে, দেখেছেন? Man, Woman, Marriage?

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পরদায় দেখা হয় নি।

দেখে আসুন। তা হ'লে, ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাকশান। আজই লাস্ট ডে।

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তা হ'লে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সেকেণ্ড শোতে যেতে পারেন।

দেখি।

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্‌মটা?

না।

যান, দেখে আসুন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা তো ছুটি পাব না।

একটু দুষ্টামি-ভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে, সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল।

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিনিকে বলিলেন, প্রকাশবাবু বলছেন, খুব ভাল একটা ফিল্‌ম হচ্ছে, যাবি?

তোমরা যাও তো যাব।

অপূর্ববাবু যাবেন?—সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ববাবু বলিলেন, খুবই সুখী হতাম যেতে পারলে। কিন্তু আমার টুইশনি আছে, মিস বেলাকে পড়াতে যেতে হবে।

শঙ্কর চকিতে একবার রিনির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা? মানে, বেলা মল্লিক? সে তো

দু-দুবার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া শুরু করেছে নাকি ?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুককণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিনির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও।

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংহের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ-আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, অস্তগামী সূর্যের রক্ত-কিরণরেখা মিষ্টিদিদির জরির আঁচলাটায় পড়িয়া জলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়িতে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাশান-দুরস্ত অধিবেশনে প্রকাশ-বাবু লোকটি একটু বেমানান-গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরমের কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা-গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোন বিপদে প'ড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হ'লে—বাস্, নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ।

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি তো এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন ; আমার ওপর এত বেশি মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে!

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালাতন ক'রে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না।

বেশ, তা হ'লে করুন।

প্রকাশবাবু সস্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়া ছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ি হইতে সে হস্টেলে ফিরে নাই। আজিকার দিনে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল, তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর। সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল। স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা তো একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিনির মত মার্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে তো রিনি সহ্য করিতেছে! এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিনিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না পারুক, অপূর্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে, শঙ্কর, এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল্ তো?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল্, এবার যাওয়া যাক, আটটা তো বাজে।

চল্‌।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মনি-অর্ডারে। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার, এই নে।

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পুরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে।

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

৪

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখিল, আটটা বাজিয়া দশ-মিনিট। বেশি সময় তো নাই!

ড্রাইভারকে সে আবার বলিল, জোর্‌সে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ি পৌছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং-রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদিদির সঙ্গে দেখা! মোটর থামিবার

শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি, শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে? আমি ভাবলাম, জামাইবাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়িতে নেই নাকি?

না, তিনি বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার?

শঙ্কর বলিল, চলুন, ফিল্মটা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তা হ'লে, ওদের খবর দিই আমি।

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল।

ম্যান, উওম্যান, ম্যারেজ!

অদ্ভুত ছবি!

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে শুরু করিয়া মানব-সভ্যতার প্রতি স্তরে নর-নারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। এক পাশে রিনি, এক পাশে সোনাদিদি। রিনির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন। রিনির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে

জ্ঞাতসারে রিনির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে—যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিনি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে ?

সলজ্জ রিনি কোন উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাস-সজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল-পেশী বলিষ্ঠ-দেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল, তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ, তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ, সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশি সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিনির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিনি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যাল।

চতুর্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল, মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটি চকচক করিতেছে; সোনাদিদি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; রিনি সাধারণতই একটু স্থিরস্বভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া

গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত। রিনি খাবি ?

রিনি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভন্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাশ দিতে দিতে আচম্বিতে মনে পড়িল, তাহার যে আজ ভন্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়ার কথা মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও ভন্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে ? কানাইটা কি ভাবিবে, কে জানে! তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মত নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতেছিল, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।...একটি ট্রেতে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা এর পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্তন-কুর্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল, ভন্টু হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

ভন্টুর বউদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা— মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপিচুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসছি, আপনারা দেখুন।

সে বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভন্টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অপূর্ববাবু বারান্দার এক ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ছবি দেখতে এসেছেন দেখছি!

অপূর্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এইমাত্র এলাম আমি। টুইশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল, তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি, ওঁরা সব চ'লে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেল—ভাবছি, এখন টিকেট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে?

শঙ্কর বলিল, না, এখন আর ঢুকে কি হবে? ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভন্টুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ববাবু অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোশামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু মিস বেলার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তা ছাড়া ট্রামটা…

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিনিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে।

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল, হয়তো প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন, ও, শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে! আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, অপূর্ব বুঝি এই হুজুক তুলেছে। কিন্তু তোমরা চ'লে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটা বললে যে, তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ।—বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন ছবিটা?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার কর, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চ'লে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। ভালমানুষের মত হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ফোনে ব'লে দেব আমি।

রিনি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা সব শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত হবে; শেলির উপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না ক'রে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মত আবার ঈজি-চেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে থাকবেন না যেন।

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায়-জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে ইলেক্‌ট্রিক-বাতিগুলি শূন্য পথটিকে আলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতল-কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচ-ঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে। আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজূটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে, এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোন অপরূপ বার্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং—

একটা রিক্‌শাওয়ালা মন্থরগতিতে বাম দিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

৫

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির বাহিরের ঘরে একটি চৌকির উপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশ-সহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছে একটি শ্রীহীন কাঠের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কবাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশ অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানাপ্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যাল্‌কুলাস, অ্যাস্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারখানি পুস্তক, ছবির অ্যাল্‌বাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বহি অগোছালোভাবে আলমারিটিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নীচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের উপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরা ছড়ানো। টেবিলের উপর খানকয়েক বিলাতী মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে এক বোতল মদ ও তাহার পার্শ্বে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তাপোশটি নিতান্ত ছোট নয়—বেশ প্রশস্ত। তক্তাপোশের উপর কোষ্ঠী-বিচারক ব্যতীত আর একজন ছিল। সে ওপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; এত ঘুমাইতেছিল যে, তাহার নাক ডাকিতেছিল।

বেশ জোরেই ডাকিতেছিল, কিন্তু এই নাসিকাগর্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠী-বিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠী-বিচারকের নাম করালীচরণ বক্‌সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কানা, অপরটি একটু বেশি-রকম প্রদীপ্ত, যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সূচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুকরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোন রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ তো নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্‌সিকে সকলেই ভয় পায়, কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসে ; তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণী লোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ির একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়া ছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে শুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠীখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন তিনি

দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রায়িত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভন্টুবাবু, উঠুন, কত ঘুমুবেন ?

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভন্টুর নাসিকাগর্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভন্টু বলিল, না, আমি ঘুমুই নি তো।

কর্কশকণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তা হ'লে এতক্ষণ ? বাই নারায়ণ, এর নাম যদি ঘুম না হয়, তা হ'লে—

ভন্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক্ করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভন্টু বলিল, লদ্‌কালদ্‌কি রাখুন, কুষ্ঠির কি হ'ল ?

দুটো কুষ্ঠিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন ?

ভালই, কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্ঠি কিন্তু ভয়ানক—বাই নারায়ণ।

শঙ্করের ? কেন ?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশি এখন আর কিছু বলব না।

ভন্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ভন্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন, শেষ হয়ে গেল। পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুক-পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার যথাসর্বস্ব দিচ্ছি। কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন।

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভন্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্যে?

যা দেবেন।

দু আনায় হবে?

হবে।

যান, তা হ'লে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন

কোন্ সিগারেট আনব?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভন্টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভন্টু পিছন হইতে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভন্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটা ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বাম হস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্বাপিতপ্রায় মোমবাতিটির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল, মোমবাতিটি আর বেশিক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হ'ত। যাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ।

নির্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ি আছেন?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটা-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন, করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন,

আপনার নামই কি করালীচরণ বক্‌সি? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শালুকের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা ক'রে দিয়েছিলেন? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার?

গোনাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, আমার কাছে গোনাতে হ'লে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্ধারিত ব'লে দেব, রেস খেলে জিতবেন কি না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না।

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন, যেন কোন মহারাজা কোন গরিব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দর-কষাকষি করা আমার স্বভাব না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর প'টে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তা হ'লে, আজ এত রাত্রে হবে না।

নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলে ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন, আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে। বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না।

সে কি কথা—সে কি কথা!

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে। কখন আসব, বলুন?

করালীচরণ বক্‌সি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্যন্ত। কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন, যদি বাড়িতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে, দেখা হবে।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা, বেশ বেশ, তাই হবে। কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে, নমস্কার।

তাই আসবেন, নমস্কার।

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্‌টু আসিয়া পড়িল। পাউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভন্‌টু বলিল, দু আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভন্‌টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন, এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট ক'রে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন, নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম ব'লেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ।

ভন্‌টু চট করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ, কি যে করেন আপনি রোজ!

ভন্‌টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বসন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে ম'রেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ। সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভন্‌টু আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যান, দেরি হয়ে গেছে চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভন্‌টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল তু শালা।

ভন্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শুকনা পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। এবারও ভন্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়িখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহুকষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে, সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু এ কথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত-মহলে করালীচরণ বকৃসি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে, লোকটা পাগল; কেহ বলে, পণ্ডিত; কেহ বলে, শয়তান।

ভন্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুরপো?

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর তো।

ভন্টু বাইকটা দুই হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গিয়েছিলে নাকি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই তো ডোবালে আজ। বিরাট কৈতুকী অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোনও ভয় নেই তো?

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না তো? লুকিও না, লক্ষ্মীটি।

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভন্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভন্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এস।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কালদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার তো ঢাকা রয়েছে ওই সামনেই, দেখতে পাচ্ছ না?

আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাই নি

ভন্টু আর একবার মুখবিকৃতি করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভন্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী।

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ—চাম লদ্।

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন, ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর।

ভন্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি ক'রে দিয়ে রাত বারোটার পর আসা হয়েছে! কিছু ব'লে গেছে নাকি?

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।—

> ভাই ভন্টু, সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস।
>
> —শঙ্কর

ভন্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজীর খবর কি?

বাবাজী আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে; ব'লে গেছে, সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

দেশলাই-কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাকু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড়বউমা, উঠেছ নাকি? চা চড়াও তা হ'লে।

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভন্টুর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো। আমি ও ভাল ধরাতে পারি না, বড্ড তেল উঠে পড়ে। তোমাকে ব'লে ব'লে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না।

ভন্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব ব'লে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি, বেশ তো তুমি!

ভন্টু বলিল, খুজবুজ।

৬

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল, তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।

বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকুরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবী-ভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সারবান মতামত আছে এবং সেই মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবী পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবী কেতায় টেবিল-চেয়ার-প্লেট-কাঁটা-চামচ-সহযোগে সম্পন্ন হয়। তাঁহার খাস বাবুর্চি তাঁহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবী খানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের

ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দর-মহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাঁহার নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল, তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাসীর মারফৎ নিজের আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্ত কফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটি তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভাল। কোলের উপর একটি সাদা ন্যাপ্‌কিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে ক'রে? বসুন, বসুন।

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন করা। এত কৃত্রিমতাপূর্ণ যে, মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে।

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে।

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভন্টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন তো তাঁর চাকরিটা আবার ক'রে দিন। বেচারীদের বড় কষ্ট। ভন্টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে।

এই বলিয়া শঙ্কর ভন্টুদের দুর্দশা, ভন্টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল। ভন্টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্স্‌কিউজ মি, হি ইজ এ হোপ্‌লেস চ্যাপ।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন, এক কাপ চা খান।—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টী-পট হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট্‌, কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ-বয়েল্ড্‌ ডিম নিপুণভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পার্সোনালি স্পিকিং, ভন্টুর মেজকাকার মত লোকের ওপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। আই উড লাইক টু কিক আউট সাচ ফেলোজ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম স্পিকিং ফ্র্যাঙ্ক্‌লি, এক্স্‌কিউজ মি।—বলিয়া তিনি সাহেবী কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে আমি যতদূর জানি, তাতে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্প্যাথি হওয়ার কথা তো নয় আপনার!

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল, সত্যিকার সিম্প্যাথি হতভাগাদেরই ওপর হওয়া উচিত।

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ তো হতভাগ্য ঠিক নয়, এ একটা 'রোগ'।

বিশেষ তফাত তো চোখে পড়ছে না।—বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভন্টুটার জন্যে। ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কিনা আমি, ওর দাদা হাফ-পে-তে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভন্টুর মেজকাকার চাকরিটা ক'রে দেন, তা হ'লে ভন্টুর লেখাপড়াটা হয়।

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য, তথাপি ইহা লইয়া আর বেশি অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চ-পদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মত কোন চাকরিও আমার হাতে নেই।

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা তো বললাম, এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা ক'রে কতকগুলি লোক নেওয়ার কথা আছে। ভন্টুর মেজকাকাকে বলুন না তাতেই অ্যাপ্লাই করতে। আই যে সিলেক্ট্ হিম, লেট হিম্ টেক এ চান্স্।

আচ্ছা, বেশ তাই। ধন্যবাদ। চলি তা হ'লে। নমস্কার।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বাচ্চা-গোছের একটা চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজী একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে।

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর প্রস্থান করিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রতীক্ষমানা শৈল চাকরের মুখে এই বার্তা শুনিয়া সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও, আচ্ছা।

৭

নির্দিষ্ট সময়ে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, পাতলা, ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই। দেখিবামাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশান্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফরসা রঙ। মাথার চুলগুলা পর্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হয়, যেন একটা শিখা। ভন্টু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যান্‌ড্‌ল অর্থাৎ মোমবাতি। আর ইনি হচ্ছেন চাম লদ্, চাম গ্যান্‌চও বলতে পার।

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি ?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, ভন্টুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভন্টু অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন ? গাধা কোথাকার !

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে এখন একটু। না হয় ব'স্, একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না, আমায় যেতে হবে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে দেখছি।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তা হ'লে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চাম লদ্ নয়—

ভন্টু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না, আমার নাম শঙ্করসেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার।

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওইজন্যেই তো ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি। সাংঘাতিক চাম গ্যান্ঢঅ—

এমন সময় হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসছিস তো? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব? নে, খা।

ভন্টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধুলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, চা খাবি, না, কোকো?

ভন্টু সোৎসাহে বলিল, দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট ক'রে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভন্টু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভন্টু বলিল, বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল করলি, বল্ সব। বোস সায়েবের ওখানে গিয়েছিলি? হ'ল কিছু?

পরে বলব এখন, অনেক কথা আছে।

মানে?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'শঙ্করদা, আপনিই বলুন তো, ট্র্যাজেডি বড়, না কমেডি বড়' বলিয়া একটি

ছোকরা চটি ফটফট করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়েরই হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভন্টুকে দেখিয়া বলিল, এই যে ভন্টুদা, আপনাকে আজকাল কলেজে তো দেখি না!

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভন্টু উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ এখন ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নীচের ঘরে খুব লেক্‌চার ঝাড়ছেন যে, কমেডিই হ'ল শ্রেষ্ঠ জিনিস।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলছেন, ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে, পারে না? তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হ'লে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচুদরের রসিক না হ'লে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে।

ভন্টু, তুই একটু ব'স্—আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভন্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছেন শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল,

ভন্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের উপর তুলিয়া দিয়া, গুটানো বিছানা-স্তূপের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভন্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভন্টু ঘুমাইতেছে।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমন ভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভন্টু, ওঠ্ ওঠ্! ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে?

ভন্টু জুতাসুদ্ধ পা দুইটা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল, ক্ষেপেছিস? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম।

চল্, বেরনো যাক।

চল্। বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্ল করলি?

চল্, রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

৮

কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভন্টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিত নেত্র: তন্ময়, বিহ্বল ভাব। পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। কীর্তন জমিয়াছিল বাবাজীরই এক বন্ধুর বাড়িতে। তিনি বড়লোক এবং ভন্টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল, তখন এই বাড়িতে এই হলেই বহুবার বাইনাচ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহার ধর্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত প্রকারে

সঙ্গীত-উৎসব করা সঙ্গত, তাহাই তিনি ইদানীং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভন্টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক, কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্তনীয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্তনীয়ার মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভন্টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কীর্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার এক ধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু মৃদু হাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, তুইও ব'সে পড়লি যে রে!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্টু কোন জবাব না পাইয়া হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও ঝদকে গেলি নাকি?

চুপ কর্, কথা বলিস না।

ভন্টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তা হ'লে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় একটু পাম্প্ ক'রে নিই। এইখানে কার একটা বাইকে পাম্প্ রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস?

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্প্‌টি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প্ করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্পান্ধকারে বেঞ্চির উপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র, তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর কমলগুলি! এক-একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল।...দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তরে কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে? চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।...চতুর্দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা গলি দেখা যাইতেছে—সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীপরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে! সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অন্ধকার গুমরিয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্তনীয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—"পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত"।

ভন্টুর কণ্ঠস্বরে শঙ্করের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। টায়ারটাই জখম হয়েছে, বুঝলি?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তা হ'লে উপায়?

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটোটাইপকে তিলিয়ে যদি কিছু হয়! চল্, তাই করা যাক। কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজীর নাগাল পাওয়া শক্ত।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে ?

আয় না তুই।

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি—কিংবা হয়তো সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভন্টুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা যন্ত্রচালিতবৎ ভন্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভন্টুর কনুইয়ের আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভন্টু বলিল, দেখ্ দেখ্, ওরিজিনাল ব'সে আছে। মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু।

শঙ্কর ভন্টুর তর্জনীনির্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল, একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এক কোণে চেয়ারে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট-ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফপ্যাণ্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কান-ঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভন্টু চুপিচুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিস্টার ফাইভ।

মিস্টার ফাইভ ? সাহেব নাকি ?

বেনে। থাম্, একটু বসা যাক এখানে কোথাও, ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ এলেই ওরিজিনাল বলবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অলরেডি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভন্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসে নি ব'লে ওরিজিনাল রেগে টঙ হয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভরভর ক'রে ধোঁয়া ছাড়ছে, দেখ্ দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভন্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ্ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও।

নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভন্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক, তিনি এক কোণে চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটি অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভন্টু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা?

কোনও উত্তর আসিল না।

ভন্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

কচে বারো।—বলিয়া ভদ্রলোক ভন্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবামাত্র ভন্টু সহাস্যমুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা?

এই যে আসি, এসে বলছি।

ভন্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্, একটু বসা যাক।

ভন্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া

মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি ?

ভন্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—

বসুন বসুন, কি চান আপনারা ?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই। একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া ক'রে—

ছ-তিন নয়।

ওয়েস্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজর দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ তো, বসুন না ওধারের বেঞ্চিটায়।

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন অবস্থা হ'ত না আমার, কি ব'ল মাস্টের ?

ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন, হ্যাঃ।

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা। তুমি খাবে নাকি আর এক কাপ মাস্টের ?

মাস্টার দক্ষিণ তর্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখবিকৃতি করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডুয়ন করিয়া লইলেন। তারপর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্টিম ক'রে নেওয়াই যাক।

ভন্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল।

ভন্‌টু এমন স্থানটিতে বসিয়া ছিল, যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ চা দিয়ে যা—আচ্ছা, চার কাপই আন্‌, আমিও খাই আর এক কাপ, কি বল মাস্টের ?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে।

ভন্‌টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন কথা কি শোনালেন দাদা ? ভাল লোকের দুর্দশা চিরকালই। মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘ'টে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দয়া ক'রে ?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি ?

যৎসামান্য।

তবে আপনি তো গুণী লোক মশায়।

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভন্‌টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার জমাটি খেলাটা এইভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি! আশ্চর্য লোক বটে তুমি!

কেহ ইহার কোন উত্তর দিল না। ভন্‌টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি লইয়া তাহাতে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল। কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভন্‌টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক

দিতে দিতে করকোষ্ঠী ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চাটুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা-ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুত করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুইজন শিশুর ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছেন এবং উপভোগও করিতেছেন।

কীর্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভন্টু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশায় ?

ভন্টু কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্বিকারচিত্তে মুখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম, তাতে আপনার পায়ের ধুলো আর একবার নিতে হবে। এর বেশি আর কিছু বলব না এখন।—বলিয়া সে সত্য-সত্যই আর একবার চট করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আহা, কি যে করেন আপনি খালি খালি! কি দেখলেন তাই বলুন ?

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধুলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙিন ব্যাপার !

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক তো আপনি মশায়!

ভন্টু স্মিতমুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস পেয়ে গেছি দাদা আপনার। এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে। আজ সময় কম।

ভন্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এসে গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানী ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা তো আমি বিক্রি করি নি। মনে রাখবেন অধীনকে, তা হলেই যথেষ্ট।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি।

ভন্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভন্টু স্মিতমুখে ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাকে আর একদিন এসে চাঙ্গাব দাদা, আজ সময় বড় কম।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভন্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভন্টু বলিল, থাম্।

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল। শঙ্কর দেখিল, একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভন্টু যাহাকে ওরিজিনাল নামে অভিহিত করিয়াছিল, তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার ক'রে দিয়ে এলে, অথচ একটি পয়সা আদায় হয় নি? কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে? পাশের বাড়ি এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে, সে তো

তোমার মাথাটি খেলে দেখছি! মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ তো তার দেবার কথা।

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বাড়ি ছিলেন না।

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না?

কেউ সাড়া তো দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ানাড়ি করলাম।

ভূতের কাছে মামদোবাজি! দাও, বিলটা আমাকে দাও, ফেরবার মুখে দেখি যদি ধরতে পারি। স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোন কাজেরই তুমি নও বাবা, বি. এ. পাস করলে কি হবে? ফিনফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন এই শীতে? সোয়েটার কোথা? ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা অসুখ বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার। সোয়েটার কোথা?

এখানেই আছে।

গায়ে দাও দয়া ক'রে সোয়েটারটি। আর এই নাও, এই টুপিটাও পর, বেশ ক'রে কান-টান ঢেকে-ঢুকে ব'স। দশটার আগে দোকান বন্ধ ক'রো না যেন।—বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কি-ক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি বলিল, ঘোর জালে পড়েছে প্রোটোটাইপ। দেখ্ দেখ্, মিস্টার ফাইভকে দেখ্ এইবার।

শঙ্কর দেখিল, টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে। দেখিতে ঠিক বাংলা পাঁচের মত। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে, যুবকটির মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভন্টু চুপিচুপি আবার বলিল, মিলিয়ে দেখ্, ওরিজিনাল আর প্রোটোটাইপ পাশাপাশি রয়েছে—দেখ্, দেখ্, ভাল ক'রে দেখ্ না রাস্কেল।

ভন্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

ওরিজিনাল বলিতেছেন শোনা গেল, দাও, আমার সাইকেলটা দাও, মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই।

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরনের বাইক বাহির করিল, এবং তদুপরি আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনর্বার প্রোটো-টাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন, সোয়েটার আর টুপিটা প'রে ফেল। যাই, দেখি মৃগেনবাবুকে যদি ধরতে পারি।

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয়, এইবার যাওয়া যাক—কোস্ট্ ইজ ক্লিয়ার।

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্তী হইল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটোটাইপ নমস্কার করিল এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, সেদিন আপনি কোথায় চ'লে গেলেন ভন্টুবাবু? আমি রাশিচক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় ব'সে ছিলাম। কোথায় গেলেন বলুন তো, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ভন্টু হৃষ্টস্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিল, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান তো আগে।—বলিয়া ভন্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ, এই যে।

প্রোটোটাইপ নানাভাবে-জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। ভন্টু সেটি ফুটপাথে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, ব'স্ তুই। শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতরে এক কোণে একটা ময়লা চট পাতা ছিল, ভন্টু তাহাতেই গিয়া বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুক-খোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোট-বুক বাহির করিয়া বলিল, কই, দেখি রাশিচক্রটা।

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভন্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোট-বুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বক্‌সি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি বক্‌সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে। রাম দক্‌চান দক্‌চেছে।

বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি আপনার, ভয় কি! কি হ'ল বাইকের?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠ্যাঙালেও আজ পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্যাদার সুরে বলিল, আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানী সম্পর্ক? কেবল দেখবেন; বাবা না জানতে পারেন—বাস্। জানেন তো সবই।

ভন্টু কিছু না বলিয়া সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান, সোয়েটারটা প'রে নিই আগে। তারপর আপনার বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মটরা, বাইকটা তোল্ তো।

আঁড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গি পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনের একটি ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভন্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এসব মেরামতি-কাজ সকালের দিকে আনলেই সুবিধে হয় বাবু, বুঝলেন? মিসিনারির কাজ—

ভন্টু কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিল।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর্ দিকিন—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়া মটরা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অস্ফুটস্বরে গজর-গজর করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, চল্ না, ততক্ষণ আমরা মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভন্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষ্মণবাবু রাজি হ'লেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক।

লক্ষ্মণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কি যে বলেন আপনি ভন্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ইহাতে ভন্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি, বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক। আয় ভন্টু।

ভন্টু করজোড়ে লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন তো? এ ছোকরা কিছুতে ছাড়বে না।

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মণবাবু বলিল, মানে? নিশ্চয়। তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রইল।

একবার তো বাইক ফেলে পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা ব'লে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন।

না, ঠিক আসব।

ভন্টু ও শঙ্কর মেজকাকার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভন্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র—রাম ও লক্ষ্মণ। রাম মারা গিয়াছে, নিউমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রীও বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষ্মণই এখন ওরিজিনালের সবে-ধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনী কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ-মা। এদিকে প্রোটোটাইপ অন্যপ্রকৃতির। কৃপণ তো নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠীর মিল হয়, তাহা হইলে প্রণয়-ব্যাপারে নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারও মারফৎ প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠী-পাগল লোক। সুতরাং

কোষ্ঠীর মিল সর্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠীর মিল না হইলেই সর্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে, তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইল, কীর্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি হইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—রসভরে হুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই—। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল, ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর আর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভন্টু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে, এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে বসবে নাকি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক্। আমাকে আবার এখুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক্, অনেক ঘুরে এলেন আপনি।

বেশ বেশ বেশ—চল, তাই চল। ওদিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তা হ'লে।

শঙ্কর ও ভন্টুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছনের দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনেই গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভন্টু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভন্টুও হাসিমুখে বলিল, আসুন, নিরিবিলিতে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক। শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভন্টুটা চিরকালই একরকম রইল। ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে, এটা তো ঠিক নয়।

না না না, পড়তে হবে ওকে। আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাই নি; ভন্টুকে কিন্তু পড়তে হবে, সেটি হবে না।—বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাই নি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশুনা ছাড়িয়াছিলেন। সে যাই হোক, খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন, অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হ'ল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল-সলতে সবই রয়েছে, কেবল শিখাটি কেউ জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভন্টুকে পড়তে হবে। ভন্টু, কালই তুমি কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

ভন্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুধির?

ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের। কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তা হ'লে আবার চাকরি নেবেন?

দেখি, তাই বোধ হয় নিতে হবে শেষ পর্যন্ত। কর্মের বন্ধন ইচ্ছে করলেই তো আর ছিন্ন করা যায় না। বিষ্টুর অসুখ হয়েই মুশকিল হয়ে পড়েছে। অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্যই হ'ল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বউমাই অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেললেন বিষ্টুকে।—বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভন্টু

নীরব হইয়া রহিল। ভন্টু পিছনের দিকে বসিয়া ছিল, সে একবার ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, নাঃ, ভন্টুর জন্মেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে। ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সায়েবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সায়েব বললেন, কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্মে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি স্থবিধে হবে আপনার ?

ভন্টু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা ? ও আপনাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়।

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্মে ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে। সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে। না, আমি পরীক্ষার জন্মে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা। চাকরি যদি নিতে হয়, তা হ'লে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি না সেইটে হ'ল সমস্যা। এমনিই 'তো তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি—থাকবার কথা আমার কাশীতে।

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল ?

ভন্টু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা ? ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে! ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে! ঠাকুর

কি আপিসের বড়বাবু নাকি যে, করেস্‌পণ্ডেন্স্‌ করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি হুড়োল পাড়োল রে তুই!

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা, সে শঙ্কর জানবে কি ক'রে?

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না, সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভন্টুও ঠাকুরকে দেখে নি এখনও। ভন্টুকে দেখলে আর ভন্টুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভন্টু বলিল, আসছে শনিবার চলুন তা হ'লে, সোমবারও ছুটি আছে। কোথায় আছেন তিনি?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভন্টু বলিল, শঙ্কর, যাবি? চল্ না, ঘুরে আসি।

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন তো, মৃন্ময়বাবু মূর্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্তন শুনতে শুনতে।

ভন্টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে ব'সে?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, সে তো সন্ধ্যে থেকেই এসে বসেছে।

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভন্টু দেখিল, মোমবাতিই মূর্ছা গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদিত।

মেজকাকা বলিলেন, ও কিছু নয়, ভাব লেগেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা হিল্লে করতে হবে আবার। রাস্‌কেল্‌টার কাণ্ড দেখেছিস, আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে কেত্তন শুনছিল! চল্‌, তোকে একটু এগিয়ে দিই।

পথে বাহির হইয়া ভন্টু আবার বলিল, বাবাজীকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হ'লেই আবার ডুব মারবে। ক্ষেপেছিস তুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর।

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছা, যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সাহেবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এক কাপ চা করিতে ফরমাশ করিবে। দোকানের

চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে এই—তাহাকে নানা ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গনগন করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে; কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির-বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারাগাছ ছিল। মিত্তির-বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির-বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা ও মোহনভোগের ফরমাশ করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর-হর্নের চীৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, বোস সাহেবেরই মোটর। মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার—মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। একখানি মিষ্টিদিদির—আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে—রহস্যময় পত্র।

৯

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিল। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি দেওয়াল-ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভল্‌ভিং বুক-শেল্‌ফ রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটি ইলেক্‌ট্রিক্ আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের উপর বিদ্যুতান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। রঙিন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশ-সহকারে মৃন্ময় যে পত্রখানি লিখিতেছিল, তাহা এই—

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি মূর্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, যেন কীর্তনীয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্মস্পর্শী যে, আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ভন্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রুছলছল

ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্নতন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব।' তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেইজন্যই পুলিস-অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিসে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ্য মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমাদের দেশে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিসে চাকুরি লইলে ভাল করিয়া তোমার সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিস-অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোন প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আমি তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমারে

এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে, এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এস, আমার স্বপের মধ্যে আজ। রোজই তো তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই, আস না তো? আমার জাগ্রতলোকের প্রতি মুহূর্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাক, স্বপ্নলোকে তোমায় তেমনভাবে পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি। জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝানো অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয় দেখা দিও। তোমার জন্য তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই

মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময় একটি রঙিন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিল এবং সেটি সীল করিয়া তাহার উপর লিখিল—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দনকাঠের বাক্স বাহির করিল এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিল। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চহিল ও তৎপরে টেবিল-ল্যাম্পটি নিবাইয়া দিয়া ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী-মূর্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনরো। পরনে একখানি রাঙা ডুরে-শাড়ি।

সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড়-বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের উপর পড়িয়া আছে। নির্নিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, হাসি, ওঠ, চল, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, সেকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম সেকে দিইগে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ ব'সে?

মৃন্ময় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, আপিসের কাজকর্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি, ভারি স্বার্থপর আমরা, তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার ক'রে আনবে আর আমরা দিব্যি মজা ক'রে তা খরচ করব। তুমি বেচারী ও-ঘরে খেটে মরছ, আর আমি কেমন আরাম ক'রে ঘুমুচ্ছি! মুখে আগুন আমাদের!

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, উপায় কি?

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্যমুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই। বাপ-মা বাংলা লেখাপড়াটা পর্যন্ত শেখায় নি যে, বই-টই প'ড়ে সময় কাটাই। নিজের বাপ-মা-ই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এ তো পাতানো বাপ-মা।—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ, শীত করছে। র‍্যাপার জড়িয়ে রান্না-বান্না করা যে কি মুশকিল, তোমাকে তো ব'লে ব'লে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না। চল, উনুন-ধারে যাই, বড্ড শীত করছে।

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক।

নিজের বাপ-মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ-মা কিনা, তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না।

হাসি বড় পুলিস-অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূরসম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু হাসিকে সে কথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, চিনু খেয়েছ ?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো, নটা বাজতে না বাজতেই। কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ তো, খিদে পেয়ে যায়। চল, উনুনও বোধ হয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে।

মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভরতি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটিই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর।

হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, এতক্ষণ কি আর আঁচ থাকে ? আঁচের আর অপরাধ কি ? স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, স্টোভে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃন্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাত-মুখ ধুইতে লাগিল, এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃন্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁ গা, একটা কথা রাখবে আমার ?

কি কথা ?

পরেশবাবুদের বাড়ি এমন সুন্দর সুন্দর বেরালছানা হয়েছে! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে।

বেশ তো। এনো।

একটা ধপধপে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি দেখতে যে কি বলব!

তাই নাকি ?

স্টোভটায় পাম্প্ করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে ? নিয়ে আসব এখন ? এই তো পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও।

এখন থাক্, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, সে যদি দেখতে! কি দুষ্টু দুষ্টু চোখ!

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এত রাত্রে কে আবার আসিল ?

কে ?

মৃন্ময় বাহির হইয়া গেল। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল-গোঁফ-দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্যমুখে বলিলেন, মৃন্ময় নাকি, ভাল আছ তো সব ?

কে মুকুজ্জেমশাই, আসুন আসুন—এত রাত্রে কোথা থেকে ?

মুশকিলে প'ড়ে এসেছি, চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃন্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি!

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্জেমশাইয়ের পদধূলি লইল। তাহার দেখাদেখি মৃন্ময়ও প্রণাম করিল। মুকুজ্জেমশাই উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধমুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস তো পাগলি ?

ভুলেও তো খোঁজ নেন না একবার। আজ যে কি ভাগ্যি এলেন?

হাসি-অভিমানভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই তো।

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই?

মুকুজ্জেমশাই সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্জেমশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময়ও বলিল, আপনি কলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না তো!

হাসি বলিল, ওঁর ওইরকমই কাণ্ড।

মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হ'ল। শিরীষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হ'ল মারা গেছে। শিরীষ বেচারা পড়েছে মুশকিলে। তাকে তো এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প কদিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হ'ল। তোমাদের দু ভায়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাক, পাগলিটা আবার না হ'লে ভয় পাবে। চিনি তো ওকে, ভয়ানক ভীতু।—বলিয়া মুকুজ্জেমশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু অপবাদে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুনি যেতে হবে? তা হ'লে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি ক'রে দিই।

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি এখনও?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চিনুই চলুক, একজন হ'লেই হবে, তিনজন পেয়েছি, তা ছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয়তো জুটতে পারে।

মৃন্ময় বলিল, আপনি যাবেন? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার?

মৃন্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোন আবরণ ছিল না, খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার? আমার কিচ্ছু হবে না।

হাসি পাকা গিন্নীর মত পুনরায় মন্তব্য করিল, ওঁর ওইরকমই কাণ্ড।

মৃন্ময় বলিল, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি আর চিনু যাই।

না না, সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাক তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিল। সদ্যঘুমভাঙা চোখে মিটিমিটি মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবামাত্র সহাস্যমুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্জেমশাইয়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃন্ময়ের অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার

চুল কটা নয়—কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের সাহচর্যে এই শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে! সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃন্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু স'রে এস, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি স'রে এস, লক্ষীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে।

আর একটু হাসিয়া মৃন্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিল। হাসি রুটি সেঁকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

১০

নির্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীলরঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম-চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়িতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময়চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন, গ্রাস করিতেছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ও বাম গণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল

আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, ছাদের ওধারে আলিসার উপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বকবকম-ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মান কণ্ঠদেশে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ুরকণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আবার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নীচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে, সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টিদিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও তিনি আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মীটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন, পারাবত-দম্পতি উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়ায় রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিকটকায় অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ-বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

১১

শঙ্কর, সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণীভুক্তা নহে। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টবায়ু যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে, তাঁহার চালচলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না, ইহাই স্বাভাবিক—তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জন কোণটুকুও ভারি সুন্দর লাগিতেছে। সুরমার পত্রখানি ইতিপূর্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে, তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে, পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে, যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। এক স্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন তো? হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না, কিংবা হয়তো এর থেকেই কোন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ্ বড় কিছু একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক, এ কথা কিন্তু অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে, অভিমানে আবদার করা চলে, তাই আপনাকে শুধু

অনুরোধ করছি, চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে—বাঘ ভালুকের মত বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে—যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায় নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি ব'লে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে, তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব? রাখবেন কথাটা? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন, সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং, আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর ক'রে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন নাকি? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে ব'সে ব'সে আপনার "কলকল্লোল" কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন? সত্যি বলছি, ভারি সুন্দর কবিতাটি।"

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে, তাহাতে ও কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেইজন্য পত্র দিতে পারে নাই, এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত।

আর তা ছাড়া সত্যই তো সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই চুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায়, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল, ওধারের গেট দিয়া রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিনি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরব একটু।

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিলেন, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিনি, সঙ্গী তো একজন পেয়েই গেলি, তা ছাড়া অপূর্ববাবুও তো আসবেনই—বোধ হয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিণি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলাদি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল।

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টি দিন তা হ'লে।

রিনি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি।

ও, আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্ত দ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়।

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার রিনিকে প্রশ্ন করিল, পুরনো বইয়ের দোকানে কি বই কিনবেন আপনি ?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিনির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিনি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করি নি এখনও। পুরনো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরনো বই কিনতে আমার বেশি ইচ্ছে করে।

বেলাদিদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠভঙ্গী করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি।

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি ?

আমি ?—বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়। কবি না হ'লে ব্লাউজের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন ? অমন সুন্দর নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দুটি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যদি আপনি কবি না হতেন। কবি সবাই—কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না—ওসব বাজে কথা।

বেলাদিদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদিদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়। আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই—এ কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটি ছদ্ম কোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদিদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্তা বলিতেছিল। রিনি চুপ করিয়া ছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেন নি।

ভুলবে? বলিস কি?—বলিয়া বেলাদিদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ববাবুকেই দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত। এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে নাকি পুরুষমানুষে! আশ্চর্য মেয়েলী রুচি লোকটার! লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়-নম্র মিহি কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এলেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি, সুতরাং কলেজ স্ট্রীটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়; কিন্তু আপনি তো ক্লাইভ স্ট্রীটের লোক, আপনাকেই কলেজ স্ট্রীটে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিস মিত্রের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা ছিল, তাই, মানে, ঘণ্টাখানেক ছুটি নিয়ে—আমাদের বড়বাবুরও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না, নতচক্ষু হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিত দৃষ্টিতে একবার বেলাদিদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করি নি।

অপ্রত্যাশিত জিনিস তো অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদিদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হ'লে চলুন, বইগুলো দেখা যাক। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী এক খণ্ড রিনির পছন্দ হইল—বেশ সুন্দর দামী সংস্করণ। অপূর্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া তিনি বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই—অর্থাৎ—। বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদিদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিনির জন্মদিন। অপূর্ববাবু রিনিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নিয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ববাবুর সব বিষয়েই একটু বিশেষত্ব আছে তো—উনি রিনিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন। —বলিয়া বেলাদিদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিশনের একটা কীট্‌সও রয়েছে যে!

রিনি একটা বুক-শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌সকে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল নয়, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উল্টাইতে

লাগিল। অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদিদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ববাবু।

বেশ তো, বেশ তো।

অপূর্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হ'লে?—ঘাড় ফিরাইয়া রিনি স্মিতহাস্যে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল।

বেশ তো, বেশ তো। আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে, এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে, দশ টাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচ টাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশ টাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ববাবুকে বলিল, এই যে, নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিনি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন, থাক্, আর দরকার নেই তা হ'লে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বইখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ববাবুর মুখ-চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল, যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদিদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুকেই ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার।

হ্যাঁ, অপূর্ববাবুর জন্তেই তো কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর

কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন।—শঙ্কর বইখানি অপূর্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ, দামটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু।

বেশ, দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে, পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ন্‌স্‌ও রহিয়াছে। সে দুইটিও সে কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বহি দুইখানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুইটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হ'লে? মিস্ মিত্র কি কলেজে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ববাবু তো আপিসে যাবেন?

হ্যাঁ, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয় নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না, হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে শুরু করিল।

বেলাদিদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি।

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা

কিছু উপহার দেওয়া স্পর্ধার মত দেখাবে, কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় ক'রে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন ?

না, রাগ করব কেন ?

তা হ'লে এইটে নিন।

বায়রনের কাব্য-গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—**Please accept Byron—Shankar.** তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, **I accept. Thanks.**

তারপর রিনির হাতে বার্ন্‌স্‌খানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস মিত্র। যাব ঠিক, কিন্তু একটা উপহার বগলে ক'রে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে; তাই ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন, তা তো জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদিদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন।

রিনি কিছু বলিল না। লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদিদি রিনির হাত হইতে বার্ন্‌স্‌খানি লইয়া বলিলেন, দেখি, তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি।

তার আগে, দাঁড়ান, আমি যাই।—বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদি খুলিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—**It Burns —Shankar.**

রিনিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

১২

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠী-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন। কাগজটিতে রাশিচক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে-ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বক্‌সি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বাম হস্তে একটি জলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ববৎ—মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে, আলমারির কপাট দুইটি তেমনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তাপোশের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোশকে কপিপাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি, কিন্তু সুন্দরভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বক্‌সি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়া ছিলেন, সেই ঘর

হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছু নাই। মুখময় গোঁফ-দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল।

বাহ্ নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল, জুত পাচ্ছি না।

করালীচরণ বলিলেন, জুত পাবে কি ক'রে, ও যে নিবে গেছে। সঁরে এস, ধরিয়ে দিই।

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বক্সি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ-দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও,

এই নাও, একটা সিগারেট নাও। মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল।

বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে। ভোগালে দেখছি!

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বক্‌সি মহাশয় যখন দেখিলেন, সেটি ধরিতেছে না, তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন, দেখছ তো?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন তো খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুত হচ্ছে না।

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বক্‌সি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও। কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জ্বলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বক্‌সি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠী-গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর

যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উল্টাইয়া এমনভাবে বন্ধ দ্বারের দিকে চাহিলেন, যেন দ্বারে কোন শত্রু হানা দিয়াছে। এক নিশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কে?

আমি গ্যান্‌ঢঅ খুজ্‌বুজ্‌।

ও, ভন্টুবাবু, আপনি? আসুন আসুন।

বক্‌সি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভন্টুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বক্‌সি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। ভন্টুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বক্‌সি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, ইনি কে?

ভন্টু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যাঁর ছক সেদিন—

বুঝেছি। বসুন আপনারা।

বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কোন রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভন্টুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইশারা করিল, ভাবটা—লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোন কথা এখন না বলে। এ ইশারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনিই নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভন্টু একবার সশব্দে গলা-খাঁকারি দিল। এই শব্দে বক্সি মহাশয় ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দি হয়েছে নাকি ? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও তো !

ভন্টু বলিল, লক্ষ্মণবাবু নাছোড় ; তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোন উপলক্ষ্যই তো আমি ছাড়ি না, জানেন।

করালীচরণ ক্ষদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনেরই রাশিচক্র মিলিয়ে দেখলাম, মিল হয় নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভন্টু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি।

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি ? মনের মিল যখন হয়েছে, তখন সেইটেই আসল মিল। লাগান আপনি, কুষ্ঠির মিল নাই বা হ'ল।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বক্সি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

লাগিয়ে দিন।

ভন্টু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন ?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

ভন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গম্ভীর গাড্ডা, বুঝেছি।

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশিক্ষণ টিকবে না। ভন্টুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে, দেখুন তো, এটা তো গেল।

ভন্টু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব ঘর করেছেন কেন ?

নানারকমে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলাম—কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখলাম—ও অসম্ভব।

ভন্টু মোমবাতি লইয়া নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিতে ধরাইয়া সেটি

যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়া ছিল। তাহার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষ চর্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হ'ল শ্রেষ্ঠ মিল। সেদিকে যদি আপনার কোন গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা ব'লে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িল।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভন্টুবাবু, আপনি যদি বসতে চান তো বসুন, আমার জানেন তো—

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ, আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি দমে যাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বক্সি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় হইল।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম বুঝলেন?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে? ও মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ-মতে অসিদ্ধ। তা ছাড়া ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—মানে, একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসতে হবে ওকে। শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখভোগও করতে হবে। একাধিক পুরুষের সংস্রবে এলে তাকে দুঃখভোগ করতে হবে বইকি।

ভন্টু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমরুল তা হ'লে বলুন। প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক। মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে। গোবেচারী প্রোটোটাইপ একেবারে মদকে গেছে।

করালীচরণ কর্কশকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভন্টু বলিল, এ যে সঙিন শুক্র দেখছি! বেচারী প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্তা কি অগ্রসর হয়েছে ?

পাগল! বাঘ ওরিজিনাল ব'সে আছে—খুন ক'রে ফেলবে তা হ'লে। ছোকরা গোপনে গোপনে প্রেমে পড়েছে। ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস। মেয়েটিই নাকি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে। বলেছে যে, কুষ্ঠির মিল যদি হয়, তা হ'লে সে তার দাদাকে বলবে, যেন ওরিজিনালের কাছে কথাটা পাড়েন।

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয়-ব্যাপারে এমন হিসেব ক'রে চলার কথা আগে কখনও শুনি নি।

ভন্টু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ক্রগিশ।

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটা ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, শ পাঁচেক টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করতে পারি বলুন তো ?

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন ?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড় ?

হ্যাঁ।

কেন ?

শুনেছি, দ্রাবিড়ে একজন জ্যোতিষী আছেন, তিনি হস্তরেখা থেকে জন্ম-সময় নির্ণয় করতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন ক'রে হোক—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন ?

বাই নারায়ণ, খেয়াল বলছেন একে! দুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুনছি, ভবিষ্যৎ বলছি, অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার

নিজের জন্ম-সময়, এমন কি, জন্ম-তারিখটা পর্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্ম-সময়ের নির্ণয় করতে পারি, তা হ'লে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল ক'রে।

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভন্টু নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজকার করেন, তার থেকেই তো অনায়াসে পাঁচ শো টাকা জ'মে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝে-সুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভন্টুর দুইটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে। আমার যা কিছু উপার্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন, তাইতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না ক'রে পারব না। নেবেন ভার?

এক চক্ষু ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভন্টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি? আপনি যা দেবেন, একটা পাস-বুক ক'রে পোস্ট-আপিসে রেখে দিলেই চুকে যায়।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই নারায়ণ!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি?

তা হ'লে আসুন, আজ থেকেই শুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্বস্ব। কিছু মাংস আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না না না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান।

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ, দিন।

ভন্টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড়বিড় করিয়া বকিতে শুরু করিল।

ভন্টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে নাকি?

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক! মোস্তাক কে?

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক, এদিকে এস।

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া ভন্টু তো বিস্ময়ে নির্বাক।

বক্‌সি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিবে গেছে নাকি?

জুত হচ্ছে না।

দাও, আবার ধরিয়ে দিই। কই বিড়ি।

মোস্তাক কিছুক্ষণ বক্‌সি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চ'লে গেছে।

তা হ'লে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম।

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি। এই নাও, দেখ।

বক্‌সি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের উপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের উপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকী।

এগুলো কি?

খরগোশ।

এগুলো কি?

কপিপাতা, খরগোশরা খাচ্ছে।

খুকী—খরগোশ—খাচ্ছে—সব 'খ'।

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল, যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'-এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ, ঠিক বলেছ। যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগল-দাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন?

খুকী আর খরগোশ একসঙ্গে কেন?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্র্যাক্‌টিস করছে। খুকী যখন বড় হবে, খরগোশগুলোও বড় হবে। বড় হ'লে খরগোশগুলোর চেহারা কিন্তু

মানুষের মত হয়ে যাবে। মানুষ-খরগোশকে যাতে তখন ভাল ক'রে পোষ মানাতে পারে, তারই রিহার্সাল দিচ্ছে আর কি!

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল। করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও!

ভন্টু বলিল, এ কে বক্সি মশায়?

বললাম তো, আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিল ও, তারপর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চ'লে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, কলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি না, ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির। বদ্ধ পাগল।

বক্সি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে।

ভন্টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভন্টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল।

লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিল।

১৩

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকা-

অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স্ প্র্যাকটিকাল ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞানপিপাসা নয়, রিনিকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে। রিনিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নয়, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিনির জন্মতিথি-উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিনির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে যদি শঙ্কর যোগাড় করিয়া দেয়, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে—বস্তুত সংসারের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারও সঙ্গে তো আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে, বলুন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ও মা, তা হ'লে তো সবচেয়ে ভাল হয়। পারবেন আপনি?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে ভাল ছেলে। সায়েন্স্ কোর্সের স্টুডেণ্ট্ আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়! উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি।

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে। আপনি কিংবা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন, মিস মিত্রকে

নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। মিষ্টিদিদি তো পারেনই, বি. এ. পাস করেছেন উনি।

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওই সব! ওসব আপনাদের মত ভাল ছেলেদেরই পোষায়। সেদিন রিনি কি একটা সামান্য জিনিস জিজ্ঞেস করেছিল রোমান হিস্ট্রির, কিছুতে মনে এল না ছাই! ভাগ্যে অপূর্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন।

অপূর্ববাবু আসেন নাকি রোজ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, অপূর্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে তিনি অবশ্য রিনিকে পড়াতে রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধ্যেবেলা গান শেখান, আরও এক জায়গায় কোথায় পড়ান নাকি।

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদিদি বলিয়াছিলেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে, সে রিনিকে পড়াইবে। সেই দিনই রিনিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্র্যাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়। লোকটি মার্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে প্রায়:

পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয়, ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিনিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বইখানি আউট-বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি. এ. কোর্সের ইতিহাসের বইগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজীটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে বেশি পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিনিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিই বা হয়, তাহা আয়ত্ত করাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিনি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা, স্বল্পভাষিণী, শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলা সঙ্গীতের মত মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে।

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে, ভন্টুবাবু তাহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন-রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নামিয়া গেল। কমন-রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়া ছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি রে, এমন সময় হঠাৎ?

ভীমজাল এবং গভীর .গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রী। মেজকাকা আবার সরেছে, বউদিদির খুব জ্বর, ট্যাক গড়ের মাঠ"।

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করের বিপন্ন মুখচ্ছবি

খিয়া ওষ্ঠ-বিকৃতি করিয়া ভন্টু বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন
ড়োল ? যা হবার হবে। এক কাপ চা খাওয়া তো আগে।

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি ?

কানা করালী কে ?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস !

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

চল্ না, যাই সেখানে। তোর কুষ্ঠিটা গোনাবি বলেছিলি তো কদিন।

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা, তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের ন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিস্ট্রির পড়া করিতে বে। সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্টু চাটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কন্‌সেশন ডে ছিল, সস্তায় 'ত। আজ বুধবার তো ?

কন্‌সেশন ডে মানে ?

মানে বুধবার দিন তার হাফ ফী। অন্য দিন দশ টাকা নেয়, আজ চ টাকা।

তাই নাকি ? বেশ তো, পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুনিয়ে য়ে আয়—সব ঠিক ঠিক ব'লে দেবে তো ?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্টু বলিল, ব'লে দেবে মানে ? এ রকম র্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ।

তুই তা হ'লে গুনিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে।

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটা টাকা আনিয়া ভন্টুকে দিল। কা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই

ছিল না। রিনির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনখানা দামী বই কিনিয়া তাহা
যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলি
নটা তো বাজে ; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখা
যাবি ? বউদির জ্বর বলছিলি !

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতর দিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলি
জ্বর তো বটেই—আমি আর বাড়ি ব'সে থেকে তার কি করব ?
করবার তা তো ক'রেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্‌কালদ
ক'রে আবার ফিরব এখুনি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে ?

কাল সন্ধ্যে থেকে না-পাত্তা।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। .

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলো
জ্বালতে হবে।

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টু
আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইক
গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটি
মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল, তাহার পর বাতি
জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর্ দিকি, আ
বাইকে চড়ি, তারপর আমার হাতে দিস।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প্ কি হ'ল ?

ভন্টু হাস্যদীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল, খুজ্‌বুজ্।

খুজ্‌বুজ্ মানে ?

মানে—বিক্রমপুর, এবং তস্য মানে—বেচে ফেলেছি। সংস
চালাতে হবে তো!

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক।

হস্টেলের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই জের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু ম খটখট করিতে করিতে বাথ-রুমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর জের ঘরে বসিয়া বসিয়া তাঁহার গলার-সাঁকি-বাহির-করা মূর্তি কল্পনা-ত্রে দেখিতেছিল। হাতকাটা ফতুয়া পরা, কানে পইতা জড়ানো। নকিশোরবাবু তিনবার বি. এ. ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত তেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই লো নিবিয়া যাইবে। কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্বে মকিশোরবাবু খড়ম পরিয়া বাথ-রুম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া য়া হইতে জল ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন— । তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও ধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন র ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক ওদিক চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্টুর সহিত হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার য় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আর সে তে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়া- ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস পড়া স্থগিত রাখিতে । সে আশা করিয়াছিল, ভন্টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া গণনার াফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্টু তো কই আসিল না! ারোটা প্রায় বাজে। ভন্টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল

জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল; ইতিহাস পড়ায়
বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছি
রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অ
যোগাড়যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল-সীটেড রুম লইয়াছে, সুত
বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্ক
ঘরে তালা লাগানো থাকিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে
এসকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃ
উপর নির্ভর করিয়া নব-বিবাহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় (জনশ্র
তিনি রামকিশোরবাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন তখন কলিকা
শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরব
রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে
করিয়া চলিতে হয়।

ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিবিয়া গেল। অন্ধক
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গি
দারোয়ানকে চুপিচুপি কি বলিল। দারোয়ান প্রথমটা একটু আপ
করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজি হইল এবং গেট খুলি
দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, শঙ্করবাবুর কথা অম
করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্যটি সে করিতেছে, কিন্তু
'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শ
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভর্ন্টুর সহিত আজ রা
তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয়
সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে এক
গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদি
অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু 'ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই।
গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হইে

পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞানভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুখ হইয়া ছিল, সে রিনি। লজ্জিতা রিনি, কুণ্ঠিতা রিনি, স্বল্পভাষিণী রিনি, কাব্যানুরাগিণী রিনি, আয়তনয়না রিনি, ঈষৎ-হাস্য-স্নিগ্ধা রিনি, বিরক্ত রিনি, বিপন্ন রিনি—রিনির নানা মূর্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলকদৃষ্টিতে শঙ্কর রিনির সঞ্চরমান নানা মূর্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিনিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে, মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠীগণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি না, তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্বেও সে রিনির কথা একবার ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ-পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল? অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্যকিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমময় হইয়া উঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া উঠে, শঙ্কর তেমনই সহসা রিনির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কার তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি সজোরে আসিয়া তাহার গালে লাগিল। রঙিন খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল, উপরে লেখা রহিয়াছে—স্বর্ণলতা দেবী। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল

একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভন্টু যাহাকে মোমবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল, সে এবং একটি কিশোরী কথাবার্তা বলিতেছে। টেবিলে রক্তজবার মত একটা আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল, কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি না! ওই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল, তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল, সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময় বলিল, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না তো ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন। তোমার রুটির নেচিগুলো করা আছে, এখনও বেলা সেকা হয় নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে।

শঙ্করের মনে হইল, মৃন্ময় একটু যেন রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপিচুপি এস এ ঘরে। বেড়াল-ছানাটা গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার একধারে কেমন চোখটি বুজে ব'সে আছে, বেচারীর শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ছুষ্টু ছুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এস না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে!

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তাহা

ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি-পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ভন্টুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রিক্শার টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত-অপেক্ষমান ফেটিন-গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোন বৃহৎ অট্টালিকার গাড়িবারান্দার নীচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতে রাস্তার ফুটপাথের উপর ঘুমন্ত দরিদ্র নর-নারী স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল, গভীর নীরবতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটি আলো জ্বলিতেছে।

ভন্টু, ভন্টু!—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শন্টু—ভন্টুর ভাইপো—মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি শঙ্কর। ভন্টু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শন্টুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধ হয়। আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মত বাহিরে কোন পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে-

অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বউদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়া হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বউদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন র‍্যাপারটি সর্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছ কি শঙ্কর-ঠাকুরপো ? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ।

ভন্টু এখনও ফেরে নি ?

ওষুধ আনছি ব'লে সেই যে সন্ধ্যে থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। চেনই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ভন্টু তো তাহারই জন্য জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিষুদের কোন ব্যবস্থা না ক'রেই বেরিয়েছে সে ? আশ্চর্য তো !

বউদিদি বলিলেন, সন্ধ্যের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই তো বেরুল। কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কিংবা, কি জানি—

বউদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়াপাত হইল।

মা, খিদে পেয়েছে।

শন্টুর ভাই নন্টু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্পপরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে, তাহা সে যেন অনুভব করিল। মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, তুমি একটু ব'স শঙ্কর-ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্, খাবি চল্।

শিশুকে লইয়া বউদিদি ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল, শিশু বলিতেছে, সাবু খাব না।

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে কেমন বেগুনভাজা দিয়ে ভাত ক'রে দেব, কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় তো ধন, নন্টুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেযে ফেলো তো বাবা চোঁ-চোঁ ক'রে।

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজি হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বউদিদিরও ধৈর্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিবেন, এমন সময় ফন্তি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিসফিস করিয়া বলিল যে, তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক, সে একটু বড় হইয়াছে তো।

বউদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু ঢেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়্ না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফনতি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফনতু, একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়তো চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বউদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন, জ্বর না হ'লেও গা-ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তা ছাড়া নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্যে আর ভাতের হাঙ্গাম করি নি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি ক'রে দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করি নি এবেলা। —বলিয়া বউদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

শীত করছে বউদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না, থাক্, এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখাট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পর-মুহূর্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বউমা, ভন্টু এসেছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে, শঙ্কর এসেছে নাকি? এত রাত্তিরে হঠাৎ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? জিজ্ঞেস কর সেটা। এখানেই ডেকে আন না, এই শীতে বাইরে কেন?

বউদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া

দেখিল, ভন্টুর বাবা কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামী সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, এস এস, এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? বাইরেই বা ব'সে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে!

ভন্টুর কাছে দরকার ছিল একটু।—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বউদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভন্টুর বাবা কালা। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভন্টুর বউদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ভন্টু এখনও ফেরে নি বুঝি? কটা বাজে?—এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের ব্র্যাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত তো খুব বেশি হয় নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভন্টুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সে-ই তো হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারোটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে, ঘড়িটা বোধ হয় স্লো আছে—, বউদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তো? না এসে থাক তো বউমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বউদিদির মারফৎ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু

হোক তা হ'লে, চায়ের তো আর সময়-অসময় নেই, কি বল বউমা? আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকীরণ করিয়া তিনি বউমার দিকে চাহিতেই বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, দিচ্ছি ক'রে।

বউদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, ইহাদের সংসারে নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনরূপ অসচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামী গড়গড়া, দামী চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর উপর পাট-করা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন ধনী বৃদ্ধ দুই-চারি দিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, নানা দিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে আমাকে।—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভন্টুর বিয়ের কথা গো। তোমরা দেখে শুনে একটা ঠিক ক'রে ফেল। বয়সও তো হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে— বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভন্টুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়। আমার পিতার বিবাহ হয় আরও সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে। পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভন্টুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বউদি, বউদি! শন্টু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভন্টুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, ব'স। এইখানেই বউমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভন্টু এসেছে।

অ্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চীৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল, বউদিদি বলিতেছেন, ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছে, ব'সে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভন্টু মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। নিমেষের জন্য।

তাহার পর ভন্টু বলিল, কি রে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম।

জানতে এলি? আচ্ছা উন্মাদ তো তুই! আয়, বাইকটা ধ'রে তুলি দুজনে!

বউদিদি বলিলেন, তা হ'লে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি ক'রে?

বউদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বউদিদি এই বলিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন। ভন্টু ও বউদিদির

ভাবানয় একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি ?

ওসব মেয়েলী ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি ? আয়, বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভন্টু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে।

থাম্, মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল, সেই কাগজের ঠোঙাটা বারান্দায় নামানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভন্টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি !

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভন্টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস পেয়েছি তোর।

কি হদিস ?

পরে সব বলব। এখানে সেসব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভন্টুর কথার শেষার্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না ? নাও, চা নাও। কি সুবিধে হবে না ?

ভন্টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ক্রগিশ অ্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বউদিদি হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভন্টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা ?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভন্টু তাহার কি হদিস পাইয়া আসিয়াছে, না শোনা পর্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভন্টুকে সে বলিল, চল্, বাইরে যাই।

থাম্, জিনিসপত্রগুলো বিড্‌ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে। বিড্‌ডিকার মানে বউদিদি। চা দিয়া বউদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভন্টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভন্টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়—চাল, ডাল, মসলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভন্টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড বউদিদি। এই নাও, তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস করগে যাও। চারটি ভাতে-ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরি আর ক'রে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সেবারের মত শেষে এক কাণ্ড ক'রে ব'স আর কি !

ভন্টু মুখ-বিকৃতি করিয়া তাঁহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বউদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বউদি, আপনার জ্বর এখন কত ?

আছে বোধ হয় একটু—সামান্যই হবে।

ভন্টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও তো দেখি।

বউদিদি প্রথমে রাজি হইলেন না; অনেক বলা-কহার পর হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর ১০২ ডিগ্রী। শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন তো! বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারে ঢুকছিস? চল্‌, বাইরে যাই। বিড্‌ডিকার is as obstinate as a mule.

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা! অত জ্বর আমার নেই, ও থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার ব'লেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভন্টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভয়ানক শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কুষ্ঠির?

অনেক প্যাঁচ তোর: করালী বললে, একদিনে হবে না।

প্যাঁচ? কি প্যাঁচ?

সঙিন প্যাঁচ এবং রঙিন প্যাঁচ। এর বেশি করালী আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না?

না। উঃ, কি শীত রে! চল্‌, ভেতরে চল্‌।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোনও খবর পেলি মেজকাকার?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজী কোন খবর রেখে যায় নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়েব্‌ল তো?

ভন্টু দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাষ।

ভন্টু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার ক'রে নিয়ে এলি মানে? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভন্টু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি। দাদা টাকার অভাবে প'ড়ে পুরী থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাঁকে টি. এম. ও. করতে গিয়ে অন্ন-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ-গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল্? উপায় কি? অনেক কষ্টে ধারধোর ক'রে যোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, মায় চাল পর্যন্ত। চল্, ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিতেই বউদিদি ভন্টুকে বলিলেন, আর একটু হ'লেই শঙ্কর-ঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম দেবার নাম ক'রে দু ঘণ্টা স্লো ক'রে দিয়েছিলে, আর একটু হ'লেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

ভন্টু বলিল, সর্বনাশ! বাকুর ঘড়ি দরকারমত স্লো-ফাস্ট আমরা হরদম করছি। খবরদার, ও বিষয়ে কক্ষনও কিছু বলিস না! বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্ট্ ঘড়ি ইন ক্যাল্‌কাটা।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভন্টু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে মরেছে, তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে, মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে, সেইজন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে। খবরদার, বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলিস নি যেন কোনদিন।

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, আমি এবার যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে তো!

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি তো, ফিরে না

গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছে, সেই তোর বক।

ভন্টু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন?

হ্যাঁ।

তা হ'লে যা। কাল আবার দেখা করব।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তা হ'লে বউদি।

এস।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময় ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! কে এই স্বর্ণলতা! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিনির জন্মতিথি-উৎসবের দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করার মত সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসা-ভাসা চোখে দামী সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভাল। মোটরখানিও দামী।

এখানে কি করছেন?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তা হ'লে, লিফ্‌ট দিয়ে দিই।

চলুন।

মৃন্ময়ের বাড়িতে ফিরিয়া তাহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে—এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে!

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীরভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিজ্ঞেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীর মুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি।

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল, যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিক্‌শাওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধ হয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু

যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হ'লে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সীটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের, দিন। অনেক ধন্যবাদ। চলি তবে—গুড নাইট।

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৪

মুকুজ্জেমশাই যখন মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া পৌছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসন্ন অপরাহ্ণের ম্লান রৌদ্রালোকে ক্ষুদ্র গলিটি তন্দ্রাতুর। চারিদিকে কোন জীবনের লক্ষণ নাই। একেবারে যে নাই তাহা নহে, একটা ডাস্ট্‌বিনের উপর উঠিয়া একটা লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুর লুব্ধ আগ্রহে কি যেন খাইতেছে, কিছু দূরে একটা গলিতে ঢং ঢং শব্দ করিয়া একটা বাসনবিক্রেতা বাসন ফেরি করিতেছে। ইহা ছাড়া চতুর্দিকে আর বিশেষ কোন চাঞ্চল্য নাই। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটির সহিত অনেকেই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় কেহই বোধ হয় জানে না। পরিচিত-মহলে তিনি মুকুজ্জেমশাই নামেই খ্যাত, নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন—ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহার বেশি নিজের আর কোন পরিচয় তিনি কাহাকেও দেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বেশি কৌতূহল

প্রকাশ করিলে বলেন, পৃথিবীর অনেক জিনিসই তো জান না, এটাও না হয় না জানলে! বলেন আর হাসেন। তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন মুখের হাসিতে অসামান্য একটি মাধুর্য আছে। আয়ত আরক্ত চক্ষু দুইটি সরল স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সর্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের নিজের কাজ বলিয়া কিছু নাই, কারণ তাঁহার নিজস্ব সাংসারিক কোন বন্ধনই নাই। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই বিব্রত ও ব্যস্ত, নানা কাজের চাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না। পরের জন্য চাকরি যোগাড় করা, কে আপিসের টাকা ভাঙিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার সংসারের তত্ত্বাবধান করা ও জেল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নানাপ্রকার তদ্বির করা, কোথায় কোন্ রোগী আছে তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, ভিড়ের দিনে অল্প পয়সার মধ্যে থিয়েটারের জন্য টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহু বিচিত্র কর্মভারে মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই নিপীড়িত। আজ তিনি কলিকাতায় আছেন, কাল রাজমহলে এবং তৎপরদিন দিনাজপুরে চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন শিরীষবাবুর পুত্রের অসুখের সম্পর্কে। পুত্রটি তো মারা গিয়াছে, এখন কন্যাটির বিবাহ-ব্যাপারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মৃন্ময়ের সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের আলাপ বেশি দিনের নয়। হাসির বাবার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং হাসির স্বামী হিসাবেই তিনি মৃন্ময়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। যে বড় পুলিস-অফিসারটি হাসিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিও মুকুজ্জেমশাইয়ের একজন ভক্ত এবং মুকুজ্জে-মশাইয়ের সুপারিশেই তিনি একদা হাসির ভার লইয়াছিলেন। সুতরাং মৃন্ময়ের অপেক্ষা হাসিই মুকুজ্জেমশাইয়ের বেশি আত্মীয়। মুকুজ্জে-মশাই বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলেন, হাসি ছাড়া বাড়িতে কেহ নাই। হাসি মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া বলিল, আপনি এলেন তবু বাঁচলুম।

এরা সব কোথা ?

ঠাকুরপো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। আর জানেন, উনি আজ দুদিন বাড়ি নেই! কি বিচ্ছিরি বলুন তো ?

কোথা গেছে মৃন্ময় ?

কি জানি! আপিসের কাজে কোথায় গেছে।

সি. আই. ডি.-র কর্মে মৃন্ময়কে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কবে ফিরবে কিছু ব'লে গেছে ?

ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া হাসি বলিল, কিছু না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে পর্যন্ত যায় নি। আপিস থেকে বাইরে বাইরে চ'লে গেছে। একটা কন্‌স্টেব্‌লের হাতে ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেছে যে, ফিরতে দু-চার দিন দেরি হতে পারে, আমরা যেন না ভাবি। দেখুন একবার আক্কেল!

মুকুজ্জেমশাই সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কি করবে বেচারী, ও চাকরিই হ'ল ওই রকম।

মুখে আগুন অমন চাকরির।—এই বলিয়া হাসি একটি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল।

কম্বলে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কই, তোর বেরাল-ছানাটা কোথায় ?

হাসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

কাল সকালে সেটা ম'রে গেছে।

ম'রে গেছে! আহা! কি ক'রে ?

ঠাকুরপোর জন্যে। সদর-দরজাটি কখন খুলে রেখেছিল, আর ও অমনই সুট ক'রে কখন বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। বাস্, ওদের বাড়ির কুকুরটা এসে খ্যাঁক ক'রে কামড়ে দিলে।

তখ্‌খুনি ম'রে গেল ?

না, বেঁচেছিল খানিকক্ষণ।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আহা!

ঠাকুরপোটা এমন পাষণ্ড—কি বললে শুনবেন? বললে, বাঁচা গেছে, আপদ গেছে।

ইহার উত্তরে মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না দেখিয়া অধিকতর উষ্মাভরে হাসি বলিল, আপনি আস্কারা দিয়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছেন।

ইহার উত্তরেও মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। বিড়ালের শোকে হাসি খুব বেশি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ সে পর-মুহূর্তেই বলিল, আচ্ছা, আপনার চুলের দশা কি হয়েছে?

উত্তরে মুকুজ্জেমশাই হাস্যদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

হাসি আবার বলিল, আঁচড়ে দেব?

দে।

হাসি ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় চিরুনি আনিয়া মুকুজ্জে-মশাইয়ের কেশ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কার খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একমাথা বড় বড় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল আয়ত্তে আনা শক্ত। হাসি মরিয়া হইয়া চিরুনি চালাইতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই ধৈর্যসহকারে চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে হাসির হুঁশ হইল।

লাগছে আপনার?

পাগল, একটুও না।

এক কাজ করি বরং, আগে একটু তেল দিয়ে নিই, বেশ ভাল তেল আছে আমার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসি পুনরায় ঘরের ভিতর গেল এবং তৈল লইয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করিলেন না। তৈল-সহযোগে ক্রমাগত আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া হাসি যখন মুকুজ্জেমশাইয়ের চুলের শ্রী অনেকটা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিল। ঢুকিতে ঢুকিতেই সে বলিল, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে বউদি, শিগগির খাবার দাও।

তাহার পর মুকুজ্জেমশাইকে দেখিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও পর-মুহূর্তে প্রণাম করিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

হাসি বলিল, মাথা যেন কাগের বাসা হয়েছিল, তবু অনেকটা পরিষ্কার হ'ল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, এইবার ছাড়্, চিনুর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে কয়েকটা। চিনু, আমার কাজের কতদূর হ'ল? আঃ, ছাড়্ আমাকে পাগলী।

দাঁড়ান না, সিঁথেটা ঠিক ক'রে দিই।

চিনু বলিল, লিস্ট্ আমি তৈরি করেছি, অনেক হয়েছে।

কই, দেখি।

থামুন, বইগুলো রেখে আসি আগে।

চিনু বই রাখিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রসাধন শেষ করিয়া বলিল, কেমন হ'ল বলুন দেখি? মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে না?

খুব।

যাই, ঠাকুরপোকে খাবার দিইগে। আপনি কিছু খাবেন?

না। আমাকে খেতে দেখেছিস কখনও বিকেলে?

হাসি চিনুর জলখাবার আনিতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

চিনু আসিয়া বলিল, সবশুদ্ধ পনরোজন ছেলের নাম যোগাড় করেছি, দেখুন।

একটি ছোট খাতায় অনেকগুলি নাম টোকা ছিল। খাতাখানি সে মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, যার যতটা পরিচয় পেয়েছি সব টুকে নিয়েছি, ঠিকানাও আছে ওতে অনেকের।

চিনুর কার্যনিপুণতায় মুকুজ্জেমশাই খুশি হইলেন। বলিলেন, বাঃ!

চিনু বলিল, এদের মধ্যে শঙ্করসেবক রায় ব'লে ছেলেটি খুব ভাল। কলেজে ভাল ছেলে ব'লে খুব নাম। বাড়ির অবস্থাও ভাল শুনেছি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, ঠিকানাটা টোকা আছে তো? কই?

হস্টেলে থাকে, এই যে ঠিকানা।

মুকুজ্জেমশাই ঠিকানাটা দেখিয়া লইলেন ও তাহার পর খাতাটা চিনুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এটা এখন থাক্ তোমার কাছে। মেডিকেল কলেজ আর ল কলেজের দুজন ছেলেকেও দিয়েছি দুখানা খাতা। একদিন সব মিলিয়ে দেখি, তারপর বেরুনো যাবে। এখন তুমি চট ক'রে খেয়ে নাও, এক দান বাঘ-বকরি খেলা যাক, এস। সেদিন তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে আমায়, তার শোধ না তুলে ছাড়ছি না।

চিনু হাসিয়া বলিল, আজও জিততে দেব না।

হাসি খাবার লইয়া আসিয়াছিল।

সে বলিল, সাবধানে খেলবেন দাদামশাই, ভয়ানক চোর ও। মরা বকরিগুলো চুরি ক'রে ঢুকিয়ে দেয়।

চিনু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, মিথ্যুক কোথাকার! নিজে খেলতে পারেন না, আবার আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিতে লাগিলেন।

বলিলেন, আমার কাছে সেসব চালাকি চলবে না। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চিনু কোনক্রমে পরোটা কয়খানা গলাধঃকরণ করিয়া মুকুজ্জে-মশাইয়ের সহিত খেলিতে বসিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া, চিনু কখন কি ভাবে চুরি করে, তাহা ধরিয়া ফেলিবার জন্য ওত পাতিয়া রহিল।

১৫

মিস বেলা মল্লিক দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটিকে চাপিয়া ভ্রূভঙ্গী-সহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের এই আধুনিকতম সমস্যাটির সমাধান করিবেন। এই জাতীয় সমস্যা তাঁহার জীবনে নূতন অথবা আকস্মিক নহে। রূপ এবং যৌবন থাকিলে স্ত্রীলোকমাত্রেরই জীবনে এরূপ সমস্যার আবির্ভাব স্বাভাবিক। বেলা মল্লিক ইহাতে কোনরূপ অভিনবত্ব অনুভব করিতে-ছিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে সমস্যাটির সুচারু সমাধান করিয়া ফেলা যায়। তাঁহার মনোভাব অনেকটা দাবা-খেলোয়াড়ের মনোভাবের অনুরূপ। এরূপ প্রেমিক তাঁহার জীবনে একাধিকবার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সু-কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ নিজে তিনি কখনও কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। নিজের রূপ গুণ ও যৎসামান্য কালচারের প্রভাবে তিনি বহু পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মনোযোগ কেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি দুইটি প্রণয়ী আলোকলুব্ধ পতঙ্গের মত অহরহ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের একজনের সম্বন্ধে বেলা দেবী

নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁহার ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই দ্বিতীয় লোকটির উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গী রহিয়াছে, যাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ঠিক নারীদেহ-লুব্ধ পুরুষের লালসাময় প্রলাপ নহে—এ আবুলতার মধ্যে মর্মস্পর্শী আন্তরিকতা রহিয়াছে: ঠিক সুরটি যেন বাজিতেছে। প্রথমোক্ত প্রণয়ীটির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নয়, কিন্তু সে আন্তরিকতা মনকে নাড়া দেয় না।' নারীর মনকে নাড়া দিবার ক্ষমতা অপূর্ববাবুর নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ পালিত নারী-স্তাবক, নারী-সঙ্গ-লিপ্সু। নারীর বন্ধু হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার হয়তো আছে, কিন্তু প্রেমিক হইবার মত বলিষ্ঠতা তাঁহার নাই। প্রলুব্ধ ভ্রমরের মত প্রতি কুসুমের দ্বারে দ্বারে তিনি গুঞ্জন করিতেই পটু, আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চাটুকার ভ্রমরকে দিয়া কুসুম তাহার নানা অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লয়, কিন্তু কখনও ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হয় না। কুসুম উপভোগ্য হয় সেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠুরের, যে তাহাকে নির্মম হস্তে বৃন্ত-চ্যুত করে, নির্দয় সূচিকা-আঘাতে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথে। ইহা হয়তো বর্বরতা, কিন্তু এই বর্বরতার জন্যই বহু নারী-হৃদয় সমুৎসুক। অতি-সভ্য, অতি-শৌখিন, অতি-মৃদু, অতি-নমনীয় পুরুষ নারীর কাম্য নহে—অন্তত বেলার নহে। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি গান শিখাইবার অছিলায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেই আসেন, তাহা বেলা দেবী জানেন এবং সহ্য করেন। সহ্য করিবার হেতু আছে। এত সস্তায় এরূপ গানের শিক্ষক পাওয়া শক্ত। অপূর্ববাবুর নিজের গলা যদিও খুব ভাল নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ভাল। তা ছাড়া, আবেগের আতিশয্যে নানা রকম উপহারও তিনি আনিয়া দিতেছেন। সেদিন একটা ভাল এস্রাজ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন,

নানা স্থান হইতে গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। বেলা মল্লিকের মত সঙ্গতি-বিহীনার পক্ষে এসব অবহেলা করিবার নয়। সঙ্গীতবিদ্যায় বেলার অনুরাগ আছে, গলাও ভাল। এই সুযোগে, অর্থাৎ অপূর্বকৃষ্ণের দুর্বলতার সুযোগে যদি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি? মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় অপূর্বকৃষ্ণবাবুর মত একজন শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। মাত্র সঙ্গসুখ দান করিয়া এত অল্প বেতনে যদি অপূর্ববাবুর মত লোক পাওয়া যায়, বেলা তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন? অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে সামান্যতম মোহও বেলার মনে নাই। অপূর্ববাবুর মোহের সুযোগ লইয়া তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন মাত্র এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাকে একটা বেতন দিতেছেন। কারণ, এটা তিনি বেশ জানেন যে, বেতন না দিলেও অপূর্ববাবু তাঁহাকে গান শিখাইতে আসিবেন। তথাপি বেলা দেবী তাঁহাকে বেতন দেন এইজন্য যে, কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও তাঁহাকে যেন অপূর্ববাবুর কাছে বাঁধা পড়িতে না হয়, ইচ্ছা করিলে যে কোন দিনই যেন সম্পর্কটা চুকাইয়া দেওয়া চলে। সুতরাং অপূর্ববাবুকে লইয়া বেলার দুর্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে এত সহজে এড়ানো যাইবে না। এড়ানো শক্ত প্রথমত এই কারণে যে, সে প্রতিবেশী, সদা-সর্বদা তাহার সহিত দেখা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, সে স্বজাতি পালটি ঘর, সামাজিকভাবেও তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে এবং সে চাহিতেছেও তাহাই। কিছুদিন পূর্বে সে বেলার দাদা প্রিয়বাবুর নিকট খোলাখুলিভাবেই এই প্রস্তাব করিয়াছিল। বেলার দাদাই বেলার একমাত্র অভিভাবক ও আত্মীয়। এই প্রস্তাবে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। এই বাজারে বোনটার যদি এমন একটা সদ্গতি হইয়া যায়, মন্দ কি? বেলা কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি নহেন এবং সে কথা দাদাকে স্পষ্টভাবে

জানাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর বয়স হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহার নিজের একটা মতামত হইয়াছে। প্রিয় মল্লিক সোজাসুজি ভগ্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাঁকা পথ ধরিলেন। বেলাকে একদিন বলিলেন, আলাপ ক'রে দেখ্ না একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে। খাসা লোক, অবস্থাও বেশ সচ্ছল, আমার তো বেশ লাগল লোকটিকে।

সুতরাং বেলার সহিত লক্ষ্মণবাবুর একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল, এবং তাহার পর হইতে লক্ষ্মণবাবু সুযোগ পাইলেই আসিয়া হাজির হইতেছে। এতদিন দূর হইতেই বেলাকে দেখিয়া ও বেলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল, এখন প্রিয়বাবু সে দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভাবটা—যদি বেলার ছেলেটিকে ভাল লাগিয়া যায়। প্রিয়বাবু লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক—ব্যাচিলার মানুষ, এক শত টাকা বেতনের চাকুরি করেন। ভগ্নীটিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া আছেন। ভগ্নীটি স্কন্ধ হইতে নামিলে তিনি এই আয়ে আরও একটু আরামে থাকিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগ্নী কিছুতেই নামিতে চায় না। প্রিয়বাবু যত পাত্র আনিয়া জুটাইতেছেন, একটা-না-একটা অজুহাতে সে তাহাদের নাকচ করিয়া দিতেছে। মেয়েটা প্রেমেও পড়ে না! ওই গানের মাস্টারটা হচ্ছে কুকুরের মত রোজ যাওয়া-আসা করিতেছে, একবার 'তু' করিয়া ডাকিলেই পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। যে আশায় প্রিয়বাবু মাসে মাসে নগদ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিতে রাজি হইয়াছিলেন, সে আশায় বহুকাল পূর্বেই ছাই পড়িয়াছে। এখন টাকাটা অনর্থক খরচ হইতেছে বুঝিয়াও প্রিয়বাবু তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলাকে তিনি ভয় করেন।

দেখা যাক, ঐ ছোকরা যদি কিছু ক'রে উঠতে পারে—এই মনোভাব

লইয়া তিনি লক্ষ্মণবাবুকে আনিয়া একদিন বেলার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

বেলার মনোজগতে কোন বিপ্লব হয় নাই।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেলা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে লইয়া মুশকিলে পড়িতে হইবে। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই অতিশয় ভাবপ্রবণ, কাছে আসিয়া আলাপ করিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। এই বিপদ হইতে কি কৌশলে ভদ্রভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বেলার মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কোষ্ঠীখানাকে কাজে লাগানো যাক। বেলা লক্ষ্মণবাবুকে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস, বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষ্মণবাবু যদি সত্যই অগ্রসর হইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের কোষ্ঠী দুইটা সর্বাগ্রে মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। নিজের কোষ্ঠীর সম্বন্ধে বেলা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোষ্ঠীখানি এমন যে, কোন জ্যোতিষীই সজ্ঞানে সেটিকে ভাল বলিতে পারিবেন না। বেলার বাবা যখন বাঁচিয়া ছিলেন এবং বেলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এই কোষ্ঠীই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বেলার বাবা ঠিক করিয়াছিলেন যে, এবার কেহ কোষ্ঠী চাহিলে একটা মিথ্যা কোষ্ঠী দিতে হইবে। সে প্রয়োজন অবশ্য আর হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান, এবং বেলা নিজেই নিজের বিবাহের কর্ত্রী হইয়া পড়েন। মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বেলার দাদা প্রিয়বাবু লোকচক্ষে যদিও বেলার অভিভাবক, কিন্তু বেলার ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারে বেলার মতই গ্রাহ্য, এবং সে মত এতই সুস্পষ্ট যে, প্রিয়বাবু ভগ্নীর বিবাহের আশা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে, বেলার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা থাকিলে এতদিন কোন্

কালে বিবাহ হইয়া যাইত। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই বিগলিত হইয়া পড়িতে হইবে—এ মনোভাব বেলার তো নাইই, বরং উল্টা। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তিনি যেন আরও কঠিন হইয়া পড়েন। প্রিয়বাবু ভগ্নীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্মণবাবুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বেলা দেবী নিজের সাংঘাতিক কোষ্ঠীখানি কাজে লাগাইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে লক্ষ্মণবাবু তাঁহার কোষ্ঠীখানি লইয়া গিয়াছেন। আজ অকস্মাৎ এই পত্রখানি আসিয়াছে—

বেলা,

এ কয়দিন আমি ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছি। কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাই নাই। অবশেষে তোমার কাছেই আসিয়াছি, তুমিই ইহার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তুমি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু বিধাতার এমনই নির্বন্ধ যে, কুষ্ঠি দুইটির কিছুতেই মিল হইতেছে না। আমি দুইজন জ্যোতিষীকে দেখাইয়াছি। দুইজনেই এ বিষয়ে একমত। একজন জ্যোতিষী কিন্তু বলিলেন যে, মনের মিলই শ্রেষ্ঠ মিল। আমার মন তাঁহার কথায় সায় দিয়াছে। জানি না, তোমার মনের কথা কি! তোমাকে বিবাহ করিলে সত্যই যদি কোন বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে ভয় নাই। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি এবং আজীবন থাকিব। যদি অনুমতি দাও, আবার তোমার নিকট যাইব। আমার মনের ভিতর যে কি হইতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দোকানের ঠিকানায় উত্তর দিও। ইতি—

লক্ষ্মণ

বেলা কিছুক্ষণ পত্রখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তর লিখিতে শুরু করিলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর—

লক্ষ্মণবাবু,

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। একদিন সময় করিয়া নিশ্চয় আসিবেন। আসিবেন না কেন? কুষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় হয়। দেখি, দাদা কি বলেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রীবেলা মল্লিক

পত্রখানা খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া বেলা দেবী টেবিলের উপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্য-বেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

১৬

কলিকাতার বাহিরে একটি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসিয়া মৃন্ময় তাহার ডায়েরি লিখিতেছিল। সি. আই. ডি.-তে কিছুকাল কাজ করিয়া এবং তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়া (কিছুটা শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরের ফলেও) মৃন্ময় সম্প্রতি আই. বি.-তে ঢুকিয়াছে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছোকরার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরওয়ালার নির্দেশমত সে ছেলেটির গতিবিধির ইতিহাস, নাম-ধাম, এমন কি একটি ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে। এমন তো সে কিছুই এ ছোকরার মধ্যে দেখিতে পাইল না যাহা ভীতিকর, বরং ছোকরাকে দেখিলে অতিশয় নিরীহ বলিয়াই মনে হয়। ইহার উপর কর্তাদের এত নজর কেন? যে জন্যই হউক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা অথবা অবসর মৃন্ময়ের নাই। সে মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছে, ওইখানেই তাহার কর্তব্যের শেষ হইয়াছে। কর্তব্যের

জের টানিয়া আনিয়া ব্যক্তিগত নিভৃত জীবনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা, মৃন্ময়ের স্বভাব নয়। সুতরাং ডায়েরি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সে তাহার চাকুরিজীবনের উপর তখনকার মত যবনিকা টানিয়া দিল এবং আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া চক্ষু বুজিল।

একটু পরেই তাহার মনে স্বর্ণলতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সোনার মত গায়ের রঙ, লতার মত তন্বী—সত্যই সে স্বর্ণলতা ছিল। সহসা কোথায় চলিয়া গেল? এমন করিয়া চলিয়া যাইবার হেতুই বা কি, মৃন্ময় আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

স্বর্ণলতা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর তাহার সহিত মৃন্ময়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সামান্য একটি অস্থায়ী চাকুরি পাইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মৃন্ময়ের সামান্য আয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। স্বর্ণলতার মনে নানারূপ শখ। মৃন্ময়ের স্বল্প আয়ে সেসব শখ মিটিত না। একদিন স্বর্ণলতা মৃন্ময়কে বলিল যে, দুইজনে মিলিয়া উপার্জন করিলে কেমন হয়—সে-ও চাকুরি করিবে। একটি কাগজে নাকি সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে যে, একটি বালিকাকে পড়াইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন-পাস একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা বাড়িতে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইবে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি অতদূরে গিয়ে রোজ পড়িয়ে আসতে পারবে?

কেন পারব না? নিশ্চয় পারব।

ইহার দুই দিন পরে মৃন্ময় একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে,

স্বর্ণলতা নাই। পাড়ায় খোঁজ করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যে ঠিকানা হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে গিয়া খোঁজ করিল, সেখানেও স্বর্ণলতা যায় নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বর্ণলতা নামে কোন শিক্ষয়িত্রী আসেন নাই। দুই দিন পরে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িতে কেহ নাই। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে—'টু লেট' ঝুলিতেছে। স্বর্ণলতার বাপের বাড়িতে খবর দিতে তাঁহারা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্বর্ণ সেখানেও যায় নাই তো! কোথায় গেল সে? পুলিসে খবর দেওয়া হইল, হাসপাতালগুলিতে সন্ধান লওয়া হইল—কোন খবরই পাওয়া গেল না। এমন ভাবে চলিয়া যাইবার অর্থ কি? অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল—চাকুরি-বিহীন উদ্‌ভ্রান্ত মৃন্ময় সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে স্বর্ণলতার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আজও ফিরিতেছে।

আরাম-কেদারায় শুইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রশ্ন বহুবার সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই প্রশ্নটি আবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা কি তাহার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? নিশ্চয় বাসিত। তবে সে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তাহাতে কোন কলুষ নাই। তবে চলিয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর মৃন্ময় আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মৃন্ময় স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কি? মাত্র এক বৎসর তো বিবাহ হইয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল, সে হয়তো স্বর্ণলতাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মুখখানি আঁকা রহিয়াছে, তাহাতে অদ্ভুত মৃদুহাসি! ওই সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিটুকুর কোন সদর্থই তো

মৃন্ময় আজ পর্যন্ত করিতে পারিল না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি? অনুরাগের হাসি? অর্থহীন হাসি? মৃন্ময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মৃন্ময় নিঃসংশয়ে জানে যে, সে নিজে স্বর্ণলতাকে আজও ভালবাসে এবং একদিন না একদিন সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

ক্লিক!

শব্দটা শুনিয়া মৃন্ময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল। শ্যামবর্ণ নাতি-স্থূল সুদর্শন একটি ভদ্রলোক আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃন্ময়কে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া একটি ছোট ক্যামেরা তিনি পকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। মৃন্ময় ব্যাপারটা ভাল বুঝিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কতদূর যাবেন আপনি?

কলকাতা।

ও।

মোটরের দালাল অচিনবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই একটি কুলী-সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কুলীর মাথা হইতে একটি সুটকেস ও হোল্ড্-অল নামাইয়া লইতে লইতে পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটু অসুবিধে করলাম আপনার, মাপ করবেন। বেশ একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, না?

না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি এলেন কোথা থেকে? এখন তো কোন ট্রেন নেই।

আমি মোটরে এলাম। আমিও কলকাতা যাব।

তাই নাকি? তা হ'লে তো ভালই হ'ল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অচিনবাবুর ড্রাইভার আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

অচিনবাবু তাহাকে বলিলেন, তুমি ফিরে যাও, রাজাসাহেবকে ব'লে

দিও, আমার কাজ হয়ে গেছে। কলকাতায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।

সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

অচিনবাবু ওয়েটিং-রুমের দ্বিতীয় ঈজি-চেয়ারটি দখল করিলেন। চক্ষু হইতে চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া চশমার কাচ দুইটি পরিপাটীরূপে পরিষ্কার করিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন। তাহার পর হোল্ড্-অলের ভিতর হইতে একটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে তাহা পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।

মৃন্ময় নির্বাক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কে? কাহার ফোটো তুলিল? মৃন্ময়ের? কেন?—এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মৃন্ময়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। অচিনবাবু কিন্তু আর মৃন্ময়ের প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তিনি প্রকাণ্ড খবরের কাগজখানা মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃন্ময় তাঁহার মুখটাও আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মৃন্ময়ের কৌতূহল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, দুই-একটি কুলী ছাড়া প্ল্যাটফর্মে আর কেহ নাই। তখন ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাহিরে গিয়া পিছন দিক হইতে ওয়েটিং-রুমের বাহির দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিল, অচিনবাবুর মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মুখে হাসি নাই, চক্ষু দুইটি হইতে কিন্তু হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের কাছেও ছোট একটি ক্যামেরা ছিল। তাহার ডিটেকটিভ মন এ সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে ক্যামেরাটি বাহির করিয়া অচিনবাবুর একখানা ফোটো সে তুলিয়া লইল।

অচিনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

১৭

শৈল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

শঙ্করকে আজ সে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু কই, শঙ্কর এখনও পর্যন্ত আসিল না তো? ভুলিয়া গেল নাকি? না, শৈলর নিমন্ত্রণ শঙ্কর ভুলিয়া যাইবে—এ কথা শৈলর মন মানিতে প্রস্তুত নয়। যদি সে না আসিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কোন কারণ ঘটিয়াছে। শৈল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—পৌনে আটটা বাজিয়াছে। রাত তো বেশি হয় নাই, অথচ শৈলর মনে হইতেছে, সে যেন যুগযুগান্ত বসিয়া রহিয়াছে। শঙ্করদার এত দেরি করিবারই বা কারণ কি? আজ একটু বকিয়া দিতে হইবে, এত আড্ডা দেওয়া ভাল নয়। চিরকাল শঙ্করদার এই স্বভাব, একপাল ছেলে জুটাইয়া দঙ্গল পাকানো।···আজ উনি বাড়ি নাই, কোথায় দুই দণ্ড বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে, তা নয়, কোথায় আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে! রাত-দুপুরে হয়তো হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবে। আক্কেলকে বলিহারি যাই—খাওয়ার নিমন্ত্রণ শুধু যেন খাওয়ার জন্যই!···সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ শৈল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিল। শঙ্কর আসিল না, আসিল বাড়ির ঝি-টা।

সে বলিল, বেয়ারা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে, আম-সন্দেশ পাওয়া গেল না, এ তল্লাটের সব দোকান সে খুঁজিয়াছে।

শৈল আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, তাকে বল, যেখান থেকে পারে খুঁজে নিয়ে আসুক। এ তল্লাটে না পাওয়া যায়, অন্য তল্লাটে গেলেই হ'ত; তল্লাটের তো অভাব নেই কলকাতা শহরে! গাড়িটা নিয়েই যেতে বল না হয়। শঙ্করদা আম-সন্দেশ খেতে ভালবাসে।

ঝি চলিয়া গেল, শৈল আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শঙ্করদা কি

এখনও কবিতা লেখে ? স্কুলে যখন পড়িত, তখন ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দিনরাত কবিতা লিখিত। ইহার জন্য জ্যেঠামশাইয়ের কাছে বকুনিও কি কম খাইয়াছে! শৈলকে ডাকিয়া কত কবিতাই যে শুনাইত লুকাইয়া লুকাইয়া! এই তো সেদিনের কথা—দেখিতে দেখিতে কয়েকটা বছর চলিয়া গিয়াছে মনেই হয় না। অত শক্ত শক্ত কথাওয়ালা কবিতা শৈল বুঝিতেই পারিত না, কথার মানে বুঝিত না বটে, কিন্তু আসল অর্থটা তাহার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। সে কথা স্বীকার করিতেও এখন লজ্জা করে। ছি ছি, যত সব ছেলেমানুষি! কিন্তু—

শঙ্কর আসিয়া পড়িল।

কি রে শৈল, ব্যাপার কি, হঠাৎ নেমন্তন্ন ?

কেন, নেমন্তন্ন করতে নেই নাকি ? ভুলেও তো খোঁজ নাও না একবার, বাধ্য হয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'ল।

শঙ্কর খাটের উপর বসিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তা বেশ করেছিস।

বেশ করেছি মানে ?

আচ্ছা, বেশ করিস নি। শঙ্কর হাসি ঢাকিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

রাগিও না আমায় বলছি শঙ্করদা, নিজে আসবে না একবারও ভুলে, নেমন্তন্ন করেছি ব'লে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!

আলুর চপ করেছিস ?

ভারি ব'য়ে গেছে আমার, সমস্ত সন্ধ্যেটা বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে এখন এসে রাত নটার সময় আলুর চপের ফরমাশ হচ্ছে!

সত্যি করিস নি ?

করেছি গো, করেছি। আচ্ছা পেটুক লোক বাপু তুমি, এসে থেকে আর কোন কথা নেই, কেবল খাওয়ার কথা!

বোস সায়েব কোথা? ক্লাবে বুঝি?

না, তিনি এখানে নেই, দিল্লী গেছেন।

দিল্লী? হঠাৎ দিল্লী কেন? লাড্ডুর চেষ্টায়?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লাড্ডুর চেষ্টাতেই বটে, কে এক সায়েব আছে নাকি সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই সায়েব যদি ইচ্ছে করে, ওঁকে নাকি আরও একটা ভাল পোস্ট্ দিতে পারে।

শঙ্কর বলিল, ভালই তো।

ভাল, না, ছাই! চাকরির তদ্বির করতে করতেই নাকাল, বিয়ে হয়ে থেকে তো দেখছি, কেবল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি।

শঙ্কর কিছু বলিল না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। শঙ্করের মুখে সিগারেট দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শৈল বলিল, এ কি শঙ্করদা, তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?

ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যমুখে শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর লাগে। খাবি? খেয়ে দেখ্ না একটা; বেশ লাগবে।

আস্পর্ধা তোমার তো কম নয়!

শঙ্কর হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া শৈল বলিল, সিগারেট খাওয়া ভারি খারাপ শুনেছি, ওতে নাকি বুক খারাপ হয়ে যায়?

আমার বুক কি অত অপলকা ভেবেছিস যে, সিগারেটের ধোঁয়ায় খারাপ হয়ে যাবে? ছেলেবেলায় কত এক্সারসাইজ করতাম, মনে নেই, তোদের বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঠটায়?

বাহাদুরি আর করতে হবে না, কখন যে কার কি হয় বলা যায় কিছু? মেজদার কথা মনে নেই? কত গায়ে জোর ছিল তার, দুদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল।

উৎপলের ভাই পঙ্কজের কথা শঙ্করের মনে পড়িল। মৃত পঙ্কজের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উভয়ের মনে ছায়াপাত করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, আচ্ছা, দাদার কোন চিঠি-পত্তর পাও তুমি শঙ্করদা? আমাকে সেই যা গিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিল, আর লেখে নি।

উৎপলের চিঠি শঙ্করও অনেকদিন পায় নাই।

বলিল, কই, আমাকেও তো লেখে না বড় একটা।

শৈল মুচকি হাসিয়া বলিল, বউদিকে খুব লিখছে নিশ্চয়।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই ভয়েই তো বিয়ে করব না। তোরা সব রাক্ষসী—

তবু তো রাক্ষসীদের মায়া এড়াতে পার না।

মানে?

আজকাল আর আস না কেন, বল তো?

পড়াশোনা নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়।

পড়াশোনা নিয়ে? তাহা মিছে কথাটা আর ব'লো না তুমি। এত মিছে কথাও বলতে পার!

মিছে কথা মানে?

আমি সব জানি গো, সব জানি। তোমার সোনাদিদির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে।

তুই আবার পার্টিতে যাস নাকি? লায়েক হয়ে উঠেছিস তা হ'লে বল্‌।

শৈল হাসিল। বলিল, সত্যি, ভাল্ লাগে না আমার ওসব পার্টি-ফার্টিতে যেতে। কেবল ওঁর জেদে প'ড়ে যেতে হয়।

কোথায় চায়ের পার্টি ছিল, কিসের জন্যে পার্টি?

উনিই পার্টি দিয়েছিলেন একটা ওঁদের ক্লাবে। সোনাদিদির স্বামীও তো রেলেতে চাকরি করেন দিল্লীতে, সেইজন্যে সোনাদিকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন উনি।

সোনাদিদির সঙ্গে আলাপ ছিল নাকি তোর?

ছিল বইকি, দাদার সঙ্গে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আমিও যে গেছি দু-এক বার। মিষ্টিদিদি রিনি সবাইকে চিনি আমি।

শৈল শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলিল, রিনি মেয়েটি বেশ, নয় শঙ্করদা?

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

গম্ভীরভাবেই বলিল, ও রকম মেয়ে আমি আর দেখি নি।

শৈল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, যাই, আমি একবার দেখি কতদূর কি হ'ল, তুমি একটু ব'স।

অনাবশ্যক দ্রুতবেগে শৈল বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শৈলর কথা নয়, রিনির কথা। আজ তাহার সহিত ক্লাউড্‌স কবিতাটা পড়িবার কথা ছিল। শৈলর নিমন্ত্রণের ধাক্কায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাজে নিমন্ত্রণ ও লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের কত পরম লগ্ন যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা তো কেহ বোঝে না। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে লোকে অভিমান করে। বিশেষত শৈলর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তো অসম্ভব। অথচ আজ সুন্দর সন্ধ্যাটা কতকগুলা দুষ্পাচ্য আহার গলাধঃকরণে কাটিয়া যাইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয়। রিনি বেচারী আমার অপেক্ষায় হয়তো বসিয়া থাকিবে। তাহাকে খবর দিয়া আসিবার সময়ও ছিল না।

শৈল ফিরিয়া আসিল।

ক্ষিদে পেয়েছে শঙ্করদা? রান্না তৈরি।

মোটেই না।

তা হ'লে এস, একটু গল্প করা যাক। জান শঙ্করদা, মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা ওরা কেটে ফেলেছে।

শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল।

কোন্ ফলসাগাছটা ?

মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা, এর মধ্যে ভুলে গেলে সব ? কি ভাবছ তুমি ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, কিছু না। বুঝেছি, কেটে ফেলেছে গাছটা! ভারি অন্যায় তো ; কে কাটলে, চণ্ডী বুঝি ? তা না হ'লে অমন বুদ্ধি আর কার হবে ?

শঙ্কর আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা শৈল বলিল, আমি কেমন সোয়েটার বুনতে শিখেছি, দেখবে শঙ্করদা ?

কই, দেখি।

শৈল একটি অর্ধসমাপ্ত সোয়েটার বাহির করিয়া পরম আগ্রহে শঙ্করকে দেখাইতে লাগিল।

এই নীল রঙটার সঙ্গে কি রঙ মানাবে, বল তো ?

কোনও লাইট রঙ। কমলা কিংবা সাদা—সাদাই দে না, বেশ হবে দেখতে।

শঙ্কর আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া গেল। শৈল একা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নূতন কৃতিত্ব সোয়েটার বোনা, টিলের দোরমা কিছুই যেন শঙ্করদাকে তেমন মুগ্ধ করিতে পারিল না। …অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈল সহসা উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীকে অকারণে পত্র লিখিতে বসিল। কালই লিখিয়াছে, আজ আর লিখিবার দরকার ছিল না। বার বার একটা কথাই নানাভাবে

লিখিল, আমার একা একা একটুও ভাল লাগিতেছে না, তুমি শীঘ্র চলিয়া এস। দেরি করিও না—একা ভারি ভয় করে আমার।

১৮

শঙ্কর হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষায় একটি মোটা খাম মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে, কপাট খুলিতেই চোখে পড়িল। কলেজ হইতে শঙ্কর হস্টেলে ফিরিতে পারে নাই, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়াছিল। বয়সের এবং বিদ্যার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রফেসার গুপ্তের সহিত শঙ্করের হৃদ্যতা জন্মিতেছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে কোথায় একটা মিল ছিল, হয়তো তাহা সাহিত্য-প্রীতি, হয়তো সৌন্দর্যলিপ্সা—ঠিক বলা শক্ত। উভয়ের মন কিন্তু বয়স এবং বিদ্যার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। রিনির অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক গুপ্তের সাহায্য লওয়া শঙ্করের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায়ই কলেজ হইতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসায় গিয়া হাজির হয়। আজও সে সেখানে গিয়াছিল এবং সেইখানেই তাহার সহসা মনে পড়িয়া যায় যে, শৈলর ওখানে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

শঙ্কর খামখানা তুলিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি। সুরমা ছোট চিঠি লেখে না—দীর্ঘ পত্র। শঙ্কর কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিয়া বিছানায় বসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে এ পত্রের অমর্যাদা করা হইবে।

সুরমা লিখিতেছে—

শঙ্করবাবু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত আবহাওয়া মনের মধ্যে ছিল না ব'লে উত্তর দিতে দেরি হ'ল। এখনও যে আবহাওয়াটা খুব মনোরম হয়ে উঠেছে তা

নয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের উৎপাতটা কমেছে মাত্র। মনের যে সাম্য থাকলে সুন্দর চিঠি লেখা যায়, তা এখন আমার নেই। তবু আপনাকে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, চিঠির উত্তর না পেলে আপনি হয়তো অকারণে অনেক কিছু ভেবে বসবেন। অকারণে একটা কিছু ভেবে বসা আপনাদের স্বভাব, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওইটেই আপনাদের বিশেষত্ব। আপনারা ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু ক'রে বসেন—অগ্র পশ্চাৎ না ভেবেই। আপনাকে চিঠি লেখার দ্বিতীয় কারণ, চিঠি লেখার অজুহাতে আপনাকে সামনে বসিয়ে (অবশ্য কল্পনায়) কলমের মুখে খানিকটা বকবক করব, মনের ভার তাতে হয়তো অনেকটা কমবে। এত লোক থাকতে এবং এত স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও আপনাকেই হঠাৎ কেন এসব কথা বলতে যাচ্ছি, তা ঠিক বুঝতে পারছি না; হয়তো আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে, কিংবা হয়তো আর কিছু— ঠিক জানি না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যা অঘটন মনে হয়, যার আকস্মিকতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা ফরম্যুলার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ তা অবশ্য-স্বীকার্য, হেতুটা পরে আবিষ্কার করতে হয়।

যাক, যে কথাটা অতি প্রবলভাবে এখন মনে জাগছে এবং যার তাড়ায় আজ কাগজ কলম নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে এই আবোল-তাবোল প্রলাপগুলো লিপিবদ্ধ করছি, সেইটেই ব'লে ফেলা যাক। সেটা হচ্ছে এই, কথাটা অতি পুরাতন—আমরা নারীরা বড় অসহায়। বিধাতা কিন্তু অসহায় ক'রে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান নি, তিনি এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দিয়েছেন, যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবীর বড় বড় বীরপুরুষরাও কাবু হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সভ্যশ্রেণীর নারীদের মুশকিল হয়েছে এই যে, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মানুষ-মনিবদের মুখ চেয়ে আছি।

তাঁদের হুকুম এবং সমর্থন না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁরা ব'লে দেবেন, কোন্‌খানে কখন এবং কতক্ষণ আমরা রণ-কৌশল দেখাতে পাব। কেউ কেউ হয়তো আজীবন সে অনুমতি পায় না। শুধু পায় না তাই নয়, বেচারীকে সমস্ত বাণ তূণে পুরে রেখে আজীবন অহিংসার গুণ গাইতে হয়। আর যেসব সৌভাগ্যশালিনী কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে ত্যাগ করবার অনুমতি পেলেন, তাঁরাও যে সব সময়ে চরিতার্থ হয়ে গেলেন তা মনে করবেন না। প্রায়ই দেখা যায়, যে লোকটিকে সম্মোহিত করবার সামাজিক সমর্থন পাওয়া গেল, তিনি এ সম্মানের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ হয় তিনি ইতিপূর্বেই আর কারোর দ্বারা জখম হয়েছেন, নয় তিনি এতই নিরীহ অথবা এতই হীন যে, অস্ত্রশস্ত্রের কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর জন্যে। এদের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয় নিরর্থক, না হয় অপমানিত। বিধাতা যাকে বিজয়িনী হবার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মানুষ-বিধাতার পাকে-চক্রে তার সমস্ত কলা-কৌশল এমন একটা পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল যে, তার জন্যে সে সর্বদাই শঙ্কিত। সত্যিই আমাদের বড় মুশকিল। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের আয়ুধ সম্বরণ ক'রে রাখতে পারি না, কখন যে তা কাকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত ক'রে বসে, তা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না। আহত ব্যক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কখনও করেন না। যখন করেন, তখন দেখা যায়, সামাজিক বিধি-নিয়ম অনুসারে লজ্জা পাবারই কারণ ঘটেছে, অহঙ্কৃত হবার নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিধাতা যে বশীকরণবিদ্যা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেটাকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কা-অস্বস্তির সীমা নেই। বস্তুত এই বশীকরণশক্তি যার মধ্যে যত প্রকট, সমাজে সে তত নিন্দিত, বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে। অথচ ভেবে দেখুন, সে বেচারীর দোষ কি? তার মাধুর্য সে অবলুপ্ত করবে

কি ক'রে? ফুল রূপ-রস-গন্ধের ঐশ্বর্যে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই তো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু তার সুষমার জন্য তাকেই লজ্জিত করে যে অদ্ভুত বিধানের জবরদস্তি, আমরা তারই চাপে আজ ম্রিয়মাণ। কি করব বলুন, যে সমাজে বাস করি, সে সমাজের নিয়ম মেনে না চললেও শান্তি নেই, মেনে চলতেই হয় এবং নিয়মানুবর্তিতার দিকে সভ্য মহিলাদের একটু বেশি রকম প্রবণতাও আছে। এই প্রবণতার কথা চিন্তা করলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মেয়েদের নিয়মনিষ্ঠা সমাজকে অর্থাৎ পুরুষকে খুশি করবার জন্যে ছাড়া আর কি? হায় রে, যার বিজয়িনী হওয়ার কথা, সেই হয়েছে আজ চাটুকার। আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—সে যে চাটুকার, তা বোঝে না, জানে না, বুঝিয়ে দিলে রাগ করে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা জানেন? মেয়েরাই। সম্ভবত হিংসার তাড়নায় একজন আর একজনের শত্রুতা করে। পুরুষেরা মেয়েদের এই হিংসা-প্রবৃত্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মোহিনী অস্ত্রগুলোকে মেয়েরা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, সে তার ব্যবস্থা করেছে; এবং সে ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, তা দেখবার ভার পড়েছে মেয়েদের ওপর। মা, দিদি, পিসী, জেঠীর দলই পাহারার কাজে সবচেয়ে দক্ষ।

আজ অকস্মাৎ আপনাকে এত কথা লেখবার কি কারণ ঘটল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ সবিস্ময়ে সে কথা ভাবছেন। কারণ একটা আছে বইকি। কিছুদিন পরে আপনিও হয়তো তা জানতে পারবেন। আমি বলতে পারলাম না। সেসব কথা বলতে আমার আত্মসম্মানে বাধে, যে কোন মেয়েরই বাধে, সেজন্যে সেগুলো আমার কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সুতরাং ও প্রসঙ্গের ওপর আপাতত যবনিকাপাত করা যাক।

আপনার খবর কি, বলুন। মিষ্টিদিদির কাছ থেকে একখানা চিঠি

পেয়েছি। তিনি তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শুনলাম, রিনির পড়াশুনার তদারক ক'রে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে উঠেছেন। নিজেরও তদারক করবেন একটু। কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন নাকি? ওদেশের সব কাগজ এদেশে এসে পৌঁছোয় না। কোনও কাগজে যদি আপনার লেখা বেরোয়, সেটা আমার পাওয়া চাই কিন্তু। বোম্বেতে চাকচিক্যশালী ব্যক্তি আছেন অনেক, কিন্তু তাঁদের চাকচিক্য প্রায়ই লক্ষ্মীর প্রসাদে। ভারতীর বীণার খবর বড় একটা মেলে না। মনের দিক থেকে একরকম নিঃসঙ্গ কারাবাস চলছে। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা যদি ভঙ্গ করেন, কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বন্ধুর কোন চিঠি পেয়েছেন কি? অনেকক্ষণ বকবক ক'রে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি হয়তো নষ্ট করলাম, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বকবক শুরু করেছিলাম, তা সফল হ'ল না দেখছি। মনের মেঘ একটুও কাটল না। সময় ক'রে উত্তর দেবেন তো? সময় যদি কম থাকে, ছোট উত্তর হ'লেও চলবে, কিন্তু একেবারে যেন নিরুত্তর হবেন না। ইতি—সুরমা

পত্র পাঠ শেষ করিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে ধীরে ধীরে সুরমার মুখখানি সজীব হইয়া দেখা দিল, হাওড়া স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সুরমা বলিতেছে, চিঠি লিখবেন, ভুলবেন না কিন্তু। দুয়ারে টোকা পড়িতেই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল, কপাট খুলিয়া দেখিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ একটি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহারই টেলিগ্রাম, শঙ্কর খুলিয়া পড়িল, মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিয়াছেন।

১৯

গঙ্গার তীরে নির্জন বালুচরে একটি ছোট খড়ের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে ইটের উনানে একটি ছোট মালসা চাপাইয়া ভন্টুর মেজকাকা

ভাত রাঁধিতেছিলেন। ঘুঁটেগুলা সম্ভবত ভিজা ছিল, উনুন ভাল ধরিতেছিল না। সুতরাং যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েকটি সবল ফুৎকার চুল্লিমধ্যে প্রেরণ করিলেন। আশানুরূপ ফল ফলিল না। শিখার পরিবর্তে ধূমই প্রবলতর বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আরক্ত সজল চক্ষু দুইটি মার্জনা করিতে করিতে মুক্তানন্দ অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত বাহির না হইয়া উপায় ছিল না, সমস্ত ঘরটি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঈষৎ-স্থূল ভক্ত-গোছের একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে আসিতেই তিনি সবিনয়ে বলিলেন, স্বামীজী, কেন এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছেন? আমাদের বাসায় ভাল বামুন দিয়ে আপনার রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি আমি। এখানে এই তেপান্তরের মাঠে থাকবার দরকার কি আপনার?

অজ্ঞ বালকের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন করিয়া হাসেন, ভন্টুর মেজকাকা সেই জাতীয় একটি হাসি হাসিলেন। ঈষৎ-স্থূল ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আপনার কিছু হবে না তা জানি, কষ্ট আমাদেরই হয়। তা ছাড়া—। কথা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। ভন্টুর মেজকাকা হাত তুলিয়া এবং মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব। ওসব অনুরোধ করবেন না। সন্ন্যাসীব্রত যখন গ্রহণ করেছি, তখন তার নিয়ম পালন করতে হবে, যতই দুরূহ হোক সে নিয়ম। তা ছাড়া, আপনারা যতটা দুরূহ ব'লে মনে করেন, তত দুরূহ এ নয়, এতে আনন্দও আছে যথেষ্ট।

একশো বার।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী দেখিলে সর্বেশ্বরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা

তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ক্ষণপরে তিনি পুনরায় কথা কহিলেন, এতে আপনার অগৌরব কিছু নেই, আমাদেরই অগৌরব।

একটু কৃপা-নরম কণ্ঠে মুক্তানন্দ বলিলেন, আপনি তো বড় নাছোড়-বান্দা লোক দেখছি। বেশ, কি করতে হবে, বলুন? ভদ্রলোক যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, আপনি সজ্জন ভদ্রলোক, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি, তবে নিয়ম ভাঙতে পারব না।

আমাদের ওখানে চলুন, স্বপাকেরই সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আলোচাল ঘি তরিতরকারি সমস্তই আনিয়ে রেখেছি। এখান থেকে কি বাজার কম দূর, কত কষ্ট হচ্ছে আপনার!

আমাদের আবার কষ্ট!

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভন্টুর মেজকাকা অবশেষে বলিলেন, দেখুন, যাচ্ছি বটে আপনার কথায়, কিন্তু ঝামেলা জোটাবেন না যেন। আমি একা নির্জনে থাকতে ভালবাসি, সেইজন্যেই এই নিরালা জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম।

না না, কোন গোলমাল হবে না আপনার। আমার কোয়ার্টার এখন একদম খালি, পরিবার-টরিবার সব দেশে।

বেশ, চলুন তা হ'লে।

মুক্তানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মালসাটা উনানের উপর উল্টাইয়া দিলেন ও পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। জাহাজঘাটের বড়বাবু সর্বেশ্বর চক্রবর্তী এই সাফল্যে উল্লসিত হইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

সর্বেশ্বরবাবুর সন্ন্যাসী-বাই আছে। গেরুয়াধারীর সন্ধান পাইলে তাঁহার সেবা না করিয়া তিনি ছাড়েন না। ইহা তাঁহার বাতিক-বিশেষ। অনেক লোকের অনেক রকম বাতিক থাকে—কেহ মদ খায়,

কেহ জুয়া খেলে, কেহ টিকিট সংগ্রহ করে, সর্বেশ্বরবাবু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া থাকেন। বহুপ্রকার সন্ন্যাসীর সেবা তিনি করিয়াছেন, বদরাগী, মৌনী, ঊর্ধ্ববাহু, উলঙ্গ, অঘোরপন্থী। সর্বেশ্বরবাবুর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। সর্বেশ্বরবাবুর বাছবিচার নাই, সন্ন্যাসী হইলেই হইল। সব সন্ন্যাসী সেবা লইতে রাজিও হন না। কিন্তু অনিচ্ছুক সন্ন্যাসীদের উপরই সর্বেশ্বরবাবুর বিশেষ করিয়া ঝোঁক। কথিত আছে, একবার এক ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিম্‌টা-পেটা পর্যন্ত করিয়াছিল, তথাপি সর্বেশ্বরবাবু তাঁহাকে ছাড়েন নাই, সেবা করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অথচ সর্বেশ্বরবাবু কখনও কোনও সন্ন্যাসীর নিকট কোন জিনিস প্রার্থনা করেন না, কাহাকেও হাতটা পর্যন্ত দেখান নাই। সন্ন্যাসীর খবর পাইলেই অনিবার্য টানে সর্বেশ্বরবাবু সেখানে যান, সাধ্যমত তাঁহার সেবা করেন, সুবিধা হইলে বাড়িতেও টানিয়া আনেন। ভন্টুর মেজকাকা দিন তিনেক পূর্বে ওই খড়ের ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, খবর পাইবামাত্র সর্বেশ্বরবাবু আসিয়া হাজির হইয়াছেন। নিকটেই যে জাহাজঘাট আছে, সেই ঘাটেরই তিনি বড়বাবু। যেখানে ভন্টুর মেজকাকা ছিলেন, সেখানে কিছুকাল পূর্বেই একটা মেলা হইয়া গিয়াছিল; এবং যে ঘরটাতে তিনি ছিলেন, সে ঘরটা মেলারই যাত্রীদের জন্য নির্মিত একটা ভাল চালা। অল্প দূরেই জাহাজঘাট, সুতরাং মুক্তানন্দের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্বেশ্বরবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুক্তানন্দ সর্বেশ্বরবাবুর পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আসল নাম উমেশচন্দ্র। ইনি ভন্টুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। বাল্যকাল হইতে উমেশের সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা দেখা গিয়াছিল। লেখাপড়ার দিকে মন তো ছিলই না, অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারেও কোন আগ্রহ প্রকাশ পাইত না। ছেলেবেলায় নদীর ধারে, মাঠে অথবা বন-বাদাড়ে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোটা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান বিলাস ছিল। আর কিছু নয়, একা একা টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। এই বেড়াইয়া বেড়ানোর নেশাতেই বোধ হয় এককালে তিনি এক যাত্রাদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যান এবং কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে কাটান। সেই সময়ে গান-বাজনাটা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার দলের জীবনও তাঁহার বেশিদিন ভাল লাগে নাই, তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং মনোযোগ দিয়া আবার লেখাপড়া শুরু করেন। সেই মনোযোগের যুগেই তিনি এনট্রান্সটা পাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আরও হয়তো অগ্রসর হইতেন, যদি না তাঁহার ছোট ভাই রমেশ অকস্মাৎ বিসূচিকায় মারা যাইত। রমেশ মারা যাওয়ায় উমেশের জীবনে সহসা যেন ছন্দপতন ঘটিয়া গেল। উমেশ অনুভব করিলেন, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন; সংসারের সাধারণ পথে স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতে পারিবেন না। অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ পথও তিনি সহজে খুঁজিয়া পাইলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ পথেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল চলিতে হইল। একটা চাকরি জুটিল, বড়দার ছোট ছেলে ভনুটুটা ক্রমশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বড়দার বড় ছেলে বিষ্ণুচরণের সাতিশয় সঙ্কীর্ণ সাংসারিকতার জন্য তাঁহাকে উমেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষত বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুচরণ যখন কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, তখন উমেশ আর তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যেই তাহাকে 'ঘুণ' 'কীট' প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণ ও উমেশ সমবয়সী ছিলেন। এইভাবেই চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পরিচয় হইলে উমেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ভগবান ইঁহাকেই তাঁহার পারের কাণ্ডারী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

উমেশ আকুল অন্তরে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। এই ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যদি সাধারণ শিষ্যলোলুপ ব্যবসায়ী গুরু হইতেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যাইত, তিনি উমেশকে যথারীতি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্ভবত সত্যসত্যই সংসার-বিরাগী বলিয়া তাহা পারিলেন না। অতিশয় সহজভাবে উমেশকে বলিলেন, আমি তো কিছুই জানি না, তোমাকে কি বলব?

ইহাতে উল্টা ফল হইল। উমেশের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল।

না, আপনাকে রাস্তা ব'লে দিতেই হবে, কিছু ভাল লাগছে না আমার।

কি ভাল লাগছে না?

সংসার।

বেশ তো, সংসার ত্যাগ কর।

সে তো এখুনি করতে পারি, তারপর কি করব?

কি করতে চাও?

ভগবানের নাম করতে চাই।

বেশ তো, তাই কর না, বাধা কিসের?

আপনি উপদেশ দিন।

ভগবানের অনেক নাম আছে, যেটা তোমার পছন্দ হয় বেছে নিয়ে তাই জপ কর কোন নির্জন স্থানে ব'সে। উপদেশ আর কি দেব?

আপনি একটা দিন আমাকে।

মন্তর? মন্তর নিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর, সংস্কৃত ভাষায় না বললে ভগবান তোমার কথা বুঝতে পারবেন না? যিনি কীটের ভাষা বোঝেন, তিনি তোমারও ভাষা বুঝবেন।

সহসা উমেশ ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

আহা, ও কি কর? পা ছাড়। কি মুশকিল! কি চাও তুমি?

মুক্তি চাই, আনন্দ চাই—

উমেশ হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেশ, মুক্তানন্দ নাম তোমার দেওয়া গেল, তুমি পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভগবানের নাম কর গিয়ে, মুক্তি আনন্দ সব পাবে।

কি কি বিধিনিয়ম পালন করতে হবে ব'লে দিন তা হ'লে।

চক্ষুজল মুছিয়া উমেশ উন্মুখ হইয়া বসিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন, কিছু একটা না বলিলে নিস্তার নাই। অপরের মুখনিঃসৃত একটা উপদেশের ভেলা না পাইলে এ লোকটি নিছক নিজের জোরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। উমেশের অসহায় মুখচ্ছবি তাঁহাকে বিচলিত করিল। একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাছ-মাংসের প্রতি কি তোমার খুব বেশি লোভ আছে?

আজ্ঞে না, মোটেই নেই।

তা হ'লে নিরামিষ আহারই কর—স্বপাক।

ঘি দুধ?

ঘি দুধ খাবে বইকি, কিন্তু গব্য। গেরুয়াও পর, সুবিধে হবে।

কোথা যাব ব'লে দিন।

ঠাকুরের হাসি পাইতেছিল। তথাপি কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, কাশী যাও, সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ কর।

আবার কবে আপনার দর্শন পাব?

আমি কোথায় কখন থাকি তার তো ঠিক নেই, আপাতত আমি ভাগলপুর যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আমাকে দিন।

একটু ইতস্তত করিয়া একটা ঠিকানা অবশেষে তিনি দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। উমেশও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে

আত্মগোপন করিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাশীবাসের পর উমেশের ভবঘুরে মন আবার উসখুস করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিয়া তিনি কেমন যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, ঠাকুরের নিকট নূতন একটা কিছু প্রেরণা লাভ করিবার আশায় তিনি ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, ঠাকুর যশোহরে গিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার ফিরিবেন। ভাগলপুরেই ফিরিবার কথা আছে। ভাগলপুরের গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুক্তানন্দ সহসা স্থির করিলেন, একবার কলিকাতাটা ঘুরিয়া আসা যাক, ভন্টুটা কেমন আছে কে জানে, অনেকদিন তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল। মুক্তানন্দের জীবনের এই অংশটুকুর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। মুক্তানন্দ দেখিলেন যে, সংসারের ব্যাপার যেরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় তাঁহাকে রীতিমত সংসারী হইতে হইবে, না হয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। চলিয়া যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন এবং চুপিচুপি একদিন সরিয়া পড়িলেন। পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুর আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না, আবার যদি জড়াইয়া পড়েন? ঠাকুরের কাছে গিয়াই বা কি হইবে? তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা তো করা হয় নাই, কাশীতে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম একমনে জপ করিতে পারিলাম কই? কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করা যে অসম্ভব! ঠাকুর অবশ্য যে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া নামজপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মুক্তানন্দ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ছিলেন। সহসা দেখিলেন, একটা মাল-বোঝাই নৌকা ছাড়িতেছে। মুক্তানন্দ দাঁড়াইয়া মাঝিকে ডাকিলেন। মাঝি আসিতে

তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে কোন গ্রামের কাছে নদীতীরে একটু নির্জন জায়গায় নামাইয়া দেয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। এখনও এদেশে গৈরিক বসনের সম্মান আছে, ইহারই জোরে প্রায় নিঃসম্বল মুক্তানন্দ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর গিয়া একটি জাহাজঘাটের নিকট বালুচরে নামাইয়া দিল। চরটি নির্জন।

কিন্তু কিছুদূরেই জাহাজঘাট ছিল এবং জাহাজঘাটে সর্বেশ্বরবাবু ছিলেন, সুতরাং মুক্তানন্দকে বেশিদিন নির্জনতা উপভোগ করিতে হইল না।

এই অবসরে ঠাকুরেরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ঠাকুর আমাদের পূর্বপরিচিত মুকুজ্জেমশাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের বন্ধনহীন চলা-ফেরা, সহজ সহৃদয় ব্যবহার, থান-কাপড়, খালি পা, একমাথা বড় চুল, একমুখ দাড়ি, শিক্ষিতজনসুলভ কথাবার্তা, পরোপকার-প্রবৃত্তি—সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা অসাধারণ যোগাযোগ, যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়। এই ভক্তের দল মুকুজ্জে-মশাইকে 'ঠাকুর' আখ্যা দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু এই ভক্তদের বড় ভয় করেন এবং যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। নানাস্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের গতি-বিধি, সুতরাং একটি ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমশ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং বহমান নদীস্রোতে খড়-কুটার মতই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই ইহাদের লইয়া নানা কৌতুক বিদ্রূপ করেন, ভর্ৎসনা করেন; কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা। মুকুজ্জেমশাইয়ের ভর্ৎসনা যত তীব্র হয়, ইহাদের ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ইহাদের সহিত অভিনয়

না করিয়া উপায় নাই। ইহারা সত্য মানুষটাকে চায় না, একটা ছদ্ম কল্পমূর্তি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং অভিনয় করিতে হয়। এই-জাতীয় কোন ভক্তের সহিত দেখা হইলে (যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে দেখা না হয়) তিনি ঠাকুরোচিত গুরু-গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে যা-হোক একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কাহাকেও বলেন—তেল মাখিও না, কাহাকেও বলেন—নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া এস, কাহাকেও কিছুদিন নির্বাক থাকিতে আদেশ করেন। তাহারাও যথাসাধ্য আদেশ পালন করে। ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন সদুপায় তিনি ভাবিয়া পান নাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের আসল কর্মক্ষেত্র নানা-দুঃখপীড়িত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, এবং সেখানেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা।

সর্বেশ্বরবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মুক্তানন্দ ভোজ্য দ্রব্যগুলি পরিদর্শন করিলেন। সর্বেশ্বরবাবু আহারের ভাল যোগাড়ই করিয়াছিলেন। আলোচাল, মুগের ডাল, আলু, পটল, দুগ্ধ, ঘি।

ওটা গাওয়া ঘি তো?

আজ্ঞে না, ভঁয়সা, তবে খুব উৎকৃষ্ট জিনিস।

হাজার উৎকৃষ্ট হোক, ভঁয়সা চলবে না।

যে আজ্ঞে।

গব্য ঘৃত পাওয়া যাবে না এখানে?

পাওয়া শক্ত, আচ্ছা, দেখছি তবু চেষ্টা ক'রে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই এক বালতি জল, একটি ঘটি এবং গামছা স্বহস্তে বহিয়া আনিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, আপনি ততক্ষণ হাত-পাটা ধুয়ে ফেলুন। আমি ঘিয়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

সর্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন এবং মুক্তানন্দ হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

২০

করালীচরণ বক্‌সি তন্ময় হইয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেট নিঃশব্দে পুড়িতেছিল। সিগারেটের ভস্মীভূত খানিকটা অংশ পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ঝাড়া হয় নাই—করালীচরণের ঝাড়িবার অবসর ছিল না। একাগ্রচিত্তে তিনি বর্জাইস অক্ষরে ছাপা উপন্যাসখানি গ্রাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল, একমাত্র চক্ষুটিও কখনও নিষ্প্রভ কখনও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেই সিগারেটের লম্বা পোড়া ছাইটা পুস্তকের উপর পড়িয়া গেল। করালীচরণ বিরক্তভাবে সিগারেটটার দিকে চাহিলেন এবং তাহাতে গোটা দুই লম্বা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ফুঁ দিয়া ছাইগুলি পুস্তকের পাতা হইতে পরিষ্কার করিতে গিয়া কিন্তু মুশকিলে পড়িয়া গেলেন, ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়া গেল।

বাই নারায়ণ!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিতে গিয়া একটা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে ঠেকিল। ভন্টু যে ঠিকুজি-কোষ্ঠীগুলা সকালে দিয়া গিয়াছে, সেইগুলাই সম্ভবত তেমনই পড়িয়া আছে, খুলিয়া পর্যন্ত দেখা হয় নাই। দেশলাইটা গেল কোথা? বসিয়া বসিয়াই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, পাওয়া গেল না। বিরক্ত করালীচরণ অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে শেষে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মোড়ের ওই পানওয়ালীটার শরণাপন্ন হইতে হইবে শেষকালে—যদি অবশ্য

তাহার দোকান এত রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। কাজল-পরা, মাথায়-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো প্রৌঢ়া পানওয়ালীটাকে দেখিলে করালীচরণের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, অথচ এই পানওয়ালীটিই ছোটখাটো আপদে বিপদে তাঁহাকে সর্বদা উদ্ধার করে। ধারে সিগারেট দেশলাই তো সে ক্রমাগত দিয়া চলিয়াছে। ভন্টুর হাতে টাকাকড়ি। আগের মত যখন তখন যেমন তেমন ভাবে খরচ করিবার উপায় নাই। ওই পানওয়ালীটির কৃপায় তবু মাঝে মাঝে ফাঁকি দিয়া খানিকটা খরচ করিয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। ধারে জিনিস দেয় এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহা শোধ করিতে হয়। করালীচরণ অন্ধকারেই পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, পানওয়ালী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি মুশকিল! সামান্য একটা দিয়াশলাইয়ের অভাবে পড়া হইবে না—সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে? নির্লোম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি গলির প্রান্তস্থিত পানওয়ালীর বন্ধ দোকানের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ভন্টুর বাইসিক্‌লের ঘণ্টা শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই ভন্টু আসিয়া সহাস্যমুখে বাইক হইতে অবতরণ করিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

আরে, আমি তো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, মিস মার্‌গারেট কার্নিস ধ'রে শূন্যে ঝুলছে।

মিস্ মার্‌গারেট!

দেশলাই আছে কি না আগে বলুন।

আছে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক্, আমার বাইকে লাইট নেই দেখে এক চাম চক্ষু তাড়া করেছিল এখুনি, পালিয়ে এসেছি আমি, এখানে আবার না এসে পড়ে ব্যাটা! চলুন, ভেতরে ঢুকে পড়া যাক।

চস্তু মানে—পুলিস? আপনি একদিন একটা কেলেঙ্কারি না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি। লাইট কিনে ফেলুন না একটা।

উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভন্টু বাইকটাকেও টানিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটি জ্বালিয়া দিল। বলিল, এ যে নিতান্ত অলিশ গুটকু দেখছি।

সত্যই মোমবাতিটি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল, বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোমবাতি জ্বলিতেই করালীচরণ পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখুন তো, ওদিকের তাকটায় আর একটা মোমবাতি আছে বোধ হয়।

আলমারির পাশেই যে ছোট তাকটি তিনি দেখাইলেন, সেটিতে কতকগুলি ধূলিধূসর পুস্তক হেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভন্টু সেগুলি সরাইয়া দেখিতে লাগিল, করালীচরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব।

ওরে বাপ রে—চাম গ্যান্ঢঅ—

ভন্টু সহসা চীৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল।

করালীচরণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, কি, হ'ল কি?

ভীষণ টিকটিকি একটা—গোদা চাম—দেখুন দেখুন।

সত্যই বেশ বড় একটা টিকটিকি দেওয়ালের উপর উঠিয়া আসিয়াছিল। করালীচরণ বলিলেন, কেন বিরক্ত করছেন ওকে? ও অনেকদিন থেকে আছে আমার কাছে। আলোর কাছে এসে পোকামাকড় ধ'রে-ট'রে খায়, থাকে ওই বইগুলোর পেছনে, ছেড়ে দিন, বিরক্ত করবেন না ওকে।

করালীচরণ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। ভন্টু মুখবিকৃতি করিয়া তাঁহাকে পিছন হইতে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বেশ খানিকক্ষণ ভ্যাংচাইয়া অবশেষে ভন্টু সহজকণ্ঠে বলিল, কই, এখানে মোমবাতি তো নেই!

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া করালীচরণ বলিলেন, মোমবাতি যোগাড় করুন তা হ'লে একটা, এটা তো গেল।

ক পাতা বাকি আছে আপনার আর?

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাটি উল্টাইয়া দেখিয়া করালীচরণ বলিলেন, বেশি নেই, আর পাতা কুড়ি আছে। তাহার পর ভন্টুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, অদ্ভুত বই, বাই নারায়ণ! শেষ করতে হবে এখুনি, যান, আপনি মোমবাতি নিয়ে আসুন। কথা বলবেন না, যান, সময় নষ্ট হচ্ছে আমার।

হ্রস্বায়মান মোমবাতিটির দিকে চকিতে চাহিয়া করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার পড়িতে শুরু করিলেন। ভন্টু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিকৃতমুখে খানিকক্ষণ করালীচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে দুইটি আঙুলের মত সরু সরু মোমবাতি বাহির করিল, একটি লাল, আর একটি সবুজ।

দেখুন তো, এতে হবে?

করালীচরণ কোন উত্তর দিলেন না, গল্পে আবার তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

ভন্টু পুনরায় বলিল, দেখুন না, এতে হবে কি না!

বিরক্ত করালীচরণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আঃ, কি গোলমাল করছেন বার বার! ও মোমবাতি পেলেন কোথা থেকে? ভয়ঙ্কর সরু যে, কোথা থেকে পেলেন বলুন তো?

আমার কাছেই ছিল, বাইকে বাতি নেই, কাগজের ঠোঙার ভেতর এইগুলো জেলেই চালাতে হচ্ছে আজকাল।

করালীচরণ ভন্টুর শেষের কথাগুলি শুনিলেন কি না সন্দেহ, কারণ আবার তিনি পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। ভন্টু স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অবশ্য পড়া বন্ধ করিয়া নূতন একটি মোমবাতি ধরাইবার প্রয়োজন হইল।

ভন্টু বলিল, আপনি এইটে জ্বালিয়ে পড়তে থাকুন, আমি আর একটা জ্বালিয়ে ততক্ষণ চট ক'রে কিছু বড় মোমবাতি কিনে আনি, ঘোর জালে ফেললেন দেখছি আজকে।

করালীচরণ কোন উত্তর না দিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভন্টু বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু যখন ফিরিল, তখন করালীচরণের উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ভন্টু দেখিল, তিনি নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভন্টু আসিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। সেই স্বল্পালোকেই ভন্টু লক্ষ্য করিল, তাঁহার চক্ষুটি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অক্ষিকোটরের মধ্যে একখণ্ড অঙ্গার যেন জ্বলিতেছে। ভন্টু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

মোমবাতি এনেছেন ?

এনেছি।

একটু থামিয়া ভন্টু বলিল, আচ্ছা, আপনি রোজ মোমবাতি জ্বালান কেন বলুন তো ? একটা লণ্ঠন কিনলে অনেক সস্তায় হয়।

সস্তা ? হ্যাঁ, তা বোধ হয় হয়।

করালীচরণ আর কিছু বলিলেন না, নির্বাণোন্মুখ কম্পিত শিখাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু মোমবাতির প্যাকেট হইতে একটি মোমবাতি তাড়াতাড়ি ধরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কেমন সুন্দর দেখুন তো!

নূতন শিখাটির পানে করালীচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, আপনি আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ভন্টুবাবু?

পড়েছি।

তাতে গোড়াতেই আছে, শাহরিয়ার নামে এক সুলতান রোজ একটা মেয়েকে বিয়ে করত, আর রোজ তাকে মেরে ফেলত। মনে আছে?

মনে আছে বইকি।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমিও তাই করতাম। সে ক্ষমতা নেই, তাই তার বদলে রোজ নতুন নতুন মোমবাতি জ্বালাই। একটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা জ্বালাই, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা। সারাজীবন ক্রমাগত মোমবাতি জ্বালিয়ে যাব একটার পর একটা, একটার পর একটা—

লণ্ঠন জ্বালালে একটু সস্তায় হয় তাই বলছিলাম।

লণ্ঠন! পুরনো কালিঝুলি-মাখা একটা লণ্ঠন সামনে জ্বালিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেব সস্তায় হবে ব'লে? বলেন কি আপনি?

করালীচরণের কথাবার্তা ভন্টুর ঠিক বোধগম্য হইতেছিল না। সে মোমবাতি-প্রসঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ মনে করিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যে কুষ্ঠি দুটো দিয়ে গিয়েছিলাম দেখেছেন? টাকা দিয়ে দিয়েছে তারা।

কই টাকা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভন্টু পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, সব নেবেন নাকি? পাস-বুকে জমা করতে হবে না?

আজ থাক্, সমস্ত দিন মদ খেতে পাই নি। আপনি কাল যেটুকু দিয়ে গেলেন, সকালেই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে তাই ও-বইটা নিয়ে বসতে হ'ল।

কি বই ওটা?

ডিটেক্‌টিভ আর পর্নোগ্রাফি কম্‌বাইণ্ড্। চমৎকার নেশা হয়, ওয়াণ্ডারফুল!

ভন্‌টু আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, দশটা টাকা আমাকে দিন, আপনার কাছে থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।

না, আজ থাক্।

করালীচরণ টাকাগুলি তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন, যেন ভন্‌টু ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর অকস্মাৎ ভন্‌টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার পাঁচ শো টাকার আর বাকি কত? কত জমল?

এরকমভাবে খরচ করলে আর জমবে কি ক'রে? সেদিনও তো আপনি পঁচিশটা টাকা নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আমাদের প্রোটোটাইপ গ্রহশান্তির জন্যে কিছু খরচ করতে চায়, কত পড়বে বলুন তো?

টাকা পঁচিশেক।

তাই ব'লে দেব তা হ'লে। হবে কিছু?

কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনি তা হ'লে আজ যান ভন্‌টুবাবু, কাল আমি কুষ্ঠি দুটো ঠিক ক'রে রাখব।

আচ্ছা।

ভন্‌টু বাহিরে আসিয়া বাইকের উপর সওয়ার হইল।

ভন্টু চলিয়া গেল। করালীচরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা আলোটা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ হনহন করিয়া হাঁটিবার পর অবশেষে তিনি যে পল্লীতে উপনীত হইলেন, তাহা বেশ্যা-পল্লী। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, স্বল্পালোকিত গলিটিতে বিশেষ কেহ ছিল না। একটা খোলার ঘরের সামনে একটিমাত্র রূপোপজীবিনী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। করালীচরণ সোজা গিয়া তাহারই সম্মুখীন হইলেন।

মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

করালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে আবার চলিতে শুরু করিলেন। দোতলার একটা ঘর হইতে গান বাজনা হাসির হর্‌রা সহসা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিল, এক চক্ষু তুলিয়া করালীচরণ একবার আলোকিত জানালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিলেন। উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে খানিকক্ষণ হাঁটিয়া করালীচরণ অবশেষে একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সহসা অনুভব করিলেন, অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

খানিকটা মাংস আর রুটি দিন তো।

কতখানি মাংস, ক পীস রুটি?

প্রচুর দিন, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

এক প্লেট মাংস আর চার পীস রুটি দিই?

দিন। মদ আছে?

আনিয়ে দিতে পারি।

হুইস্কি আনিয়ে দিন এক বোতল।

টাকা লইয়া একজন হুইস্কি আনিতে চলিয়া গেল এবং একটি বালক-ভৃত্য মাংস ও রুটি আনিয়া করালীচরণের সম্মুখে ধরিতেই করালীচরণ

গপগপ করিয়া গিলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সেই পানওয়ালীটিকে মনে পড়িল। সেই কাজল-পরা, মাথায়-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো নীলাম্বরী-কাপড়-পরা বুড়ীটা—ছুঁড়ী সাজিয়া লোক ভুলাইতে চায়! অসহ্য! ভাবিলেও গায়ে জ্বর আসে। জ্বর আসুক, কিন্তু ওই বোধ হয় একমাত্র নারী, যে করালীচরণকে একটু মমতার চক্ষে দেখে। বাকি সবাই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেহই তো তাহাকে আমল দিতে চায় না, টাকা দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করে—এমন কি বেশ্যারাও!

বাহ্ নারায়ণ!

হিংস্র বুভুক্ষু শ্বাপদের ন্যায় করালীচরণ মাংসের হাড়গুলা কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভন্টু সেদিন অত রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, দত্ত মহাশয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের মুদীর দোকান আছে এবং সেই দোকান ভন্টুদের সংসারে ধারে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়িয়াছে। ভন্টু আজ নিশ্চয়ই কিছু দিবে বলিয়াছিল, সেই আশায় দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন।

দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া ভন্টু করজোড়ে বলিল, বড় লজ্জিত হলাম দাদা, বিশ্বাস করুন, কিছুতেই যোগাড় করতে পারলাম না। আজ এক জায়গা থেকে নির্ঘাত পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব হোন্‌ডল-মোন্‌ডল হয়ে গেল।

দত্ত মহাশয় নীরবে সমস্ত শুনিলেন এবং নীরবে উঠিয়া গেলেন।

বউদিদি মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, দত্ত কি বললে?

চুপসে গেল।

ওর টাকাটা কাল যেমন ক'রে হোক দিয়ে দাও বাপু তুমি। না হয় আমার বালাটা কোথাও বাঁধা দাও।

গভীর গাড্ডা মিস্টার বিড্ডিকার, ছুটো 'ড' নয়, পাঁচ-সাতটা 'ড'। বালাটাকে দব্‌চে আর লাভ কি? চল, খেতে দেবে চল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে, আগে গিলি, তারপর অন্য কথা।

রান্না তো হয়ে গেছে, এস না।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মায়ের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহার পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে একটা ঘরে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাধ্য হইয়াই বাঁধিতে হইয়াছে, কারণ তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেছিলেন যে, বাঁধিয়া রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। শঙ্কর দেখিল, তাহার বাবার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। শুনিল, মা নাকি উন্মত্ত অবস্থায় একটা বাসন ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল, বন্দী-অবস্থাতেও মা বিড়বিড় করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন।

মা!

কোন সাড়া নাই, উন্মাদিনী অস্ফুটভাবে ক্রমাগত কি বলিতেছে!

মা, ও মা! দেখ, আমি এসেছি।

শঙ্কর হেঁট হইয়া পদধূলি লইল।

দূর-হ, দূর হ, দূর হ—যত সব পাপ আপদ বালাই—দূর হয়ে যা সব—

শঙ্করের বাবা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, শঙ্কু, চ'লে আয় তুই, ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে ডাক্তারে মানা করেছে। ওতে পাগলামি বাড়ে শুধু। বেরিয়ে আয়।

শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল। তাহার অমন মা এই হইয়া গিয়াছে!

কোন্ ডাক্তার দেখছে ?

কোন ডাক্তার বাকি নেই, এ অঞ্চলে সবাই দেখেছে, এমন কি সিভিল সার্জন পর্যন্ত।

কি বলছেন তাঁরা ?

বলবেন আর কি ? কেউ বলছেন ডব্লিউ. সি. রায়, কেউ দিচ্ছেন ব্রোমাইড, কেউ বা আর কোন ঘুমের ওষুধ। ওই টেম্পরারি কিছু ফল হয়, তারপর যে-কে সেই। কবরেজিও করেছি—কিচ্ছু হয় নি।

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বাবা বলিলেন, চল, বাইরে চল—আরও কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাহিরের ঘরে আসিয়া শঙ্করের বাবা একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আর একটি চেয়ার দেখাইয়া শঙ্করকে বলিলেন, ব'স্ তুই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ভেবে আর কি হবে বল্, সবই অদৃষ্ট।

শঙ্কর নীরবে উপবেশন করিল।

শঙ্করের পিতা অম্বিকাচরণ রিটায়ার্ড ডেপুটি, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, গম্ভীর রাশভারী লোক। দেখিলেই সম্ভ্রম হয়, মনে হয়, এ লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলিবে না। কোথাও বসিলে পা দোলানো তাঁহার স্বভাব, কিন্তু তাহাও এমন গম্ভীর চালে করিয়া থাকেন যে, ছন্দপতন হয় না, হাকিমী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেশ মানাইয়া যায়।

চেয়ারে বসিয়া তিনি গম্ভীরভাবে পা দোলাইতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে অম্বিকাবাবু একটা মোটা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরবেই ধূমপান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অম্বিকাচরণই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

বলিলেন, তোমাকে টেলিগ্রাম ক'রে আনলাম এইজন্তে যে, তুমি যদি পার, কলকাতায় একটা বাসা ঠিক কর গিয়ে। নিয়ে যাবার মত অবস্থা হ'লে কলকাতাতেই নিয়ে যাই ওকে, সেখানে নানারকম স্পেশালিস্ট্ আছেন, দেখা যাক একবার চেষ্টা ক'রে।

চুরুটে দুই-একটা টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, আক্ষেপ থাকে কেন ?

শঙ্করের বলিবার কিছু ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চুরুটের ছাইটা সন্তর্পণে ঝাড়িয়া অম্বিকাবাবু বলিলেন, আরও একটা কথা বলবার আছে তোমাকে। নানা জায়গা থেকে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আসছে, আমি তাড়াতাড়ি তোমার বিয়েটাও দিয়ে দিতে চাই। কারণ, আমার ব্লাডপ্রেসারের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তা ছাড়া বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন দেরি করার কোন মানে হয় না। আরও একটা কথা আছে, দু-একজন ডাক্তার বলেছেন যে, বউয়ের মুখ দেখে ওঁর পাগলামি খানিকটা কমবে, অন্তত সম্ভাবনা আছে।

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, এই অবস্থায় এখন বিয়ে !

ডাক্তারদের মতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্তেই বিয়ের দরকার।

অম্বিকাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারে আরও একটি টান দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, তা ছাড়া, বেশি বয়সে বিয়ে করার আমি পক্ষপাতীও নই।

শঙ্করের মনে রিনির মুখখানি ভাসিয়া উঠিল, মনে হইল, তাহার সচকিত নয়ন দুইটি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার পানে চাহিয়া আবার আনমিত হইল।

শঙ্কর বলিল, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না।

অম্বিকাবাবুর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের

কালে বাপ-মারা বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলেদের মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। আজকাল আমরা ছেলেদের সে সম্মানটা দিয়েছি; এটাও প্রত্যাশা করি যে, ছেলেরাও আমাদের সম্মান রাখবে।

শঙ্কর বলিল, এতে সম্মানের কোন প্রশ্নই উঠছে না।

উঠছে বইকি। আমি তোমাকে আদেশ না ক'রে অনুরোধ করলাম, সে অনুরোধ তুমি যদি না রাখ, তা হ'লে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বইকি।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে আমি একটু ভেবে দেখতে চাই। সময় দিন আমাকে কিছু।

আবার রিনির মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারটাতে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন।

ভেবে দেখতে চাও, দেখ। দায়িত্বের কথা নিয়ে আস্ফালন করাটা আজকাল তোমাদের একটা ফ্যাশান হয়েছে বটে, আসলে কিন্তু ওটা অন্তঃসারশূন্য ডেঁপোমি। বিয়ে করার দায়িত্ব যে কতখানি, আর সে ভার বহন করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না, এটা ভাল ক'রে ভেবে দেখবার বয়স অথবা অভিজ্ঞতা তোমার হয় নি।

যখন হবে, তখনই বিয়ে করব।

যখন হবে তখন বিয়ে করাটা নিরর্থক—It is no good marrying at fortyfive or fifty. তার আগে অভিজ্ঞতা হয় না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অম্বিকাবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আসলে আজকালকার ছেলেরা অতিশয় স্বার্থপর। তাদের মতলবটা, হালকা মেঘের মত গায়ে ফুঁ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব, যা রোজগার

করব নিজের সুখের জন্যেই সেটা খরচ করব, স্ত্রীপরিবারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না। তারা ভুলে যায় কিংবা ভুলে থাকতে চায় যে, যে সমাজ তাদের মানুষ করেছে, সেই সমাজের প্রতিও তাদের একটা কর্তব্য আছে। সামান্য কুলী-মজুরও রোজগার ক'রে তাদের স্ত্রীপরিবার পালন করছে। দুঃখ-ভোগ করছে তা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখ-ভোগ করাটাও যে একটা ট্রেনিং, একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, স্টিমুলাস ফর স্ট্রাগ্‌ল—তোমরা আজকাল সেটা এড়িয়ে চলতে চাও।

কুলী-মজুরদের মত জীবন-যাপন করাটা কি বাঞ্ছনীয়?

তা তো আমি বলছি না। আমি বলছি, দুঃখের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রাম কর, ভীরুর মত পালিয়ে যাওয়াতে কোন বাহাদুরি নেই। লড়াই কর —লড়াই ক'রে জেতো। হারলেও লজ্জা নেই। কিন্তু যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা কোন কালেই গৌরবের নয়। আজকাল তোমরা তাই করছ।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকাচরণ চোখ বুজিয়া সিগারে টান দিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখ। তুমি আমার এক-মাত্র ছেলে। আমার শরীর ভাল নয়, তোমার মায়ের অবস্থা তো দেখছই —বাড়িতে কোন দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও নেই যে, আমাদের দেখাশোনা করে। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরই তোমার মায়ের পাগলামি শুরু হয়েছে, তোমার বিয়ে হ'লে হয়তো সেরেও যেতে পারে—কিছু বলা যায় না। সমস্ত জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, টেক টাইম, দেয়ার ইজ নো হারি। আচ্ছা, যাও এখন। কয়েকখানা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।

শঙ্কর উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ির ভিতরে গিয়াই সে শুনিতে পাইল, মা চীৎকার করিতেছেন, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি সব?

শশাঙ্ক শঙ্করের ছোট ভাই, কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে।

শঙ্কর একা রাত্রে বিছানায় শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার কথাগুলি যুক্তিহীন নয়, কিন্তু রিনি? রিনিকে যে সে ভালবাসিয়াছে! যদিও মুখে সে রিনিকে কিছু বলে নাই, কিন্তু রিনি কি বোঝে না? একটুও না? অসম্ভব। তাহার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার একটু আভাসও কি রিনি পায় না? তাহার মনে সামান্যতম স্পন্দনও কি জাগে নাই? নিশ্চয়ই জাগিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর তাহা জানিবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করা তো অসম্ভব। অথচ—

…হঠাৎ দারুণ একটা চীৎকারে শঙ্করের চিন্তাস্রোত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাগলিনী চীৎকার করিতেছেন। সে চীৎকার এত করুণ, এত তীব্র, এত মর্মস্পর্শী যে, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, চতুর্দিকের অন্ধকার যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে, নানারূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। অদ্ভুত সব মূর্তি!…সহসা চীৎকারটা থামিয়া গেল; চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সহসা দালানের ঘড়িটার শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দূরে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল। শঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এ বাড়ির কেহ নহে, কোন আগন্তুক যেন হঠাৎ আসিয়া এক রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, কাল সকালেই উঠিয়া চলিয়া যাইবে। পাশ-বালিশটা জড়াইয়া ঘুমাইবার জন্য সে ভাল করিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। মুদিত নয়নের সম্মুখে রিনি আনত নয়নে সারারাত বসিয়া রহিল।

২২

দ্রুতগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বোস সাহেব বসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, কষ্ট হইবার কথা নয়, তথাপি বোস সাহেবের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তিনি দিল্লী হইতে ফিরিতেছিলেন, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন। যে সাহেবটিকে তোয়াজ করিতে তিনি গিয়াছিলেন, নানারূপ তোয়াজ সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। এমন একটিও আশাপ্রদ কথা সাহেবের মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই, যাহার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায়; অথচ তাঁহার ধারণা ছিল, ক্যামেরন সাহেব···

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বোস সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

মিস্টার এল. কে. বোস (ললিতকুমার বোস) বাঙালী-সমাজের আদর্শ পুরুষ। বরাবর ভাল করিয়া পরীক্ষা পাস করিয়াছেন, সুপারিশ এবং বিদ্যার জোরে ভাল চাকুরি যোগাড় করিয়াছেন, চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল শিখিয়াছেন, মোটা রকম পণ লইয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছেন, ইহার মধ্যে কলিকাতা শহরে খানিকটা জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন দুই-একজনের চাকরি করিয়া দিয়াছেন, করেন নাই কি? সুতরাং পরিচিত-মহলে নিদারুণ সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বোস সাহেবের নামে সকলের মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই জাগে। গোপনে গোপনে দুই-চারিজন বোস সাহেবের সাহেবিয়ানা লইয়া যে টিটকারি দেন না তাহা নয়, কিন্তু টিটকারিতে বোস সাহেবের কিছু আসে যায় না। সেজন্যও বটে এবং সাহেবিয়ানাটা তাঁহার চাকরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই বিশ্বাসের ফলেও বটে, অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহেবিয়ানা লইয়া আর মাথা ঘামায় না। বোস সাহেব একজন বড় অফিসার, এই মহিমার জ্যোতিতেই সকলের চোখ ধাঁধিয়া আছে। তাঁহার চারিত্রিক নানা দোষও তাই মহিমান্বিত

হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই বোস সাহেব উদ্যমশীল ব্যক্তি, নিত্য নব উপায়ে চাকুরির উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন, শাসন-যন্ত্রের কোন্ চাকাটিতে কখন কোন্ তৈল নিষেক করিলে সুফল ফলিবে, ইহা আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহাতে তিনি খানিকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈলকে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না, তিনি নিজেও না। শৈলকে তিনি মিসেস এল. কে. বোসের মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নয় কি? ইহার অধিক আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, জীবনে তাঁহাকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করিবার অবসরই বা কোথায়?

একটা ছোট স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চলিতে শুরু করিল। অনেক দূরে তাহাকে যাইতে হইবে, অনেক স্টেশন পার হইতে হইবে, ছোট স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার তাহারও অবসর নাই।

এক্সপ্রেস ছুটিতে লাগিল।

২৩

মিস বেলা মল্লিক তন্ময় হইয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন গানখানা—মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো। এই পুরাতন গানটাই বেলা মল্লিকের কণ্ঠে নূতন লালিত্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশের বাড়িতে মুগ্ধ লক্ষ্মণবাবু খবরের কাগজটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহা শুনিতেছিল। তাহার তন্ময় নিস্পন্দ ভাবটা বেলাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছে; সেদিন বেলা একটি পত্রযোগে

স্পষ্টভাবেই লক্ষ্মণবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোষ্ঠীর অমিল সত্ত্বেও বিবাহ দিবার মত দৃঢ় মনোভাব তাঁহার দাদার অর্থাৎ প্রিয়বাবুর নাই, তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মণবাবু যেন অনুগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাব আর না উত্থাপিত করেন, কারণ তাহা এ ক্ষেত্রে অকারণ ক্ষোভেরই সৃষ্টি করিবে। প্রিয়বাবুও বেলার জেদে পড়িয়া এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণবাবুকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কুষ্ঠির যখন মিল হচ্ছে না, তখন আর উপায় কি? কিন্তু মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন, আহা, এমন পাত্রটা ফসকাইয়া গেল! বেলাটা যে দিন দিন কি হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই!

গানটা খানিকক্ষণ গাহিয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঙ্গভঙ্গী-সহকারে পা ভাঙিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর এস্রাজখানা পাড়িয়া বাজাইতে লাগিলেন। ওই গানখানাই বাজাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু আর বাতায়নে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গেল।

বেলা বাজাইতেছেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য বেচারীকে অনেকটা দূর হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহাকে চাকরি ছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালিও করিতে হয়। একটি শিকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সহসা সঙ্গীতনিরতা বেলাকে দেখিয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, আমি খাটিয়া খাটিয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিলাম, আর এ দিব্যি বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছে! বিবাহ করিবার নাম নাই, পাত্র আনিলে কোন না কোন ছুতায় সেটাকে তাড়াইয়া দিতেছে। মেয়েমানুষ বলিয়া মাথা কিনিয়াছে একেবারে!

প্রিয়নাথ মল্লিকের সহসা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সম্প্রতি ভগ্নীর চালচলন ভাবগতিক এমন একটা বেপরোয়া মূর্তি ধারণ করিয়াছে যে, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোর মতলবটা কি, বল্ দেখি খুলে ?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে বেলা উত্তর দিলেন, কিসের মতলব ?

কিসের আবার, বিয়ে-থা করবি, না, না ?

সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন তিনি।

বেলা ছড়টা পাশে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে তোমার অত মাথাব্যথা কেন ? তুমি নিজে বিয়ে কর না, যদি ইচ্ছে হয়। কর না, বেশ আমার একটি সঙ্গী হোক।

প্রিয় মল্লিক ব্যঙ্গতিক্ত একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি বিয়ে করব! এই কলকাতা শহরে একটা অবিবাহিত বোন ঘাড়ে নিয়ে একশো টাকা মাইনেয় বিয়ে করা চলে ? বললেই হ'ল, বিয়ে কর!

গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ঘাড়ে ক'রে মানে ? আমিই কি তোমার বিয়ের পথে বাধা নাকি ?

তাঁহার চক্ষু দুইটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন, সে কথা কি এখনও বুঝতে পার নি ? আর কিছু না হোক, তোমার বুদ্ধির উপর আমার কিঞ্চিৎ আস্থা ছিল।

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, বেশ, তুমি পাত্রী দেখ, আমি তোমার ঘাড় থেকে এখুনি নেবে যাচ্ছি। এ কথাটা আগে বললে আগেই ব্যবস্থা করতাম, মিছিমিছি তোমার সময় নষ্ট হ'ল এতদিন।—এস্রাজটা কোল হইতে নামাইয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কোন কথা না বলিয়া সম্মুখের আলনাটা হইতে নিজের কাপড়-জামা প্রভৃতি টানিয়া নামাইয়া পাট করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এর মানে ?

বেলা কোন উত্তর দিলেন না। একটির পর একটি কাপড় পাট করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এর মানে কি ?

তথাপি বেলা নিরুত্তর।

একটু বিব্রতকণ্ঠে প্রিয়নাথ আবার বলিলেন, হঠাৎ কাপড় গোছাবার মানে কি, আমি জানতে চাই।

বেলা ঘাড় ফিরাইয়া নির্বিকারভাবে বলিলেন, কাপড়গুলো কি তা হ'লে রেখেই যাব ? তুমি এগুলো কিনে দিয়েছ অবশ্য, ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পার।

ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পারি !

বিহ্বল প্রিয়নাথ যন্ত্রচালিতবৎ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

পার বইকি। বেশ, নেব না এগুলো, রইল।

দ্রুতপদে বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাতে লইলেন শুধু ছোট হাতব্যাগটা। স্তম্ভিত প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, মেয়েটা সত্য সত্যই গেল কোথা ! কিছু দেখা গেল না। তখন তিনিও রাস্তায় বাহির হইলেন। দেখিলেন, দূরে দ্রুতপদে বেলা চলিয়াছেন। ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়নাথকে দেখিয়া ডান দিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রিয়নাথ কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণবাবু বাহির হইয়া আসিল এবং সস্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে, এমন ক'রে ? আসল কথাটা প্রিয়নাথ বলিতে পারিলেন না। কেমন যেন বাধিয়া গেল। বলিলেন, দেখছি, যদি রিক্‌শা-টিক্‌শা একটা পাওয়া যায়।

কোথাও বেরুবেন নাকি ?

মনে করছি তো।

প্রিয়বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণবাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া অকারণে সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল; আপনার ছেলেটি কেমন আছে আজ ?

লক্ষ্মণবাবুর কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, এমনিই জিজ্ঞাসা করিল। সামনের বাড়ির ভদ্রলোক জানালার ধারে বসিয়া কামাইতেছিলেন, আবছা-গোছের একটা উত্তর দিলেন, চলছে।

উপরের বাতায়ন হইতে বেলাকে বাহির হইয়া যাইতে লক্ষ্মণবাবু দেখিয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র আর সঙ্গীতের সম্ভাবনা নাই। সে বাইকটি বাহির করিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ দ্রুতপদে হাঁটিয়া বেলাকে অবশেষে গতিবেগ মন্থর করিতে হইল। শিয়ালদহের জনবহুল মোড়টাতে দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইবার কি করা যায় ? এক রিনিদের বাড়ি ছাড়া চেনাশোনা আর কোন স্থান তো কলিকাতা শহরে নাই! কিন্তু রিনিদের বাড়ি যাইতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল, সেখানে গিয়া কি বলিবেন? তাহা ছাড়া, তাঁহার দাদা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া খোঁজ করিবেন এবং অবশেষে একটা নাটকীয় ব্যাপার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। এরূপ অপমানের পর আর তিনি দাদার আশ্রয়ে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবেন না, তাহাতে অদৃষ্টে যত কষ্টই থাক্। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। রোদও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। শিয়ালদহের বড় ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে বারোটা বাজিয়াছে, ক্ষুধারও একটু উদ্রেক হইয়াছে। সহসা বেলার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে একটু পরীক্ষা করিয়া! হাতব্যাগটা খুলিয়া দেখিলেন,

আনা তিনেক পয়সা রহিয়াছে। উহাতেই হইবে। একটু আগাইয়া গিয়া বড়-গোছের একটা দোকানে বেলা উঠিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, দয়া ক'রে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি?

নিশ্চয়, এই যে আসুন।

দোকানদার ভদ্রলোক ভদ্রতার আতিশয্যে টুলটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ফোনটা আগাইয়া দিলেন। নিকটেই ডাইরেক্টরিখানা ছিল, বেলা অপূর্ববাবুর আপিসের ফোন-নম্বরটা বাহির করিয়া অপূর্ববাবুকে ফোন করিলেন। বলিলেন, তিনি বড় বিপদে পড়িয়া শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ববাবুকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন বড় ভাল হয়, না আসিলে বড় মুশকিলে পড়িতে হইবে।

অপূর্ব বলিলেন, খুব চেষ্টা করছি আমি যেতে, ছুটি পেলে নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

ছুটি নিন যেমন ক'রে হোক।

দেখি।

ফোনটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেলা দেবী ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে দুই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু দোকানী ভদ্রলোক কিছুতেই তাহা লইতে রাজি হইলেন না। বেলা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অপূর্ববাবুর প্রতীক্ষায় ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে শিয়ালদহের মোড়ে আসিতে একটু সময় লাগে, বেলা অলসভাবে দাঁড়াইয়া প্রাচীরগাত্রের এবং ল্যাম্প-পোস্টের উপর যে বিজ্ঞাপনগুলি ছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলেন। হরেকরকমের নানাবিধ বিজ্ঞাপন, অধিকাংশই বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত। দেখিতে দেখিতে একটি বিজ্ঞাপন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

একটি ছোট মেয়েকে গান শিখাইবার জন্ত ও পড়াইবার জন্ত একটি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। দুই বেলা পড়াইতে হইবে, বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আবেদনকারিণী যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বেলা অধর দংশন করিয়া খানিকক্ষণ বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সেই ফোনওয়ালা দোকানে গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে এলাম। এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল যদি দেন—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেন্সিল দিলেন। বেলা কাগজে ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া হাতব্যাগে সেটি রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় ভদ্রলোককে ধন্তবাদ দিয়া ট্রাম-লাইনের ধারে গিয়া অপূর্ববাবুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই অপূর্ববাবু আসিয়া পড়িলেন। ট্রাম হইতে নামিয়া কোঁচাটি ঝাড়িয়া পাঞ্জাবির পকেটে পুরিতে পুরিতে মিহি গলায় মৃদু হাসিয়া অথচ একটু চিন্তিতকণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

ব্যাপার গুরুতর।

তার মানে?

তার মানে, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, রাস্তায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি, আপনি এখন একটা ব্যবস্থা করুন আমার।

অপরূপ গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধর দংশন করিয়া বেলা অপূর্ববাবুর পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ববাবু ইহার জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। আপিসে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্জ করিতেছিলেন, হঠাৎ এ কি কাণ্ড!

দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেন কি?

বলছি তো, কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন, কি বৃত্তান্ত পরে শুনবেন, এখন আমার একটা দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করুন তো আগে। আপনি যে মেসে থাকেন, সেখানে সুবিধে হতে পারে কিছু? প্রস্তাবটার অসমীচীনতায় বেলা নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পুনরায় বলিলেন, বলুন না, সেখানে আমার জায়গা হতে পারে কি না।

অপূর্ববাবু পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন ও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমার মেসে? মানে, সেটা একটু দৃষ্টিকটু হবে না? মানে, অন্য কিছু নয়, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু আবার ঘামিতে লাগিলেন।

বেলা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, আমার সম্বলের মধ্যে মাত্র তিন আনা রয়েছে এই ব্যাগে। তা না হ'লে আপাতত একটা হোটেলে উঠলেও চলত, কিন্তু—

অপূর্ববাবু পুনরায় মুখটা মুছিয়া বলিলেন, মাসের শেষ কিনা, আমারও হাত একদম খালি, মানে—

কুটিল হাসি হাসিয়া বেলা বলিলেন, তা ছাড়া, সেদিন রিনিকে অমন দামী দুখানা বই কিনে দিতে হ'ল তো। শঙ্করবাবুকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি?

না, এখনও দেওয়া হয় নি, দেখাই হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে।

এমন সময় অভাবিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

রোক্কে—রোক্কে—

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

বিস্মিত বেলা বলিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেকদিন বাঁচবেন আপনি, এইমাত্র আপনার নাম হচ্ছিল! হঠাৎ এখানে কোথা থেকে?

বাড়ি গিয়েছিলাম, এইমাত্র নাবলাম ট্রেন থেকে। হস্টেলে ফিরছিলাম, আপনাদের দেখে নেবে পড়লাম। অপূর্ববাবুকে একটু যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

অপূর্ববাবু বারম্বার ঘাড় ও মুখ মুছিতে লাগিলেন।

বেলা অপাঙ্গে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিব্রতই করেছি ওঁকে একটু। আপনিও শুনুন তা হ'লে ব্যাপারটা, এবং যদি ইচ্ছে করেন, বিব্রত হোন।

বেলা দেবী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত করিলেন।

শঙ্কর বলিল, তার জন্যে আর ভাবনা কি? এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি ডাকলেন যে [illegible]

চলুন আমার হস্টেলে। সেখানে একটা কমন-রূম আছে তো। সেখানেই না হয় বসবেন খানিকক্ষণ, তারপর খাওয়া-দাওয়া ক'রে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেই হবে। ওর জন্যে আর ভাবনা কি, চলুন।

সেখানে কি ব'লে আমার পরিচয় দেবেন?

বোন।

না, বোন আমি হতে চাই না কারও। একজনের বোন হয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, পরিচয় যা হোক একটা দিলেই হবে, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন উঠুন।

বেলাকে লইয়া শঙ্কর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

বেলা অপূর্ববাবুকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, অনর্থক কষ্ট দিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না।

না না, কিছু না—

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অপ্রস্তুত মুখে সেই দিকে চাহিয়া অপূর্ববাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৪

প্রফেসার গুপ্ত কালিদাসের কাব্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য চর্চা করা তাঁহার জীবনের প্রথমতম বিলাস। যদিও তাঁহার পরিধানে রিম্‌লেস চশমা, হস্তে বিলাতী সিগারেট, অঙ্গে মুসলমানী ঢিলা পাঞ্জাবি ও পায়জামা, কিন্তু মনে মনে তিনি উজ্জয়িনীবাসিনী মালবিকা-নিপুণিকা-চতুরিকার প্রণয়ী। তাঁহার কুশন-দেওয়া রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্যের মধ্যে অথবা অলকাপুরীর মায়াময় স্বপ্নলোকে তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। ছন্দে গাঁথিয়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা যদিও তিনি অদ্যাপি লেখেন নাই, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহার নিজের জীবনটাতেই নানা কবিতার উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোন দিন ছন্দোবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না। ছাত্রস্থানীয় শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কারণও এই কবিত্বপ্রীতি। শঙ্করের কবিতা যদিও ছাপা হয় নাই, কিন্তু তাহা অপরূপ। তাহার মধ্যে তিনি উদীয়মান কবি-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সুখ হয়, তাহার মনের সংস্পর্শে আসিলে নিজের মনের সুর বিচিত্র লীলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। বয়স এবং সম্পর্কের অনৈক্য সত্ত্বেও তাই শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে শকুন্তলায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি বিলাত হইতে আসিয়াছে, পরিচিত হস্তাক্ষর। প্রফেসার গুপ্তের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ইভার চিঠি। সেই ইভা, যাহাকে ঘিরিয়া একদিন কত স্বপ্নই না পরিগ্রহ করিয়াছিল! সে স্বপ্নগুলি আজ কোথায়? লণ্ডনবাসিনী বিপণি-পরিচারিকা ইভার মনেও কি এখনও

তাহারা সজীব হইয়া আছে? হয়তো নাই। না থাকুক, কিন্তু একদিন এই ইভাই তাঁহার প্রবাস-জীবন অনন্ত মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। একদিন ইহা জীবন্ত সত্য ছিল বলিয়াই আজও পত্রধারার নির্জীব অভিনয় চালাইতে হইতেছে। ইভাও তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, তিনিও ইভার ধ্যানে মগ্ন নহেন, চিঠি লেখাটা এখনও তবু চলিতেছে। অতীত জীবনের সেই পরম রমণীয় ভঙ্গুর স্বপ্নটি যদিও আজ ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তো তাহা একদিন ছিল! ইভার ছবিটা মনে ভাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চক্ষু দুইটিতে, সোনালী অলকে, রক্তিম অধরে, পীবর বক্ষে এখনও কি সেই মাদকতা আছে? চক্ষু মুদিত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত নয়নে তিনি ইভাকেই দেখিতে লাগিলেন—যে ইভা তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করে নাই যে ইভা সর্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে একটু খুশি করিতে পারিলে বর্তিয়া যাইত, সে ইভা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তিনি যেন কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়াছেন, অদূরে আশ্রমবাসিনী বল্কলবসনা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এ কি, শকুন্তলার মুখখানা ঠিক যেন ইভার মত! এ যে একেবারে অবিকল ইভা!

খুট করিয়া একটা শব্দ হইল, স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মাথা তুলিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, অধর দংশন করিয়া একটি তন্বী যুবতী অপরূপ গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—পাশে শঙ্কর দাঁড়াইয়া।

শঙ্কর বলিল, এই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি?

না, ঘুমুই নি ঠিক, একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ব'স ব'স। ইনি কে? আসুন, বসুন।

প্রফেসার গুপ্ত সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেলাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

যথাবিধি নমস্কারান্তে সকলে যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন শঙ্কর বলিল, আপনি মান্তুর জন্যে একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলেন, ইচ্ছে করলে এঁকে রাখতে পারেন। গান-বাজনায় খুব ভাল ইনি।

বেশ তো।

শঙ্কর সংক্ষেপে বেলার পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিল, অতিশয় স্বাধীনপ্রকৃতির মহিলা ইনি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, নিজে রোজগার ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন—এই এঁর প্রতিজ্ঞা।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। দেশের যা অবস্থা, তাতে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় জাগা খুবই উচিত! খালি গানই শেখান আপনি? পড়াতে পারবেন?

বেলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না। খালি গানই শেখাই। পড়াশোনা আমার বেশিদূর নয়, ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম, পাস করতে পারি নি। প্রাইভেটে বাড়িতে প'ড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, হ'ল না।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ম্যাট্রিকটা পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার, একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়।

পড়াশোনায় কোনদিনই বেশি মন নেই আমার। গান-বাজনাই বেশি ভাল লাগে, সেইটেই ভাল ক'রে শিখেছি।

সহসা বেলা লক্ষ্য করিলেন, প্রফেসার গুপ্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

বেলা দৃষ্টি নত করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে

ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছি, এখন আপনারা একটু সাহায্য না করলে মুশকিলে পড়ব।

সাহায্য নিশ্চয়ই করব। মাইনে কত চান আপনি ?

মাইনে যা হয় দেবেন, আপনার মেয়েকে বেশ ভাল ক'রে গান-বাজনা শিখিয়ে দেব আমি। আমার খাওয়া-পরা-থাকার খরচটা চ'লে গেলেই হ'ল।

বেলা দেবী আবার চক্ষু দুইটি আনত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছু না বলিয়া বেলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, কি ভাবছেন ?

একটু হাসিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ভাবব আবার কি ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথায় আছেন ?

শঙ্করই উত্তর দিল, মহৎ আশ্রমে।

হোটেলে থাকা কি বেশিদিন সুবিধে হবে ?

বেলা বলিলেন, সে তো অসম্ভব। ঠিক করেছি, কোথাও একটা রূম নিয়ে ইক্‌মিকে রেঁধে খাব। কিন্তু তার আগে রোজগারের একটা ঠিকঠাক করতে হবে, সেই অনুপাতেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! আরও দু-একটা টিউশনি যোগাড় করতে হবে। ক'রে দেবেন তো শঙ্করবাবু ?

দেখব চেষ্টা ক'রে নিশ্চয়।—বলিয়া শঙ্কর শকুন্তলাটা টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিল। সকলেই মিনিটখানেক নীরব হইয়া রহিলেন।

তাহার পর বেলা বলিলেন, আপনার মেয়ে কোথা, ডাকুন না, আলাপ করি একটু।

তারা এখন এখানে কেউ নেই, মামার বাড়ি গেছে। এই কলকাতাতেই অবশ্য মামার বাড়ি, কালই বোধ হয় আসবে তারা।

আপনার মেয়ের বয়স কত ?

বছর বারো হবে।

আগে গান শিখেছিল কারও কাছে ?

তেমন কিছু নয়, এমনিই শুনে শুনে যা দু-একটা শিখেছে। তবে গলাটা মিষ্টি, সুর-বোধও আছে ব'লে মনে হয়, তা ছাড়া বিয়ের বাজারেও গানটা দরকারে লাগবে।

প্রফেসার গুপ্ত একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন, গোড়াতেই কিন্তু মাইনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়া ভাল। আমি টাকা কুড়ির বেশি এখন দিতে পারব না। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি; আপাতত আপনার থাকবার ব্যবস্থা একটা আমি ক'রে দিতে পারি। আমার এক বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি আমার চার্জে আছে, ভাড়াটে এখনও পর্যন্ত জোটে নি। ভাড়াটে যতদিন না জুটছে, ততদিন সেটাতে আপনি পুট-আপ করতে পারেন।

বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িটার ভাড়া কত ?

ভাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বাড়িটা ভাল।

কোন্ পাড়ায় বাড়িটা ?

বাগবাজারে।

বেশ তো, যতদিন ভাড়াটে না জোটে, আমি না হয় থাকি; অত না পারি, কিছু ভাড়া দেব। আরও গোটা দুই টিউশনি যদি যোগাড় করতে পারি, আমিই না হয় থেকে যাব। কি বলেন শঙ্করবাবু ?

হ্যাঁ।

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। সে শকুন্তলায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তা হ'লে কালই চ'লে আসুন সে বাড়িটাতে, মিছিমিছি হোটেলে আর পয়সা দিয়ে লাভ কি ? দাঁড়ান, চাবিটা এনে দিই আপনাকে।

প্রফেসার গুপ্ত উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চা আনতে বলি, কি বলেন ?

শঙ্কর বলিল, বলুন।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলে শঙ্কর শকুন্তলাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল এবং বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

হাসলেন যে ?

এমনিই।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, প্রায় তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখছি ! আমার বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল ভেবে দুঃখ হচ্ছে। হাসিটা ছদ্মবেশ মাত্র।

দেখুন, কবিত্বশক্তি ভগবান যতটুকু দিয়েছেন, সবটুকু আমার ওপর নিঃশেষ ক'রে ফেলবেন না। রিনি বেচারীও তো আশা ক'রে ব'সে আছে !

রিনি ! রিনির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

সম্বন্ধ নেই ব'লেই সম্বন্ধ গভীর। সব জানি আমি, বৃথা লুকোচ্ছেন কেন ?

অধর দংশন করিয়া বেলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু বলিল না, কেবল ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফেসার গুপ্ত চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, এই নিন। আসুন, এইবার একটু গল্প করা যাক।

বেলা বলিলেন, আপনি পড়াশোনা করছিলেন, আপনাকে হয়তো বিরক্ত করছি।

না না, কিছু না। এসে তো দেখলেন, ঘুমুচ্ছিলাম। আসুন, একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মত বিদ্যে আমার নেই, শঙ্করবাবু হয়তো পারবেন।

বেলা দেবী হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আড্ডা দেওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্থান কোথায় তা তো বুঝি না। তা ছাড়া— আচ্ছা থাক, এত অল্প পরিচয়ে সে কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কি কথা ?

থাক্, সে পরে বলব কোনদিন, অবশ্য সে দিন যদি আসে।

প্রফেসার গুপ্ত বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তাহার পর অন্য কথা পাড়িলেন।

আপনি ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে ফেলুন।

কি আর লাভ হবে তাতে ?

চাকরি। আপনার পড়বার আমি সুবিধে ক'রে দিতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত পাস করা থাকলে অনেক রকম স্কোপ পাওয়া যায়, কি বল শঙ্কর ?

শঙ্কর পুনরায় শকুন্তলাটা উলটাইতেছিল।

মুখ না তুলিয়াই বলিল, নিশ্চয়।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, পাস ক'রে ফেলুন ম্যাট্রিকটা, ম্যাট্রিক পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার ? প্রাইভেটেই দিন আবার।

বেলা কিছু না বলিয়া প্রফেসার গুপ্তের মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিলেন। ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেলা নিজেই উঠিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা প্রস্তুত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চা-পরিবেশনকারিণী বেলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনাদের এই মূর্তিই কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে আমার।

ঘাড় ফিরাইয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোন্ মূর্তি?

অন্নপূর্ণা-মূর্তি।

শঙ্কর বলিল, আমার চায়ে একটু বেশি চিনি দেবেন, একটু বেশি মিষ্টি খাই আমি।

বেলা বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আজ সকালে বলছিলেন, আপনি খুব ঝালেরও ভক্ত। মাংসে ঝাল না হ'লে ভাল লাগে না।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

তিন চামচ দিয়েছি, আর দেব?

না, ওতেই হবে।

সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলেন।

২৫

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। কই, আজও তো মৃন্ময় আসিল না? কোথায় গেল সে? তিন দিন তাহার কোন খবর নাই। জানালার ধারে জনবিরল গলিটার পানে চাহিয়া হাসি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজ মৃন্ময় নিশ্চয় আসিবে, সে বড় আশা করিয়াছিল। রাত বারোটা বাজিয়া গেল। শুনিতে ভুল হয় নাই তো? সে উঠিয়া গিয়া ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, না, ঠিক বারোটাই বাজিয়াছে। আজও কি তাহা হইলে আসিবে না? শুষ্কমুখে হাসি পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল। বড় ভয় করে তাহার। তিন-চার দিন হইতে ডান চোখের পাতাটা এমন নাচিতেছে! তিন দিন

পূর্বে 'এখনই আসিতেছি' বলিয়া মৃন্ময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নাই। এই তিন দিন হাসি খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল ঘর আর বাহির করিয়াছে। ঘরের এই জানালাটার ধারে সে সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বসিয়াছে; দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল। ঠাকুরপোও তো এখনও পর্যন্ত ফিরিল না! ভন্টুবাবুর বাড়ি কতদূর? অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হাসির দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, টপটপ করিয়া কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কপোল বাহিয়া আঙুলের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন কেন? কি দোষ করিয়াছে সে? অতি শৈশবেই বাপ মা ভাই তাহাকে ফেলিয়া একে একে মরিয়া গেল। সে মরিল না কেন? মরে নাই বোধ হয় মেয়েমানুষ বলিয়া। অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইবে যে! মুকুজ্জেমশাইয়ের উপর সহসা হাসির রাগ হইল, কেন তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া দূর-সম্পর্কে বড়লোক পিসামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিলেন, কেন তাহাকে অনাহারে মরিয়া যাইতে দিলেন না? সে মরিয়া গেলে কাহার কি ক্ষতি হইত? কাহারও না। এমন তো কত লোক রোজ মরিয়া যাইতেছে। সকলকে কি মুকুজ্জেমশাই বাঁচাইতে যাইতেছেন? তাহাকে বাঁচাইতে গেলেন কেন? ছেলেবেলায় সব শেষ হইয়া গেলেই তো ভাল হইত। এখন যে মৃন্ময়কে ছাড়িয়া মরিতেও ইচ্ছা করে না। মরা দূরের কথা, তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতেও কষ্ট হয়। অথচ কপালগুণে এমন একটা চাকরি জুটিয়াছে যে, দিনরাত বাহিরে না থাকিলে উপায় নাই। 'এবারও কি চাকরির কাজেই বাহিরে গিয়াছে? প্রতিবারেই তো যাইবার আগে বলিয়া যায়; তা ছাড়া, এখনই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে যে! হঠাৎ কোন জরুরি দরকারে যদি বাহিরে যাইতেই হয়, বাড়িতে আসিয়া সেটা বলিয়া

যাইবারও কি অবসর ছিল না? না, আপিসের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে।

হাসি অন্ধকারে একা একা বসিয়া অকূলপাথার ভাবিতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার তাহার মনে হইল, মৃন্ময় তাহাকে ভালবাসে তো? তাহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে তো? তাহার মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয়, কেমন যেন কোথায় কিসের একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, সেটা যে কি, তাহা হাসি ধরিতে পারে না। ধরিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে। আর কাহাকেও কি মৃন্ময় ভালবাসে? কাহাকে? কেমন দেখিতে সে মেয়েটি? সহসা হাসির মনে হইল, ছি ছি, সে এ কি করিতেছে? স্বামীর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করাও পাপ। তিনি ভাল হোন, মন্দ হোন, সে সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, ইহাই কি আমার মত অভাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমিই কি আমার স্বামীর যোগ্য? অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহধর্মিণী হইবার মত কি যোগ্যতা আছে আমার?

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের পাতা উপচাইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে মুছিবার চেষ্টা করিল না। পাথরের মূর্তির মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সঙ্কীর্ণ গলিটা রাত্রে একেবারে নির্জন। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, সকলেই ঘুমাইতেছে। সহসা পদশব্দ শোনা গেল। ওই যে, চিন্ময় আর ভন্টুবাবুর গলার স্বর শোনা যাইতেছে। আরও কে যেন একজন সঙ্গে রহিয়াছে, গলার স্বরটা হাসির ঠিক চেনা নয়।

ভন্টু, চিন্ময় এবং শঙ্কর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাসি যে এত রাত্রে বৈঠকখানায় আসিয়া রাস্তার ধারে জানালায় বসিয়া থাকিতে পারে, চিন্ময় তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনরূপ সাবধানতার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। অসঙ্কোচেই ভন্টুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভন্টুদা, বউদিকে কি বলবেন, এখনই ঠিক ক'রে নিন। দাদা যে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন, এ কথা তো বউদিকে বলা চলবে না।

হাসি রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সে আমি সামলে নেব।

কি বলবেন ?

শঙ্কর, বল্ না কি করা যায়, তুই তো মিথ্যে কথার গুরুমশাই একটি।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, সত্যি কথাটা বললে ক্ষতি কি ?

ভন্টু মুখটি সূচালো করিয়া কয়েক সেকেণ্ড শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মুখটি সূচালো করিয়া রাখিয়াই উচ্চারণ করিল, সত্যি কথা !

তাহার পর সহজভাবে বলিল, বাপের টাকায় মজাসে হস্টেলে আছিস—সত্যি-মিথ্যের হদিস তুই কি বুঝবি ?

চিন্ময় বলিল, না শঙ্করবাবু, সত্যি কথা বললে বউদি ভয়ানক কান্নাকাটি করবেন, এমনিই না খেয়ে আছেন কদিন থেকে।

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেসব ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি। ওর কথা শুনছিস কেন তুই ? কড়া নাড়্, বারোটা বাজে, ফিরতে হবে তো আবার।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, সত্যি-ফত্যি ভুলে যা—দারকে টোক গিলে যা। রাস্তায় চলতে গেলে যেমন গায়ে ধুলো লাগবেই, সংসার করতে গেলে তেমনই ক্রমাগত মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের হরির লুট দিতে দিতে যেতে পারলে আরও ভাল হয়।

হাসি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ওঁর কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো? হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছেন উনি? আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু, লক্ষীটি, শিগগির বল, কি হয়েছে?

হাসির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। অপরিচিত শঙ্কর এবং স্বল্প-পরিচিত ভন্টুকে দেখিয়া সহজ অবস্থায় সে হয়তো ঘোমটা দিত, এখন কিছুই করিল না।

বলা বাহুল্য, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, চল, ভেতরে চল, সব বলছি।

না, আগে বল তুমি।

সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা যায়? ভেতরে চল, বলছি সব।

সকলে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চিন্ময় শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু, আপনি একটু বাইরের ঘরটায় বসুন, আমরা আসছি এখনি। আসুন ভন্টুদা।

ভন্টু, চিন্ময় ও হাসি ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্কর বাহিরের ঘরের চেয়ারটায় বসিয়া রহিল। সে বেলাকে মহৎ আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া হস্টেলে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পথে ভন্টুর সহিত দেখা। ভন্টুর সহিত চিন্ময়ও ছিল। ভন্টুর মুখেই শঙ্কর শুনিল যে, গত তিন দিন যাবৎ মোমবাতির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর এখন জানা গিয়াছে যে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি তাহাকে নাকি চাপা দিয়াছে। ভন্টুর আগ্রহাতিশয্যে সে হস্টেল হইতে ছুটি লইয়া সেই হইতে ইহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। রিনির কাছে যাইবার কথা ছিল,

যাওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া আর একটা কর্তব্যও এখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়াছে। বাবা একটা বাড়ি ভাড়া করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার এখনও কিছু করা হয় নাই। বেলা এবং ভন্টুর পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যেটাই তাহার মাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইহাদের সঙ্গ এত লোভনীয় যে, জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না। যাই হোক, কাল সকালে উঠিয়াই প্রথমে রিনির ওখানে যাইতে হইবে এবং যেমন করিয়া হোক একটা বাড়ির সন্ধান করিতে হইবে। সহসা তাহার মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। ভন্টু ও চিন্ময়ের সঙ্গে সেও হাসপাতালে গিয়াছিল। অচেতন মৃন্ময় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিল, প্রশান্ত মুখখানায় কেমন যেন একটা আত্মসমাহিত ভাব। সেদিন রাত্রের সেই চিঠিখানার কথাও মনে পড়িল। চিঠিটা এখনও তাহার কাছে আছে। সেদিন রাত্রে ঘরে এই মেয়েটিই তো ছিল। স্বর্ণলতা তাহা হইলে কে?

ভীম জাল!

ভন্টু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

ভীম জাল টু দি পাওয়ার এন।

মানে?

মানে, খুজবুজ হাসপাতালে যেতে চাইছে।

খুজবুজ কে?

মোমবাতির বউ। বলছে, আমি শুধু একটিবার নিজের চোখে দেখতে চাই তাকে। ভয়ানক উইপিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর বলিল, এত রাত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? সেখানে ঢুকতে দেবে কি?

আমাদের পাড়ার ধীরেন ডাক্তার চেষ্টা করলে করতে পারে ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে, কারণ রিয়েলি সে চাম লদ্। চল্ যাই।

কোথায়?

ধীরেন ডাক্তারের কাছে।

আমাকে আবার টানছিস কেন ভাই?

উত্তরে ভন্‌টু শুধু মুখ-বিকৃতি করিল।

প্রভাত হইবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

শঙ্কর একা দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিল। হাসিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং অসময়ে রোগীর কাছে যাইবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য কম বেগ পাইতে হয় নাই। অনেক বলা-কহার পরে তবে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। হাসি গিয়া মৃন্ময়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে, এবং এখনও সেখান হইতে নড়ানো যাইতেছে না। এখন হাসি যাহাতে সেখানে থাকিতে পায়, নিরুপায় ভন্‌টু অগত্যা নানাভাবে সেই তদ্বির করিতেছে।

ভন্‌টুর সঙ্গে চিন্ময়ও আছে। শঙ্কর কিন্তু আর সেখানে থাকিতে পারিল না। বেদনাতুর হাসির অশ্রু-ছলছল মুখখানি শঙ্করকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া দিল। শঙ্কর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ হাঁটিবার পর সে যখন রিনিদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোরের মৃদু আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তা হইতে বাড়িটা দেখা যায়, শঙ্কর বাড়িটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গেটের নিকট গিয়া দেখিল, গেট ভিতর হইতে তালা-বন্ধ। শঙ্কর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এভাবে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা যে অশোভন, সে চেতনাও তখন তাহার ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাড়িটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা দ্বিতলের একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল এবং শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে রিনি দাঁড়াইয়া আছে।

কেহ কোন কথা বলিল না। নির্নিমেষ শঙ্কর ও নিস্পন্দ রিনির মধ্যে তালাবদ্ধ লোহার গেটটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬

রাস্তাটি খুব বড় নহে, গলি বলিলেই চলে, বাড়িটি কিন্তু প্রকাণ্ড। রাত্রি গভীর হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দামী মোটরকার নিঃশব্দে আসিয়া বাড়িটার সম্মুখে থামিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়া অচিনবাবু একবার ভাল করিয়া চতুর্দিকে দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বাড়িটার বন্ধ দরজার উপরে চারিটি টোকা দিলেন। টোকা দিবার মধ্যেও একটু কায়দা ছিল। প্রথম দুইটি টোকা ঘন ঘন এবং শেষ দুইটি বেশ দেরি করিয়া করিয়া। দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, কিন্তু নিষ্কাশিত-অসি বিরাটকায় এক পাঠান আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। অচিনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি এবং একটি দুয়ানি তাহার হস্তে দিলেন। পাঠান পকেট হইতে একটি টর্চ বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি উলটাইয়া প্রত্যেকটির সাল দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুদ্রাগুলি ফেরত দিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বেল টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং অচিনবাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে যে ঘরে গিয়া তিনি হাজির হইলেন, সেই ঘরের একটি কোণে বিস্তৃত ফরাশের উপর সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়াইয়া একটি বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। অচিনবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার কাজ

হয়ে গেছে, তিনখানা কারের অর্ডার দিয়েছেন মালিক। একখানা নিজের জন্যে, একখানা জামাইবাবুর, আর একখানা যাবে স্টেটের ম্যানেজারের ওখানে। তারপর সে ছোকরার খবর কি ?

এখনও মরে নি, হাসপাতালে রয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল বোধ হয়।

ড্রাইভারটা কিন্তু ধরা পড়েছে শুনলাম ?

হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, এ ঠিক সেই ছোকরাই তো, মৃন্ময় না কি নাম বলছিলেন ? ভুলে অন্য কোন লোককে আবার চাপা দিলে না তো ?

অচিনবাবু বলিলেন, না না, আমি নিজে তার ফোটো তুলে নিয়েছি, নিজে সেই ড্রাইভারকে ফোটো দিয়েছি, তা ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে দেখিয়েও দিয়েছি একদিন। ভুল হয় নি।

একটু থামিয়া অচিনবাবু বলিলেন, ড্রাইভারটাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে। আপনারই কথামত তাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, টাকা দিয়ে যা করা সম্ভব, তা আমরা করব তাকে বাঁচাবার জন্যে।

নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে ঢালা হুকুম আছে কর্তার। উকিল-টুকিল ব্যবস্থা ক'রে দিন। ফাইন হয়, দেব আমরা। জেল হয়, তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচা ছাড়াও কম্পেন্সেশন দেব। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। কত টাকা চাই, বলুন না ?

শ পাঁচেক এখনই দরকার।

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন ও দেওয়ালে পোঁতা একটা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অচিনবাবুর হস্তে দিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, নতুন মাল কবে দিচ্ছেন ? কর্তা যে ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে !

অচিনবাবু বলিলেন, শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি একটা সুবিধেমত পেলে হাজির ক'রে দেব।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যা হয় করুন একটা।

সর্বদাই চেষ্টায় আছি। আচ্ছা, এবার চলি আমি, ব্যবস্থা করতে হবে অনেক।

আসুন তা হ'লে।

অচিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন ও যথাবিহিত নমস্কারান্তে নামিয়া আসিলেন। বাহির হইবার সময় কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। মোটরে চড়িয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া মিনিটখানেক কি যেন ভাবিলেন। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটিতে অতি মৃদু চাপা একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মোটরে স্টার্ট দিয়া নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অচিনবাবু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগানো একটি বোতাম টিপিলেন। প্রকাণ্ড বাড়িটার দ্বিতলের সুদূর একাংশে ইলেকট্রিক বেল ঝনৎকার দিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা-গোছের একটা লোক আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, নিয়ে আয় এবার।

লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আরও দুইজন লোকের সাহায্যে একটি অজ্ঞান যুবতীর দেহ বহন করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ফরাশের উপর শোয়াইয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ বাদে এর জ্ঞান হবে, ডাক্তার বলেছে কিছু?

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটি উত্তর দিল, ঘণ্টা দুই বাদে।

কিছু খাওয়ানো হয়েছে?

গ্লুকোজ না কি একটা ইন্জেক্শন দিয়েছেন, বলেছেন, আজ রাত্রে আর খাওয়াবার দরকার নেই কিছু।

আচ্ছা, যা তোরা, এখন কর্তার পছন্দ হ'লে হয়! ভ্যালা এক

চাকরি হয়েছে আমার! তোরা সব বাড়ি চ'লে যা, ওই পাঠানটাকেও বাড়ি যেতে বল্। কর্তা আজ আসবেন।

আচ্ছা হুজুর।

ভৃত্য তিনজন বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাদের পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, একটু পরে আর শোনা গেল না। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শালখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, কুব্জ দেহটাকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে পাশবিক ক্ষুধা মূর্তি পরিগ্রহ করিল, লুব্ধ চাহনি অচেতন মেয়েটির সর্বাঙ্গ যেন লেহন করিয়া ফিরিতে লাগিল, নিশ্বাসের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। না, কেহ কোথাও নাই। ত্বরিতপদে আবার তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েটি এখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। একবার সেদিকে চাহিয়া আলমারি হইতে কয়েকটা বড়ি বাহির করিয়া কি একটা আরক সহযোগ সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শাল মুড়ি দিয়া বসিলেন এবং অপলকদৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পূর্বপুরুষ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; টাকা দিয়া যাহা সম্ভব সব হইতেছে, এবং দেখা যাইতেছে, সবই বোধ হয় সম্ভব। এমন কি সুনামটি পর্যন্ত বজায় আছে। চাকরবাকর পর্যন্ত জানে যে, কোন অজ্ঞাত লম্পটের জন্য এইসব আয়োজন, এই বৃদ্ধ তাহাদেরই মত

বেতনভুক একজন ভৃত্য মাত্র। বৃদ্ধ যে নিজেই কর্তা, এ কথা বৃদ্ধ ছাড়া আর কেহ জানে না।

নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধ সংজ্ঞাহীন নারী-দেহটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শিকারলুব্ধ বৃদ্ধ অজগরের লোলুপতা মূর্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

২৭

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে, নিশাচর ভন্টুও এই কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছে এবং দালানে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বাকু এখনও উঠেন নাই, যদিও উঠিবার আর বেশি দেরিও নাই। ভন্টুর বউদিদি ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে নিজের তোরঙ্গটির নিকট গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গের চাবি খুলিলেন। তাহার পর তোরঙ্গের ভিতর হইতে কতকগুলি রঙিন চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। মার্জিত-রুচি কোন লোকের চোখে কাগজগুলি হয়তো তেমন সুদৃশ্য বলিয়া মনে হইবে না, বউদিদির নিকট উহাই কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। স্বামী যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কাগজ বাহির করিয়া বউদিদি ইতস্তত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শন্টুটা দোয়াত কলম যে কোথায় ফেলে, তাহার ঠিক নাই। ঠাকুরপোর কাছে এত মার খায়, তবু ছেলেটার স্বভাব বদলাইল না। ঘরের কোণে কমানো বাতিটি আস্তে উস্কাইয়া দিয়া সেটি হাতে করিয়া লইয়া বউদিদি সন্তর্পণে ঘরের তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে দোয়াত কলম তাকেই ছিল, মিলিয়া গেল। বউদিদি প্রসন্নমুখে ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার উপর বসিলেন এবং আলোটি কাছে সরাইয়া আনিয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে

প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা ভাল নয়, কাগজ অতি সাধারণ, দোয়াতে কালি জলবৎ। বউদিদির চিঠির ভাষাও উচ্চাঙ্গের নহে। বানান-ভুল অজস্র হইতেছে। তথাপি কিন্তু এই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে চুরি করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে যে মাধুর্য, যে মহিমা, স্পন্দিত বিরহের যে আকৃতি বউদিদির গোলগাল কালো মুখমণ্ডলকে মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। স্বল্পালোকিত ঘরে ছিন্ন মাদুরের উপর উপুড় হইয়া বউদিদি দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। পত্র লেখা শেষ করিয়া পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, পুনশ্চ দিয়া আবার খানিকটা কি লিখিলেন, অবশেষে খামের মধ্যে পত্রটি পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া সেটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর প্রাচীর-বিলম্বিত জগদ্ধাত্রীর ছবিটির নিকট গিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

২৮

শঙ্কর সকালে উঠিয়াই একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উৎপল বিলাতে নাকি কোন এক মেমসাহেবের প্রেমে পড়িয়াছে! পত্রখানি লিখিতেছেন উৎপলের একজন আত্মীয়। পত্রখানির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অবশ্য শঙ্করের দেরি হইল না। কারণ যদিও পত্রখানির ভাষায় আত্মীয়-সুলভ চিন্তা ও ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষার অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত খোঁচাটি অপ্রত্যক্ষ রহিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবটি এই—ভারি যে উহার শ্বশুর উহাকে বাহাদুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিল, এইবার মজাটা বুঝুক! শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল, গিয়া অবধি উৎপলও তাহাকে বিশেষ

কোন চিঠিপত্র লেখে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়াই সে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়-কাহিনী কিছু ছিল না, ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। তাহার পর যে দুই-একখানা পত্র সে লিখিয়াছে, তাহা নিতান্তই নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, দুই-চারি ছত্রের মামুলী চিঠি। শঙ্কর নিজে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে হয়তো উৎপলের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইত; কিন্তু উৎপলের বিলাত যাওয়ার পর হইতে তাহার নিজেরই মানসিক জগতে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহাতে বাহিরের কোন কিছুতে বিচলিত হইবার তাহার উপায় ছিল না। মায়ের এতবড় শোচনীয় অসুখও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে যাহা করিতেছিল, কর্তব্যের অনুরোধেই করিতেছিল, প্রাণের তাগিদে নহে। সহসা সুরমার কথা তাহার মনে পড়িল, সুরমার পূর্বপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের কিছু অর্থও তাহার যেন বোধগম্য হইল। উৎপলের আত্মীয়ের পত্রখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া শঙ্কর কলেজের পড়া করিতে বসিল। অনেকদিন বই ছোঁওয়া হয় নাই। রিনির বই পড়িতেই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, নিজের পড়া কিছুই হয় নাই। ক্লাসে বসিয়াও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে প্রবেশ করে, কিন্তু মনে প্রবেশ করে না। ক্লাসে ভাল করিয়া মন দিয়া শুনিলে বাড়িতে পড়িবার ততটা দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ক্লাসেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। ক্লাসের জনতার মধ্যেই সে সেই নির্জনতা পায়, যাহা তাহার পক্ষে এখন একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্লাসের বাহিরে ভন্টু আছে, বেলা আছে, শৈল আছে, আরও কত অগণ্য প্রাণী আছে, যাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে চলে না, যাহাদের সংস্পর্শ অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে ধ্যান ভাঙিয়া যায়, মনের প্রত্যক্ষলোক হইতে লজ্জিতা রিনি সরিয়া যায়। ক্লাসের এক কোণে বসিয়া মনের মধ্যে সে যে একাকীত্ব অনুভব করে, রিনিকে মনে মনে

যেমন একান্তভাবে পায়, এমন আর কোথাও সম্ভব হয় না। ক্লাসে তাই তাহার পড়া হয় না। অথচ এই মোটা মোটা বইগুলা পড়িতে হইবে তো!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া চাকরকে আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল এবং ঘটা করিয়া ফিজিক্সের একখানা বহি লইয়া পড়িতে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া দুই-চারি দিন এইবার পড়িতে হইবে। বাবা একখানা বাড়ি দেখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সে দেখিয়াছে, বাবাকে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছে। তাঁহার আসিবার পূর্বে পড়াটাও কিছুদূর আগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাঁহারা আসিলে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। রিনি তো আছেই। কিন্তু হায় রে, বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই যদি পড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! শঙ্কর খোলা বইটার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু এক বর্ণও তাহার মাথার ভিতর ঢুকিল না। চাকরে চা দিয়া গেল, চা পান করিয়াও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বরং কিছুক্ষণ পরে সে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল যে, এমনভাবে বসিয়া শুধু সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র, আর কিছুই হইতেছে না। ইহার অপেক্ষা বরং রিনির কাছে যাওয়াই ভাল। তাহার মনে একটা কথা কয়েকদিন হইতে জাগিতেছে, সোনাদিদি-মিষ্টিদিদিকে আসল কথাটা খুলিয়া বলিলে ক্ষতি কি? এই মহিলা দুই-জনের সহিত তরল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তাহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়াছে যে, ইঁহাদিগকে যেন মনের গোপন কথাটি বলা যায়। তবু কিন্তু সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, ভাষায় প্রকাশ করিলেই যেন ইহার পবিত্রতা, ইহার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আর তো চাপিয়া রাখা যায় না! এমনভাবে লুকাইয়া কতদিন আর থাকা সম্ভব! তাহা ছাড়া মনের ভাব এমন করিয়া গোপন করিয়া ওখানে প্রত্যহ যাতায়াত করা শুধু যে কষ্টকর তাহা নয়, ভণ্ডামিও। তাঁহার তো কোন অসৎ

উদ্দেশ্য নাই, সে রিনিকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে চায়। ইহাতে অগৌরবের বা অসম্মানের কিছুই নাই। প্রফেসার মিত্রকে সে কিন্তু নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। রিনিকে কিছু বলা আরও অসম্ভব। সোনাদিদি অথবা মিষ্টিদিদিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহারা ইহাতে যদি আপত্তিকর কিছু না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাই প্রফেসার মিত্রকে বলিবেন এবং রিনির মনোভাব জানিয়া লইবেন। রিনির মনোভাব শঙ্করের জানাই আছে। মুখে কেহ কাহাকেও কোনদিন কিছু বলে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মনের নিগূঢ় বার্তাটি নিগূঢ় উপায়েই সে যেন জানিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, এসব বিষয়ে অন্তর্যামী মনের কখনও ভুল হয় না। শঙ্করের বাবা সনাতনপন্থী লোক, তিনি হয়তো এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে, তিনি যদি না বোঝেন, তাঁহার অমতেই বিবাহ করিবে সে। আজকাল কুল-গোত্র-গণ-কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। পাত্রী হিসাবে রিনি— শঙ্কর আর ভাবিতে চাহিল না। পাত্রী হিসাবে রিনি অযোগ্য কি সুযোগ্য—এ আলোচনা মনে মনে করিতেও শঙ্করের বাধিল। তাহার মনে হইল, পাত্রীর বাজারে রিনিকে দাঁড় করাইয়া অন্যান্য পাত্রীর সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রিনিকে অপমান করা হইবে। তাহাকে এমনভাবে মনে মনে খাটো করিবারই বা তাহার কি অধিকার আছে? জামা জুতা পরিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল বটে, কিন্তু পথে আসিয়া তাহার গতিবেগ পুনরায় মন্থর হইয়া আসিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এখনই গিয়া এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হইবে? প্রথমে কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে, তাহাই তো

পরম সমস্যা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, একটা রাস্তার মোড়ে একটা পাগলকে ঘিরিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। পাগল আমাদের পূর্বপরিচিত মোস্তাক। শঙ্কর ইহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই, সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। অঙ্গে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, চক্ষু দুইটি লাল। নূতনত্বের মধ্যে খবরের কাগজের একটা শিরস্ত্রাণ বানাইয়া মাথায় পরিয়াছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিতেছে। একবার দুইবার নয়, 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করিতে করিতে ক্রমাগত সেলাম করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া শঙ্করও কিছুক্ষণ মোস্তাকের পাগলামি উপভোগ করিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এই উন্মাদটার সেলাম-প্রবণতায় তাহার কবি-মনে অদ্ভুত একটা রূপকের আভাস জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই উন্মাদটা যেন সমস্ত বাঙালী জাতির প্রতীক, কারণে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে সেলাম করিয়া চলিয়াছে। বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে শুরু করিল।

ও শঙ্করবাবু!

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ববাবু, আরও কে একজন তাঁহার সহিত রহিয়াছেন, অপর দিকের ফুটপাথ হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। শঙ্কর থামিতেই তাঁহারা রাস্তাটা পার হইয়া শঙ্কর যে ফুটপাথে ছিল, তাহাতেই আসিয়া হাজির হইলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি আমরা।

বিনীতকণ্ঠে আনতচক্ষে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া অপূর্ববাবু শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। শঙ্কর দেখিল, অপূর্ববাবু ঠিক তেমনই আছেন। সেই কোঁচানো কাপড়, গিলে-করা পাঞ্জাবি, মুখে

স্নো-পাউডার। সেই নম্রনত লীলায়িত হাবভাব। অপর ভদ্রলোকটিকে শঙ্কর আগে দেখে নাই। ভদ্রলোকটির চেহারা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত। দেখিলে মনে হয়, যেন রাত্রে ঘুম হয় নাই।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো?

মানে, ইনি হচ্ছেন বেলার দাদা, মিছিমিছি একটা রাগারাগি ক'রে সামান্য জিনিস নিয়ে হঠাৎ এমন একটা—মানে মিটে গেলেই—অনর্থক একটা, বুঝতেই পারছেন—

অপূর্ববাবু কোন কথাই সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে পারেন না। কিছুদূর বলিয়া চুপ করিয়া যান, এবং এমন একটা ভাব করেন, যেন এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়া তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায় কার্য করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ উপায় নাই।

প্রিয়বাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, বেলা কোথায় আছে, জানেন আপনি?

শঙ্কর বলিল, এখন তো ঠিক জানি না। আমাদের কলেজের এক প্রফেসারের মেয়েকে গান শেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। সেই প্রফেসারের বন্ধুর একটা খালি বাড়ি আছে, তাতেই উঠে গেছেন পরশু-দিন। ঠিকানাটা পরে এনে দিতে পারব আমি, এখন তো জানি না।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার প্রফেসারের ঠিকানাটা দিন না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি গিয়ে, আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

বেশ।

প্রফেসার গুপ্তের ঠিকানাটা শঙ্কর বলিয়া দিল। উভয়েই শঙ্করকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। অপূর্ববাবুর উচ্ছ্বাসটা কিছু যেন অধিক বলিয়াই বোধ হইল; অসম্পূর্ণ বাক্যাবলী অসংলগ্নভাবে খানিকক্ষণ বলিয়া বিনীত নমস্কারান্তে অপূর্ববাবু বিদায় লইলেন। প্রিয়বাবুও সঙ্গে গেলেন। শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন অবশেষে প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে সোনাদিদি ও মিষ্টিদিদি রহিয়াছেন। শঙ্করকে তাঁহারা এ সময়ে প্রত্যাশা করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সোনাদিদি কোথায় যেন বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর আসাতে যাওয়া স্থগিত করিলেন ও সবিস্ময়ে বলিলেন, এমন সময়ে যে, মানে এমন অসময়ে যে? এ কি অঘটন!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ছুটি আছে বোধ হয়, নয়? বসুন।

শঙ্কর বলিল, না, ছুটি নয়, এমনই এলাম।

সোনাদিদি কিছু না বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিল, একটু চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। কিন্তু এই অসময়ে চা কেন, ব্যাপার কি বলুন তো আজ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু নয়, এমনই কিছু ভাল লাগছে না ব'লে এলাম এখানে। শরীরটাও ভাল নেই।

ডক্টর সেন বলছিলেন, কলকাতাতেও নাকি ম্যালেরিয়া হচ্ছে আজকাল, কুইনিন খাবেন?—বলিয়া সোনাদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি, ডক্টর সেন বলছিলেন সেদিন।

কুইনিন খবার দরকার নেই, আপনি কথা ব'লে যান, তা হ'লেই কাজ হবে, কি বলুন মিষ্টিদি?

উভয়েই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সোনাদিদির পানে কোপকটাক্ষে চাহিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, কেমন, জব্দ হয়েছিস তো এবার? থামুন, চায়ের কথাটা ব'লে দিই। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। সোনাদিদি হাসিভরা চক্ষু দুইটি

শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া পুনরায় বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো সত্যি ক'রে ?

শঙ্কর বলিয়া ফেলিল, থাকতে পারলাম না।

থাকতে পারলেন না ? তার মানে ?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার না-থাকতে-পারার প্রতিকার কি এ বাড়িতে আছে নাকি ?

তা কি আপনি জানেন না ?

শঙ্কর গম্ভীরমুখে বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনার অজ্ঞাতসারে একটা কাজ ক'রে ফেলেছি কিন্তু। রাগ করবেন না তো ?

কাজটা কি ?

আপনার সেই কবিতাটা একটা কাগজে দিয়ে দিয়েছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে দেখালুম, তিনি এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেলেন।

কোন্ কাগজে ?

তা এখন বলছি না, বেরুলে দেখবেন।

কোন্ কবিতাটা দিয়েছেন ? আমি তো অনেকগুলো কবিতা দিয়েছিলাম আপনাকে।

সেই যে, যার গোড়ার লাইনটা হচ্ছে—'রসনা নীরব মম চিত্ত মম নিত্যমুখরিত'—

ও।

শঙ্কর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছেন দেখা গেল।

শঙ্করকে গম্ভীর দেখিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, সোনা বুঝি আবার ঝগড়া করেছে আপনার সঙ্গে ?

না।

শঙ্কর সস্মিত দৃষ্টি মিষ্টিদিদির দিকে ফিরাইল।

চায়ের কতদূর ?

ব'লে দিয়েছি, এখুনি আসছে।

বলিতে বলিতেই চা আসিয়া পড়িল। সোনাদিদি উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অলিখিত আইন অনুসারে সোনাদিদিই এসব কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন।

সহসা শঙ্কর গাঢ়স্বরে বলিল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আজ একটা বলব ব'লে এসেছি। আমার একটা শুধু অনুরোধ, হাসি-ঠাট্টা ক'রে জিনিসটাকে হালকা ক'রে ফেলবেন না। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সোনাদিদি চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন এবং একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, সে কি, আপনার কাছে যেটা এত সিরিয়াস ব্যাপার, তা আমরা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেব! ছি ছি, এতটা খেলো লোক ভাবেন আপনি আমাদের !

শঙ্কর গাঢস্বরেই বলিল, খেলো লোক ভাবলে আসতাম না আপনাদের কাছে। আপনারা খেলো লোক নন ব'লেই অসঙ্কোচে এত বড় একটা কথা বলতে এসেছি।

সোনাদিদি নীরবেই এক কাপ চা শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিলেন। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিতেই মিষ্টিদিদি বলিলেন, দে, আমিও খাই একটু— আচ্ছা, একটু কড়া হোক, পাতলা চা আমি খেতে পারি না বাপু।

সোনাদিদি নিজের জন্য এক কাপ ছাঁকিয়া লইলেন।

শঙ্কর নীরবে ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কথাটা কি, শুনিই না ?

শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, রিনিকে আমি ভালবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোনাদিদি সহসা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদবেগে বহিতেছিল।

মিষ্টিদিদি উঠিয়া নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আপনাকে আমরা নিজের আত্মীয়রূপে পাব, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে ? কিন্তু সকলের চেয়ে আগে রিনির মত নেওয়াটা দরকার নয় কি ?

রিনির অমত হবে না।

জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

না, আমি জানি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর বলিলেন, তবু ফর্মালি জিজ্ঞেস করাটা একবার দরকার।

সে আপনি করবেন। প্রফেসার মিত্রকেও আপনি বলবেন—আমি পারব না, আমরা ভারি লজ্জা করবে। আমার বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন, যদি করেন, তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আমি বিয়ে করব।

সেটা কি ঠিক হবে ?

বাবা হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। যাই হোক, সে আমি বুঝব।

শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এবার উঠি আমি, ক্লাস আছে। আসব কাল।

শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া আচমকা বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় দেখিল, অতিশয় গম্ভীর মুখে সোনাদিদি একপ্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। শঙ্করের পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, এক নিমিষের জন্য তাঁহার চক্ষু দুইটি শঙ্করের উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার পর ত্বরিতপদে তিনি পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িলেন। শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শঙ্কর কলেজে যায় নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন হস্টেলে ফিরিল, তখন দেখিল, মিষ্টিদিদির চাকর একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চাকরের উপর আদেশ ছিল— শঙ্করবাবু ছাড়া অপর কাহাকেও যেন চিঠি দেওয়া না হয়। শঙ্কর তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

আপনি এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন যে, একটা দরকারী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। একটা গুজব রটেছে যে, বেলা মল্লিক নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আপনার আশ্রয়ে কোথায় আছে। বেলার দাদা বেলাকে খুঁজতে এসেছিলেন, অপূর্ববাবু বললেন, বেলা আপনার আশ্রয়ে আছে। রিনিও কথাটা শুনেছে। আসলে ব্যাপারটা কি, পত্রবাহক মারফৎ জানাবেন। কারণ এ বিষয়ে সবিশেষ না জানলে— বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। আশা করি, এটা সিরিয়াস কিছু নয়। সব কথা খুলে লিখবেন। ইতি—

মিষ্টিদিদি

বেলার সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহাই শঙ্কর সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইয়া দিল এবং লিখিল যে, তিনি প্রফেসার মিত্র ও রিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফলাফল যেন তাহাকে পত্রযোগেই অনুগ্রহ করিয়া জানান। তৎপূর্বে সে ওখানে যাইবে না, অর্থাৎ যাইতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির চাকর চলিয়া যাইবার পর হস্টেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের বাড়ি হইতে মাঈজী এই জিনিস ও চিঠি দিয়াছেন। শঙ্কর খুলিয়া দেখিল শৈলর চিঠি।—

শঙ্করদা,

তোমার জন্যে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনেছি। তুমি যেমন বলেছিলে—নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙই দিয়েছি। বুনতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, শীত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গায়ে ঠিক হয়েছে কি না জানিও। তুমি একদিন এস না সময় ক'রে। একবারও তো এদিকে মাড়াও না। কেমন আছ? ইতি—

শৈল

শঙ্কর প্যাকেট খুলিয়া সোয়েটারটা বাহির করিল। বেশ বুনিয়াছে তো! গায়ে দিয়ে দেখিল, ঠিক ফিট করে নাই। বগলের কাছটা আঁট, গলাটা ঢিলা। তবু কিছুক্ষণ শঙ্কর সেটা পরিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে একখানি মুখ ভাসিয়া আসিল—একমাথা কোঁকড়ানো চুল, দুষ্টামি-ভরা হাসি-হাসি মুখখানি। সেই কতকাল আগেকার কিশোরী শৈল!

২৯

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আপিস হইতে ফিরিয়া ভন্টু যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। অনেক কষ্টে অনেক রকম ফিকির-ধান্দা করিয়া কোনক্রমে সে সংসারটিকে চালাইতেছে, তাহার উপর যদি এই সব কাণ্ড ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে তো সে

নাচার। নানারূপ ফন্দি করিয়া সে কিছু টাকা যোগাড় করিয়াছিল এবং সমস্ত মাসের চাল ডাল নুন তেল মসলা প্রভৃতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাসায় ফিরিয়া সে শুনিতেছে, শন্টু ফন্তি নাকি ভাঁড়ার-ঘরে লুকাচুরি খেলিতে গিয়া সমস্ত তেলের ভাঁড়টি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লুকাচুরি খেলিতে গিয়া! ভন্টুর সমস্ত মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল।

বউদিদিকে প্রশ্ন করিল, তুমি ওদের ভাঁড়ার-ঘরে যেতে দিয়েছিলে কেন?

বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। বঁটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন, আমি কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা কেউ? তুমি বাড়ি থেকে যেই বেরুবে, আর অমনই সমস্ত বাড়ি মাথায় ক'রে দাপাদাপি করবে ওরা। আমি কি করব, বল?

ভন্টু কিছু না বলিয়া শন্টু ও ফন্তিকে একটা ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া খিল দিল। তাহার পর আলমারির মাথা হইতে বেতটা পাড়িয়া মার শুরু করিল। চোরের শাস্তি! দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মত ভন্টু বেত চালাইতে লাগিল। তাহার যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। শন্টু ও ফন্তির আর্ত হাহাকারে সমস্ত বাসাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাকি শিশুগুলি ভয়ে শুষ্কমুখে নীরবে এক কোণে বসিয়া কাঁপিতেছিল, কারণ তাহারাও অপরাধী, তাহারাও লুকাচুরি খেলিয়াছিল। বউদিদি নীরবে নির্বিকারভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। বাকু কানে কিছুই শুনিতে পান না, সুতরাং তিনিও নির্বিকারভাবে তাম্রকূট-চর্চায় মগ্ন রহিলেন। ভন্টু আজ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। মারিতে মারিতে বেতটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, তবু তাহার রাগ কমিতেছে না। কতক্ষণ এভাবে চলিত বলা যায় না, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই ছিল। শঙ্কর সন্ধ্যা

পর্যন্ত মিষ্টিদিদির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাস্তায় ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ভন্‌টুকে লইয়া সেই জ্যোতিষীর বাড়ি গেলে হয়। ধার করিয়া কিছু টাকা যোগাড় করিয়া তাই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কুষ্ঠির ছক তো ভন্‌টুর কাছেই আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়াই এই নিদারুণ কোলাহল শুনিয়া সে দ্বারের নিকটেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড!

শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি উঠিয়া পড়িলেন, প্রতিকারের যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুরপো বড্ড রেগে গেছে, তুমি যদি পার একটু সামলাও ওকে। আমি বললে কিছু হবে না, বরং উলটে আরও রেগে যাবে। সেইজন্যে আমি কখনও কিছু বলি না।

শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, তুমি একটু ডাক ওকে শঙ্কর-ঠাকুরপো, অনেকক্ষণ ধ'রে বড্ড মারছে, আহা, ম'রে গেল ওরা!

বউদিদির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল—ভন্‌টু, এই ভন্‌টু, কপাট খোল্—করছিস কি তুই?

শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভন্‌টুর যেন চৈতন্য হইল, সে বেতটা ফেলিয়া দিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল্, বাইরে চল্। থাম্, টিন্‌চার আইওডিনটা লাগিয়ে দিয়ে আসি আগে।

কিসে টিন্‌চার আইওডিন লাগাবি?

কেটে গেছে, ওই নিয়ে পরে আবার আদাকেই ভুগতে হবে।

ভন্‌টু টিন্‌চার আইওডিন লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চল্, বাইরে চল্।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বল্ তো? হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভন্টু উত্তর দিল, শরীরে রক্তমাংস আছে ব'লে।

রক্তমাংস আছে ব'লে তুই খুন করবি?

ভন্টু উত্তর দিল না। অন্ধকার গলিটা উভয়ে নীরবেই পার হইল। বড় রাস্তায় পড়িয়া শঙ্কর দেখিল, ভন্টু দুই হাতে চোখ কচলাইতেছে এবং চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে।

কি হ'ল?

পোকা না কি একটা পড়েছে মনে হচ্ছে।

রাস্তার একটা কলে তখনও জল ছিল এবং কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছিল। ভন্টু সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল। পকেট হইতে মলিন রুমালটি বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল, পয়সা আছে সঙ্গে?

আছে কিছু, কেন বল্ দেখি?

সহাস্যে ভন্টু বলিল, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চল্, একটা চায়ের দোকানে ঢোকা যাক।

চল্।

কাছে-পিঠে মনোমত চায়ের দোকান পাওয়া গেল না। উভয়ে পুনরায় হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ভন্টু বলিল, উঃ, পেটের ভেতর যেন একটা শেয়াল ঢুকেছে, নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

শঙ্কর কিছু বলিল না। সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় ভন্টুকে লইয়া জ্যোতিষীর বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কি না! রিনির কথাটা এখন ভন্টুকে বলা কি উচিত? তা ছাড়া— শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত

হইল। একটা ভাল চায়ের দোকান চোখে পড়িতেই ভন্টু বলিল, চল্, জেকলিশ অ্যাফেয়ারে ঢোকা যাক।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, তোর কানা করালীর ঠিকানাটা কি রে ?

কেন ?

যাব সেখানে, একটু প্রাইভেট দরকার আছে।

চল্, আমিও যাচ্ছি।

আমাকে একা যেতে দে আজ, পরে সব বলব তোকে।

মটন চপটা বাগাইতে বাগাইতে ভন্টু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

পরে সব বলব তোকে, আজ আমাকে একা যেতে দে ভাই।

ভন্টু চপে একটা কামড় বসাইয়াছিল, উত্তর দিল না। মাংসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, দেখিস, গাড্ডায় পড়িস না যেন, করালী সোজা লোক নয়।

শঙ্কর বলিল, সে আমি ঠিক ক'রে নেব তাকে। আমার চুকটা কোথা ?

আমার পকেটেই ডায়েরিতে টোকা আছে। আগে তুই খেয়ে নে না, সব দিচ্ছি আমি।

উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

৩০

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া করালীচরণ তাড়াতাড়ি বাক্সটি লুকাইয়া ফেলিলেন ও হাতের আয়নাটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিলেন, কে ?

আমি শঙ্কর, কপাটটা খুলুন একবার।

বাহ্ নারায়ণ !

অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া করলীচরণ উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন।

কি চান আপনি?

ভনটুর উপদেশ অনুযায়ী শঙ্কর হেঁট হইয়া প্রণাম করিল ও বলিল, কুষ্ঠি গণনা করাতে এসেছি।

এখন হবে না।

ভনটুর কাছ থেকে আসছি আমি। ভনটু এই টাকা দশটা আর ছকটা দিতে বললে আপনাকে।

ভনটুবাবু পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসময়ে যত বখেড়া ভনটুবাবুর!

সহসা করালীচরণের চক্ষুটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আমি কি ভনটুবাবুর চাকর? টাকা দশটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি আমার মাথাটা কিনে ফেলবেন ভেবেছেন নাকি?

ভনটুর নির্দেশ অনুযায়ী শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল ও সবিস্ময়ে এই একচক্ষু জ্যোতিষীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতি জ্বলিতেছে, কাছে আর একটা মদের বোতল, ফাটা একটা গ্লাস, চতুর্দিকে এলোমেলো স্তূপীকৃত একগাদা বই।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছকটা দেখিতেছিলেন।

কার কুষ্ঠি এটা?

আমার।

বেশ, কাল আসবেন।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি, একটা কথা যদি শুধু ব'লে দিতেন, তা হ'লে বড় উপকার হ'ত আমার।

ঘোড়াটা কি বাইরে বেঁধে রেখে এসেছেন? বাই নারায়ণ! এসব কি তাড়াতাড়ির জিনিস? কি জানতে চান আপনি? একসঙ্গে হবে।

আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই খালি, কবে হবে আর কি রকম স্ত্রী হবে?

বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চক্ষুটিতে বিদ্রূপ-করুণা-মিশ্রিত অদ্ভুত একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর একবার ছকটার পানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ঘুরে আসুন তা হ'লে।

কতক্ষণ পরে আসব?

ঘণ্টা দুই পরে। এখন কটা বেজেছে?

আটটা।

দশটা নাগাদ আসবেন। দশটার বেশি দেরি করবেন না যেন, দশটার পর আমি বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা।

নমস্কার করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ খানিকটা মদ্যপান করিয়া মুখবিকৃতিসহকারে স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এসব কান্ট্রি-ফান্ট্রি কি আমার পোষায়! ভন্টুবাবুর ধাপ্পায় প'ড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

মুখটা মুছিয়া খানিকক্ষণ তিনি মোমবাতির শিখাটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লুকানো ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আগ্রহভরে সেটি খুলিয়া চ্যাপ্টা সাদা-গোছের কি একটা বাহির করিয়া অতিশয় কৌতূহলভরে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া টেবিলের উপর হইতে উপুড়-করা আয়নাটা তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে সেই চ্যাপ্টা বস্তুটি চক্ষুহীন অক্ষিকোটরের ভিতর বসাইয়া দিয়া বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাথরের চোখ। নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছে না তো! স্পন্দিতবক্ষে করালীচরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আয়নাটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং করিয়া শব্দ হইল—সাড়ে আটটা বাজিল বোধ হয়। করালীচরণ চক্ষুটি খুলিয়া রাখিয়া শঙ্করের ছকে মনোনিবেশ করিলেন।

শঙ্কর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর যদিও একই চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে যদিও রিনির কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু পরিপূর্ণ নদীস্রোতে ভাসিয়া-আসা একটা ফুল যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নদীকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া ছোট ফুলটাকেই আমরা যেমন লক্ষ্য করি, আজিকার সন্ধ্যায় ভন্টুর বাড়ির ব্যাপারটাও তেমনই শঙ্করের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। বউদিদির আর্ত অসহায় মুখচ্ছবিটা কিছুতেই সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এখনও যেন তাহার কানে বউদিদির করুণ কথাগুলি বাজিতেছে, আহা, ম'রে গেল ওরা! ভন্টুটা সময়ে সময়ে এমন নিষ্ঠুরও হইতে পারে! অথচ সে বেচারারই বা দোষ কি? এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়? কত দিক সামলাইবে সে? সমস্ত মাসের খরচ এক ভাঁড় তেল পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে রাগ হয় বইকি। এই তো সে এখনই আবার হন্যে কুকুরের মত টাকা ধার করিতে ছুটিল—দাদাকে টাকা পাঠাইতে হইবে, বাবাকে বালাপোশ করাইয়া দিতে হইবে। বাবুর জামা আছে, র‍্যাপার আছে, সোয়েটার আছে, কান-কাটা টুপি আছে, তথাপি বালাপোশ দরকার। শীতটা ফুরাইয়া যাইবার পূর্বেই বালাপোশটা করাইয়া দেওয়া চাই, তাহা না হইলে বউদিদিরই মুশকিল, বাক্যবাণ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইবে। অথচ ভন্টুর কতই বা আয়? ধার করিয়া চলিতেছে। সেই চায়ের দোকানের ভদ্রলোকের সহিত

আলাপ জমাইয়াছে, উদ্দেশ্য যদি কিছু সেখান হইতে হস্তগত করিতে পারে।···সহসা শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। মনিব্যাগটা খুলিয়া দেখিল, গোটা দশেক টাকা এখনও আছে। এক মাসে কত তেল খরচ হয়? কিছুই তো জানে না সে। পৃথিবী হইতে কোন্ নক্ষত্রের দূরত্ব কত 'লাইট ইয়ার', তাহা সে হয়তো নির্ভুল বলিতে পারিবে; কিন্তু একটা সাধারণ সংসারে মাসে কত চাল ডাল নুন তেল লাগে, এ সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কিছুদূর হাঁটিয়া সে একটা মুদীর দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, সের পাঁচেক সরষের তেলে একটা সংসারের এক মাস চলা উচিত, কি বলেন?

মুদী যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল, সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে?

রাবণের সংসার নয়, ছোটখাটো সাধারণ সংসার, দু-তিনজন বড় লোক, চার-পাঁচটি ছেলেপিলে। পাঁচ সেরে হবে না?

ভেসে যাবে।

দিন তা হ'লে পাঁচ সের তেল আমাকে। আর একটা পাত্রও আপনাকেই দিতে হবে, একটা টিন-ফিন হ'লেই ভাল হয়।

দিচ্ছি সব ঠিক ক'রে, বসুন আপনি। ওরে, মোড়াটা এগিয়ে দে আর মহেশের দোকান থেকে পাঁচসেরী একটা টিন আন্‌গে চট্ ক'রে।

দোকানের বালক-ভৃত্যটি মোড়া আগাইয়া দিয়া টিন আনিতে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই টিন আনিয়া হাজির করিল।

মুদী টিনটি ওজন করিয়া তাহার পর তেল মাপিতে বসিল।

ভাল তেল তো? একটু ভাল দেখে দেবেন দয়া ক'রে।

মুদী ওজন-দাঁড়ির পাল্লার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহ উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল জিনিস দেব বইকি। খাঁটি ঘানির তে

নসীরামের দোকানে চালাকিটি চলবার জো নেই। খেয়ে অপছন্দ হয়, নগদ মূল্য ফেরত দিয়ে দেন।

ওজন সমাপ্ত করিয়া পাঁচ সেরের উপরে আরও এক পলা ফাউ দিয়া টিনের মুখটি মুদী বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল এবং শঙ্করের প্রদত্ত মূল্য বেশ করিয়া বাজাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কাঠের বাক্সের ছিদ্রমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শঙ্কর মুদীর কার্যতৎপরতায় খুশি হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামই কি নসীরাম?

আজ্ঞে না, আমার ঠাকুরের নাম নসীরাম, অধীনের নাম কেবলরাম।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে, নমস্কার।

কেবলরাম সবিনয়ে প্রতি-নমস্কার করিল।

তেলের টিন লইয়া শঙ্কর একটি রিক্‌শা করিল। রাস্তায় একটা ঘড়িতে দেখিল, পৌনে নয়টা বাজিয়াছে। রিক্‌শা এবং ট্রামের সহায়তায় সে অনায়াসে ভন্টুদের বাড়িতে তেলটা দিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভন্টু এখন বাড়িতে নাই সে জানে, সুতরাং বেশি দেরি হইবে না।

ভন্টুর বাড়ির সামনে রিক্‌শা হইতে নামিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিন্তু এত দূর যখন আসিয়াছে, ফেরা যায় না, কড়া নাড়িতে হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, আপিস থেকে এসে না খেয়েই—

বউদিদি শঙ্করকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

বন্ধুটি কোথায়?

সে এক জায়গায় গেছে, এই তেলটা কিনে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বললে। এই নিন।

তেলের টিনটা সে নামাইয়া দিল।

পৌঁছে দিতে বললে ?

হ্যাঁ।

বউদিদির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিলেন, আপিস থেকে এসে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেয় নি। আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া কেন ?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এস, ভেতরে এস।

না, এখন আর বসব না, দরকারী কাজ আছে একটু আমার।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না। বউদিদির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিল না। মুখটা ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িল। রাস্তা হইতে সে শুনিতে পাইল, বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিতেছেন, বউমা, চায়ের জল চড়াও।

করালীচরণের গলিতে শঙ্কর আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন পৌনে দশটা। শীতকালের রাত্রি। গলিটা নির্জন হইয়া পড়িয়াছে গলির মোড়ের পানের দোকানটা এখনও কেবল খোলা আছে। শঙ্ক কপাটে আঘাত করিতেই করালীচরণ বলিলেন, ভেতরে আসুন, কপা খোলা আছে।

কপাট ঠেলিয়া শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। এক চক্ষুর দৃ শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনা বিয়ের এখন ঢের দেরি। বছর দেড়েকের আগে তো হতেই পারে না

শঙ্করের পায়ের তলার মাটি সহসা যেন সরিয়া গেল। তথাপি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং স্থিরকণ্ঠেই পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমা স্ত্রী কি রকম হবে একটা আইডিয়া দিতে পারেন ?

নিশ্চয় পারি। শ্যামবর্ণা, নাতিদীর্ঘাঙ্গী—

লেখাপড়া কিছু জানবে কি?

বাই নারায়ণ, ওটা তো দেখি নি! দেখি, দাঁড়ান। বসুন আপনি।

করালী আবার ঝুঁকিয়া পুঁথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন। শঙ্কর চৌকির এক পাশে বসিল। কয়েক মিনিট পরে করালীচরণ বলিলেন, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী হবে।

লেখাপড়া কিচ্ছু জানবে না?

কই, সে রকম তো মনে হচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। লোকটার সম্বন্ধে তাহার ধারণাই সহসা বদলাইয়া গেল। মনে মনে 'বোগাস' কথাটা উচ্চারণ করিয়া মুখে সে বলিল, আচ্ছা, উঠি এখন তবে আমি—নমস্কার।

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, ছোকরার বউ পছন্দ হ'ল না। বাই নারায়ণ! জোটেও ভন্টুবাবুর কাছে সব!

করালীচরণ উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটি রমণীমূর্তি আসিয়া দর্শন দিল। কালো কুচকুচে রঙ, বয়স কত তাহা বলা অসম্ভব, গালের হাড় উঁচু হইয়া রহিয়াছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, চোখে কাজল, দাঁতে মিশি। মোড়ের সেই পানওয়ালী।

হাসিয়া বলিল, ও গণকঠাকুর, হারিয়েছে তোমার কিছু?

করালীচরণ রোষদীপ্ত চক্ষে নারীটির পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ফের আসিয়াছে!

ফের তুই এসেছিস এখানে? মানা ক'রে দিয়েছি না তোকে?

বাবা রে বাবা! এক চোখেই যেন আগুন ছুটছে! এসেছি কি

নিজের গরজে নাকি ? দশ টাকার নোটটা তখন সিগারেট কিনতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে আমার দোকানে, তাই দিতেই এসেছি। ভালর কাল নেই। এই নাও।

করালীচরণের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল।

দূর হ তুই—চাই না নোট—দূর হ তুই।

পানওয়ালী নোটটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, খুব রাগ করিয়াই যাইতেছে, কিন্তু পিছু ফিরিয়া হঠাৎ একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

করালীচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩১

সারপেণ্টাইন লেনের একটি বাড়ির বাহিরের ঘরে ভন্টু ও নিবারণবাবু বসিয়া ছিলেন। নিবারণবাবু লোকটির সহিত ইতিপূর্বে আমাদের যৎসামান্য পরিচয় হইয়াছে। নিবারণবাবু সেই চায়ের দোকানের মালিক, যে চায়ের দোকানে কিছুদিন পূর্বে ভন্টু ও শঙ্কর প্রোটোটাইপের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, এবং যিনি ওয়েস্ট-কোট-পরিহিত মাস্টারের সঙ্গে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে উঠিয়া আসিয়া ভন্টুর দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার করাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই নিবারণবাবুর সহিত ভন্টুর পরিচয়, এবং মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে যাতায়াত করিয়া ভন্টু সেই পরিচয়টিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। নিবারণবাবু ভন্টুর নানা গুণে মুগ্ধ। ভন্টুও নিবারণবাবুর মধ্যে একটি সহৃদয় মানুষ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। নানারূপ ধান্দা-ফিকির করিয়া ভন্টুকে যে শুধু সংসার চালাইতে হয় তাহা নহে, অসুস্থ অগ্রজকে টাকা পাঠাইতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে নানাজাতীয় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। কখন কাহার নিকট হইতে

কোন্ উপকার পাওয়া যায় কে বলিতে পারে? নিবারণবাবু লোকটি কেবল সহৃদয় তাহাই নয়, শাঁসালোও। সুতরাং তাঁহার বারম্বার পদধূলি লইয়া, করকোষ্ঠী বিচার করিয়া, তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া (ভন্টু আজকাল হোমিওপ্যাথি লইয়া নাড়াচাড়া করে) এবং ছোটখাটো নানা ব্যাপারে তাঁহার উপকার করিয়া ভন্টু নিবারণবাবুর অন্তরঙ্গ হইয়াছে।

নিবারণবাবু লোকটি পুরাকালে আসাম-অঞ্চলে চা-বাগানে কাজ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নির্ঝঞ্ঝাট নন, দুইটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, গৃহিণীটি সর্বদাই অসুস্থ। এতদ্ব্যতীত মাস্টার নামক ব্যক্তিটি পূর্বপরিচয়ের সুযোগ লইয়া কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্কন্ধারূঢ় হইয়াছেন। আসামের চা-বাগানে যখন ছিলেন, তখনই এই মাস্টারের সহিত তাঁহার আলাপ। চমৎকার পাশা খেলিতে পারেন, চমৎকার চা বানাইতে পারেন, চমৎকার তবলা বাজাইতে পারেন এবং চমৎকার মাংস রাঁধিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চতুর্বিধ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও মাস্টার বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারেন না। একটা অবশ্য সুবিধা আছে, তিন কুলে তাঁহার কেহ নাই। একটা পেট, কোন রকমে চলিয়া যাইবার কথা; কিন্তু কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে, তাহা চলাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে পূর্ব-পরিচিত নিবারণবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায় সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবু গুণী মাস্টারকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। গৃহিণীকে বলিতে হইয়াছে যে, চায়ের দোকানে কাজ এত বেশি যে, ম্যানেজার-জাতীয় একজন লোক না রাখিলে চলিতেছে না। খাওয়া পরা এবং মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় এমন একজন ভাল পরিচিত লোক যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে

হাতছাড়া করা উচিত নয়। সস্তায় এমন একটা লোকের কর্মপটুতার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নিবারণ-গৃহিণী আপত্তি করেন নাই। মাস্টারের অবসর-বিনোদনের জন্য চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবুকে তাঁহার সহিত বসিয়া পাশা খেলিতে হয় এবং তবলা বাজাইবার সুযোগ দিবার জন্য সেতার বাজাইতে হয়। নিবারণবাবু আসাম-অঞ্চলে যখন ছিলেন, তখন তাঁহার একটু-আধটু সেতার বাজানোর শখ ছিল; কিন্তু বহুকাল চর্চা নাই, হাত আর তেমন চলে না। কিন্তু মাস্টারের প্ররোচনায় পড়িয়া আবার তাঁহাকে সাধনা করিতে হইতেছে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে চা যত না বিক্রয় হউক, পাশা-খেলা এবং সেতার-তবলা পুরাদমে চলিয়া থাকে।

এখনও মাস্টার দোকান হইতে ফেরেন নাই। ভন্টু এই খানিকক্ষণ হইল আসিয়াছে। ভন্টুর সাহচর্য নিবারণবাবুর অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, চা হবে নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু বলিল, কেন ফর নাথিং কথা ব'লে সময় নষ্ট করছেন?

ফর নাথিং মানে?

নিবারণবাবুর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এতদিন আলাপের পরও তিনি ভন্টুবাবু লোকটির কথাবার্তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

চা তো না খাইয়ে ছাড়বেন না জানি, অনর্থক কচলা-কচলি ক'রে লাভ কি? আপনাকে চিনি না!

ভন্টু চট করিয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

আহা-হা, কি যে করেন আপনি! এই অভ্যেসটা আপনার ভারি খারাপ, যাই বলুন, ওতে অপরাধ হয়।

অপরাধ কিসের? আমরা এক জাত, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ—

তা হোক, তবু ঠিক নয় এটা। আপনাকে বলাও বৃথা।

ভন্‌টু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, চা আনতে বলুন।

দার্জি, দার্জি, ওরে দার্জি!

কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া নিবারণবাবু উঠিয়া গেলেন। নিবারণ-বাবুর কন্যা দুইটির নাম একটু অদ্ভুত। বড়টির নাম দার্জিলিং, ছোটটির নাম আসাম। ভৌগোলিক কোন কারণে নয়, দুই প্রকার চায়ের নাম অনুসারেই তিনি কন্যা দুইটির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম দুইটি ডাকনাম। দার্জিলিঙের ভাল নাম শ্যামলী, আসামের ভাল নাম যমুনা। দুইজনেরই রঙ চায়ের পাতার মত কালো, হয়তো চা-ব্যবসায়ী নিবারণবাবু সেইজন্যই তাহাদের চায়ের নামে নামকরণ করিয়াছেন। দৈবক্রমে উভয়ের নামের সঙ্গে চরিত্রও ভারি খাপ খাইয়া গিয়াছে। দার্জিলিং-চায়ে যেমন গন্ধ বেশি লিকার কম, নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও সেইরূপ—একটু ভাবময়ী, কাজকর্মে তেমন পটু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে আর্টিস্টিক। আসাম ঠিক ইহার উল্টা, ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, বাড়ির কাহারও সঙ্গে তাহার ভাব নাই—কোন্দল করাই তাহার স্বভাব, কিন্তু খাটিতে পারে অসম্ভব—রান্নাঘরের সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী।···নাঃ, এ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, হরদম সেলাই!—বলিতে বলিতে নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একটা বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, ছাড়ুন ছাই হবে দেখছি মেয়েটার।

ভন্‌টু সব বুঝিতেছিল, তথাপি প্রশ্ন করিল, কার?

কার আবার, দার্জির। গিয়ে দেখি, লণ্ঠনের আলোয় ঝুঁকে প'ড়ে একটা কাপড়ের ওপর রেশমী সুতো দিয়ে ফুল তোলা হচ্ছে। টেবিল-ক্লথ হচ্ছে। নিজেদেরই ক্লথ জোটে না, টেবিল-ক্লথ! আর টেবিলই

কোথা যে, টেবিল-ক্লথ পাতবি ! ঝঞ্ঝাট বুঝুন, কাল বলবে—টেবিল চাই, ক্লথ পাতব ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, জুতে দিন ।

আরে মশাই, জুতে দিতে কি আমি অরাজি ? কিন্তু পাত্র কই ? এক-একটা খুঁজে-পেতে আনি, জলখাবার খায়, স'রে পড়ে। এই আমরাও তো বিয়ে করেছিলাম মশাই, রঙ নিয়ে তো মাথা ঘামাই নি। আজকাল সবাই চায় গোলাপী রঙ, ভুলে যায় এটা বাংলা দেশ, বসোরা নয় ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, বাবাও আমার বেছে বেছে এমন একটি রক্ষে-কালীর বাচ্চার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশটাই কালো হয়ে গেল। মুক্তোকেশী বেগুনের গাছে আপেল ফলবে কি ক'রে, বলুন ?

ভন্টু স্মিতমুখে বসিয়া রহিল। এসব কথায় সায় দেওয়াও বিপদ, প্রতিবাদ করাও বিপদ। আসল কথাটা অর্থাৎ টাকার কথাটা সে কখন কি ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এতদিন নিবারণবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভন্টু তাঁহার নিকট টাকার কথা কোনদিন উত্থাপন করে নাই। অথচ উত্থাপন না করিলেও আর চলিতেছে না। কিছু টাকা অবিলম্বে চাইই। ধার-করা ব্যাপারে প্রথম সঙ্কোচটা কাটাইয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে পরে আর কোন গোলমাল হয় না। শুভ-অশুভ যাহা হোক, একটা মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু নিবারণবাবুর এই ক্ষোভের মুখে কথাটা পাড়িতে তাঁহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। হঠাৎ একবার 'না' বলিয়া ফেলিলে সেটাকে 'হাঁ' করিতে আবার বেশ কিছুদিন হয়তো সময় লাগিয়া যাইবে, হয়তো হইবেই না। ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনার ছোট মেয়েকে চুলকনির যে একটা ওষুধ দিয়েছিলাম—

অদ্ভুত ফল হয়েছে মশাই, একেবারে সেরে গেছে। আমাকেও এক ডোজ দেবেন তো, আঙুলের গলিগুলোতে আমারও হয়েছে।—বলিয়া তিনি চুলকাইতে লাগিলেন।

আচ্ছা, কাল আনব।

মাস্টার আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভন্টুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ভ্রূযুগল নাচাইলেন, ভাবটা, এই যে, আসিয়াছেন দেখিতেছি!

নিবারণবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি চ'লে আসার পর খদ্দের-টদ্দের এসেছিল দু-একটা?

খদ্দের!

এমন একটা বিস্ময়সূচক ভঙ্গীতে মাস্টার কথাটি উচ্চারণ করিলেন যে, যেন নিবারণবাবু অতিশয় অসম্ভব একটি প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মাস্টারের দৃষ্টি দেখিয়া নিবারণবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, মানে, আসেও তো মাঝে মাঝে—

রাত্তির নটার পর কার দায় পড়েছে ওই গলিতে চা খেতে আসবে! একদিনও তো দেখি নি।

নিবারণবাবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন একটা মুখভাব করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন যে, বোঝা গেল, তিনি কথা-কাটাকাটি করিয়া কথা বাড়াইতে চাহেন না বটে, কিন্তু নয়টার পর কখনও তাঁহার দোকানে খরিদ্দার আসে না, এ উক্তি তিনি মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহেন। ভন্টু একটু হাসিল মাত্র। মাস্টার বসিলেন। এমন সময় দার্জি দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল। দার্জিসিংহের রঙ মায়ের মত, মুখশ্রী বাবার মত। বয়স বছর ষোলো-সতেরো। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে চায়ের পেয়ালা ভন্টু ও নিবারণবাবুর হস্তে দিয়া সে চকিতে একবার মাস্টারের পানে চাহিয়া দেখিল। মাস্টার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন, বলিলেন, আমি আর খাব না এখন, চার পেয়ালা হয়ে গেছে।

দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

নিবারণবাবু পেয়ালায় এক চুমুক দিয়াই বলিলেন, কাণ্ডটা দেখেছেন।

ভনুটু তখনও চুমুক দেয় নাই, বলিল, কি, লাইট হয়েছে বুঝি?

খেয়ে দেখুন না মশাই, লাইট তো হয়েইছে, চিনি পর্যন্ত দেয় নি! ওরে আসৃমি, আসৃমি!

আসাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল।

চিনি নিয়ে আয় তো একটু। দার্জি চায়ে চিনি দেয় নি।

আসাম একটু পরেই চিনির টিন ও একটি চামচ লইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং হাসি চাপিতে চাপিতে উভয়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইয়া দিয়া গেল। আসামের বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, বেশ চালাক চটপটে মেয়ে, রঙ কালো হইলেও দার্জির মত অতটা কুশ্রী নয়।

চা পান করিতে করিতে নিবারণবাবু বলিলেন, ভনুটুবাবু, আপনি তো পাঁচ জায়গায় ঘোরেন, একটু খোঁজখবর রাখবেন, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে একটু ঝাড়া-হাত-পা হওয়া যায়।

ভনুটু বলিল, বাজার বড় খারাপ। কি বলেন মাস্টারবাবু?

মাস্টার বলিলেন, হ্যাঃ।

চা পান শেষ করিয়া ভনুটু উঠিয়া পড়িল। ভাবিয়া দেখিল, টাকার কথাটা এখন পাড়িলে ঠিক সুবিধাজনক হইবে না, অথচ প্রয়োজন কালই। কাল একবার আসিতে হইবে। উপায় কি?

এইবার উঠি আমি।

এরই মধ্যে উঠবেন?

হ্যাঁ, কাজ আছে, আবার আসব কাল।

ভনুটু বাহির হইয়া গেল।

ভনুটু চলিয়া গেলে মাস্টার খুব রহস্যময় একটি উক্তি করিলেন।

দাঁও মাফিক খুব একটা দামী কারবার করেছি আজ।

চায়ের সেই এজেণ্টটা এসেছিল নাকি ? আমি তাকে পাঁচ আনা পাউণ্ডের বেশি দর দিতে রাজি নই, তুমি আবার বেফাঁস কিছু বল নি তো ?

আরে না না। তুমি যে ধাঁ ক'রে একেবারে অন্য লাইনেই চ'লে গেলে !

অন্য লাইনে মানে ? ঠিক লাইনেই আছি। ওই ডাস্ট চায়ের পাঁচ আনার বেশি দর দেওয়া যায় ?

কি মুশকিল, কথাটা শোনই শেষ পর্যন্ত। আমি বলছি গতের কথা, তুমি একেবারে চায়ের এজেণ্ট এনে ফেললে !

গৎ ? কিসের গৎ ?

কি আশ্চর্য, আকাশ থেকে পড়লে যে একেবারে ! বলি নি তোমাকে পরশুদিন যে, হোসেন মিঞা সেতারার খুব ভাল একটা গতের খাতার সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে ? অনেক পৈরবী ক'রে তিলোককামোদটা টুকে এনেছি আজ। দেখে এলাম, ইয়া মোটা খাতা—বহু গৎ আছে। দাঁড়াও না, সব হাতাব ক্রমশ। চা-টা খাইয়ে লোকটাকে খুব তোয়াজ করেছি আজ ; একটু যেন ভিজেছে মনে হচ্ছে।

এতবড় একটা সুসংবাদ শুনিয়াও কিন্তু নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন না। নীরবে পকেট হইতে বিড়ির কৌটাটি বাহির করিয়া নীরবেই একটি বিড়ি ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিলেন। গতের খাতার মালিক সেই রোগা লম্বা লোকটিকে তিনি দেখিয়াছেন এবং মাস্টারের সঙ্গে ভাব জমাইয়া সে যে দোকানে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় চা খাইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। চা যাক, দুই-এক পেয়ালা চায়ে বিশেষ আসিয়া যাইবে না, কিন্তু কাল হইতে উক্ত তিলোককামোদ গৎ তাঁহার উপর ভর করিবে, ইহাই ভাবিয়া নিবারণবাবু একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। 'পিলু'টাকে লইয়াই তো নাজেহাল হইতে হইয়াছে'।

এ বয়সে কি আর ওসব পোষায় ! অথচ মাস্টার লোকটা নাছোড়বান্দা, তবলা তিনি বাজাইবেনই ; এবং মুশকিল এই যে, তবলা যন্ত্রটা একা একা বাজানো যায় না ।

সঙ্গত করিবার জন্য নিবারণবাবুকে সেতার বাজাইতে হয় ।

এককালে অবশ্য খুবই শখ ছিল, কিন্তু এখন আর ওসব পোষায় না। নিতান্ত মাস্টারের খাতিরেই তিনি রাজি হইয়াছেন । শরণাগত আশ্রিত লোককে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না, লোকটা গুণীও বটে । অথচ—

কাল থেকে গৎখানায় হাত দিয়ে ফেল, দু-তিন দিনে রপ্ত ক'রে ফেলা চাই ।

বিড়িতে একটা টান দিয়া বিমর্ষ নিবারণ বলিলেন, দেখি ।

সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলিত, কিন্তু অকস্মাৎ ভন্টুর পুনরাবির্ভাবে তাহা আর ঘটিল না। ভন্টু প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদা, ঘোর জালে প'ড়ে এসেছি ।

কি হ'ল ?

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মনিব্যাগ গ্যাণ্ডিফায়েড ।

গ্যাণ্ডিফায়েড ! মানে ? পকেট-মারা গেছে নাকি ?

স্টোন ডেড ।

এখানে ফেলে-টেলে যান নি তো ?

দেখুন ।

সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজা হইল, মনিব্যাগ পাওয়া গেল না ।

ভন্টু বলিল, ওতেই আমার যথাসর্বস্ব ছিল দাদা । গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিন, কাল থেকে তা না হ'লে ফাস্টিং আপিস খুলতে হবে। দয়া করুন দাদা ।

ভন্টু নিবারণের পদধূলি লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল ।

আহা, টাকা আপনাকে দিচ্ছি, অমন করছেন কেন ? বসুন ।

ভন্টু উপবেশন করিল ।

৩২

শিরীষবাবুর বাসায় বসিয়া মুকুজ্জেমশাই পত্র লিখিতেছিলেন। শিরীষবাবুর কন্যা অমিয়া আসিয়া হাজির হইল। অমিয়ার বয়স বারো বছরের বেশি নয়, বোধ হয় কমই হইবে। অথচ ইহারই বিবাহের জন্য শিরীষবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহারই জন্য পাত্র-সংগ্রহ-কার্যে মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন, এ কথা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। এখনও মুকুজ্জেমশাই সেই কার্যেই ব্যাপৃত আছেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাবের বিশেষত্ব—যখন যাহাতে লাগেন, তাহার চরম করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য সহজ কঠিন সরল জটিল যত প্রকার উপায় মাথায় আসে সবগুলিই করিয়া দেখেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কলিকাতার এবং মফস্বলের যাবতীয় কলেজ হইতে অবিবাহিত কায়স্থ যুবকগণের নাম-ধাম-পরিচয় সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। ফলে, নানারকম চিঠিপত্র কোষ্ঠী জমিয়া এবং সেগুলি নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত হইয়া নানা রঙের ফাইল স্ফীত করিতেছিল। অর্থাৎ মুকুজ্জেমশাই ছোটখাটো একটি আপিস খুলিয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরনের কার্যেই তিনি আনন্দ পান এবং কার্যটি যতই দুঃসাধ্য ও জটিল হয়, ততই যেন তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। মধ্যবিত্ত বহু গৃহস্থের বহু কঠিন সমস্যার সমাধান মুকুজ্জেমশাই বহুবার নিঃস্বার্থভাবে করিয়াছেন। করিয়া আনন্দ পান, এইটুকুই বোধ হয় তাঁহার স্বার্থ।

এই সংক্রান্ত ছয়খানি চিঠি লেখা তিনি সকাল হইতে বসিয়া শেষ করিয়াছেন, সপ্তম চিঠিখানি লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া বলিল, মা বললে, আপনি হাত পা ধুয়ে আহ্নিক ক'রে নিন, আর ব'সে চিঠি লিখতে হবে না।

মুকুজ্জেমশাই লিখিতে লিখিতে একটু হাসিলেন।

এত চিঠি রোজ রোজ কোথায় লেখেন আপনি? এত লিখতেও পারেন!

মুকুজ্জেমশাই হাস্যস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই যে হয়ে গেল। এখন আর লিখব না, এইটে শেষ ক'রে নিই। আবার তিনি পত্ররচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অমিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিল। উজ্জ্বল শ্যাম মেয়েটির বর্ণ, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে নাক মুখ চোখে তেমন বিশেষ কোন সৌন্দর্য নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে মেয়েটির মুখশ্রীতে সুন্দর একটি লাবণ্য আছে। অতিশয় সরল পবিত্র অনাড়ম্বর অন্তরের প্রতিচ্ছবি সমস্ত মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া এমন একটি কোমল কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে।

অমিয়া আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এত চিঠি আপনি রোজ রোজ কাকে লেখেন দাদামশাই?

তোর শ্বশুর-ভাশুরকে।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ নয়—সত্যি তাই।

আমার তো বিয়েই হয় নি এখনও, শ্বশুর-ভাশুর পাবেন কোথা?

আছে এক জায়গায়।

কোথায়?

তা এখন বলব কেন?

মুকুজ্জেমশাই চিঠিখানি খামে পুরিতে পুরিতে খুব রহস্যময়ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। একটি প্রশ্ন অনেকদিন হইতেই অমিয়ার অন্তর আলোড়িত করিতেছিল, নিজে সে ইহার সমাধান করিতে পারে নাই, অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। দাদামশাইকে

শিরীষবাবু বলিলেন, দশটা বেজে গেছে, আপনি আর দেরি করবেন না, সুশীল ব'সে আছে।

এই যে উঠি।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া অমিয়ার সহিত বাড়ির ভিতরে গেলেন। অনেক কাজ এখনও বাকি। স্নান করিবেন, আহ্নিক করিবেন, স্বপাক ভাতে-ভাত দুইটি ফুটাইয়া লইবেন, আহারাদি করিয়া মৃন্ময়ের একবার খবর লইবেন। যদিও খবর পাইয়াছেন যে, মৃন্ময় সুস্থ আছে, তথাপি একবার যাইতে হইবে, তাহা না হইলে পাগলীটা অনর্থ বাধাইবে।

শিরীষবাবু ক্যালেণ্ডারের শিব ও প্রাচীর-বিলম্বিত হস্তাঙ্ক ঠাকুর-দেবতার ছবিকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারও আপিসের দেরি হইয়া গিয়াছে।

৩৩

এত রূঢ় আঘাত প্রিয়বাবু জীবনে আর কখনও পান নাই। বেলা যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। কি একটা সামান্য কথা হইতে কি হইয়া দাঁড়াইল! প্রথম যেদিন বেলা চলিয়া গেলেন, প্রিয়বাবু আশা করিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই রাগটা কমিলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া গেল, বেলা ফিরিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বেলার গানের মাস্টার অপূর্ববাবু আসিয়া হাজির হইলেন। অদ্ভুত লোক এই অপূর্ববাবু! বেলাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন। মিনমিন করিয়া কথাবার্তা কন, ভদ্রলোকের মধ্যে কিছুমাত্র যদি পদার্থ আছে! ইঁহাকেই তিনি এ যাবৎ মাসে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা গনিয়া দিয়াছেন, অথচ এই সামান্য উপকারটি ভদ্রলোক করিতে পারিলেন না। বেলা যখন

তাঁহাকে ফোন করিয়া ডাকিলেন এবং সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন উনি কি হিসাবে তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্করের সহিত যাইতে দিলেন, তাহা প্রিয়বাবু ভাবিয়া পাইলেন না। রাগ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না! লোকটি কেবল ছিমছাম পোশাক পরিয়া 'অনুগ্রহ ক'রে' 'আশা করি' 'যদি কিছু মনে না করেন' প্রভৃতি কতকগুলি মোলায়েম অর্থহীন বুলি অসংলগ্নভাবে আওড়াইতেই পারেন, আর কোন কর্মের নন। নিরীহ অপূর্ববাবুর প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় প্রিয়বাবুর সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকের পাউডার-মাখা মুখে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহাকে ইচ্ছাটি সম্বরণ করিতে হইল। কারণ, এই জাতীয় উত্তেজনাজনিত আকস্মিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া জীবনে তিনি বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন। একবার একটা সাহেবকে মারিয়া চাকুরি গিয়াছিল; বেলাও যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাও এই হঠকারিতার জন্য। দ্বিতীয়ত, অপূর্ববাবুকে চটাইলে বেলার নাগাল পাওয়া শক্ত হইবে। অপূর্ববাবু শঙ্করবাবুকে চেনেন। তাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অপূর্ববাবুর সাহায্যে বেলার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কে এই শঙ্করবাবু? বেলার সহিত তাহার পরিচয় কবে হইতে এবং কি সূত্রে—প্রিয়বাবু কিছুই জানেন না। অপূর্ববাবুও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রিয়বাবু যদি বেলাকে ভাল করিয়া না চিনিতেন, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত শঙ্করবাবুর সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের নাটকীয় পরিকল্পনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু বেলাকে তিনি ভাল করিয়াই চেনেন। তাঁহার অসীম অহঙ্কার এবং পুরুষ-জাতির প্রতি অসীম অবজ্ঞার কথা প্রিয়বাবুর অপেক্ষা বেশি আর কে জানে! সুলভ উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইবার মত প্রকৃতি বেলার নয়।

হালকা ফুলটির মত তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবেন, কিন্তু সহজে ডুবিবেন না। ডুবিলে এতদিন ডুবিয়া যাইতেন। তরঙ্গও অনেক আসিয়াছিল এবং উচ্ছ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেলার এই পদ্মপত্রজাতীয় অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য প্রিয়বাবু মুখে অনেক চটাচটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি এইজন্যই বেলাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং ভয়ও করেন। বেলার দুর্দমনীয় স্বভাব প্রিয়বাবুর অনেক উৎকণ্ঠার ও নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সেই দুর্দমনীয় ব্যক্তিটি যখন তাঁহার সমস্ত একগুঁয়েমি লইয়া সহসা সরিয়া গেলেন, তখন প্রিয়বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বেলাবিহীন তাঁহার জীবন মস্তবড় একটা নিরর্থক শূন্যতা। বেলা ব্যতীত অপর কেহই সে শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারে না। সেদিন রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, বেলার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা এখন তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন। বস্তুত বিবাহ করিবার কোন কল্পনাই তাঁহার মাথায় নাই। প্রিয়বাবু বর্তমান যুগের সুবিধাবাদী সেই যুবকগোষ্ঠীর একজন, যাহারা নানা অজুহাতে নিজেরা বিবাহ করে না, কিন্তু যাহারা নিজেদের ভগ্নীদের বিবাহ দিবার জন্য সর্বদাই সমুৎসুক—অর্থাৎ নিজেরাই শুধু যে কোন দায়িত্ব লইতে চাহে না তাহা নয়, নিজেদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী অথবা অন্য কোন পোষ্যার দায়িত্বভারও ভদ্রভাবে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বর্তমান সমাজের শিথিল বিধি-ব্যবস্থার কল্যাণে অবিবাহিত থাকিলেও ইহাদের চলিয়া যায় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সাধ্য বিলাসপ্রবণতার স্রোতে কোনক্রমে ভাসিয়া থাকিবার মত সামান্য কিছু হয়তো ইহারা উপার্জন করে, কিন্তু সে উপার্জন সপরিবারে বিলাসের স্রোতে ভাসিবার মত সুপ্রচুর

নহে। বিলাস বর্জন করিয়া জীবনের বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে ইহারা অনিচ্ছুক। যতটা সম্ভব হালকাভাবে এবং ভালভাবে ভাসিয়া থাকিতে পারাটাই ইহাদের লক্ষ্য; ঝামেলা জুটাইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করিতে ইহারা চাহে না, পারেও না। সুতরাং প্রিয়বাবুর বিবাহ করিবার কোনরূপ কল্পনাই ছিল না। সেদিন শুধু রাগের মাথায় আর কোন যুক্তি না পাইয়া এই মিথ্যা কথাটাকে তিনি জোর গলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য এখন মনে মনে তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। বেলা চলিয়া যাওয়াতে আর একটা কথাও তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া বেলাকে স্কন্ধ হইতে নামাইবার বহুপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে, সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন প্রথা-অনুযায়ী। আজ বেলার অনুপস্থিতিতে তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন যে, বেলাকে ছাড়িয়া তিনি একদণ্ড থাকিতে পারিবেন না। সে মুখরা দুর্বিনীতা বোনটিকে তাঁহার চাই, সে তাঁহার জীবনের যে অংশটি জুড়িয়া বসিয়া ছিল, সেখানে আর কাহাকেও বসানো চলিবে না। যে তীক্ষ্ণ দন্তটি সুযোগ পাইলেই কুট করিয়া জিহ্বাকে কামড়াইয়া দিত, সেই তীক্ষ্ণ দন্তটির অন্তর্ধানে জিহ্বা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই শূন্য স্থানটায় বারম্বার ডগাটুকু বাড়াইয়া আকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

সেদিন শঙ্করবাবু লোকটিকে তো তেমন খারাপ বলিয়া মনে হইল না। রাস্তায় অবশ্য দুই মিনিটের জন্য দেখা, কিন্তু ওই দুই মিনিটেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। ভদ্রলোকের চোখে মুখে কি যেন একটা ব্যঞ্জনা আছে, যাহা আকৃষ্ট করে। শঙ্করবাবুর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া প্রফেসার গুপ্তের নিকটও প্রিয়বাবু গিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তের আচার-ব্যবহারেও নিছক ভদ্রতা

ছাড়া আর কোন কিছু পান নাই। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বাগবাজারের বাসার ঠিকানা তো দিলেনই, আশ্বাসও দিলেন যে, তিনি মিস মল্লিককে বুঝাইয়া বলিবেন যেন তিনি এই সামান্য কলহটা মিটাইয়া ফেলেন। প্রফেসার গুপ্তের নিকট হইতে প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংবাদ পাইয়া কিন্তু আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম, বেলা আরও দুইটি টিউশনি যোগাড় করিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা; এবং দ্বিতীয়, তিনি একটি বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই দারোয়ানকে অতিক্রম না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করা যাইবে না। দারোয়ান-প্রসঙ্গে প্রফেসার গুপ্ত যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই।—দারোয়ানটি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ। খুব বিশ্বাসী। এককালে মিলিটারিতে ছিল, এখন পেন্‌শন পাইতেছে। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে কিছুদিন পূর্বে রাখিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তই বেলাকে দারোয়ানটি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বেলাকে 'বেটী' সম্বোধন করিয়াছে এবং নামমাত্র বেতন লইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যোগাযোগ অতি সুন্দর হইয়াছে। জনার্দন সিংহের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটিও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। দেশে ফিরিবার আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। বাকি জিন্দ্‌গীটা সে কলিকাতা শহরেই 'বিতাইয়া' দিতে অর্থাৎ অতিবাহিত করিতে চায়। সে পেন্‌শন যাহা পায় তাহাতে তাহার খাওয়া-পরাটা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু বাড়িভাড়া করিতে গেলে সঙ্কুলান হয় না। প্রফেসার গুপ্তের ওখানে সে আনন্দেই ছিল, কিন্তু মুখরা মাঈজীর অত্যাচারে সে টিকিতে পারে নাই। কোথাও মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই পাইলেই তাহার চলে, সামান্য কিছু বেতন পাইলে আরও ভাল, কিন্তু স-সম্মানে সে থাকিতে চায়। 'ছোটা বাত' বলিয়া কেহ তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিলে সে সহ্য

করিতে পারিবে না। সুতরাং বেলার সহিত তাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। অতবড় বাসাটায় বেলার পক্ষে একা থাকা শক্ত এবং জনার্দনের পক্ষেও এমন একটা বাসা পাওয়া শক্ত। জনার্দন বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, স্নেহশীল। বেলাকে সে প্রকৃতই বেটীর ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমস্ত শুনিয়া প্রিয়বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, ভোজপুরী জনার্দন হয়তো তাঁহাকে ভিতরে যাইতেই দিবে না। অবশ্য জনার্দন না থাকিলেও যে প্রিয়বাবু নিঃশঙ্কচিত্তে যাইতে পারিতেন তাহা নয়, কিন্তু জনার্দন থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বাড়িটার আশেপাশে আনাচে-কানাচে প্রিয়বাবু দুই-একদিন সঙ্গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, অপূর্ববাবুকে দূত করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিতে হইবে। বেলার জিনিসপত্র এস্রাজ সেতার কাপড়-চোপড় অপূর্ববাবুর মারফৎ বেলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বেলার মনোভাবটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহার পর দেখা যাইবে। অপূর্ববাবুকে বেলা নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন না।

রবিবার সকালে গাড়ির মাথায় জিনিসপত্র লইয়া অপূর্ববাবু বেলা দেবীর বাসার দরজায় আসিয়া নামিলেন। দরজা খোলা ছিল, ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় জনার্দন সিং বাহির হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জেরাসে ঠহর যাইয়ে বাবুসাহেব।

জনার্দন সিংহের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অপূর্ববাবু একটু ভড়কাইয়া গেলেন। মুখখানা সত্যই যেন সিংহের মত। মোচার মত কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফ মহিষের শিঙের মত যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বলিষ্ঠ চোয়াল, মাংসল নাক এবং তীক্ষ্ণচক্ষুসম্পন্ন জনার্দন সিং কিন্তু যথোচিত বিনয়সহকারেই প্রশ্ন করিল।

কেয়া মাংতে হেঁ আপ্ হুজুর ?

থতমত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, মিস মল্লিকের জিনিসপত্রগুলো এনেছি। মাঈজী কাঁহা ?

মাঈজী অন্দরমে হেঁ। আপ জেরিসে ঠহর যাইয়ে, হাম তুরন্ত খবর দে দেতে হেঁ। হুজুরকা নাম ?

অপূর্ববাবু।

অপূরববাবু।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক পরেই বেলা দেবী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন।

ও, আপনি এসেছেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। গাড়ির মাথায় ওসব কি ?

গলা-খাঁকারি দিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, আপনারই জিনিস-পত্রগুলো, অর্থাৎ প্রিয়বাবুর সিচুয়েশনটা একটু, আমাকে তাই রিকোয়েস্ট্ করলেন—

অপূর্ববাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেটি মুখের সামনে ধরিয়া বার দুই কাসিলেন।

বেলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। চক্ষু পুনরায় হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, আচ্ছা বেশ, নামাতে বলুন তা হ'লে ওগুলো।

জনার্দন সিং নিকটেই ছিল, বলিল, আপ লোক ভিতর যাইয়ে, হাম্ কুল্ বন্দোবস্ত্ কর্ দেতে হেঁ।

অপূর্ববাবু ও বেলা ভিতরে গেলেন।

অপূর্ববাবু দেখিলেন, ইহারই মধ্যে একখানি ঘর বেশ সুন্দরভাবে বেলা দেবী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাশের একটি ঘরে ইক্মিকে রান্না হইতেছে। বেলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কোনরকমে মাথা

খোঁজবার একটা জায়গা যোগাড় করেছি। আমার সবচেয়ে দুঃখ ঐইটে যে, আপনাকে ছাড়তে হ'ল। আমার আর একটা টিউশনি যোগাড় হ'লেই আবার আপনাকে খবর দেব আমি। আরও শিখতে চাই।

অপূর্ববাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

টাকার কথা পেড়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না, মানে, আপনার যদি দরকার হয়, এমনিই এসে আমি— মানে, সন্ধ্যাবেলাটা ফ্রীও আছি আজকাল—

সন্ধ্যাবেলা আমি যে ফ্রী নেই। তা ছাড়া বিনা পয়সায় আপনাকে আমি খাটাব কেন, বাঃ!

না না, তার জন্যে কি হয়েছে? পয়সাটাকেই সব সময়ে প্রমিনেন্স্ দেওয়াটা—অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু গলা-খাঁকারি দিয়া নীরব হইলেন।

চা খাবেন এক কাপ?

বেশ তো, যদি আপনার অসুবিধে না হয়।

না, অসুবিধে আবার কিসের?

বেলা নূতন প্রাইমাস স্টোভটি জ্বালিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে, বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল এবং উপরের দাঁত কয়টি অধরকে দংশন করিতে লাগিল। অপূর্ববাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত নীরবতার মধ্যেই চা-প্রস্তুত-পর্ব শেষ হইল। চা পান করিতে করিতে অপূর্ববাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলাকে বিনা পয়সায় পড়াইলেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—এই কথাটি ঠিক কি ভাবে বলিলে বেলার পক্ষে কন্ভিন্সিং হইবে, অর্থাৎ—

আপনি যাবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে যাবেন, দাদাকে দেব। আপনি চা খান ততক্ষণ, আমি লিখে নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

বেলা দেবী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিজের ছোট কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো টেবিলটির উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর লিখিলেন—

দাদা,

অপূর্ববাবুর কাছে তোমাকে খাটো করবার ইচ্ছে হ'ল না ব'লেই জিনিসগুলো ফেরত দিলাম না। কিন্তু ওগুলো আমি ব্যবহার করতে পারব না, ওসব প'ড়ে থাকবে। নূতন বউদিদির যদি গান-বাজনার শখ থাকে, এস্রাজ আর সেতারটা কাজে লাগতে পারে হয়তো। আমি ভদ্রভাবে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছি, আমার জন্যে অনর্থক ভেবে তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমার একটা পেট চ'লে যাবেই। ইতি—

প্রণতা বেলা

খামে মুড়িয়া পত্রখানি অপূর্ববাবুর হাতে আনিয়া দিতেই একটু ইতস্তত করিয়া রুমাল দিয়া বারকয়েক ঘাড় মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বসিয়া থাকিবার আর তো কোন সঙ্গত অজুহাত নাই!

মিস মল্লিক, গানের জন্যে আমাকে যদি আপনার দরকার হয়, তা হ'লে আন্‌হেজিটেটিংলি, মানে—

আচ্ছা, দরকার হ'লে খবর দেব।

নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই প্রফেসার গুপ্তের মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত জনার্দন সিংয়ের পুরাতন মনিব। সুতরাং সে সেলাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রফেসার গুপ্ত মোটর হইতে নামিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, মাঈজীকে একটু খবর দাও।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপ্ জেরাসে ঠহর যাইয়ে হুজুর, মাঈজী আস্নান কর্ রহি হয়।

প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলার এখানে এখন আসিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই আকর্ষণ বেশি। প্রয়োজনীয় কত জিনিসই তো করিবার আছে, কিন্তু করা হয় নাই। বেলার সহিত দেখা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, দেখা করাটাই প্রয়োজন। বাড়িতে ডিস্পেপ্সিয়াগ্রস্ত খিটখিটে প্রৌঢ়া গৃহিণীর নানারূপ গঞ্জনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইয়া বেড়ানোটাই প্রফেসার গুপ্তের স্বভাব। তিনি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিস লইয়া কচকচি তাঁহার ভালই লাগে না। সুযোগ পাইলেই মোটরখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বেলার বাসাটি তাঁহার আড্ডা দিবার স্থান হইয়াছে। বেলা মেয়েটিকে এখনও কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়েটি কেমন যেন একটু রহস্যময়। কেমন যেন একটা স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহার লীলা-চঞ্চল সজীবতা, উচ্ছল যৌবন-ভঙ্গিমা, পরিহাস-মধুর কথাবার্তা মনকে উতলা করিয়া তোলে, কিন্তু হাত বাড়াইলেই কোথায় যেন ঠেকিয়া যায়। ব্যবধানটা ঠিক যেন কাচের প্রাচীর, স্বচ্ছ অথচ শক্ত। সব দেখা যায়, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই বোধ হয় মনকে আরও লোলুপ করিয়া তোলে। প্রফেসার গুপ্ত এখনও ঠিক লোলুপ হইয়া উঠেন নাই, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ঔৎসুক্যভরে তিনি এই তরুণীটিকে লক্ষ্য করিতেছেন। বেলার শুধু যে তারুণ্য আছে তাহা নয়, বৈশিষ্ট্যও আছে।

স্নান সমাপন করিয়া বেলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আপনি এমন সময় হঠাৎ যে আজ?

প্রফেসার গুপ্ত কয়েক সেকেণ্ড কোন উত্তরই দিলেন না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

হঠাৎ? আজকের আসাটাকে 'হঠাৎ' ব'লে মনে হ'ল যে হঠাৎ?

এমন সময় আর কোনদিন আসেন না তো?

আজ রবিবার, ছুটি আছে। নিছক গল্প করতেই শুধু আসি নি, কাজের কথাও আছে। অচিনবাবু ব'লে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ ক'রে দিন।

কথাবার্তা বিশেষ চালাই নি, একটা শুধু দরখাস্ত করেছি।

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না, খবর পেলাম, লোকটা সুবিধের নয়।

তাই নাকি?

প্রশ্ন করিয়া বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমাকে এখুনি এক জায়গায় বেরোতে হবে।

বেশ, ও-বেলা আসা যাবে, আমারও একটা কাজ আছে গড়পারের দিকে, সেরে ফেলি সেটা। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? ওই দিকে হয় তো, আসুন, আপনাকে একটা লিফ্ট দিয়ে যাই।

না, ওদিকে নয়, আমি যাব ভবানীপুরের দিকে। আপনি যান।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলেন।

বেলা কোথাও গেলেন না, কারণ তাঁহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৩৪

প্রোটোটাইপ ওরফে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার জীবনের প্রথম প্রেম যে স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা সহসা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বেলা শুধু যে

তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ প্রিয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়। ভদ্রলোক কেমন যেন এক রকম হইয়া গিয়াছেন। বেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন অর্থহীনভাবে চাহিয়া থাকেন এবং শেষে অসম্ভব রকম একটা উত্তর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। লক্ষ্মণবাবু তুইবার প্রশ্ন করিয়া তুই রকম উত্তর পাইয়াছে। প্রিয়বাবু প্রথমবার বলিয়াছিলেন যে, বেলা মামার বাড়ি গিয়াছেন, তুই-চারি দিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন। তুই-চারি দিন পরে বেলা যখন আসিলেন না, তখন লক্ষ্মণবাবু অতিশয় সঙ্কোচভরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মর্মান্তিক। অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে প্রিয়বাবু বলিয়াছিলেন, আপনাদের পাঁচজনের জন্যেই তো সে চ'লে গেল। সে ঠিক করেছে, চাকরি ক'রে স্বাধীনভাবে থাকবে।

আমাদের জন্যে?

প্রিয়বাবু কোন উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সেই হইতে কথাটা চিন্তা করিতেছে। তাহার নিজের মনেও ক্রমশ সন্দেহটা দৃঢ়তর হইতেছে। বেলা হয়তো উত্যক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কথা তো সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না যে, বেলাকে একবার দেখিবার জন্য, তাঁহার গান শুনিবার জন্য সে নানা ছুতায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কোন অজুহাতে বেলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। হয়তো তাহার এই মনোযোগ বেলার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; হয়তো তাহার এই কাঙালপনার জন্য বেলা মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। লুব্ধ ভিখারীকে এড়াইবার জন্য লোকে যেমন সরিয়া যায়, বেলাও হয়তো তেমনই তাহার পথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আলোকিত চৌরঙ্গীর বিচিত্র সৌন্দর্য, দ্রুতগামী অসংখ্য মোটর, নানা বেশে সজ্জিত চঞ্চল জনতা, সমস্ত যেন তাহার নিকট নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার মানদণ্ডটি সহসা যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, সেবার যখন অনার্স পাইল না, তখনও মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। সে পড়াশোনায় অবহেলা করে নাই, দিনরাত্রি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল, অথচ অনার্স পাইল না। কোন আশাই তো জীবনে তাহার পূর্ণ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এম. এ.টা ভাল করিয়া পাস করিয়া অন্তত একটা ফার্স্ট-ক্লাস অর্জন করিয়া অনার্স না পাওয়ার ক্ষোভটা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বাবা তাহাতে বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আর পড়াশোনা করিয়া কাজ নাই, দোকান দেখ গিয়া। পিতার অবাধ্য হইবার মত শিক্ষা অথবা যোগ্যতা লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। পিতার আদেশ মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই রূঢ়-আঘাতটা কম বেদনাদায়ক হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. হইয়া কোন কলেজের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা ভাঙা সাইকেলের দোকানের ময়লা চটের উপর বসিয়া ফাটা টিউব-টায়ার মেরামত করিতে লাগিয়া যাওয়া লক্ষ্মণবাবুর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নাই। কিন্তু বিপত্নীক পিতার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন, দাদাও সেদিন মারা গেলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নাই। দোকান দেখিবার মত মনের অবস্থা নয়। তাঁহাকে এ অবস্থায় সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়াই লক্ষ্মণবাবু দোকানে বসিতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু কই, দোকানে বসিয়াও সে বাবাকে সুখী করিতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না! বাবা রোজই তাহাকে অকর্মণ্য বলিয়া গালাগালি দেন, উপহাস করেন। শেষে নিজেই পুনরায় দোকানে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সামান্ত একটা সাইকেলের দোকানের ভার লইবার মত যোগ্যতাও তাহার নাই? সত্যই নাই। অনর্গল মিথ্যা সে বলিতে পারে না, অথচ সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইলে যে চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন, তাহারও অভাব। সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্ত নিজের আদর্শ খর্ব করিয়াছে। কিন্তু পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। জীবনের জন্মলগ্নে বসিয়া কোন্ দুষ্টগ্রহ যে জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিতেছে, তাহা জানিয়াও তো লাভ নাই। বক্শি মহাশয়কে দিয়া গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইয়া কি লাভ হইয়াছে? কিছু যে হইবে না, তাহা অবশ্য বক্শি মহাশয় বলিয়াছিলেন। বক্শি মহাশয়ের কথাগুলা লক্ষণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল—কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করলেই যদি রুষ্টগ্রহ তুষ্ট হ'ত, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভবপর হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। আপনারাও নাছোড়, আমরাও টাকার দরকার—তাই এইসব প্রহসনের অভিনয় করতে হয়।

অদ্ভুত লোক ওই বক্শি। স্বস্ত্যয়ন করিয়া কিছু তো হয় নাই। সহসা মৃতা জননীর মুখখানা লক্ষণবাবুর মনে পড়িল। তিনি সর্বদাই যেন শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ব্রত, উপবাস, আচার, নিয়ম করিয়া তিনি আজীবন শঙ্কিতচিত্তে সকলের মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতা যে আবার বিবাহ করিয়া মায়ের স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই, এইজন্যই সে পিতার প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাহার গৌরবহীন আদর্শচ্যুত জীবনে পিতার পত্নী-নিষ্ঠাই একমাত্র জিনিস ছিল যাহা গৌরব করিবার মত। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণবাবু নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় পিতা তাহাকে বসাইয়া যেখানে যান, তাহা ভদ্রপল্লী নহে। সেখানে তাঁহার একজন রক্ষিতা আছে। লক্ষ্মণবাবুর জীবনে গৌরব

করিবার মত আর কিছু রহিল না। সমস্ত জীবনটা একটা ভাঙা সাইকেলের দোকানে ময়লা চটের উপর বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সাধ্বী মাতাকে প্রত্যহ এতবার অপমান করিতেছে, তাহারই খোশামোদ করিয়া, তাহারই সঞ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে ধন্য মনে করিতে হইবে। তাহার পর হয়তো কালক্রমে এক অপরিচিতা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বেলার স্মৃতি সুগোপনে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত আজীবন প্রেমের ভান করিতে হইবে। দিব্যচক্ষে লক্ষ্মণবাবু তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের এই সম্ভাব্য আলেখ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। চৌরঙ্গীর প্রতি সৌধশীর্ষে নানাবর্ণের আলো জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—আবার জ্বলিতেছে। সম্মুখের পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তা দিয়া বিচিত্র আকারের কত মোটর আসিতেছে, যাইতেছে। জনতার স্রোত নির্বিকার সমারোহে বহিয়া চলিয়াছে।

নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্মণবাবু মানবনির্মিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের দিকে চাহিল না। চাহিলে দেখিতে পাইত, অন্ধকার মহাশূন্য ; কেবল অন্ধকারই নহে, সেখানে জ্যোতিষ্কও আছে।

৩৫

প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর শঙ্কর যখন হস্টেলে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। কিন্তু সমস্ত অবসাদ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল—যখন সে দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি তাহার জন্য একটি পত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া সে খুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। যদি দুঃসংবাদ থাকে ? যদি মিষ্টিদিদি লিখিয়া থাকেন যে, বিবাহ হওয়া অসম্ভব ? তখন সে কি করিবে ? আর যাহাই করুক, প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আর যাওয়া

চলিবে না। রিনির সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে হইবে। এই নিদারুণ পরিণতির কথা মনে হওয়া মাত্র শঙ্করের চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কেন সে মিষ্টিদিদিকে এসব কথা বলিতে গেল? যেমন চলিতেছিল, আরও কিছুকাল তেমনই ভাবেই না হয় চলিত। আরও কিছুকাল রিনির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার মনের কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর কথাটা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে এমনভাবে আবিল করিয়া তোলা ঠিক হয় নাই। পত্রখানা হাতে করিয়া শঙ্কর স্পন্দিতবক্ষে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাও অসম্ভব। পত্রটি খুলিতে হইল।—

শঙ্করবাবু,

সুসংবাদ আছে। আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। আপনি আপনার দিকটা সামলান। অনেক কথা আছে, যা চিঠিতে লেখা ঠিক নয়। আপনি যদি আসেন আজ একবার, বড় ভাল হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সোনা দিল্লীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। আপনি সেদিন সেই দুপুরে এসেছিলেন, তার পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে সোনা চ'লে গেল। অনেক অনুরোধ করলাম, কিছুতেই থাকল না। কি যে তার হ'ল, জানি না। আপনি আজ সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় আসবেন। আমি ঘটকালি করছি, আমার কিছু মজুরি চাই, অমনই ছাড়ছি না। আসবেন নিশ্চয়ই। —মিষ্টিদি

একবার নয়, বার বার শঙ্কর পত্রখানি পড়িল। নিজের উত্তেজনার আতিশয্যে সোনাদিদির অকস্মাৎ দিল্লী চলিয়া যাওয়ার কোন বিশেষ অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বরং তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সোনাদিদিকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি গিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি ছাড়া

বাড়িতে আর কেহ নাই। মিষ্টিদিদিও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না, তিনি স্নান করিতেছিলেন। সেই বালক-ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বলিল যে, মাঈজী এখনই আসিতেছেন, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার নজরে পড়িল—টেবিলের উপর কি একখানা বই রহিয়াছে। বইখানা টানিয়া লইয়া দেখিল, জেম্‌স্ জয়েসের 'ইউলিসিস'। বইটার নাম শুনিয়াছিল, পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। পিছনে এক জায়গায় পেন্সিল মার্ক দেওয়া ছিল, সেখানে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; এবং কখন যে সে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর স্রোতে তলাইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ফিকে সবুজ রঙের অদ্ভুত পাতলা একটা শাড়ি তাঁহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শঙ্কর চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়াছে!

মিষ্টিদিদিই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

খুব চটছেন তো একা ব'সে ব'সে? কি বই ওখানা, দেখি? ও, 'ইউলিসিস'! যা-তা সব গাঁজাখুরি গল্প। অমন আবার নাকি হয়? কেন যে বইখানার অত নাম, আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারা সাহিত্যিক মানুষ।

একটু হাসি গোপন করিয়া মিষ্টিদিদি সম্মুখের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন ও শঙ্করের হাত হইতে বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন করিলেন, পড়েছেন বইটা?

না।

নিয়ে যান তা হ'লে। অনেক খবর পাবেন। এইবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এসব খবর জানাও দরকার এখন আপনার।

শঙ্কর একটু হাসিল।

মিষ্টিদিদি তাহা দেখিয়া ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে হাস্য-বর্ষণ করিয়া বলিলেন, হাসছেন যে বড়? অনেক কিছু শিখতে হবে এবার। নারী নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস, আর তাকে বিয়ে ক'রে সুখী করা আর এক জিনিস।—বলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বইখানি মুড়িয়া সেটি শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিই বলুন না, মেয়েরা কিসে সুখী হয়? অত বড় বই পড়বার দরকার কি? আপনি তো পড়েছেন বইখানা, নিজের অভিজ্ঞতাও আছে কিছু—

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এসব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেলে কিছু হয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিল। সে-ই চা ছাঁকিতে যাইতেছিল; মিষ্টিদিদি বলিলেন, আমিই ছাঁকছি, তুই নীচেয় যা, সায়েব হয়তো এখুনি আসবেন।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রফেসার মিত্র আসবেন কখন? কোথা গেছেন তিনি?

একটু বিরক্তকণ্ঠে মিষ্টিদিদি বলিলেন, কলেজ, মীটিং, ডিনার, লেক্‌চার, শেলি, শেক্সপীয়ার—এই সব নিয়েই আছেন উনি, আর কারও দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই ওঁর। একটা মানুষের চেয়ে বইয়ের আলমারিটা ওঁর কাছে বেশি দরকারী।

মিষ্টিদিদি চা ছাঁকিতে লাগিলেন।

রিনি কোথা?

শঙ্কর অবশেষে মরিয়া হইয়া প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল।

রিনি? আপনি আসবেন শুনেই সে পালিয়েছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, যা লাজুক মেয়ে, দেখবেন, ওর লজ্জা ভাঙাতেই এক যুগ কাটবে আপনার।

ইহার উত্তরেও শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শঙ্করকে এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি জোলা পড়েছেন?

না।

মোপাসাঁ?

না।

কি পড়েছেন তা হ'লে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

মিষ্টিদিদি নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভারতচন্দ্র?

না, এখনও পড়ি নি।

মিষ্টিদিদি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, নিতান্ত শিশু আপনি। ফীডিং-বট্‌লে দুধ খাবার অবস্থা পার হয় নি এখনও আপনার। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে' পড়েছেন তো?

পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

অতি চমৎকার।

বিমলার ওপর রাগ হয় নি তো আপনার?

না।

'নষ্টনীড়ে'র বউদিদির ওপরেও তো চটেন নি!

চটব কেন? কি যে বলেন আপনি!

মিষ্টিদিদি আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চা-টুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর তখনও চা পান করে নাই, খাবারগুলি খাইতেছিল। মিষ্টি-দিদি বলিলেন, চা খান, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরও খাবার আনতে বলি? প্যাটিগুলো কেমন হয়েছে? আরও আসুক দুখানা, কি বলেন?

আসুক।

মিষ্টিদিদি ঘণ্টা বাজাইলেন ও বলিলেন, গরম চাও একটু আনতে বলি, এ চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়।

হাত দিয়া শঙ্করের কাপের উত্তাপ অনুভব করিয়া মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, এ তো একেবারে হিম।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল ও আদেশ লইয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর শেষ প্যাটিখানিতে কামড় দিয়া বলিল, সুন্দর হয়েছে প্যাটিগুলো।

মাথা নাড়িয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আসলে আপনার খিদে পেয়েছে খুব।

খিদে পাবে না? সেই কখন কলেজ থেকে ফিরে মাত্র খানছয়েক লুচি খেয়েছি।

বুঝেছি, আপনার খিদে একটু বেশি। চেহারা দেখলেই তা মনে হয়।

চেহারা দেখে খিদে বোঝা যায়? আপনি ফিজিওনমিও চর্চা করেন নাকি?

তা একটু একটু করি বইকি। আপনার পুরু পুরু ঠোঁট দুটো দেখলেই মনে হয়, ভয়ানক লোভী আপনি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেয়ারা আরও প্যাটি ও গরম চা দিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, এ প্যাটি কি আপনার বাবুর্চি তৈরি করেছে? চমৎকার করেছে কিন্তু।

আমি করেছি, সোনার কাছে শিখেছিলাম।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি, সোনাদি হঠাৎ চ'লে গেলেন কেন বলুন তো?

মিষ্টিদিদি ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? আপনিও সেদিন দুপুরে চ'লে গেলেন, সোনাও বাক্স গোছাতে বসল, পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে গেল। এত ক'রে থাকতে বললুম, কিছুতেই রইল না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, স্বামীকে ছেড়ে আছেও তো অনেকদিন, দোষও দেওয়া যায় না বেচারাকে।

মিষ্টিদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শঙ্কর প্যাটি ও চা লইয়া ব্যস্ত ছিল, হাসিটুকু দেখিতে পাইল না। হঠাৎ মিষ্টিদিদি বলিলেন, মোপাসাঁর Une Vie পড়েন নি, না?

না।

পড়ুন তা হ'লে। পড়া উচিত আপনার, আমার প্রাইভেট লাইব্রেরিতে আছে বইখানা, দাঁড়ান দিচ্ছি, এই ঘরেই আছে।

ঘরের কোণে একটা আলমারি ছিল, তাহার কপাটগুলাও কাঠের, কাচ নাই। মিষ্টিদিদি উঠিয়া সেই আলমারিটা খুলিয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। শঙ্কর দেখিল, আলমারিতে এক-আধখানা নয়, বহু পুস্তক রহিয়াছে। বই দেখিলেই শঙ্কর কেমন যেন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। পড়ুক আর নাই পড়ুক, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে চা-টুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া মিষ্টিদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টিদিদির পাতলা ফিকা সবুজ শাড়িটার উপর ইলেকট্রিক

আলো পড়িয়া শঙ্করের মনে কেমন যেন একটা অপরূপ মোহ সৃজন করিতেছিল। মিষ্টিদিদি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছিলেন।

এই নীচের তাকেই কোথায় যে রেখেছি, মনেও থাকে না ছাই।

শঙ্কর উপরের তাক হইতে মোটা চামড়া-দিয়া-বাঁধানো একখানা বই লইয়া খুলিয়া দেখিতে গেল বইখানা কি, খুলিয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য গতিহীন হইয়া আবার উন্মাদবেগে বহিতে লাগিল। বই নয়, ফোটো-অ্যালবাম। এসব কি ফোটো? শঙ্করের সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। মিষ্টিদিদি আর একটু হেঁট হইয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় শঙ্কর অ্যালবামটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মিষ্টিদিদি দেখিয়া ফেলেন নাই তো? কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক, ফোটোগুলি আর একবার দেখিতে হইবে। মিষ্টিদিদির পানে সে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি তেমনই হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছেন। ফিকা সবুজ পাতলা শাড়িটার উপর প্রখর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়াছে। স্পন্দিতবক্ষে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

না, এ ঘরে নেই দেখছি। দাঁড়ান, নীচে আছে বোধ হয়, দেখে আসি। একটুখানি বসুন আপনি, বেশি দেরি হবে না আমার।

মধুর হাসিয়া মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। আলমারি খোলাই রহিল। সন্তর্পণে শঙ্কর চোরের মত উঠিয়া গিয়া অ্যালবামটি বাহির করিয়া ফোটোগুলি দেখিতে লাগিল, রোগী যেমন করিয়া আচার চুরি করিয়া খায়।

...হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ। শঙ্কর তাড়াতাড়ি অ্যালবামটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মিষ্টিদিদি নয়, রিনি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে

দাঁড়াইল। শঙ্করকে দেখিয়া একটু সলজ্জ অথচ গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টিদিদিও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রিনি এসেছে, দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কি লজ্জা মেয়ের, কিছুতে ওপরে আসবে না।

শঙ্কর বলিল, বইটা পেলেন?

না, বইটা নীচেতেও তো নেই। এই আলমারিটাতেই তো যেন রেখেছিলাম। দাঁড়ান, দেখি আর একবার। ওদিককার ওই সুইচটা টিপে দিন তো, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল।

শঙ্কর অবশ্য আলোর অভাব অনুভব করিতেছিল না, তবু আরও একটা আলো জ্বালিয়া দিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় বইখানা খুঁজিতে লাগিলেন। হয়তো আলোর অভাবেই এতক্ষণ বইখানা পাওয়া যাইতেছিল না, এইবার পাওয়া গেল।

মিষ্টিদিদি বইখানা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিলেন, আর কাউকে দেবেন না কিন্তু। বইখানা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল। অনেক দাম ওর।

শঙ্কর বইটা খুলিয়া দেখিল, টকটকে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে, To sweet Ye from sweet O, নীচে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটা তারিখ।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, বেচারী মারা গেছে। ওরই সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি?

বইখানা পকেট পুরিয়া শঙ্কর বলিল, যত্ন ক'রে পড়ব। এখন উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন কি? রিনির সঙ্গে একটু গল্প করুন। কোনও কথাই হ'ল না যে!

না, অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আসব। আজ থাক্।

বিয়ের কথা লিখেছিলেন বাড়িতে ?

না, এখনও লিখি নি, লিখব এবার। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে, মনের মধ্যে, সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা শুধু যে অবর্ণনীয় তাহা নহে, অভূতপূর্ব। এমন উন্মাদনা তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

নেশায় টলিতে টলিতে সে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

৩৬

যদিও মৃন্ময় হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া বাড়িতে আসিয়াছে, তবু হাসির মনে স্বস্তি নাই। হাঁটিতে গেলে এখনও হাঁটুতে খচখচ করিয়া যখন একটু বেদনা লাগিতেছে, তখন আরও কিছুদিন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া একেবারে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া উঠা-হাঁটা করিলেই তো ভাল হয়। কিন্তু মৃন্ময় কিছুতে তাহার কথা শুনিবে কি! ওই পা লইয়াই বিশ্ব জয় করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিবেশী পরেশবাবুর বাড়িতে একটি ছেলে ডাক্তারি পাস করিয়াছে। পরেশবাবুর পিসীকে ধরিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া একটি মালিশের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হাসি লিখাইয়া লইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, এই মালিশটি দিন-কয়েক ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইয়া দিলেই ওই সামান্য ব্যথাটুকু সারিয়া যাইবে। হাসি আজ তিন দিন ধরিয়া মালিশ আনাইয়া রাখিয়াছে, মৃন্ময়ের কিন্তু ফুরসৎ হইতেছে না। রোজই একটা না একটা কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আজ হাসি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছে, যেমন করিয়া হউক মালিশ করিবেই। 'রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিয়া দিলে চলে, কিন্তু

মৃন্ময় তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, বিছানা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাণের চেয়ে বিছানা বড় হইল! অদ্ভুত লোক! অথচ দিনের বেলায় নানা কাজের ছুতায় কিছুতেই করিতে দিবে না। এমন কাজ-পাগল মানুষ হাসি আর কখনও দেখে নাই। আজ বৈকালে থাকী হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-পরা কে একটা মিনসে আসিয়াছিল, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাহার পর তাহারই সহিত আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। কখন যে ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই। মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে হাসির। তিন দিন ধরিয়া ওষুধটা পড়িয়া আছে, পড়িয়া পড়িয়া শেষটা হয়তো খারাপ হইয়া যাইবে। ঝাঁজ চলিয়া গেলে কখনও ফল হয়?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। চিন্ময় নিজের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পাগলী কই রে?

যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আপনি আপনার অমিয়াকে নিয়ে থাকুন গিয়ে।—বলিয়া হাসি উঠিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিল।

হাসি চাপিতে চাপিতে আসনে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চ'লে যেতে বলছিস, আবার আসন পেতে দিলি যে?

ইহার উত্তর না দিয়া হাসি ঘসঘস করিয়া বেগুন কুটিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, ভারি ওঁর এক অমিয়া হয়েছেন, সেই ছুতোয় আর এদিকে মাড়ানোই হয় না! একেবারে সেইখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! আমরা যেন কেউ নই!

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সুখে

আছিস। অমিয়া বেচারীর বিয়েটা দিয়ে দিই, থাম্। তোর তো দুঃখু নেই আর।

বিয়ে আর দিতে হবে না কারুর। বিয়ে দিয়ে তারি স্বর্গে তুলেছেন আমাকে! এক অন্যমনস্ক দামাল দুরন্ত লোক, কখন কি যে ক'রে বসে তার ঠিক নেই; তাকে সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হয়েছে আমার।

মুকুজ্জেমশাই কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

হাসছেন যে বড়? থামুন, আপনার অমিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে একদিন ব'লে দিয়ে আসছি, সে যেন কিছুতে না বিয়ে করে। এমন পাপের ভোগ আর নেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন, কি হয়েছে তাই বল্ না?

না, ক্ষেপবে না! তিন দিন ধ'রে মালিশের ওষুধ নিয়ে ব'সে আছি, ফুরসৎই হচ্ছে না বাবুর; তারপর হাঁটু ফুলে পেকে একাকার হয়ে উঠুক, আবার তাই নিয়ে ভুগি আমি কিছুদিন।

কিসের মালিশ?

আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে তবু। আজ মালিশ না করলে ও-ওষুধে আর ফলই হবে না! ওষুধ বেশি বাসী হয়ে গেলে কি আর ফল হয়?

আরে পাগলী, কিসের ওষুধ তাই বল্ না।

মালিশ, মালিশ। সে হাঁটুর ব্যথা এখনও সারে নি, তাই নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। মালিশের ওষুধ আনিয়ে রেখেছি সেই কবে, আজ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না। আজ আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, একটু বসুন, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে।

আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে রে!

লক্ষ্মীটি, একটুখানি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে ও। তামাক খাবেন? আপনার জন্যে হুঁকো কলকে তামাক টিকে সব আনিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনারই দেখা নেই, তামাক খাবে কে? ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, নেবে এস না একবার।

চিন্ময় নামিয়া আসিল ও মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া পুলকিত হইল। আপনি কখন এলেন?

মুকুজ্জেমশাই তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমে একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, এই এখুনি।

হাসি চিন্ময়কে বলিল, তুমি ওঁকে নিয়ে ওপরের ঘরটায় ব'স গিয়ে, আমি তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। উনি এসেই পালাই পালাই করছেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কেন? বেশ তো ব'সে আছি।

না, এখানে বসতে হবে না, যা ঠাণ্ডা, ভিজে সপসপ করছে। আপনি ওপরেই গিয়ে বসুন।

মুকুজ্জেমশাই পুনরায় বলিলেন, তোর তরকারি কোটা হয়ে গেল?

ভারি তো তরকারি কোটা! হাতে কোন কাজ ছিল না ব'লে কাল সকালকার জন্যে কুটে রাখছিলুম।

চিন্ময় বলিল, চলুন ওপরে।

মুকুজ্জেমশাইকে উঠিতে হইল।

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাসি উপরে আসিয়া দেখিল, বাঘ-বকরির ছক পাতিয়া মুকুজ্জেমশাই চিনুর সহিত খেলিতে বসিয়াছেন। হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, দেখুন, জল ঠিক হয়েছে কি না। তাহার পর বক্রকটাক্ষে চিন্ময়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখন বুঝি পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না, আমি খেলতে চাইলেই যত ক্ষতি হয়?

বাঃ, রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার সঙ্গে বাঘ-বকরি খেললে আমার ক্লাসের টাস্ক্‌ কে ক'রে দেবে? আর ভারি তো খেলতে জানেন, খেলতে বসলেই তো হেরে যান!

তোমার মত চুরি করতে পারি না ব'লেই হেরে যাই। মিথ্যুক কোথাকার, ক্লাসের টাস্ক্‌, না হাতী। ক্লাসে তোমাদের গীতা পড়া হয়, না আনন্দমঠ পড়া হয়? জানেন দাদামশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে খালি যা-তা বই পড়বে ব'সে।

মুকুজ্জেমশাই হুঁকার জল ঠিক করিয়া এবং হুঁকার উপর কলিকাটি স্থাপন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত এবং মুখে মৃদু হাসি। আরও দুই-একবার টানিয়া চিন্ময়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, বাড়িতে আবার অত পড়া কেন? বাঘ-বকরি খেলাই তো ভাল। এস, এবার শুরু করা যাক, তুমি বাঘ হবে, না বকরি?

চিন্ময় বলিল, আসুন, টস করা যাক।

হাসি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, টস! টস আবার কি?

একটা পয়সা দাও না তুমি, আচ্ছা থাক্‌, আমার কাছেই আছে একটা পয়সা।

চিন্ময় উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা পয়সা বাহির করিল এবং যথারীতি টস করিল। চিন্ময় বাঘ হইল এবং মুকুজ্জেমশাই বকরি হইলেন। হাসি নীরবে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার বলিল, জোচ্চুরির নতুন একটা ফন্দি শিখেছে দেখছি। বকরি হ'লে ও কিছুতে পারে না, খালি হেরে যায়, কেমন চালাকি ক'রে বাঘ হয়ে গেল, দেখলেন?

মুকুজ্জেমশাই যেন বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেছেন না এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া হাসির দিকে চাহিয়া বলিলেন, সব চালাকি বার করছি, দেখ্‌ না।

এতে আবার জোচ্চুরি কোথা দেখলে তুমি ?

চিন্ময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিন্ময়ের অকৃত্রিম হাসির তোড়ে হাসি বেচারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মুখে সে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, তোমাকে চিনি না আমি যেন!

খেলা চলিতে লাগিল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

মৃন্ময় যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, চিন্ময়ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, হাসি কেবল একা জাগিয়া বসিয়া আছে। মৃন্ময় ভিতরে ঢুকিতেই হাসি কিছু না বলিয়া কেবল তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিল, কি, হ'ল কি ?

হবে আর কি, রোজ যেমন হয়, খাও-দাও শুয়ে পড়, মালিশটা পড়ুক।

দরকার কি মালিশের ? ব্যথা তো ক'মে গেছে, প্রায় নেই বললেই হয়।

তবু একেবারে সারে নি তো ? চল, আগে মালিশ ক'রে দিই, তারপর খাবে। খুব খিদে পায় নি তো ?

খিদে ? না, খিদে খুব পায় নি। কিন্তু এখনও আমার একটু কাজ বাকি আছে, কদিন থেকে করাই হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি সেরে নিই সেটা। এক্ষুনি আসছি আমি।

মৃন্ময় বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘরে খিল দিয়া স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাঁকা বৃন্তের উপর রক্তজবার মত বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে মৃন্ময়

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া সে যেন স্বর্ণলতার কাছে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই চিঠি লেখায় বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কই, আগে তো এমন হইত না! একটু ইতস্তত করিয়া সে লিখিতে শুরু করিল—

প্রিয়তমাসু,

আমার অপরাধ অমার্জনীয় তাহা জানি, কিন্তু আমি তোমাকেও জানি, সেইজন্য আমার ভয় নাই। একটা কথা আজ তোমাকে বলিতে চাই। এ কথা আমার সহকর্মী মিস্টার মজুমদার ছাড়া আর কেহ জানে না। হাসিকেও জানাই নাই। হাসি নিতান্ত ছেলেমানুষ, শুনিলে হয়তো কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে এবং বলিবে, পুলিসের চাকরি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তোমার জন্যই পুলিসে চাকরি লইয়াছি এবং তোমাকে যতদিন না খুঁজিয়া পাইতেছি, ততদিন এ চাকরি আমি ছাড়িব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। প্রাণ তো যাইতেই বসিয়াছিল, সেই কথাই আজ তোমায় বলিব। কয়েক-দিন পূর্বে আমি মোটর-চাপা পড়িয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমি অন্যমনস্ক লোক বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যমনস্কতার জন্য আমি চাপা পড়ি নাই। যে লোকটা আমাকে চাপা দিয়াছিল, সে যেন পিছু পিছু ছুটিয়া তাড়া করিয়া আমাকে চাপা দিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, লোকটা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে চাপা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একবার এক ওয়েটিং-রুমে একটা লোক লুকাইয়া আমার ফোটো লইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া আমিও গোপনে তাহার ফোটো লই। সেই ফোটোর সাহায্যে মিস্টার মজুমদার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকটার নাম অচিনবাবু, মোটরের দালালি করে। লোকটার কি উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। পুলিসে চাকরি করা বিপজ্জনক, কিন্তু তোমার জন্য আমি সমস্ত বিপদই

বরণ করিব। একটা সুসংবাদও আছে। কর্তৃপক্ষ আমার শরীররক্ষী-হিসাবে দুইজন সশস্ত্র লোক দিয়াছেন এবং আমাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, খরচ তাঁহারাই দিবেন। একটা বড় বম্ব্-কেসের অনুসন্ধানের ভারও আমার উপর পড়িয়াছে। যদি ইহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারি, কাজে উন্নতি হইবে। তখন তোমাকে খোঁজার আরও সুবিধা হইবে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমাকে হয়তো আর খুঁজিয়া পাইব না। হয়তো তুমি আর বাঁচিয়া নাই, কিংবা হয়তো বাঁচিয়া থাকিলেও আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমাকে খুঁজিতেছ কি? নানারকম অসম্ভব কথা মনে হয়। আমার এ দুর্বলতার জন্য আমাকে মাপ করিও। আমার যতদিন শক্তি আছে, ততদিন তোমাকে খুঁজিব এবং যতদিন পাগল না হইয়া যাই, তোমার আশায় থাকিব···

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিল।

হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

৩৭

শৈল আপন মনে বসিয়া আলপনা দিতেছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার উপবাস করিয়া সে লক্ষ্মীপূজা করে, তাহারই আয়োজন চলিতেছিল। ঠাকুর-দেবতার প্রতি শৈলর খুব যে একটা ভক্তি আছে তাহা নয়, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, শৈল লক্ষ্মীপূজা করে সময় কাটাইবার জন্য। সোয়েটার বোনা, লক্ষ্মীপূজা করা, আচার জেলি প্রস্তুত করা, কার্পেটে ফুল তোলা, এমন কি ঝিয়ের মেয়ের ফ্রক বানাইয়া দেওয়া—সমস্তই শৈল করে তাহার সত্যকার কিছু করিবার নাই বলিয়া। একা একা বসিয়া থাকিলে অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে, এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সমস্ত জীবন-

কেমন যেন দৈন্যনিপীড়িত ব্যর্থতা বলিয়া মনে হয়। কিছুই করিবার নাই। স্বামী নিজে এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ যে, তাঁহার জন্য কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই; এমন কি তাঁহার জামায় বোতাম লাগাইবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু সমস্তই বাহিরের ঘরে থাকে, তাঁহার অপিসের চাপরাসী সে সমস্ত তত্ত্বাবধান করে; এবং তাঁহার খাস-চাকরটি এমন ভাল যে, শৈলর কোন কিছু করিবার, এমন কি দেখিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। মিস্টার বোস হাবজা-গোবজা শাকচচ্চড়ি স্থক্তো-ডালনা পছন্দ করেন না, সাহেবী খানাই তাঁহার পছন্দ। বেশি মসলা পেয়াজ দেওয়া মাংস অথবা তরকারি তিনি বরদাস্তই করিতে পারেন না। একটু ঝাল বেশি হইলেই মেজাজ এবং অর্শ বিগড়াইয়া যায়। সাহেবদের মত রোস্ট-স্টু প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্যই তাঁহার খাদ্য। তরিতরকারিও শুধু সিদ্ধ করিয়া খান এবং এসব জিনিস তাঁহার বাবুর্চিই ভালমত করিতে পারে। একেবারে মসলা না দিয়া রান্না করিতে শৈল ঠিক কেমন যেন পারে না। বাবুর্চিরা টুকিটাকি কি সব জিনিস দিয়া মাংসের রঙ গন্ধ করে, তাহা শৈলর জানা নাই। শৈল যে ইচ্ছা করিলে এসব শিখতে পারে না তাহা নয়, বরং সে শিখিবার চেষ্টাও একদা করিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই বোস সাহেব এমন টিটকারি দিতেন যে, রাগ করিয়া শৈল শেষকালে বাবুর্চির হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছে। শুধু টিটকারির জন্যই নয়, বাবুর্চি রাখাটা বোস সাহেবের স্টাইলের পক্ষেই অপরিহার্য। মিসেস বোস রান্নাঘরে উবু হইয়া বসিয়া রান্না করিতেছে, ইহা মিস্টার বোসের পক্ষে সম্মান-হানিকর। সুতরাং বাহিরের জন্য বাবুর্চি এবং অন্দরের জন্য রাঁধুনী রাখিতেই হইয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের পক্ষে যাহা অশোভন, তাহা কি করা চলে? গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে শৈলর প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগিত। স্বামীকে

রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারিবে না, এ আবার কি রকম ব্যবস্থা? কিন্তু ক্রমশ এই সাহেবিয়ানা তাহার সহিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সবই সহিয়া যায়। এখন কচিৎ-কদাচিৎ দুই-একটা শৌখিন খাবার, তাহাও জ্যাম জেলি প্যাটি কাটলেট-জাতীয় বিজাতীয় খাবার, সে প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং বোস সাহেব তাহা একটু চাখিয়া প্রশংসা করিলে সে খুশি হয়। মাঝে মাঝে রান্না করিবার অর্থাৎ দিশী ধরনের রান্না করিবার শখ হইলে শঙ্করদাকে সে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু শঙ্করদারও আজকাল দেখা পাওয়া মুশকিল। কখন সে যে কোথায় থাকে, বলা যায় না।··· শৈলর সময় কাটে কি করিয়া? যে পাড়ায় তাহারা থাকে, তাহাও বাঙালীপাড়া নহে যে, পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া খানিকটা সময় কাটিবে। আশেপাশে সকলেই অফিসার শ্রেণীর, সকলেই কেতা-দুরস্ত। পরনিন্দা পরচর্চা তাহারা যে করে না তাহা নহে, কেতা-দুরস্তভাবে করে। শৈল তাহা ঠিক পারে না। যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে যাওয়াই যায় না। তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালী। হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, না হয় মাদ্রাজী, না হয় মারহাট্টা। ইংরেজীতে কথা না বলিতে পারিলে আলাপ করাই চলে না। এই সব অসুবিধার জন্য শৈল পারতপক্ষে ইহাদের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া? বৃহস্পতিবারটা অন্তত লক্ষ্মীপূজার কল্যাণে ভালভাবেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্য দিনগুলি যেন আর কাটিতেই চায় না। বোস সাহেব সমস্ত দিন আপিসে থাকেন, সন্ধ্যায় আসিয়াই ক্লাবে চলিয়া যান। যেদিন ক্লাবে যান না, সেদিন হয় কোন পার্টি না কোন বন্ধুর বাড়িতে ডিনার থাকে। শৈলর কেমন যেন মনে হয়, এই ক্লাব-পার্টি-ডিনার প্রভৃতিও চাকরির একটা অঙ্গ। ভালভাবে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে ক্লাব-পার্টি-ডিনারে যোগ না দিলে চলে না। বড় বড় সাহেব-সুবো সেখানে আসে। অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন

তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, টেনিস খেল্রে, তাস খেলে, কিন্তু শৈল ঠিক ওসব পারে না। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরূপ। তাহার স্বামীর সঙ্গে অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব করে, সে তেমন পারে না। সে যে ইংরেজী বলিতে পারে না বলিয়াই পারে না তাহা নহে, ইংরেজী বলিতে পারিলেও সে পারিত না। যখন তখন অমন হাসি, অমন বিস্ময়, অমন ওজন-করা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইবার সে ঠিক করিয়াছে, ইংরেজী শিখিবে। বোস সাহেবের তাহাতে শুধু যে অমত নাই তাহা নয়, পূর্ণ উৎসাহ আছে। শৈল ঠিক করিয়াছে, শুধু ইংরেজী নয়, গান-বাজনাও কিছু শিখিতে হইবে। কিছু একটা না করিলে সময় যে কাটে না! বোস সাহেব বলিতেছেন, শৈল ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতে পারিলে চাকরির নাকি সুবিধা হয়। উপরওয়ালা সাহেবদের সহিত শৈল যদি সহজভাবে আলাপ-টালাপ করিতে পারে, উন্নতির শিখরে উঠিবার ধাপগুলা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা নাকি সহজ হইবে। কি করিয়া হইবে, তাহা শৈলর বুদ্ধির অতীত। কিন্তু অপর দুই-একজন প্রতিবেশী অফিসারের উন্নতি নাকি তাহাদের পত্নীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দতার জন্যই এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে। ইহা সত্য, মিথ্যা অথবা সম্ভবপর কি না তাহা শৈল জানে না, কিন্তু ইহাই গুজব। কোন অফিসারের কার্যনিপুণতার সহিত যদি একটু আপ-টু-ডেট ধরনের চটুলা পত্নী যুক্তা থাকে, তাহা হইলে উপরওয়ালাদের ওপিনিয়ন নাকি তাড়াতাড়ি ভাল হয়, উন্নতির জন্য বেশি নাকি বেগ পাইতে হয় না। অর্থাৎ দাঁড়ী-মাঝি একটা নৌকাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে নিশ্চয়ই সক্ষম, কিন্তু একখানা নিখুঁত পাল থাকিলে অনুকূল হাওয়ার মুখে আরও সুবিধা হয়। শৈল ইংরেজী শিখিতে রাজি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বোস সাহেবকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে

মিশিতে-টিশিতে সে পারিবে না। সে ইংরেজী শিখিতে চায় এবং বিশেষ করিয়া এস্রাজ বাজাইতে শিখিতে চায় নিজের সময় কাটাইবার জন্য। সময়কে লইয়াই যত সমস্যা। দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘতর সন্ধ্যা আর কাটিতে চায় না। আরও একটা কাজ সে করিয়াছে, অবশ্য খুব লুকাইয়া। ঝিয়ের মারফৎ সন্তানকামনায় একটি মাদুলি সে গোপনে সংগ্রহ করিয়াছে। বোস সাহেব ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। এত ঘটা করিয়া লক্ষীপূজা করিবার ইহাও একটা কারণ। যিনি মাদুলি দিয়াছেন, তিনি লক্ষীপূজাও করিতে বলিয়াছেন। আজ বৃহস্পতিবার, শৈল উপবাস করিয়া লক্ষীপূজার আয়োজন করিতেছে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে, মিস মল্লিক বাহিরের ঘরে আসিয়াছেন, সাহেব তাঁহাকে সেলাম দিতে বলিলেন। শৈল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, বাইরের ঘরে আর কেউ আছে ?

না।

এই আলপনাটুকু দিয়ে যাচ্ছি আমি। বলুগে যা, আমার হাত জোড়া।

বেয়ারা চলিয়া গেল। শৈল খানিকক্ষণ আলপনা দিল। কিন্তু তাহার নারীপ্রকৃতি এই শিক্ষিতা এবং গীতবিদ্যা-পারদর্শিনী মহিলাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আলপনা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল এবং হাত ধুইতে লাগিল। কিন্তু ড্রইং-রুমে তাহাকে যাইতে হইল না, বোস সাহেবই মিস মল্লিককে সঙ্গে করিয়া ভিতরে আসিয়া হাজির হইলেন এবং ইংরেজী কেতায় পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনারা তা হ'লে আলাপ করুন, আমায় কতকগুলো ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে, আমি একটু আপিস-ঘরে যাই। এক্স্‌কিউজ মি মিস মল্লিক ?

বোস সাহেব সহাস্যে 'নড' করিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সবিস্ময়ে শৈলর পানে চাহিয়া

রহিলেন। এত উগ্র সাহেবের পট্টবস্ত্রপরিহিতা পত্নী! আলপনা দিতেছে!

শৈল হাসিমুখে বলিল, চলুন, আমরা ওপরে যাই।

চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেল।

৩৮

সেদিন হইতে শঙ্কর আর মিষ্টিদিদির কাছে যায় নাই। ঔদাসীন্য ইহার কারণ নয়, বরং ঠিক উল্টা, আগ্রহাতিশয্যের অতি-প্রবণতার প্রতিক্রিয়া। ধাবমান তুরঙ্গ ছুটিতে ছুটিতে সহসা সম্মুখে অতলস্পর্শী অলঙ্ঘনীয় গহ্বর দেখিয়া যেমন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, বিহ্বল শঙ্করও তেমনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে হইতেছিল না, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা এবং মোহ তাহাকে প্রলুব্ধও করিতেছিল। এতদিন রিনিই তাহার অন্তরদেশ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মানস-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপরূপ সুর সৃষ্টি করিতেছিল, প্রতি মুহূর্তে রিনিকে ঘিরিয়াই নানা বিচিত্র স্বপ্ন তাহার কল্পলোককে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল, মিষ্টিদিদি তাহার মনোজগতে কোন বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। মিষ্টিদিদি এতদিন নিতান্তই বাহিরের পরিজন ছিলেন এবং রিনির জন্যই শঙ্কর মিষ্টিদিদির সঙ্গ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন মুখে না বলিলেও হাব-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে মিষ্টিদিদি যেন নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইয়াছে। মিষ্টিদিদির এই স্বরূপ এতই ভয়ঙ্কর ও মনোরম, এতই অপ্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, এতই প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট, এতই লোভনীয় ও অসুচিত যে, শঙ্কর দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। এত দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কয়দিন সে কিছুই করিতে পারে নাই। দৈনন্দিন

কর্তব্যকর্ম করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যন্ত্রচালিতবৎ। ক্লাসে যাইতেছে, লেক্‌চার শুনিতেছে, প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাস করিতেছে, পরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিতেছে, কিন্তু আসলে মনে মনে সে এই অতলস্পর্শী গহ্বরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করা ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

বাড়িতেও চিঠি লিখে নাই। বাড়ি হইতে বাবার পত্র পাইয়াছে যে, এখন মাকে কলিকাতায় লইয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। এ পত্র পাইয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। নিজের মায়ের এই নিদারুণ অসুখেও সে উদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। চিন্তিত হইবার ভান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ভাবিয়াছে, তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। অর্থাৎ কোন কিছু করিবার মত মানসিক সক্রিয়তা তাহার নাই। তাহার সম্মোহিত মন একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে যেন তলাইয়া গিয়াছে, সহজভাবে কোন কিছু করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। রিনিকে দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে রিনিদের বাড়ি আর যায় নাই। শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে যায় নাই তাহা নহে, মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়াছে তো! মনের কাছে কিছুই তো অগোচর নাই! নিজের মনের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়াই রিনির নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। নিজের সঙ্কোচ তো আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে ইহাও তাহার মনে হইতেছে যে, হয়তো তাহার চোখে মুখে ব্যবহারে রিনি তাহার অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাইবে, হয়তো ভাবিবে— কি ভাবিবে তাহা আর শঙ্কর ভাবিতে চাহে না, জোর করিয়া অন্য কিছু ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে জবরদস্তি চলে না। রিনির

বিস্মিত ব্যথিত নির্বাক মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, রিনি যেন তাহার কলুষিত সত্তার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কিছু বলিতেছে না। তাহার চোখের দিকে আর সে তাকাইতে পারে না। কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। রিনি তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে, ইহা চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসহ্য। কল্পনার আকাশ-কুসুমে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা, সামান্যতম গ্লানিও স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই ছিল আদর্শ। সেই আদর্শকে সহসা মলিন দেখিয়া শঙ্কর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ রবিবার। সমস্ত দিন কিছু করিবার নাই। গত কয়েকদিন ক্লাস প্রভৃতি লইয়া সময়টা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে, আজ এই অস্বস্তিকর অবকাশ তাহাকে পীড়ন করিতেছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! একই মন তাহাকে কত রকম পরামর্শই না দিতেছে! কত পরস্পর-বিরোধী যুক্তি একসঙ্গে এক নিশ্বাসে বলিতেছে ও খণ্ডন করিতেছে। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন আগে সে একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের সম্মুখে সুমতি-কুমতির তর্ক শ্রবণ করিয়া ভাবিয়াছিল, এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাহা কর্তব্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা যে কোন সুস্থ ব্যক্তি অবিচলিতচিত্তে করিবে। শুধু যে উচিত বলিয়াই করিবে তাহা নয়, করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া করিবে। সুস্থ সবল ব্যক্তির মনে সুমতিরই স্থান আছে, কুমতির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নিজেকেও এতদিন সুস্থ সবল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের মনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু সুমতি কুমতি নয়, বহু প্রকার মতি আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং সকলের যুক্তিই সে সমান আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার কার্যের সমর্থক একটা যুক্তিই কিন্তু ক্রমশ মনের

মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, পুরুষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কি আছে? যে লোলুপ কামনা তাহার মনের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রেরণা যোগাইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক্ষণ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে? সমাজ সংস্কার সমস্তই কৃত্রিম। কৃত্রিমতার জবরদস্তিতে অকৃত্রিম পৌরুষকে, বলিষ্ঠ যৌবনের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল। মিষ্টিদিদিকে সে যাহা ভাবিতেছে, তিনি তাহা নাও হইতে পারেন। জোলা মোপাসাঁ পড়িলেই যে খারাপ হইতে হইবে অথবা কতকগুলি ছবি গোপনে রাখিলেই যে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে, এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। নিছক আর্ট-প্রীতির বশেই এসব করা অসম্ভব নহে। অকারণে হয়তো সে···। তাহার মনের মধ্যে একটা লুব্ধ পশু, একটা ক্ষুব্ধ ঋষি এবং একটা আর্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া তিন রকম চিন্তা করিতে লাগিল। প্রেমিক চিন্তা করিতেছিল না, ধ্যান করিতেছিল, প্রার্থনা করিতেছিল—এ সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া যাক। নির্মল মনের মধ্যে রিনির হাস্যস্নিগ্ধ সলজ্জ মুখখানি সগৌরবে আবার বিরাজ করিতে থাকুক।

সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি পত্র লইয়া আসিয়াছে। সেলাম করিয়া জানাইল, মাঈজী জবাব চাহিয়াছেন।

শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

এর মধ্যেই যে পুরোদস্তুর জামাই হয়ে উঠলেন দেখছি, নেমন্তন্ন না করলে আর আসাই হয় না! রিনি বেচারা কয়েকদিন থেকে মনমরা·

হয়ে আছে, আমার কথা আর নাই বললাম। উনি কাল এক বন্ধুর সঙ্গে গিরিডি গেলেন এই উইক-এণ্ডটা কাটিয়ে আসতে। ভারি একা লাগছে আমাদের। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন নিশ্চয়ই। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন। আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁকে ফোন ক'রে আজও রাত্তিরের মত ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। কটা নাগাদ আসবেন, এর মারফৎ জানাবেন। প্রস্তুত থাকব।—ইতি

মিষ্টিদিদি

চাকরের হাতেই জবাব দিতে হইল, বেশিক্ষণ গবেষণা করিবার অবসর মিলিল না। লিখিয়া দিল, সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে। ব্যাপারটার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপটুভাবে শিস দিতে লাগিল।

৩৯

ওরিজিনাল অর্থাৎ দশরথ সাইকেলের দোকানে বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বেশবাস আগের মতই—টাইট-ফিটিং গলা-বন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার, খাকী হাফপ্যাণ্ট, পায়ে আজানু কপিশবর্ণের মোজা, মাথায় কান-ঢাকা কালো রঙের টুপি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তিনি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হুইতে ধূমপান করিতেছিলেন।

ভন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভন্টুরও সেই সাবেক মূর্তি। মালকোঁচা-মারা, গায়ে বুকখোলা জামা এবং পার্শ্বে সাইকেল। ভন্টু যথাবিধি নমস্কার করিয়া (ওরিজিনালের পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছা এবং সাহস ভন্টুর কোনদিন হয় নাই) বিনীত ভদ্রভাবে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

ওরিজিনাল কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভন্টু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের চোখ দুইটি লাল, হঠাৎ দেখিয়া মনে হয়, চোখ উঠিয়াছে। হয়তো বরাবরই তাঁহার চক্ষুর বর্ণ এইরূপ, কারণ ভন্টু ইতিপূর্বে এত কাছে আসিয়া তাঁহার চক্ষু লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। ওরিজিনালকে চিরকালই সে দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্মণবাবুর সহিতই তাহার কারবার এবং তাহা এ যাবৎ ওরিজিনালের অগোচরেই হইয়াছে। গত তিন-চার দিন হইতে সে কিন্তু লক্ষ্মণবাবুর পাত্তা পাইতেছে না। নিবারণবাবুর চায়ের দোকানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভন্টু দেখিয়াছে, লক্ষ্মণবাবু সন্ধ্যার সময় আসে না। লক্ষ্মণবাবুর বাড়িটাও ঠিক কোন্‌খানে, তাহা ভন্টুর জানা নাই। সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে এই সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত দেখা হইত। গত দুই দিন হইতে কিন্তু প্রোটোটাইপের দেখা নাই। হয়তো তাহার দোকানের ডিউটির সময় বদলাইয়াছে, হয়তো আজকাল সে সন্ধ্যায় না আসিয়া দুপুরে আসিতেছে। ব্যাপারটা ঠিক জানিয়া লওয়া দরকার, কারণ সাইকেলটি পুনরায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে প্রোটোটাইপের হদিস না পাইলে হাঁটিয়া আপিস যাইতে হইবে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাই আজ ভন্টুকে ওরিজিনালের সম্মুখবর্তী হইতে হইয়াছে।

ওরিজিনাল কোন উত্তর দিলেন না। রক্তচক্ষু মেলিয়া ভন্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল এবং পুনরায় সবিনয়ে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

আমি কি লক্ষ্মণবাবু?

এ প্রশ্নের জন্য ভন্‌টু প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সে অবিলম্বে দিল, আজ্ঞে না।

তা হ'লে আমার কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন?

লক্ষ্মণবাবু কখন দোকানে আসেন, তাই জানতে চাইছিলাম।

তিনি দোকানে আর আসেন না, আসবেনও না।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তা হ'লে?

দেখা হবে না।

ওরিজিনাল আবার তাঁহার গড়গড়ায় মন দিলেন।

ভন্‌টু বুঝিল, এখন সুবিধা হইবে না, ভদ্রলোক চরম তিরিক্ষি হইয়া রহিয়াছেন। সে সাইকেলটি ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ওরিজিনাল বলিলেন, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে বসুন ওইখানে।

ওরিজিনাল বাম হস্ত দিয়া তাঁহার গোঁফদাড়িটা একবার চুমরাইয়া লইলেন এবং নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দোকানের সম্মুখে ফুটপাথের উপর যে টিনের চেয়ারটি ছিল, সেইটি দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন, ওইটে একটু এদিকে টেনে এনে বসুন। সাইকেল সারাবেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়, পয়সা সঙ্গে নেই। কত পড়বে, সেইটে লক্ষ্মণবাবুর কাছে জেনে নিতে এসেছিলাম।

আমি ব'লে দিচ্ছি। যে সাইকেলের দোকানে লক্ষ্মণবাবু নেই, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

নীরব থাকাই ভন্‌টু সমীচীন মনে করিল।

ওরিজিনাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, বলুন আপনি, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে বইকি।

ওরিজিনাল তাঁহার রক্তচক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গড়গড়ায় সুদীর্ঘ একটি টান দিলেন এবং আদেশ করিলেন, মটরা, সাইকেলটা তুলে দেখ্, কি কি করতে হবে আর কত পড়বে! আপনি বসুন, চেয়ারটা আর একটু টেনে আসুন এদিকে।

পিছনের ঘর হইতে লুঙ্গি-পরা মটরা বাহির হইয়া আসিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সাইকেলটি পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওরিজিনালের ধমকে নিরস্ত হইল। ওরিজিনাল দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলতে কি কষ্ট বোধ হচ্ছে বাবুর? গতরে কি আগুন লেগেছে হুজুরের?

মটরা অবিলম্বে সাইকেলটা দোকানের উপর তুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনার মত জিনিসটার উপর চাপাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সামনের চাকার টায়ার-টিউব দুটোই নষ্ট হয়েছে, পেছনের চাকার অ্যাক্সেলের নাটটাও বদলাতে হবে। এখন থাক্, পয়সা সঙ্গে আনি নি—

বেশ তো, কাল পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন, কটার সময় চাই কাল?

কাল সকালবেলা পেলেই ভাল হয়।

বেশ, সকালেই পাবেন, তৈরি থাকবে।

মটরা বলিল, নতুন টায়ার ফুরিয়েছে।

চৌধুরীর ওখান থেকে নিয়ে এস গিয়ে। যাও, এখুনি যাও, কাল, সকালেই ওঁর চাই।

সিলিপ দেবেন?

এক ডজন, টায়ারের অর্ডার আমার দেওয়াই আছে, গেলেই পাবে তুমি, পা চালিয়ে যাও।

নটরা চলিয়া গেল।

ওরিজিনাল গড়গড়ায় মন দিলেন। ভন্টুও উঠিবে কি না ভাবিতেছিল, এমন সময় ওরিজিনাল তাহাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

পৃথিবীতে ক রকম লোক আছে জানেন?

মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রো প্রভৃতি কয়েক রকম শ্রেণীবিভাগের কথা ভন্টু পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সব তাহার মনে ছিল না। নিজের বিস্মরণশক্তির পরিচয় দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে সাধারণভাবে বলিল, অনেকরকম।

অনেকরকম নয়; দুরকম, জুয়াচোর আর খাঁটি।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া ওরিজিনালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওরিজিনাল বলিয়া চলিলেন, জুয়াচোরের সংখ্যাই অধিক। খাঁটির সংখ্যা অল্প। অল্প কয়েকটি খাঁটি লোকে একদল জুয়াচোরের পাল্লায় প'ড়ে অহরহই কষ্ট পাচ্ছে, এইটেই হ'ল সার কথা।

এই সার কথা শুনিবার জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, আগ্রহান্বিতও ছিল না। কিন্তু ওরিজিনালকে কথায়-বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো সুবিধা হইতে পারে, এই ভাবিয়া সে তাহার প্রিয় বচনটির পুনরুক্তি করিল। এই জাতীয় লোকের কাছে এই বচনটি আওড়াইয়া ভন্টু প্রায়ই সুফল পাইয়াছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে, মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘ'টে আসছে।

ওরিজিনালও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া বলিলেন, গোটা মহাভারতে মাত্র দুটি খাঁটি লোকের দেখা পাবেন, দুর্যোধন আর ভীম। বাকি সব জুয়াচোর।

ভন্টু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া ওরিজিনালের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

ও কি ?

পায়ের ধুলো নিলাম আপনার, এমন ভাল কথা একটা শোনালেন !

ওরিজিনাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভন্টু ব্যঙ্গ করিল কি না ! কিন্তু ভন্টু সুদক্ষ অভিনেতা, সমস্ত মুখচ্ছবিতে এমন একটা গদগদ শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া তুলিল যে, শেষ পর্যন্ত ওরিজিনাল মনে মনে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ভন্টু বলিল, ওর জন্যে কিছু মনে করবেন না, আপনি লক্ষ্মণবাবুর বাবা, আপনার পায়ের ধুলো নিলে দোষ আর এমন কি আছে ? লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু।

ওরিজিনাল মুখ ফিরাইয়া গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, আপনার বন্ধুটি একটি প্রকাণ্ড জুয়াচোর ছিলেন।

কে, লক্ষ্মণবাবু ?

হ্যাঁ, লক্ষ্মণবাবু।

মানে ?

মানে, আমি তাদেরই জুয়াচোর বলি, যাদের মনে মুখে এক নয়, যারা ~~ভাবে~~ একরকম, করে আর একরকম। গাঁটকাটাদের আমি জুয়াচোর বলি না, তারা খাঁটি লোক।

জুয়াচোরের এবম্বিধ সংজ্ঞা ভন্টু এই প্রথম শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ওরিজিনালের আর একবার পদধূলি সে লয়, কিন্তু ওরিজিনালের কথাবার্তায় এমন একটা আন্তরিকতা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাঁহাকে অপদস্থ করিতে ভন্টুর ইচ্ছা হইল না। ওরিজিনাল গড়গড়ায় আবার একটি টান দিয়া বলিলেন দেখুন, আমি নেশাসক্ত। রীতিমত

মাইনে দিয়ে একজন রক্ষিতাকে আমি রেখেছি, তার কারণ স্ত্রী-বিয়োগের পর দেখলাম, ওসব সংযম-টংযম আমার দ্বারা পোষাবে না, বিয়ে করাও পোষাবে না, তাই আইনত যেটা অন্য উপায় আছে, সেইটেই আমি নিলাম। পেটে খিদে মুখে লাজ—এ রকম ভণ্ডামির কোন মানে আমি বুঝি না। এতে কি যে এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাও আমার মাথাতে আসে না। তুইও একটা রাখলে পারতিস, যার তার আনাচে কানাচে অমন ছুংছুং ক'রে না বেড়িয়ে পছন্দমত একটা মেয়েমানুষ রাখলেই পারতিস। টাকার তো অভাব ছিল না, ন্যায্য খরচে আমি আপত্তিও করি নি কোনদিন।

ওরিজিনাল পুনরায় গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিলেন।

ভন্টু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ওরিজিনালের এই স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সে কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ ওরিজিনাল বলিয়া উঠিলেন, জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এত বড় একটা দাগা দিতে লজ্জা করল না ওর? উনি আবার লেখাপড়া শিখেছিলেন, কচু শিখেছিলেন! গ্র্যাজুয়েট! ঝাড়ু মারি আমি অমন গ্র্যাজুয়েটের মাথায়।

ভন্টু ভাবিল, প্রোটোটাইপ নিশ্চয় কিছু টাকা মারিয়া সরিয়াছে। কি ভাবে কি ঘটিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সহসা ভন্টু লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তিনি নিষ্পলকভাবে সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভন্টু বলিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

ওরিজিনাল হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

খাঁটি লোকের কথা জুয়াচোরেরা বুঝতে পারে না, আপনি বুঝবে

কি ক'রে ? আপনি তো লক্ষ্মণেরই বন্ধু। আমার এই পোশাক দেখে আপনারা হাসেন, কিন্তু আমার শীত করে ব'লে এই পোশাক আমি পরি। লোকের মন রাখবার জন্যে আপনার মত বুক-খোলা জামা প'রে শীতে কেঁপে মরি না। আপনাদের মত মর‍্যাল সেজে ভদ্দর-লোকের বাড়ির জানলার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি না, সোজা বেশ্যাবাড়ি যাই। আমি খিদের সময় চাই খাবার, চা নয়। চটলে লাথি মারি, ভালবাসলে জড়িয়ে ধরি। ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় পছন্দ করি না। আমার কথা আপনারা বুঝবেন না। কোনও জুয়াচোরই কোন খাঁটি লোকের কথা বোঝে নি, বুঝতে পারবে না, পারবে না, পারবে না।

ওরিজিনাল প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ভন্টু ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওরিজিনালের হাত দুইটি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, আপনি অমন করছেন কেন, কি হয়েছে খুলে বলুন না, লক্ষ্মণবাবু কি করেছেন ?

রাস্কেল আত্মহত্যা করেছে, ভেবেছে, আমাকে দমিয়ে দেবে। কিন্তু দমবার ছেলে আমি নই।

ওরিজিনাল দুই হাত দিয়া চক্ষু দুইটি কচলাইতে লাগিলেন।

নির্বাক ভন্টু দাঁড়াইয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

৪০

শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

এত দ্রুতবেগে যে, মনে হইতেছিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়া পলাইতেছে। যে পথে সে চলিতেছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত জনবিরল, যান-বাহনের তেমন ভিড় নাই, থাকিলে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ শঙ্কর পথ দেখিয়া চলিতেছিল না।

আত্মরক্ষার জন্য, যে অদৃশ্য শত্রুটা তাহাকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য ঠিক নাই, গন্তব্যপথ অনির্দিষ্ট, কোথাও পলাইয়া লুকাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে। কিন্তু ইহাও সে বুঝিতেছে, কোথাও পলাইবার তাহার উপায় নাই, কোথাও লুকাইয়া সে নিস্তার পাইবে না, কারণ শত্রু নিজের মধ্যেই রহিয়াছে; যে বৃশ্চিকটা তাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার বাসা তাহার হৃদয়-বিবরেই, অন্য কোথাও নহে। কিন্তু ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা, কি অপরিসীম লজ্জা—রিনি দেখিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মহিমার ছদ্ম মুখোশটা খুলিয়া যে মুহূর্তে ক্লিষ্ট কদর্য পশুটা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই রিনি তাহার স্থূল রূপটা দেখিয়া ফেলিয়াছে। উত্তেজনার আধিক্যে ওদিককার জানালাটা বন্ধ করা হয় নাই।

এতদিনকার সাধের প্রাসাদ নিমেষের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়া সব যেন ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, কোন কিছুর উপর নির্ভর করিবার আর যেন সাহস নাই। এতদিনকার সমস্ত নীতি, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত যুক্তি, সমস্ত শক্তি অপ্রত্যাশিত প্লাবনে কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে; যে ভিত্তির উপর মন এতকাল পরম নির্ভরতার সহিত দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সেই ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে; যাহাকে ভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, তাহা বিরাটকায় অন্ধ একটা সরীসৃপের কুণ্ডলীকৃত ক্লেদাচ্ছন্ন দেহ—নড়িয়া-চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত পটভূমিকাই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল যে রিনিকে পত্নী কল্পনা করিয়া সে এতদিন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে নীত হইয়াছিল; সেই রিনিকে সে আর জীবনে মুখ দেখাইতে পারিবে না। যে মিষ্টিদিদি এই খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত

তাহার অত্যন্ত আপন জন ছিলেন, তাঁহাকে সে জীবনে ক্ষমা করিতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির একারই দোষ? তাহার নিজের লোভ ছিল না? ছিল বইকি। কিন্তু মিষ্টিদিদি না থাকিলে তাহা এমন কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিত না। স্ফুলিঙ্গ হয়তো ছিল, মিষ্টিদিদি তাহাকে দাবানলে পরিণত করিয়াছেন; ওই ক্ষুধিতা রমণীটির আকস্মিক কামনার ঝটিকায় লেলিহান শিখা আকাশ-বিসর্পী হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদির প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে মিষ্টিদিদিকে ভুলিতে পারিতেছিল না। দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে পারিপার্শ্বিকের-সম্বন্ধে-অচেতন মন মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিল। সেই দৃশ্যটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, সেই—

সহসা শঙ্কর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কোথায় চলিয়াছে সে? মনে হইতেছে, যেন এ রাস্তায় সে আর কখনও আসে নাই। কোন্ গলি এ? গলিটা হইতে বাহির হইয়া সে সারকুলার রোডে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই দেখিল সমাধিক্ষেত্র, যে সমাধিক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সমাহিত রহিয়াছেন। সে অন্যমনস্কভাবে ভন্টুর বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল, বেলেঘাটার মোড় ছাড়াইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তাটা পার হইয়া সে সমাধিক্ষেত্রের পাশে আসিয়া একবার দাঁড়াইল, একবার ইচ্ছা হইল, সমাধিক্ষেত্রের ভিতর ঢুকিয়া মধুসূদনের সমাধির পাশে খানিকক্ষণ বসে। কবি মধুসূদনের জীবনে নানা দুঃখ নানা মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, হয়তো জীবনের পরপারে গিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন, হয়তো সে সান্ত্বনার ক্ষীণতম আভাস অন্ধকারে মৌন সমাধির ধারে একা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে পাওয়া যাইবে। শঙ্কর আর একটু গেল, গিয়া দেখিল, গেট বন্ধ। গেটের সামনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে নিজেও জানে না। চেতনা হইলে হঠাৎ সে

দেখিল, ওদিকের ফুটপাথে চলমান একটি নারীমূর্তির পানে সে আগ্রহে চাহিয়া আছে। আঁটসাঁট-পোশাক-পরা একটি মেমসাহেব ওদিকের ফুটপাথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরগুহাবাসী নারীদেহ-লুব্ধ পশুটা তাহারই চোখ দিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নারীমূর্তি চলিয়া গেল, শঙ্কর সহসা স্থির করিল, ভন্টুর বাড়ি সে আর যাইবে না। তাহার কলুষিত মন লইয়া সে এখন বউদিদির সম্মুখীন হইতে পারিবে না। ভন্টুর সম্মুখেই বা সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর আবার হনহন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা রাস্তা নানা গলি অতিক্রম করিয়া শঙ্কর আবার সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, একটা ল্যাম্প-পোস্টের ধারে একফালি সরু বারান্দার উপর রঙিন-কাপড়-পরা কয়েকটি মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আবার একজন কোমরে হাত দিয়া সিগারেট খাইতেছে। দৃশ্যটা শঙ্করের কেমন দৃষ্টিকটু লাগিল, সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মেয়েটির পানে চাহিল। শঙ্করকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া মেয়েগুলিও তাহার পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। যে মেয়েটি সিগারেট খাইতেছিল, সে আরও একটু কায়দা করিয়া মুখ তুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল, একটি মেয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে অল্প একটু অন্ধকারে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, সে রাস্তায় নামিয়া আসিল এবং শঙ্করের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া সঙ্গিনীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একজন সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল, আমার খোঁপাটা একটু ঠিক ক'রে দে তো, বার বার এলিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গিনী খোঁপা ঠিক করিয়া দিল।

মেয়েটি আবার শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চাহিল ও আবার একটু
সিল। শঙ্কর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শঙ্করকে এমন বিমূঢ়ভাবে
ড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই চটুলা মেয়েটিই প্রশ্ন করিল, আপনি
াউকে খুঁজছেন ?

শঙ্কর আগাইয়া গেল এবং মেয়েটির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
লিল, আপনি কি ১৮ নম্বর কেরানীবাগানে থাকেন ?

'আপনি' শুনিয়া মেয়েটি গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার পর আবার
াখ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

শঙ্কর কিছু বলিতে পারিল না ; তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন
াহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় বুক কাটিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

শঙ্কর সহসা বলিয়া ফেলিল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে
ারেন ?

খুব পারি, আসুন।

মেয়েটির পিছন পিছন শঙ্কর অগ্রসর হইল।

বাকি মেয়েগুলির মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, মুক্তোটার কপাল
াল। আমাদের আর কতক্ষণ ভোগান্তি আছে, কে জানে বাপু!

আর একজন একটু হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, ওলো মুক্তো, শুধু জল
িস নি, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিস বাবুকে।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মুক্তো প্রশ্ন করিল, আমার ঠিকানা
াপনি জানলেন কি ক'রে ?

আপনারাই দিয়েছিলেন।

কবে ?

কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে। আমাকে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন
িয়েছিলেন, ভুলে গেছেন ?

মুক্তো হাসিয়া বলিল, ভুলে গেছি।

আপনি হাওড়া স্টেশনে মূর্ছা যান, আমি আপনার মুখে জল দি মূর্ছা ভাঙাই। আপনার সঙ্গে আরও যেন কে ছিলেন একজন।

মুক্তো মন দিয়া কথাগুলি শুনিল; তাহার পর ভঙ্গীভরে স্কন্ধযুগ ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইয়া বলিল, মনে নেই।

অতবড় একটা ঘটনা ভুলে গেছেন? বেশিদিনের তো কথা নয়।

মুক্তোর সমস্ত মনে ছিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না। জিজ্ঞা করিল, শুধু জল খাবেন? খাবার-টাবার—

না, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, মুক্তো কাচের গ্লাসে ঢালিয়া দিল এবং শঙ্ক তাহা ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ বসবেন?

কতক্ষণ আর, এই খানিকক্ষণ, মানে—আপনার কি অসুবি করছি?

কিছুমাত্র না। ঘণ্টা পিছু দু টাকা ক'রে লাগবে, এই আম রেট।

শঙ্কর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ও।

পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিল, একটি দশ টাক নোট রহিয়াছে, সেইটি বাহির করিয়া মুক্তোর হাতে দিতেই মুক্তো খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

বাবা! রাগ তো আপনার কম নয় দেখছি!

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, না, ছি, আপনি অতিথি মানু আমাদের নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছেন বলছেন, আপনার কাছে কি টাক নিতে পারি? সব জায়গায় কি আর ব্যবসাদারি চলে? দাঁড়ি রইলেন কেন? বিছানায় বসুন না, আমি আসছি এক্ষুনি।

মুক্তো বাহির হইয়া গেল।

একটু দেরি করিয়াই ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, ক্লান্ত শঙ্কর তাহার

ানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মুক্তো নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

জঙ্গম

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

বনফুল

তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৪
চতুর্থ মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৫৮
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-[illegible]
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য চার টাকা

জঙ্গম

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শিরীষবাবুর বাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া মুকুজ্জেমশাই, শিরীষবাবু এবং শিরীষবাবুর পত্নী সুশীলাসুন্দরী কথাবার্তা বলিতেছিলেন। সুশীলাসুন্দরী অবশ্য বিশেষ কোন কথাবার্তা বলিতেছিলেন না, তিনি একটু দূরে বসিয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন এবং ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গুরুজনদের সম্মুখে অকারণে বাচালতা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ এবং স্বভাবতই তিনি নীরবপ্রকৃতির। সব কিছু মন দিয়া শোনেন, কিন্তু বেশি কিছু বলেন না।

চিন্তিতমুখে শিরীষবাবু বলিলেন, আপনি যাবেন না, তা হ'লে কি ক'রে হবে? আমার পক্ষে একা—

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হ'লেই বা একা, তারা তো বাঘ-ভালুক নয় যে, তুমি গেলেই টপ ক'রে খেয়ে ফেলবে। তুমি মেয়ের বাপ, তুমি না গেলে চলবে কেন?

শিরীষবাবু মুখটা উঁচু করিয়া চিবুকের তলাটা চুলকাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছেলেটিকে একবার দেখাও হবে, আর ভদ্রলোকের মনোভাবও খানিকটা বোঝা যাবে। চিঠিপত্রে তিনি খোলাখুলি কিছু বলতে চান না, সে তো দেখছ।

শিরীষবাবু চিবুক চুলকানো শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কোঁচা

দিয়া নাকটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সর্দিও করেছে, ভাবছি, ট্রেনে আবার একস্‌পোজার লাগবে। পরের শনিবারে গেলে কেমন হয়? রাজমহলে কদিন লাগবে আপনার?

আদালতের ব্যাপার তো, ঠিক বলা যায় না। সাক্ষী-কাক্কিগুলোও সব ঠিক করতে হবে, তা ছাড়া, মনু হয়তো ছাড়তে চাইবে না, অনেক দিন যাই নি।

সুশীলাসুন্দরী চকিতে একবার মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আবার সুপারি কুঁচানোতে মন দিলেন।

মনু অর্থাৎ মনোরমা নামক বিধবাটির সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রকৃত সম্পর্কটা যে কি, কেহ তাহা জানে না। সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে, কারণ মুকুজ্জেমশাই তাহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। মনোরমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, খুব নিষ্ঠাবতী বিধবা। মুকুজ্জেমশাই যদিও তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু কখনও নিকটে রাখেন না। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত লোকের অভাব নাই, কাহারও না কাহারও পরিবারে মুকুজ্জেমশাই মনোরমাকে রাখিয়া দিয়া নিজে অন্যত্র চলিয়া যান। সাধারণত যে সকল পরিবার মুকুজ্জেমশাইয়ের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে সেই সব পরিবারেই মনুকে তিনি রাখিয়া থাকেন। সম্প্রতি মনোরমা রাজমহলে যে পরিবারে রহিয়াছে, সেই পরিবারের কর্তাটি জেলে গিয়াছেন, আপিসের টাকা ভাঙিয়াছেন—এই তাঁহার অপরাধ। মুকুজ্জেমশাইয়ের ধারণা—লোকটি নিরীহ, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। উকিল ব্যারিস্টার দ্বারা যতটা করা সম্ভব সবই করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়িবেন না ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু গতকল্য মনুর একখানি পত্র আসিয়াছে যে অন্তত দুই-একদিনের জন্য রাজমহলে আসা তাঁহার নিতান্ত দরকার, না

আসিলে মকদ্দমার ক্ষতি হইবে। সেই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুজ্জেমশাইকে যাইতে হইতেছে।

শিরীষবাবু অকূল পাথারে পড়িয়া গিয়াছেন।

শিরীষবাবু মুখের উপর হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন, আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। এতদিন যখন গেছে, তখন দু-চার-দশ দিনে আর কি এমন এসে যাবে! তা ছাড়া, যতই তাড়াতাড়ি করুন, বোশেখের আগে তো আর বিয়ে হচ্ছে না।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হাতে কি খুব বেশি সময় আছে মনে কর তুমি? তিরিশটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে তো জন পনেরোকে বাতিল করা গেছে, কুষ্টির মিল জন-ছয়েকের সঙ্গে হ'ল না। বাকি আছে ন জন, এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যতটা হবার হয়েছে, এইবার দেখাশোনা করা দরকার। সব কটিই সুপাত্র। ন জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমার অন্তত ন সপ্তাহ লাগবে, তোমার তো শনি রবি ছাড়া ছুটি নেই।

শিরীষবাবুকে স্বীকার করিতে হইল, ছুটি নাই। কিন্তু তিনি অবুঝের মত বলিলেন, ন জনকেই দেখতে না হতে পারে। এই শঙ্কর ছেলেটিকেই আমাদের পছন্দ, শঙ্করের বাবা অম্বিকাবাবু আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও। সেজদার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কি যেন সম্পর্ক আছে ওঁদের। ওইখানেই হয়তো হয়ে যাবে। কুষ্টি অনুসারে তাই হওয়া উচিত।

ধর, যদি না হয়!

শিরীষবাবু অবশ্য ধরিতে রাজী নহেন, কিন্তু যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করা মুশকিল। ও-পথে না গিয়া সুতরাং তিনি বলিলেন, বুঝছেন না, আপনি সঙ্গে না থাকলে বেশ জোর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আপনিই সব করেসপন্ডেন্স করেছেন। আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। একা একা এসব ব্যাপারে যাওয়া ঠিক নয়, আমি এর ভাল-মন্দ তেমন বুঝিও না। তা ছাড়া নিজের দায়িত্বে একটা কিছু ক'রে ফেলে শেষে যদি গোলমাল হয়, সুশীলা আমাকে—

কথাটা শিরীষবাবু শেষ করিলেন না, সুশীলার দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া পুনরায় নাকটা ঝাড়িলেন। মুকুজ্জেমশাই ও সুশীলা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল, মুকুজ্জেমশাই রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তৎপূর্বে কিছুই হইবে না।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, যাই, তা হ'লে মন্নুকে একটা চিঠি লিখে দিই, কাল সকালের ট্রেনেই যাব।

মুকুজ্জেমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলে সুশীলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে না কি ? দেখি—

কি দেখবে ?

সুশীলা উঠিয়া স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

শিরীষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, ও তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু সর্দির মত।

গা-টা কিন্তু ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে, আজ বরং ভাত খেয়ে কাজ নেই, রুটি দুখানা ক'রে দিই, শুকনো-শাকনা খেয়ে থাকাই সর্দির ওষুধ—সাবধান হওয়াই ভাল, মোজা পায়ে দাও।

শিরীষবাবু মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। সুশীলা আলনা হইতে গরম মোজা আনিয়া দিলেন। শিরীষবাবু মোজা পরিতে পরিতে বলিলেন, রুটি কিন্তু খাব না, বুঝলে ?

তোমার কথা শুনছি কিনা আমি !

[illegible]পারির ডালা লইয়া সুশীলাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।

শিরীষবাবু মুখবিকৃতি করিয়া গরম মোজাকে গোড়ালি পার করাইতে লাগিলেন। এ কি বিপদে পড়িয়া গেলেন তিনি !

রান্নাঘর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া সুশীলা মনে মনে প্রার্থনা করিলে ঠাকুর, ওর শিব-পূজো যেন সার্থক হয়, শঙ্করের সঙ্গেই ওর যেন বিয়ে হয়।

অমিয়া উঠানের ও-ধারে মাটির শিব গড়িয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছিল। যদিও মুকুন্দমশাই শিব লইয়া যখন-তখন তাহাকে ঠাট্টা করেন, তবু সে শিব-পূজা ছাড়ে নাই। তাহার মনের গহনে যে চিরন্তনী উমা বসিয়া আছে, তাহার তপস্যায় বাধা দিবার সামর্থ্য তাহার নিজেরও নাই।

২

বেলা মল্লিকের বাসায় প্রফেসর গুপ্ত বসিয়া ছিলেন।

বেলা বাড়িতে নাই, বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। জনার্দন সিংহের 'জেরাসে ঠাহর যাইয়ে হুজুর' এই কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বাহিরের ঘরটাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলার নিকট আসিবার একটা অজুহাত অবশ্য প্রফেসর গুপ্তের আছে, সর্বদাই থাকে, এবং সে অজুহাতগুলি যে যুক্তিসহ নহে, তাহাও প্রফেসর গুপ্ত এবং বেলা উভয়েই জানেন। কিন্তু না-জানার ভান করেন। আজ প্রফেসর গুপ্ত আসিয়াছিলেন বেলাকে জানাইতে যে, তাঁহার কন্যা মান্তু মামার বাড়ি গিয়াছে, আজ আর বেলার সন্ধ্যাকালে পড়াইতে যাইবার দরকার নাই। এ খবরটা কোন চাকরকে দিয়া পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু—

আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বেলা দেবীর দেখা নাই। কখন যে তিনি ফিরিবেন, তাহা জনার্দন ঠিক বলিতে পারিল না। বোস সাহেবের পত্নীকে বেলা সকালের দিকে এস্রাজ শিখাইতে যান, তাহা প্রফেসর গুপ্ত জানেন। সেখানে এতক্ষণ দেরি হইবার কথা নয়। প্রফেসর গুপ্ত আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, আর একবার হাতঘড়িটা দেখিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া এক টুকরা কাগজে তাঁহার আগমনবার্তা এবং আগমনের হেতু লিখিয়া জনার্দনের হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'কার'টা যখন

গলি হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সাত নম্বরের বাড়ির দ্বিতলের বাতায়ন হইতে বেলা যখন তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিও নামিয়া আসিলেন।

এই গলির সাত নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে বেলার ভারি সুবিধা হইয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সান্নিধ্য এড়াইবার প্রয়োজন যখনই ঘটে (এবং সে প্রয়োজন অধুনা প্রায়ই ঘটিতেছে), বেলা সাত নম্বরের বাড়িতে আত্মগোপন করেন এবং যতক্ষণ না প্রফেসর গুপ্তের 'কার'টা চলিয়া যায়, ততক্ষণ সেখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতে থাকেন। একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত সাত নম্বরের বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই। বেলার সমবয়সী একজন এবং বেলার চেয়ে ছোট তিনজন মেয়েকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ হলধরবাবু সাত নম্বরে বাস করেন। হলধরবাবু পিতৃভাবাপন্ন, মেয়েগুলি মিশুকপ্রকৃতির, বেলার সহিত বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটি কলেজে এবং বাকি মেয়েগুলি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটি বেলাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং বেলা তাহাকে গান বাজনা শিখিতে সহায়তা করিবেন, এরূপ একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ শৈলদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া গলিতে ঢুকিয়াই প্রফেসর গুপ্তের 'কার'খানা চোখে পড়িতেই বেলা সোজা সাত নম্বরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। 'কার' চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে নামিয়া আসিলেন এবং জনার্দন সিংহের নিকট হইতে প্রফেসর গুপ্তের গমন ও আগমন সংবাদটা এমনভাবে শুনিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রফেসর গুপ্তের লেখা কাগজখানাও অত্যন্ত নির্বিকারভাবে দেখিলেন।

আজ রবিবার, তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। তাহা না হইলে আবার কেহ হয়তো দয়া করিয়া আসিয়া জুটিয়া যাইবেন। বিগত কয়েকটি রবিবারের অভিজ্ঞতা হইতে বেলা দেবী স্থির করিয়াছেন যে, রবিবারটা তিনি বাহিরেই কাটাইবেন। একের পর এক পুরুষ বন্ধুর অভ্যাগম, আর কিছু না হউক, দৃষ্টিকটু।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বেলা দেবী বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখ, চুল উস্কোখুস্কো, চোখে এমন একটা দৃষ্টি যাহা অল্প কথায় বর্ণনা করা শক্ত। ভয় এবং মরিয়া ভাব, ভালবাসা এবং রাগ, বিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তা প্রিয়বাবুর চকিত দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দাদা যে হঠাৎ ?

প্রিয়বাবু নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে চল, বলছি।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রিয়বাবু ইতিপূর্বে নিজে বেলার নিকট আসেন নাই, তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এবং বেলার ঘরখানি পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিয়া তিনি, কেমন যেন একটু খতমত খাইয়া গেলেন। মনে মনে বেলার যে দৈন্য-নিপীড়িত অবস্থা তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র মিল নাই দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন না, ভয় পাইয়া গেলেন। বেলা তো বেশ সুখেই আছে! আর যাই থাক্, বেলার আধিভৌতিক কোন দুঃখ নাই, তাহা ঠিক।

তাঁহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, তিন মাস পরে আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে ? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি ?

প্রিয়বাবুর সহসা যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল, চোপ রও, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

প্রিয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়বাবুর ক্রোধের আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতার পরিচয় বেলা ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না, একটু মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি এ কি করিয়া বসিলেন! আসিয়াছেন বেলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য নয় ; কিন্তু হঠাৎ তিনি এ কি

বসিয়া ফেলিলেন। রাগারাগি করিবার জন্ত তো তিনি আসেন নাই। নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল, তাহার উপর বসিলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; আত্মধিক্কারে তাঁহার সমস্ত মন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই খাপছাড়া রাগের জন্ত জীবনে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বহুবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইল না। হঠাৎ পাশের ঘরে স্টোভ জ্বালার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেলা স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইতেছে।

তুমি ওই ঘরেই ব'স, চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।

কোনও কথা না বলিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মেয়েটার শরীর রক্ত-মাংসের, না, পাথরের?

একটু পরে বেলা রেকাবিতে কিছু জলখাবার এবং এক বাটি চা আনিয়া তাঁহার সামনে একটি ছোট টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, খাও।

খাব? আমি কি এখানে খাবার জন্যে এলাম?

বেলা এক গ্লাস জল আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, খাবার জন্যে কেউ কারও বাড়িতে যায় নাকি? তবে অতিথি এলে চা জলখাবার দেওয়াটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ।

আমি কি অতিথি নাকি যে, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে?

বেলা কিছু না বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং একটা ডিসে কয়েক খিলি পান লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আগে আমার কথার একটা জবাব দে, তা না হ'লে কিছু খাব না আমি।

বল।

আমার কাছে ফিরে যাবি কি না?

না।

রাগের মাথায় একটা কথা ব'লে ফেলেছি, সেইটেকেই বড় ক'রে দেখতে হবে ?

বড় ক'রে দেখতাম না, যদি সেটা সত্যি কথা না হ'ত। আমি ভেবে দেখেছি, তুমি সেদিন যা বলেছিলে, সেটা খুব বড় সত্যি কথা, তার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

কি সত্যি কথা ?

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লেই যে চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে—এর কোনও মানে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত—তা সে মেয়েমানুষই হোক বা পুরুষমানুষই হোক।

তার মানে ?

তার মানে, আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

আমার কাছে থাকা মানে তা হ'লে কি পরাধীনতা বলতে চাও ? আমি কি তোমার পর ?

পর কেন হতে যাবে, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ ব'লেই চিরকাল তোমার উপার্জনে ভাগ বসাব কেন ? তাতে আমারও সম্মান নেই, তোমারও সম্মান নেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, বেশ তো, রোজগার করতে চাও রোজগার কর, কিন্তু আমারই কাছে থাক, আলাদা বাসা করবার দরকার কি ?

আলাদা থাকলে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, একসঙ্গে থাকলে তা সম্ভব নয়। পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব ক'রে একসঙ্গে বাস করার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না আমি।

খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস তো।

বেলা কোনও উত্তর দিলেন না।

যাবে না তা হ'লে ফিরে ?

না।

প্রিয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

উঠলে যে, খাবে না ?

খাবার জন্যে আমি আসি নি। চললাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার মনে এই যে কষ্ট দিচ্ছ, এর ফল ভাল হবে না, জেনে রেখো। শুধু আমার মনে নয়, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি, লক্ষ্মণবাবুর মত ছেলে তোমারই জন্যে আত্মহত্যা করেছে। এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না— কখনও না, কখনও না। এই তেজ বেশি দিন থাকবে না।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে গিয়া প্রিয়বাবুর মাথাটা চৌকাঠে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণবাবুর তরুণ বিহ্বল মুখচ্ছবিটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

খুট করিয়া শব্দ হইল।

বেলা চাহিয়া দেখিলেন, শঙ্কর দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করবাবু যে, আসুন।

শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর আসাতে বেলা যেন অনেকটা আত্মস্থ হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, এমন অবস্থা কেন আপনার ? চান করেন নি নাকি ?

শঙ্কর সত্যই কয়েকদিন স্নান করে নাই। কাপড় ময়লা, গরম জামার পিছনে দিকটায় দেওয়ালের চুন লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, চুল উস্কখুস্ক।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল, শরীরটা ভাল নেই, জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

সেইজন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

একটা ভীষণ দরকারে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছু টাকা চাই—ধার।

ওমা, টাকা ধার চাইবার আর লোক পেলেন না আপনি? ক টাকা?

গোটা দশেক হ'লেই আপাতত চলবে।

এখন দশ টাকা তো আমার হাতে নেই। কাল শৈলদি মাইনে দেবেন, কাল বরং দিতে পারি।

শৈলদি কে?

মিসেস এল. কে. বোস। তিনি তো আপনাকে চেনেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, সে কি গান শিখছে আজকাল আপনার কাছে?

গান নয়, বাজনা আর একটু একটু ইংরিজী।

আপনার সঙ্গে যে আলাপ আছে আমার—সে কথা বলেছেন শৈলকে?

না, বলি নি।

বলবেন।

ব'লে চাকরিটি খোয়াই আর কি!

তার মানে?

আপনার সঙ্গে আর কারও ভাব থাকতে পারে—এ শৈলদির পক্ষে অসহ্য।

শঙ্কর একটু হাসিল।

বেলা বলিলেন, চা খাবেন?

খেতে পারি।

প্রিয়বাবুর চা ও জলখাবারটা বেলা শঙ্করকে বসাইয়া খাওয়াইলেন।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, শৈলর মনোভাবটা কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

অনেক কথা আমরা—মেয়েরা—বুঝতে পারি।

তবু বলুন না একটু, শুনি।

তা হ'লে চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। আমাকে এক জায়গায় বেরোতে হবে, কাজ আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই শঙ্কর বলিল, এইবার বলুন।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, এই ধরুন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রিনির সঙ্গে আপনার বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, তখন শৈলদি ভারি খুশি। একমুখ হেসে বললেন—শঙ্করদাকে জানি তো ছেলেবেলা থেকে, ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি, রিনির মত মেয়েকে দেখে গ'লে পড়বার ছেলেই ও নয়। আমার তখুনি মনে হয়েছিল, ওসব বাজে গুজব, শঙ্করদা বিয়ে করবে রিনিকে—তবেই হয়েছে!

এই পর্যন্ত বলিয়া বেলা দেবী থামিলেন, চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল কেন বলুন তো?

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

বেলা দেবী এই নীরবতা-প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাশের একটি গলি হইতে একটি সুদৃশ্য মোটরকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং একবার হর্ন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি কদিন থেকে।

আমাকে? কেন বলুন তো?

অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং স্মিত মুখে বলিলেন, হস্টেলে যাচ্ছিলাম, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার।

তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইনি কি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন? চলুন না, কিছু যদি মনে না করেন, লিফ্‌ট দিয়ে দিই আপনাদের।

বেলা বলিলেন, না, ধন্যবাদ, আমি অন্য জায়গায় যাব। শঙ্করবাবু, আপনি যান ওঁর সঙ্গে, আমি একাই যাচ্ছি।

সকলেই যখন কি করিবেন ইতস্তত করিতেছেন, তখন অচিনবাবু শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইনি কি প্রফেসর মিত্রের কেউ হন নাকি? মিষ্টিদিদির ওখানে ওঁকে দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

না, মিষ্টিদিদির কেউ হন না ইনি। ইনি হচ্ছেন মিস বেলা মল্লিক, গান-বাজনা খুব ভাল জানেন, অনেককে শিখিয়েও থাকেন। আর ইনি হচ্ছেন অচিনবাবু, মোটরকারের দালালি করেন।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

অচিনবাবু নামটা শুনিয়া বেলা মনে মনে একটু উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং ইঁহারই আশ্রয় পরিহার করিয়া চলিতে প্রফেসর গুপ্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন! অচিনবাবু বেলা দেবীকে এক নজর আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, কিছুদিন আগে আপনিই কি আমার কাছে শিক্ষয়িত্রীর একটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? বেলা মল্লিক নামটা মনে পড়ছে যেন।

প্রথম প্রথম অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার কাছেও হয়তো ক'রে থাকব।—বেলা দেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, বাইরে—মানে, কলকাতার বাইরে মেয়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আমার একজন বন্ধুর। ভাল লোক পাই নি এখনও তেমন। আপনি যান্ তো এখনও যোগাড় ক'রে দিতে পারি। মাইনে পঞ্চাশ থেকে শুরু, একশো পর্যন্ত হবে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল জমিদার-ফ্যামিলি—

না, ধন্যবাদ। আমার আর দরকার নেই।

একটু থামিয়া বেলা দেবী বলিলেন, আপনারা যান তা হ'লে। আমি চললাম, আমার একটু কাজ আছে, নমস্কার।

বেলা দেবী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অচিনবাবু বলিলেন, বেশ সপ্রতিভ মহিলাটি।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ।

শঙ্কর অচিনবাবুর মোটরে চড়িয়া বসিল, অচিনবাবু স্টার্ট দিলেন। কিছুদূরে গিয়া অচিনবাবু বলিলেন, হস্টেলেই ফিরবেন এখন? চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সন্ধ্যেবেলা হস্টেলে পৌঁছে দেব আপনাকে।

চলুন।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, দরকারটা কি?

চলুন, বলছি।

শঙ্কর কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় মুক্তোর সহিত দেখা করিতেই হইবে। অচিনবাবুর পাল্লায় পড়িয়া আবার দেরি না হইয়া যায়!

গড়ের মাঠের কাছাকাছি আসিয়া অচিনবাবু গাড়ির গতিবেগ কমাইলেন এবং নির্জন একটা স্থান দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন। সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া শঙ্করকে দিলেন ও নিজে খাইলেন।

চলুন, একটু বসা যাক।

উপবেশন করিলে শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বলুন তো?

ভন্টুবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে?

আছে।

মৃন্ময়বাবু ব'লে ভন্টুবাবুর একজন বন্ধু আছেন, জানেন আপনি?

জানি।

মৃন্ময়বাবু লোকটি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, তিনি অকারণে আমার পেছনে লেগেছেন।

আপনার পেছনে? কেন, কারণটা কি?

কিছুই কারণ নয়, পুলিসের লোকেদের কারণের অভাব থাকে নাকি, খাড়া করলেই হ'ল একটা।

একটু নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

আপনি ভন্টুবাবুকে ব'লে একটু ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌ করতে পারেন যদি, বড় ভাল হয়।

বেশ বলব আমি ভন্টুকে।

তাহার পর হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এই ব্যাপারের জন্যে এত! আগে বললেই হ'ত।

অচিনবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া বলিলেন, না, আর একটা কথাও আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটা গুজব শুনেছিলাম—রিনির সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে; এখন আবার গুজব শুনছি—হচ্ছে না। কোন্‌টা সত্যি বলুন তো?

দুই-ই সত্যি, হবে ঠিক হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে।

ভেঙে গেল কেন?

সে অনেক কারণে।

অচিনবাবু প্রশ্ন করিলেন, ভেঙে গেছে—এটা ঠিক?

ঠিক।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

আমার একটা উপকার করবেন?

কি বলুন?

আমরা স্বজাতি, আমার একটি মেয়ে আছে নেবেন তাকে? দেখতে সে সুশ্রী, পণও আমি যথাসাধ্য দেব। ওই আমার এক মাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। আপনার মত ছেলের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

আমার মত ছেলের হাতে! আমার কতটুকু জানেন আপনি?

যা জানি, তাই যথেষ্ট। আপনি রাজী কি না বলুন, আপনি মত দিলে আপনার বাবাকে চিঠি লিখব।

আমি বিয়েই করব না।

একেবারেই না ?

একেবারেই না। তবে আপনার মেয়ের জন্যে অন্য পাত্র চেষ্টা করতে পারি। মেয়েটি কোথা ?

মেয়েকে দেশে রেখেছি মশাই, এ কলকাতা শহরের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে মেয়েকে এখানে রাখতে ভরসা পাই না। দেশে আছে সে। দরকার হ'লে আনতে পারি।

ওরই জন্যে কি শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন নাকি ?

না, ওর জন্যে নয়, আমি অত টাকা কোথায় পাব বলুন ? ও আর একজনের জন্যে।

অচিনবাবু সিগারেটে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, আপনি বিয়েই করবেন না ঠিক ক'রে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ।

কারণটা জানতে পারি কি ?

শঙ্কর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, আমাদের মত ভাল ছেলের পক্ষে বিয়ে ক'রে গোল্লায় যাওয়া উচিত নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের আহ্বান করছে।

অচিনবাবু একটু হাসিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নানা রকম মামুলী কথাবার্তা চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইল। নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল মুক্তোর কথা; এবং অচিনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলার সহিত তিনি আর একবার দেখা করিবেন কি না, করিলে কি ভাবে কোথায় করিবেন!

৩

শ্রীমৎ মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে উমেশচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত বিব্রত ভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করিতেছিল। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার, বাহিরে খরস্রোতা গঙ্গার অবিরাম কল-কলধ্বনি, রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছন্দ লাভ করিয়াছে। মুক্তানন্দ একা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া কিছুদিন হইল তিনি হরিদ্বারে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশবাস দেখিয়া পাণ্ডাজী তাঁহাকেই ভক্তিভরে আশ্রয় দিয়াছেন। মুক্তানন্দ সুখেই ছিলেন, বেশ সুন্দরই লাগিতেছিল, এমন কি মনে মনে কল্পনাও করিতেছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবনটা এইখানেই বোধ হয় অতিবাহিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। নিকটস্থ চণ্ডীপাহাড়ে বা অন্য কোন নির্জন স্থানে একটা আস্তানা বানাইয়া ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী নাম-জপ করিয়া বাকি জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইবে। বিশ্বাস মহাশয় নামক স্থানীয় ভক্ত ব্যক্তিটি এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ কি হইল, একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত মন বিকল হইয়া গেল।

স্বপ্নে তিনি দেখিলেন, ভন্টু যেন প্রকাণ্ড একটা রোলারের তলায় চাপা পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। রোলারের চাপ এত ভীষণ যে, ভন্টুর মুখ দিয়া, নাক দিয়া, এমন কি চোখ দিয়া রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পথ দিয়া জনতার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহই ভন্টুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে না। ভন্টু আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, তাহার রক্তে রাস্তার খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহারও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ঠাকুর আসিলেন, ভন্টুর দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি কি করিব বল, তোমার নিজের লোকই যখন তোমাকে

ছাড়িয়া মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন আমি আর কি করিতে পারি ?

ঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভনুটু আর্তনাদ করিতে লাগিল। এ রকম স্বপ্নের মানে কি ? স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে ? এ স্বপ্নের কি অর্থ হইতে পারে ? সত্যই ভনুটু বিপন্ন নয় তো ? বিমূঢ়ের মত একা বসিয়া মুক্তানন্দ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী গঙ্গার কলকলধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

৪

পরদিন দ্বিপ্রহর।

শঙ্কর মুক্তোর বিছানায় চুপচাপ একা শুইয়া ছিল। মুক্তো ঘরে ছিল না। মুক্তোর ঘরখানি ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো। দুইখানি তক্তাপোশ রহিয়াছে, একখানি অপেক্ষাকৃত নীচু ও ছোট, অপরটি উঁচু ও বড়। বড় খাটটিতে পুরু গদি, ফরসা চাদর, ফরসা বালিশ। শঙ্কর ইহারই উপর শুইয়া ছিল। শুইয়া শুইয়া সে বহুবার-দেখা আসবাব-পত্রগুলি পুনরায় দেখিতেছিল। ছোট গ্লাস-কেসটি বেশ পরিচ্ছন্ন, নানা রকম রঙিন শাড়ি পাট করা রহিয়াছে অনেক। দেওয়ালে নানা রকম ছবি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মেম-সাহেব, কালীঘাটের পট, পুরীর জগন্নাথ। গত কার্তিক-পূজার কার্তিকের ময়ূরের পালকগুলি এক কোণে টাঙানো আছে। এক ধারে একটি আলনা। আলনায় মুক্তোর নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়-জামা এবং তাহারই এক ধারে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি ঝুলিতেছে। মুক্তোর বাঁধা বাবুর লুঙ্গি ও গেঞ্জি। তিনি প্রত্যহ রাত্রি আসেন, সমস্ত রাত্রি থাকেন। মুক্তোর সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত খুব পাকাপাকি রকম। রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুক্তো ইচ্ছা করিলে অপর লোক বসাইতে পারে, কিন্তু দশটার পরে মুক্তোর কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি কোন দিন কোন কারণে আসিতে না পারেন, সেদিন মুক্তোর

ছুটি এবং সে ছুটি মুক্তো নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে। তাঁহার ওরফে দশরথবাবু ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং খাঁটি লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যবহার কোন রকম খুঁত নাই। দশরথবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি রোজ যে আসেন তাহা নয়; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা এইরূপ। বলা বাহুল্য, মুক্তোর সহিত তাঁহার হৃদয়ঘটিত কোন ঝামেলা নাই, সম্পর্কটা নিতান্তই আধিভৌতিক। প্রথম দিনই আসিয়া শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, আজও আবার পড়িল, কবে কে যেন দেওয়ালের উপর লাল পেন্সিল দিয়া লিখিয়া গিয়াছে, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' কে এই দার্শনিক? এমন মর্মান্তিক একটা বচন এমন মর্মান্তিক স্থানে লিখিয়া গিয়াছে! রোজই শঙ্কর লেখাটি পড়ে। মুক্তোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, লেখকটি কে? মুক্তো বলে, জানি না বাবু, কত লোক আসে যায়, কে কখন লিখেছে, অত খেয়াল করি নি। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।

অদ্ভুত মেয়ে এই মুক্তো! এতদিন ধরিয়া শঙ্কর এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু মেয়েটির স্বরূপটি যে কি, তাহা আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া দেয় না। হাসে, নাচে, গান গায়, মদ খায়, বৈকালে গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া চোখে কাজল দিয়া রঙিন শাড়িটি কায়দা করিয়া পরিয়া গালে ঠোঁটে রঙ মাখিয়া খোঁপায় ফুলের মালা পরিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়ায়, ভঙ্গীভরে সিগারেট টানে, কথায় কথায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, চটিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, অন্ধ-আতুর দেখিলে পয়সা দেয়, গঙ্গাস্নান করিতে যায়, মেনি বিড়ালকে আদর করে, দশরথের জন্য প্রত্যহ হাঁসের ডিমের ডালনা ও পরোটা বানায়, সামনের চপ-কাটলেটওয়ালাটার সঙ্গে দুই-এক পয়সার জন্য ইতরের মত কলহ করে, ঘরে লুকাইয়া মদের বোতল রাখে এবং তাহা সুযোগমত শাঁসালো কাপ্তেনের নিকট দুর্মূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু শঙ্করের মনে হয়, আসল ব্যক্তিটি অন্তরালে আছে, সে কখনও ভুলিয়াও পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে না। তাহাকে একটু একটু যেন চেনা যায়, যখন সে দুপুরে

কালি বারান্দাটুকুতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকায়। মনে হয়, উহাই যেন তাহার জীবনের সত্য আকাঙ্ক্ষা, ও যেন আর কিছু চায় না, নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে চায়।

শঙ্কর উঠিয়া বসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, মুক্তো বারান্দায় বসিয়া চুল শুকাইতেছে কি না! দেখিল, মুক্তো নাই। তাহার চোখে পড়িল, উষা নাম্নী ওধারের ঘরের মেয়েটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া নিজের ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। মুক্তো কোথায় আছে, কে জানে! রোজই দুপুরে শঙ্করকে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তো বাহিরে চলিয়া যায়, কাছে বসিতে চায় না। অথচ শঙ্কর কলেজ পলাইয়া আসে তাহারই সঙ্গ-কামনায়। কিন্তু মুক্তো কেমন যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। আসছি, বসুন।—বলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া সে বাহির হইয়া যায় এবং পাশের ঘরে হাসি-গল্প করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া তবে আসে। আসিয়াই আবার কোন ছুতায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। দশরথের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা যেরূপ সুনির্দিষ্ট, শঙ্করের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা এখনও সেরূপ হয় নাই। শঙ্কর মুক্তোকে একদিন দশটা টাকা জোর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে দর-কষাকষি করিতে তাহার যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তা ছাড়া শঙ্করের সামর্থ্যই বা কতটুকু? তাহার বাবা মাসে মাসে তাহাকে যাহা পাঠাইয়া থাকেন, তাহাই তাহার সম্বল। বলা বাহুল্য, তাহা এসব ব্যাপারের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। এমনিই তো হস্টেলের অনেকের কাছে ধার জমিয়া আছে। কি করিয়া শঙ্কর যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই জানে না। অতিশয় আঁকা-বাঁকা বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধ নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া সে চলিয়াছে। নিজের দুর্দম বাসনার আবেগই তাহার শক্তি, আর কোন সম্বল তাহার নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পতিতা নারীটির মধ্যেই সে মানসীকে খুঁজিতেছে।

মানুষের কত দ্রুত পরিবর্তন হয়! দুপুরে কলেজ হইতে পলাইয়া

গণিকা-পল্লীতে আসিয়া একটি গণিকার বিছানায় সে শুইয়া থাকিবে—কিছুদিন পূর্বে ইহা কি তাহার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল? রিনিকে ঘিরিয়া যখন সে তাহার স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতেছিল, তখন কোথায় ছিল এই মুক্তো? মুক্তোর মত মেয়ের সান্নিধ্য সে কি তখন কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারিত? কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তে সে আর মুক্তো কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এবং পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। রিনি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে, রিনির সংস্পর্শে তাহার মনের তন্ত্রীতে যে-সুর বাজিয়াছিল, মুক্তোর সংস্পর্শে আসিয়াও ঠিক সেই সুরই বাজিতেছে। মুক্তো অশিক্ষিতা গণিকা বলিয়া সে সুর কিছুমাত্র কম উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে না। প্রথম দুই-চারি দিন তাহার তথাকথিত ভদ্র-অন্তঃকরণে একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, কিন্তু সে দুই-চারি দিন মাত্র। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রথম প্রথমই। এখন শঙ্করের কাছে মুক্তো গণিকা—এই কথাই বড় নয়, মুক্তো নারী—এই কথাই বড়। শুধু নারী নয়, লাঞ্ছিতা অবনমিতা নারী। সমাজের অত্যাচারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য দেহ-বিক্রয় করিতেছে। উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীকে আহরণ করিয়া প্রেমের পূত মন্দিরে নির্মাল্য রচনা করিতে হইবে। মুক্তোকে তাহার চাই, একান্তভাবে চাই, তাহার চরিত্রের সমস্ত মলিনতা সত্ত্বেও চাই। আর কেহ তাহার কাছে আসিতে পাইবে না—যেমন করিয়া হোক দশরথকে তাড়াইতে হইবে। সমস্ত কলুষ সত্ত্বেও মুক্তোর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং সে নারীত্বের সম্মান শঙ্কর যদি না করে, তাহা হইলে বৃথাই তাহার শিক্ষা। ক্ষুধা—মানুষের এই আদিম ক্ষুধাটা মানুষকে কত স্বপ্নই না দেখায়! রিনির জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মোহ যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে হইত, এখন তো আর তাহা মনে হয় না। অথচ মাত্র দুই মাস কাটিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, রিনি যেন অতিদূর বিগত জীবনের একটা

সুখ-স্মৃতি মাত্র, আর কিছু নয়। মিষ্টিদিদি? মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও মনোভাব শঙ্করের নাই। মুক্তো গণিকা বটে, কিন্তু মুক্তোকে দেখিয়া তো ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না! সে রূপোপজীবিনী, ওই তাহার পেশা। মিষ্টিদিদির মত ছদ্মবেশী ঘৃণ্য জীব সে নয়। আর একটু তলাইয়া দেখিলে শঙ্কর বুঝিতে পারিত, যে কারণে মুক্তো অ-ছদ্মবেশী, সেই কারণেই মিষ্টিদিদি ছদ্মবেশী। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তো ও মিষ্টিদিদির কোন তফাত নাই। কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিস, সে নিরপেক্ষতার ভান করে, কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না, হইলে সে কখনও ভালবাসিতে পারিত না।

শঙ্কর একা শুইয়া শুইয়া মুক্তোর কথা ভাবিতেছিল, মুক্তো পাশের ঘরের জানালার ফুটো দিয়া নির্নিমেষ নয়নে শঙ্করকে দেখিতেছিল। গণিকাজীবনে অনেক রকম লোক সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখে নাই। এত অসহায়! মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ঠিক যেন ভিখারীর মত। আজ পর্যন্ত যত লোকের সংস্পর্শে মুক্তো আসিয়াছে, সকলেই ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলে, গায়ের জোরে দাবি করে—এ তো সে রকম নয়! এ অন্য জাতের মানুষ। অমন বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু শিশুর মত অসহায়; লাজুকও কম নয়, মুখ ফুটিয়া সহজে কিছু বলিতে চায় না; যদিই বা কিছু বলে, তাও এমন ভদ্র ভাষায়, শুনিলে হাসি পায়। নিশ্চয় বিদ্বান খুব, সেদিন একখানা বই হাতে করিয়া আনিয়াছিল, কত মোটা আর কত ভারী—আগাগোড়াই ইংরেজী। অথচ কথাবার্তা যেন ছেলেমানুষের মতন, কে বলিবে অত লেখাপড়া জানে! অমন লোকের এসব আঁস্তাকুড়ে আসা কেন বাপু? মাসীটিকে তো চেনে না। সেদিন তো মাসী তাহাকে বলিয়াই দিয়াছে, ওসব কাব্যি-মার্কা ছোঁড়াকে যেন আমল না দেয় সে। অথচ মাসী নিজের মুখেই তাহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এখন বলিতেছে বিদায় করিয়া দিতে! কোন্ দিন হয়তো মুখের ওপর কি বলিয়া বসিবে! হঠাৎ খোঁপায় টান পড়িল।

ফিরিয়া দেখিল, টিয়া। এটি তাহারই ঘর।

টিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না। ঘরে গিয়ে নয়ন ভ'রে দেখ্ না! উঁকি দেওয়া কেন?

মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, খোঁপাটা খুলে দিলি, জড়িয়ে দে ভাল ক'রে।

আর জড়িয়ে দেয় না, এলো-খোঁপাতেই বেশ দেখাচ্ছে। এমনিতেই গ'লে পড়েছে, কিছু করতে হবে না, যা।

সবাই তো আর তোর মালবাবু নয়।—মুচকি হাসিয়া খোঁপাটা জড়াইতে জড়াইতে মুক্তো বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, অতিথির খবর কি, চা আনাব?

শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল।

না, চা দরকার নেই।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, আমাকে তুমি অতিথি ব'লে ডাক কেন বল তো?

অতিথিকে অতিথি বলব না তো কি বলব, আপনি তো খদ্দের নন ঠিক।

শঙ্কর ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে ঠিক কি বলা উচিত, সহসা তাহার মাথায় আসিল না।

একটু পরে বলিল, খদ্দের মানে কি?

মুক্তো গা দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'—এই কথা যাকে বলতে পারা যায়, সেই হ'ল খদ্দের।

আমাকে সে কথা বলতে পার না?

মুক্তো বলিল, নিশ্চয় পারি, আজ না পারি কাল না পারি একদিন পারতেই হবে, রোজগার করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলি নি।

মুক্তো বাহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, একদিন না একদিন আপনাকেও খদ্দের হতে হবে। ওই দেখুন, একজন খদ্দের ঘুরঘুর করছে। আপনি কি থাকবেন এখন? না থাকেন তো রোজগার করি কিছু।

শঙ্কর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, আবক্ষ-কাঁচাপাকা-দাড়ি এক ব্যক্তি সতৃষ্ণ নয়নে মুক্তোর দিকে চাহিয়া আছে।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

উঠছেন নাকি সত্যি সত্যি?

অগত্যা উঠতে হবে বইকি, টাকা যখন সঙ্গে নেই—

মুক্তো বিস্ময়ের সুরে বলিল, সত্যি? আজ এতক্ষণ ব'সে আছেন দেখে আমি ভাবলাম বুঝি—

মুক্তো মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেই মুক্তোর মুখের হাসি নিবিয়া গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি একমুখ হাসি লইয়া আগাইয়া আসিতেছিল। মুক্তো তিক্ত কণ্ঠে বলিল, এখন এখানে হবে না।

সহসা তাহার নজরে পড়িল, শঙ্কর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মুক্তো তাহা দেখিয়া দাড়িওয়ালা লোকটিকে পুনরায় আহ্বান করিল, আচ্ছা, আসুন আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ঢুকিতেই মুক্তো ঘরে খিল দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, আমার বইখানা ফেলে গেছি।

কোনও উত্তর আসিল না। শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর মুক্তো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইল, ক্ষ্যাপাই হইয়াছে, বইখানার জন্যও অন্তত আর একবার আসিবে। কি অন্যমনস্ক লোক বাপ্‌।

৫

সকাল হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিনে বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। শুধু বৃষ্টি নয়, এলোমেলো হাওয়াও বেশ জোরে বহিতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়, ভন্টু বেচারাকে আপিস যাইতেই হইবে। তা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিতেও হইবে। একটা গুজব শুনিতেছে, মেজকাকা নাকি পুনরায় আসিয়াছেন এবং গোয়াবাগানে সেই বন্ধুটির বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। আস্‌নি-দাজির পিতা নিবারণবাবু নাকি অসুস্থ, সেখানে একবার না গেলে অন্যায় হইবে। তৃতীয়ত, তাহারই আপিসের একজন সহকর্মী তাহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছেন, বক্‌সি মহাশয়কে দিয়া তাঁহার কোষ্ঠীখানা গণনা করাইয়া দিতে হইবে, তিনি গরিব মানুষ, দুই টাকার বেশি দিতে পারিবেন না। ভন্টু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, চেষ্টা করিবে, সুতরাং বক্‌সি মহাশয়ের নিকটেও যাইতে হইবে। চতুর্থত, চাম গ্যান্‌টঅ ঙ্করের বহুদিন কোন খবর নাই, সে ছোকরার কি হইল তাহা জানিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছে। পঞ্চমত, দাদার কাল একটি পত্র আসিয়াছে, লিখিয়াছেন, তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে। বউদিদির নিকটে সংবাদটি সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে ধীরেন ডাক্তারের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার। ধীরেন ডাক্তার তো পাড়াতেই থাকে, এখনই পর্বটা সারিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। পাশের ঘরে ছেলেরা তারস্বরে পড়া করিতেছে। ভন্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ছেলেদের পড়ার চাড় ভয়ানক বেশি, একটু অন্যমনস্ক হইলে এবং কাকা তাহা দেখিতে পাইলে রক্তারক্তি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভন্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, এক মিনিটের জন্য তাহারা পড়া বন্ধ করে না। ভন্টুর মনে হইল, ধীরেনবাবু ডিস্পেন্সারিতে আছেন

কি না একবার খোঁজ লওয়া দরকার। এই বাদলার বাজারে যদি তাঁহার পুরাতন ওয়াটার-প্রুফটাও আজিকার মত বাগাইতে-পারা যায় মন্দ হয় না।

শন্টু!

শন্টু শুনিতে পাইল, কিন্তু এক ডাকে সাড়া দিলে পড়ায় মনোযোগ দেখানো হয় না। সে আরও জোরে পড়িতে লাগিল—The boy stood on the burning deck, whence all but—

শন্টু!

আজ্ঞে?

ভাল মানুষটির মত শন্টু আসিয়া দাঁড়াইল। বেশি মনোযোগ দেখাইলে অন্তরূপ বিপদ ঘটিয়া যাইবে হয়তো।

কটা বেজেছে দেখ্ তো।

শন্টু ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, পৌনে আটটা।

চট ক'রে দেখে আয় তো একবার, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতে আছে কি না!

শন্টু চলিয়া গেল।

ভন্টু উঠিয়া বউদিদির ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে গেল। গিয়া দেখিল, বউদিদি সশব্দে ডালে ফোড়ন সংযোগ করিয়া নাক-মুখ কুঁচকাইয়া হাঁড়ির ভিতর হাতা সঞ্চালন করিতেছেন। ভন্টুও অনুরূপভাবে নাক-মুখ কুঁচকাইয়া বউদিদির পিছনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি মুখ ফিরাইতেই বলিল, বাকুর কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না আজ! লেটেস্ট্ বুলেটিন কি?

বাবার আজ সকাল থেকে হাঁফটা বেড়েছে, ঠাণ্ডার জন্তে বোধ হয়।

উপায়?

খাওয়া-দাওয়া চুকলে সরষের তেল আর কর্পূর গরম ক'রে বুকে পিঠে মালিশ ক'রে দেব। ওষুধ তো উনি খাবেন না কিছুতে।

চা খান নি এখনও আজ?

এইবার ক'রে দেব। বলেছেন আথনির চা ক'রে দিতে।

বউদিদি একটু হাসিলেন।

ভন্টুও হাসিয়া বলিল, লর্ড বাকু কি সোজা চিজ! আমাকেও এক ঢোঁক দিও।

বাকুর সর্দি হইলে তিনি সাদা জলে চা খান না। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পোলাওয়ের মসলা জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার পর তাহাতে চায়ের পাতা দিয়া চা প্রস্তুত করিতে হয়। ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া বউদিদি বলিলেন, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ভন্টুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বউ দদি চলিয়া গেলেন।

ভন্টু মসলার থালা হইতে কিছু মসলা লইয়া চিবাইতে লাগিল। বউদিদি ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আদার রস মিশিয়ে দিলে একটু উপকার হ'ত—তা কিছুতে রাজী নন।

ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারেব একটি গুরুমশাই তুমি। এতদিনেও তুমি বাকুকে চিনলে না! হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড বাক্‌লাণ্ড্‌ চা-ও চান না, আদাও চান না, উনি চান—লিকুইড পোলাও। বাকুর কুর কুর কুর।

বলিতে বলিতে ভন্টু শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

আদার রস দিলে সর্দিটার একটু উপকার হ'ত। ভয়ানক ঝামরে রয়েছেন।

আদার ফাদার এলেও ঝামরানো কমবে না।

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল মোজাজোড়া দেখে চটেন নি তো, একটু 'চিপিস' অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম, তাও বারো গণ্ডা পয়সা সাফ হয়ে গেল।

বউদিদি একটা ফরসা ন্যাকড়ায় আথনির জলের মসলাগুলি বাঁধিতেছিলেন। এই কথায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। বলেন নি কিছু।

তার মানেই চটেছেন। পছন্দ হ'লে বলতেন।

শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতেই আছেন।—বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই চীৎকার শুরু করিল—The boy stood on the burning deck—

ভন্টু উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, তুমি চা-টা ততক্ষণ কর, চট ক'রে আমি ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।

ধীরেন ডাক্তারের কাছে কেন?

আসল সত্যটা গোপন করিয়া ভন্টু বলিল, দেখি যদি ওয়াটার-প্রুফটা বাগিয়ে আনতে পারি। কিন্তু বাই দি বাই, বিড্‌ডিকার, একটু তাড়াতাড়ি ভাত চাই আজ।

এই বাদলায় সকাল সকাল বেরিয়ে কি হবে?

অনেক জায়গায় খজলাখজলি করতে হবে আজ।

খজলাখজলি কি?—বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

এই কথাটা ভন্টু নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, বউদিদি ইতিপূর্বে কথাটা শোনেন নাই।

ফইজৎ।—বলিয়া ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

বউদিদি কেৎলিতে জল দিয়া তাহাতে মসলার পুঁটুলিটি দিলেন এবং সেটি উনানে চড়াইয়া দিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া চারটি পোস্ত বাহির করিলেন এবং তাহা বাটিতে লাগিলেন। ডাল ভাত হইয়া গিয়াছে, তরকারি যদি না-ও হইয়া উঠে, কয়েকটা পোস্তর বড়া ভাজিয়া দিলে ঠাকুরপোর খাওয়া হইয়া যাইবে।

জীর্ণ ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে দিয়া ভন্টু একটু সকাল সকালই বাহির হইল। উদ্দেশ্য ছিল, যাইবার মুখে গোয়াবাগানটা একটু ঘুরিয়া মেজকাকার সন্ধানটা লইয়া যাওয়া। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল, শঙ্কর ভিজিতে ভিজিতে ও-ধারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। শঙ্কর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ভন্টু বাইক ঘুরাইল।

চাম গ্যান্‌চঞ্জ! চাম গ্যান্‌চঞ্জ।

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এ রকম অগাধ জলে ডুব মেরে ব'সে আছিস, ব্যাপার কি তোর?

শঙ্কর একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, ভন্‌টুকে সে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হইয়া যাওয়ায় কি যে বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসি অনেক সময় মানুষকে কথা কহিবার দায় হইতে রক্ষা করে।

ভন্‌টু বলিল, মিছিমিছি ভিজে লাভ কি, চল্‌, ওই গাড়ি-বারান্দাটার তলায় দাঁড়ানো যাক। থাম্‌ থাম্‌, সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেবে এক্ষুনি।

একটা মোটর বেগে বাহির বাহির হইয়া গেল।

নির্বিঘ্নে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছিয়া ভন্‌টু বলিল, তোর ব্যাপার খুলে বল্‌ দিকিন। ডিটেলে ঢুকিস নি, সংক্ষেপে শাঁসটুকু দে।

অকস্মাৎ শঙ্করের সন্দেহ হইল, ভন্‌টু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে। বলিল, ব্যাপার মানে?

মানে, তোর টিকি আন্‌ট্রেসেব্‌ল্‌। কোথা থাকিস আজকাল তুই?

প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

রাত্তির নটা-দশটা পর্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস? কাকে ধাপ্পা মারছিস তুই!

শঙ্কর বলিল, এখন তুই যা, পরে সব বলব তোকে। এখন আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি এক জায়গায়। যাব একদিন তোদের বাড়ি।

আসছে রবিবারে আসিস। মেজোকাকা আবার ফিরেছেন।

তাই নাকি?

শুনছি তো। উঠেছেন গোয়াবাগানে, সেখানেই যাচ্ছি আমি।

গোয়াবাগানে কেন?

ঘোড়েল বাবাজীর কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

এ সংবাদ দুই মাস আগে শঙ্করের মনে আর কিছু না হোক কৌতূহল

উদ্রিক্ত করিত, এখন তেমন কিছুই করিল না। আচ্ছন্নের মত ভন্টুর মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আশ্চর্য তো!

ভন্টু বাইকে চড়িয়া বলিল, এখন চললাম আমি, আস্সিস।

ভন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর যাইতেছিল প্রফেসর গুপ্তের নিকট টাকার চেষ্টায়। কিছু টাকার যোগাড় না করিতে পারিলে মুক্তোর নিকট আর মান থাকে না। ভিজিতে ভিজিতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসার উদ্দেশে চলিতে লাগিল।

ভন্টু গোয়াবাগানে গিয়া শুনিল যে, উমেশবাবু আসিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন বাড়িতে নাই, কখন ফিরিবেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে ভন্টু ভাবিতে লাগিল, বাবাজী আসিয়াছেন তাহা হইলে! কিন্তু নিজের বাড়িতে না গিয়া বন্ধুর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিবার মানে কি? এ রহস্যের উদ্ভেদ ভন্টু করিতে পারিল না। বাবাজী আসিলে গব্যঘৃত প্রভৃতির জন্য খরচ বেশ একটু বাড়ে, বাবাজী বন্ধুগৃহে অবস্থান করাতে খরচের দিক দিয়া ভন্টুর কিছু সুরাহা হইয়াছে, তথাপি ভন্টুর আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বাবাজীর এ কি ব্যবহার? রাস্তার একটা ঘড়িতে সে দেখিল, সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। ইচ্ছা করিলে নিবারণবাবুর খবরটাও এ বেলা সে লইতে পারে। বখেড়া মিটাইয়া রাখাই ভাল; ও-বেলা করালীচরণের ওখানে যাইতে হইবে। সে খপ্পর হইতে সহজে বাহির হওয়া মুশকিল।

টারপেনটাইন লেনে নিবারণবাবুর বাড়িতে গিয়া ভন্টু বিস্মিত হইল। কাল দোকানে মাস্টারের মুখে শুনিয়াছিল যে নিবারণবাবু ভয়ানক অসুস্থ, শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ভন্টু দেখিল, ভদ্রলোক তো দিব্যি বসিয়া আছেন, অসুখের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভন্টুকে দেখিয়া নিবারণবাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আসুন আসুন ভন্টুবাবু, তারপর—হঠাৎ অকাল বোধন যে! এমন সময় তো আসেন না কোন দিন। আপিসে রেনি-ডে হয়ে গেল নাকি?

বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে ভন্টু বলিল, ভুলে যান সেসব কথা। আপনি কেমন আছেন তাই বলুন আগে।

যেমন রেখেছেন তেমন আছি। আমাদের আর থাকাথাকি কি, দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলেছি।

ওসব তো মামুলী লদ্‌কালদ্‌কি। অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন তাই বলুন।

হাস্য-স্নিগ্ধ চক্ষে ভন্টুর প্রতি চাহিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, মাস্টার বলেছেন বুঝি ?

হ্যাঁ। কাল আর আসবার সময় পাই নি, আজ আপিস যাবার মুখে ভাবলাম, খবর নিয়ে যাই।

বেশ করেছেন এসেছেন, বসুন। খিচুড়ি খাবেন ?

আমি ইটিং আপিস খুলে তবে বেরিয়েছি।

ইটিং আপিস মানে ?

বিরাট ইটিং আপিস খুলেছি, আজ বউদিদি খুলিয়ে তবে ছেড়েছেন।

ইটিং আপিস কি মশাই ?

খেয়ে বেরিয়েছি। তবু আনতে বলুন একটু খিচুড়ি, পুনরায় আপিস খোলা যাক। প্লেটে ক'রে সামান্য একটু আনতে বলুন, চেঁখে দেখা যাক। আপনার গিন্নীর হাতের রান্না খাই নি কখনও। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

গিন্নীর রান্না নয়, তিনি বাতের ব্যথায় কাতর, আজ ঠাণ্ডায় আরও আউরেছে। রেঁধেছে আস্‌মি।

ভিতর হইতে আস্‌মির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমায় অমন টিকটিক ক'রো না ব'লে দিচ্ছি, পোড়া কড়া মেজে গা-গতর টাটিয়ে গেছে আমার, ব্যাসনটা তুমিই ফেনাও না, শেলাই-ফেলাই পরে ক'রো।

নিবারণবাবু হাঁকিলেন, ওরে আস্‌মি, শোন্ এদিকে।

তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে ভন্টুকে বলিলেন, আজ আবার ঝি-মাগী আসে নি, সব ওকেই করতে হচ্ছে, দার্জিটা তো কুটোটি পর্যন্ত নাড়বে না।

আস্‌মি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।

খিচুড়ি হয়েছে তোর?

আস্‌মি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আর কি হয়েছে?

মাছভাজা।

একটু খিচুড়ি আর মাছভাজা নিয়ে আয় ভন্‌টুর জন্যে।

আস্‌মি চলিয়া গেল।

ভন্‌টু বলিল, আপনার অসুখের খবরটা সর্বৈব ভুয়ো তা হ'লে?

ওই ছুতো ক'রে দিনকতক রেহাই নিয়েছি। কাঁহাতক আর সেতার বাজাই মশায়!

নিবারণবাবুর হাসি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, ভন্‌টু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

আহা-হা, আবার বাই চাগল দেখছি!

ভন্‌টু স্মিত মুখে নীরব রহিল।

একটু পরেই নিবারণবাবু বলিলেন, কাল ফের দু ব্যাটা জলখাবার খেয়ে সরেছে মশায়। এর একটা বিহিত করুন। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

আস্‌মি খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৬

বৃষ্টি ছাড়ে নাই। আকাশে মেঘের উপর মেঘের স্তর জমিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এমন দিনে লোক ঘরের বাহির হয় না, কোষ্ঠিগণনা করাইতে কে আসিবে। করালীচরণ বক্‌সির হাতে আজ কোন কাজ নাই, এমন দিনে কাজ আসিবার সম্ভাবনাও নাই।

একটা সিগারেট ধরাইয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তিনি কর্দমাক্ত গলিটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কর্মহীন দিন তাঁহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। প্রতিদিন একটা না একটা কাজ হাতে থাকে এবং তাহা লইয়াই সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায়। বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহার অবসর ছিল না; আজ এই মেঘমেদুর দিনের পরিপূর্ণ অবসরটা লইয়া তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, টেবিলের উপর হইতে বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা বাকি আছে। দেখিলেন, আধ বোতল রহিয়াছে। বোতলে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা পান করিলেন এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুখটা মুছিয়া সিগারেটটায় আরও গোটা-দুই টান দিলেন।

এইবার? এইবার কি করা যায়? মদ খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া দুইটাই তো হইল। অতঃপর?

সহসা করালীচরণের কানে আসিল, সামনের খোলার বাড়িতে যে কোচোয়ান-দম্পতি বাস করে, তাহারা উচ্চকণ্ঠে কলহ শুরু করিয়াছে। উভয় পক্ষই চোখা চোখা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে তো! বাহি নারায়ণ! সাগ্রহে কান পাতিয়া করালীচরণ তাহাদের অশ্লীল ভাষার গালাগালিগুলি শুনিতে লাগিলেন। অসভ্য বুড়ো কোচোয়ানটাকে তাঁহার হিংসা হইতে লাগিল। আর যাই হোক, সময় কাটাইবার জন্য বুড়োকে পরের উপর নির্ভর করিতে হয় না, ঘরের সঙ্গিনীটিই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনী! সঙ্গিনীর কথায় করালীচরণের অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। সকলেরই তো একটা না একটা সঙ্গিনী আছে, তাঁহার বেলাতেই বিধাতা-পুরুষ এমন কৃপণ হইলেন কেন? বিবাহের বয়স তাঁহার এখনও পার হইয়া যায় নাই বোধ হয়। নিজের বয়সটা ঠিক কত তাহা তাঁহার জানা নাই, কারণ নিজের জন্মসময়ই ঠিক তিনি জানেন না।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় মায়ের নিকট হইতে বয়সের একটা খবর আনিতে হইয়াছিল, সে হিসাবে তাঁহার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কি আর এমন বয়স! এমন বয়সে কত লোকই তো বিবাহ করিতেছে। বিবাহের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটিল। কে এমন নিষ্ঠুর মেয়ের বাপ আছেন, যিনি সজ্ঞানে তাঁহার মত কানা কালো কুৎসিত একটা মাতালের হাতে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন! রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যাহারা দেহ বিক্রয় করে, তাহারাও তাঁহাকে চাহে না। অর্থ ই যাহাদের পরমার্থ, করালীচরণের অর্থ তাহাদের নিকটও নিরর্থক।

অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! ভন্টুবাবুর পাস-বুকে কত টাকা জমিল একবার খোঁজ লইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক, দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠিগণনার চূড়ান্ত করিয়া নিজের অদৃষ্টলিপিটা পাঠ করিতে হইবে।

সহসা কোচোয়ান-দম্পতির কলহ থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ ঘনতর হইয়া উঠিল। দমকা বাতাসে ওদিককার জানালাটা খুলিয়া গিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জানালাটার ছিটকানি নাই, সকাল হইতে ক্রমাগত ওইরূপ হইতেছে।

করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ভন্টু কয়েকদিন হইতে আসে নাই, হাতে গোটা-পনেরো টাকা জমিয়া গিয়াছে। মদ এবং সিগারেট যাহা আছে, তাহাতে খানিকক্ষণ চলিবে। কিন্তু তাহার পরই মুশকিল। ফুরাইলে এই বর্ষায় আনিয়াই বা দেয় কে? বৃন্দাই একটা ছোঁড়া বিড়ির দোকান খুলিয়াছে, ইদানীং তাহাকেই দুই-চারি আনা পয়সা দিয়া করালীচরণ ফাই-ফরমাশ খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বর্ষায় সেও আসে নাই। করালীচরণের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। বাপ্ নারায়ণ! সমস্ত দিনটা আজ কাটিবে কি করিয়া?

সিগারেটে টান দিতে দিতে করালীচরণ আলমারি ও তাকের বইগুলির দিকে চাহিলেন। সমস্তই পড়া, একবার নয়—বহুবার। তবুও যদি উহারই মধ্যে এই দিনের মত কোন খোরাক পাওয়া যায়! করালীচরণ

আলমারি খুলিয়া বইগুলি নামাইতে লাগিলেন। পাঁজি, পাঁজি, ক্যাল্‌কুলাস, Tale of two Cities, পাঁজি, Scarlet Lady, Statics, পাঁজি, পাঁজি, পাঁজি, Paradise Lost, Race tips, রুবাইয়াৎ, আরব্য উপন্যাস, Astronomy, পাঁজি— বিরক্তিকর! বইয়ের গাদা ঠেলিয়া দিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নজরে পড়িল, বইগুলার পিছন হইতে একজোড়া টিকটিকি বাহির হইয়া দেওয়ালে উঠিয়াছে। ইহারা করালীচরণের আলমারিতে বহুকাল হইতে আছে। অপরিচিত নয়, চেনা। আজ কিন্তু করালীচরণ ইহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইহারা দম্পতি! টিকটিকিদের মধ্যেও দম্পতি আছে!

টেবিলের উপর হইতে আয়নাটা তুলিয়া লইয়া করালীচরণ নিজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঠোঁট দুইটা আজকাল আরও ঝুলিয়া গিয়াছে। সহসা খেয়াল হইল, পাথরের চোখটা আর একবার পরিয়া দেখা যাক না, দিনের আলোতে কোন দিন পরিয়া দেখা হয় নাই। চোখটা পরিয়া আয়নার দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, নিদারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় আয়নাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি চোখটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাথরের চোখে কখনও মানুষ ভোলে! ওটা পরিলে চেহারাটা আরও যেন বীভৎস হইয়া উঠে। করালীচরণ উঠিয়া বোতলে মুখ লাগাইয়া আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ার বিরাম নাই, সমস্ত গলিটাময় প্যাচপ্যাচে কাদা। বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু বর্ষার মহিমা নাই। শতছিন্ন মলিন কাপড় পরিয়া একটা ভিখারিণী বুড়ী যেন দুঃখের ভারে অবনমিত হইয়া পথ চলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই-চারি ফোঁটা অশ্রু উদ্গত হইয়া উঠিতেছে, দুই-একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শ্রীহীন বেদনার মূর্তি। পাশের বাড়ির ঘড়িটা বাজিয়া উঠায় করালীচরণের হুঁশ হইল, বেলা বাড়িতেছে। বারোটা বাজিয়া গেল।

যে হোটেলটায় তিনি রোজ আহার করেন, সে হোটেলটা আজ খুলিয়াছে কিনা কে জানে! খুলিয়াছে নিশ্চয়ই।

করালীচরণ উঠিলেন, কোটটা গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলে গিয়া কিন্তু তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। ইহারা মানুষ, না, পশু! এমন বর্ষার দিনেও সেই সনাতন কলায়ের ডাল, বড়িচচ্চড়ি, শাকভাজা, উরগুনি মাছের ঝোল! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ওই অখাদ্যগুলাই দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিতে হইল। কিন্তু নাঃ, অসম্ভব; ক্ষুধা সত্ত্বেও করালীচরণ উঠিয়া পড়িলেন।

দাম দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেই পানওয়ালীটা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। হোটেল এবং পানওয়ালীর দোকান ঠিক সামনাসামনি। করালীচরণ এতক্ষণ পানওয়ালীকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পানওয়ালী করালীচরণের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। পানওয়ালীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া হনহন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া অবশেষে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া করালীচরণ ভিড় দেখিতে লাগিলেন। তিনিই শুধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না, বাহিরের পৃথিবীর তো ব্যস্ততার সীমা নাই! মোটর, ট্রাম, রিক্শ, ঘোড়ার গাড়ি, পদাতিক—সকলে মিলাইয়া কাদা ছিটাইয়া চৌরাস্তাটাকে যেন মথিত করিয়া ফেলিতেছে। সকলেরই কাজ আছে। থাকিবে না কেন? তাঁহার মত—। করালীচরণ আবার ফিরিলেন, মদ কিনিতে হইবে। এক বোতল মদ ও কিছু সিগারেট কিনিয়া ফেলা অবিলম্বে দরকার। ভন্টুবাবু কখন যে হানা দিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইবেন স্থিরতা নাই।

ভিড় ঠেলিয়া পিছল কর্দমাক্ত ফুটপাথ দিয়া প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে করালীচরণ মদের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিলেন, যেন কোন জরুরী দরকারে ট্রেন ধরিতে ছুটিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত করালীচরণ মদ ও সিগারেট লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের কপাট খোলা, হাঁ-হাঁ করিতেছে। মনে পড়িল, যাইবার সময় বন্ধ করিয়া যান নাই। ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল, টেবিলের উপর একটা থালায় কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। কি এ! আগাইয়া গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানা পরোটা ও হাঁসের ডিমের ডালনা। কে রাখিয়া গেল! পর-মুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এক টানে থালাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, হারামজাদী! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। একদিন দুর্মতি হইয়াছিল, ওই ডাকিনীদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ্যারা আবার মানুষ! দুই-চারি টাকার জন্য যাহারা—। করালীচরণ পূর্বেকার নিঃশেষিতপ্রায় বোতলটাতে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। মাগীর তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা, সোহাগ জানাইতে আসিয়াছে! একটুও যদি রূপ থাকিত, দেমাকে মাটিতে পা পড়িত না, আমাকে দেখিয়া তখন হয়তো মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইত। এখন বোধ হয় কেউ পোঁছে না, তাই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। এবার আসিলে চাবকাইয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব।

ঘরে খিল দেওয়ায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণ মোমবাতির সন্ধান করিয়া দেখিলেন, মোমবাতি নাই। বাই নারায়ণ! আবার বাহির হইতে হইবে। করালীচরণ তালাটা খুঁজিতে লাগিলেন, এবার তালা দিয়া যাইতে হইবে। তালাটা লাগাইতে লাগাইতে করালীচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, থালাটা কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল, ওই দিকের গলিতে কতকগুলা ছোঁড়া একটা দাড়কাক

ধরিয়াছে এবং তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নানা রকম যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতেছে। করালীচরণ খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া মোমবাতির খোঁজে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভন্টু আপিসের ফেরত করালীচরণের বাসার দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুনিতে পাইল, করালীচরণ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন—It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us—

ভন্টু দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই করালীচরণ বইটা বন্ধ করিলেন।

বাই নারায়ণ! সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন আপনারা? একা একা পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছি—'টেল অফ টু সিটিজ'-খানা পড়ছিলাম, কি আর করি!

ভন্টু কাজের কথা পাড়িল।

আমাদের আপিসের একজন বড্ড ধরেছে, তার ছকটা যদি একটু দেখে দেন। বেচারা ভারি গরিব, দু টাকার বেশি—

ছকটা এনেছেন? কই?

করালীচরণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভন্টু ছকটা বাহির করিতেই করালীচরণ তাহার হাত হইতে তাহা প্রায় ছিনাইয়া লইলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া দেখিতে শুরু করিলেন।

ভন্টু স্মিতমুখে করালীচরণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা খড়খড় শব্দ শুনিয়া আলমারির মাথার উপর নজর পড়িতেই বিস্মিত হইয়া গেল।

ওটা কি আবার ?

করালীচরণ চকিতে একবার সেদিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, পুষলাম।

কি পাখি ওটা ?

দাঁড়কাক।

দাঁড়কাক ! কোথা থেকে পেলেন ?

রাস্তার ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিনলাম এক টাকা দিয়ে। একটা সঙ্গী না হ'লে চলে না মশাই, একা একা আজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ভন্টু আলমারিটার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, মস্ত একটা দামী খাঁচায় সত্যই একটা দাঁড়কাক রহিয়াছে। করালীচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি তন্ময় হইয়া গণনায় মন দিয়াছেন। ভন্টু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

৭

মানুষ ভাবে এক রকম, হইয়া যায় আর এক রকম। পথের নেশায় মাতিয়া মানুষ পথটাকেই বড় মনে করে, লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে পথকে সে আশ্রয় করে, সেই পথই শেষে তাহাকে পাইয়া বসে, পথ-চলার উন্মাদনায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মৃন্ময়েরও তাহাই হইয়াছিল। মজফ্‌ফরপুরগামী একটা ট্রেনের কামরায় বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় সহসা অনুভব করিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। হারানো পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে পুলিসে চাকুরি লইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজ সহসা সে অনুভব করিল যে, সে উদ্দেশ্যটা গৌণ হইয়া গিয়াছে, চাকরিই এখন মুখ্য। কই, সে তো বিগত এক মাসের মধ্যে স্বর্ণলতাকে একখানি চিঠিও লেখে নাই ! কাজের চাপ পড়িয়াছে সত্য কথা, কিন্তু কাজের চাপই কি একমাত্র কারণ? তাহার

উৎসাহও কি কমিয়া আসে নাই? স্বর্ণলতাকে হারাইয়া যে তীব্র বেদনা সে অনুভব করিয়াছিল, যাহার তাড়নায় পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল, সে বেদনা কি এখনও তেমনই তীব্র আছে? তীব্রতাটা কি এতটুকু কমে নাই? নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করিয়া, নিজেরই অন্তরের মধ্যে সত্য সন্ধান করিয়া ডিটেক্‌টিভ মৃন্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন সে যে শুধু স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিবার সময় পায় নাই তাহা নহে, স্বর্ণলতাকে ভাবিবারও সময় পায় নাই। এ কয়দিন সে শুধু মিস্টার ঘোষের কথা এবং মিস্টার ঘোষের আচরণের কথা ভাবিয়াছে।

মজুমদারের মত মিস্টার ঘোষও তাহার সহকর্মী। সম্প্রতি বাহির হইতে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। কর্মতৎপরতা তাঁহার যেন অসাধারণ রকম প্রখর, মনও তাঁহার তেমনই অসাধারণ রকম বিষাক্ত। মৃন্ময় নিজের কর্মকুশলতার জোরে উন্নতি করিতেছে, উপরওয়ালার প্রিয়পাত্র হইতেছে, এই বম্ব্ কেসটার তদন্তের ভার পাইয়াছে—মিস্টার ঘোষের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছে। মিস্টার ঘোষও এই বম্ব্ কেসে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু মৃন্ময়ের উন্নতি তিনি ভাল চক্ষে দেখিতেছেন না। কাহারও কোন উন্নতি কখনও তিনি ভাল চক্ষে দেখেন না। তাঁহার স্বভাবই ওইরূপ। তাঁহার বক্রোক্তি, আচরণের অন্তর্নিহিত তিক্ততা, গোপনে চক্রান্ত পাকাইয়া তুলিবার ক্ষমতা—মৃন্ময়কে এ কয়দিন এমন ক্ষুব্ধ ও ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার অন্য কথা ভাবিবারই অবসর ছিল না। তাহার মোটর-চাপা-পড়া সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মিস্টার মজুমদার যখন অচিনবাবুকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, তখন মিস্টার ঘোষ স্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে বলিয়া বসিলেন যে, অচিনবাবুর ইহাতে যদি লাভ থাকে, তাহা হইলে মৃন্ময়বাবুও নিশ্চয়ই কোন নারীঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। লোকটার ব্যবহার, কথাবার্তা আশ্চর্য রকম ভদ্র, আশ্চর্য রকম হাস্যলিপ্ত, অথচ আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত। মজুমদার ঠিক ইহার বিপরীত। ভদ্রতার ধার ধারে না, চীৎকার করিয়া কথা বলে, অশ্লীল কথা

মুখে লাগিয়াই আছে, মন কিন্তু পরিষ্কার। মৃন্ময় অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে—ইহা মিস্টার ঘোষের বিদ্বেষ এবং মিস্টার মজুমদারের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। মজুমদারের সাবধানবাণী মৃন্ময়ের মনে পড়িল। কাজে কোন রকম খুঁত যেন না হয়, হইলে তাহা ঘোষের দৃষ্টি এড়াইবে না এবং সেই খুঁতটুকুকে নিখুঁতভাবে উপরওয়ালার নয়নগোচর করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই 'চুগলি'-পটুতার জন্যই নাকি উপরওয়ালার নিকট তাহার প্রতিপত্তি। মৃন্ময় স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান। জ্ঞাতসারে সে কোন খুঁত ঘটিতে দিবে না। যে কাজে সে যাইতেছে, কি ভাবে করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তাহারই ভাবনায় সে পুনরায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। স্বর্ণলতাব কথা একবার মাত্র মনে হইয়াছিল, আর হইল না।

বরং হাসির মুখখানা মনের মধ্যে দুই-একবার উঁকি দিয়া গেল। মনে পড়িল, হাসি মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছে—টিফিন-কেরিয়ারে যে লুচি আলুর দম ও মোহনভোগ সে করিয়া দিল, মনে করিয়া ঠিক সময়ে তাহা যেন সে খায়। মৃন্ময় টিফিন-কেরিয়ারটা নামাইয়া দেখিল, হাসি করিয়াছে কি! এ যে তিনজনের খাবার! কিন্তু আশ্চর্য, হাসির এই অপব্যয়প্রবণতায় মৃন্ময়ের রাগ হইল না, মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল।

৮

হাসি একা দুপুরে বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল। চিন্ময় আজকাল তাহাকে বাড়িতে লেখাপড়া শিখাইতেছে। আগ্রহ অবশ্য হাসিরই বেশি। বাংলা লেখাপড়াটা বাড়িতে শিখিয়া ফেলিতেই হইবে। সবাই কেমন নানারকম বই পড়ে, স্বামীকে চিঠি লেখে, হাসি কিছুই পারে না। চিন্ময়ের সাহায্য লইয়া তাই সে বর্ণ-পরিচয় হইতে শুরু করিয়া দিয়াছে। সবাই পারে, সেই বা পারিবে না কেন? প্রথম ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগেরও বেশি বাকি নাই। প্রত্যহ দশখানা করিয়া ছাপের লেখা

লিখিতেছে। হাতের লেখাটা তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া ফেলিতে হইবে। কবে সে স্বামীকে ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারিবে? ও-বাড়ির কুসুম কেমন সুন্দর করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখে, স্বামীর কত সুন্দর চিঠি পায়।

অতিশয় মনোযোগসহকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখে প্রসারিত লিখন-প্রণালী দেখিয়া হাসি হাতের লেখা লিখিতে লাগিল। দুপুরবেলায় ঘুমানো তাহার বহুদিনকার অভ্যাস; মাঝে মাঝে হাই উঠিতেছে; কিন্তু না, কিছুতেই না, হাতের লেখাগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। একখানি কম হইলে চিন্ময় ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিবে। এমনিই তো তাহার লেখাকে কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ নাম দিয়াছে। হাসি ঝুঁকিয়া লিখিতেছিল, এই কথা মনে হওয়াতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া নিজের হস্তাক্ষরগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ কেন হইবে? আগেকার চেয়ে তো অনেকটা ভাল হইয়াছে। আবার সে ঝুঁকিয়া লিখিতে শুরু করিল।

৯

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

নিবারণবাবু ও মাস্টার দোকানে গিয়াছে, আসুমি কাজকর্ম সারিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মা পাশের ঘরে নিদ্রিত। দার্জি ওরফে জাহ্নবী একা বসিয়া একটি কাপড়ে রঙিন সুতা দিয়া ফুল তুলিতেছে আর ভাবিতেছে, সকলে তাহাকে ইহার জন্য এত বকে, কেন? সকলের ইহা খারাপ লাগে, অথচ তাহার ইহা ভাল লাগে কেন? বাবা বকে, মা বকে, আসুমি বকে; সে কিন্তু কিছুতেই ইহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ফুলিপিসীর কথা মনে পড়ে। ফুলিপিসীই প্রথমে তাহাকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়াছিল। বেচারী মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার হাতের বাঁধা কার্পেটের আসনটা এখনও আছে। সেই কার্পেটটার

প্রতি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া ফুলিপিসী এখনও বাঁচিয়া আছে। ফুলিপিসীও তাহারই মত কুৎসিত ছিল, বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী-সুখ কখনও পায় নাই। সুন্দরী দেখিয়া স্বামী আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিল। ফুলিপিসী চিরকাল বাপের বাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। ফুলিপিসীর দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত, যখন সে তাহার সেলাই লইয়া বসিত। ওই ছিল তাহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র।

দার্জি সেলাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, তাহার কি বিবাহ হইবে? কত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইতেছে না, তাহাকে বিবাহ করিবে কে? কত লোকই তো আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল—কই, কেহই তো পছন্দ করিল না! আসুমিটাকে বরং দুই-একজন পছন্দ করিয়াছে। আসুমি যদিও কালো, কিন্তু তাহার মুখ-চোখ হাব-ভাবে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার বিবাহ না হইলে তো আসুমির বিবাহ হইবে না। তাহাকে কে বিবাহ করিবে? কোথায় সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে তাহার বাহিরটাকে তুচ্ছ করিয়া ভিতরটা দেখিতে পাইবে? কোথায় সে?

দার্জি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মানসপটে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মুগ্ধ যুবকের অজানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সে আবার সুতা দিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

১০

নানা স্থান হইতে ঋণ করিয়া শঙ্কর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা লইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। এ কয়দিন সে মুক্তোর কাছে যাইতে পারে নাই। সেদিনকার সেই ঘটনার পর শূন্যহস্তে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কয়েকদিন ক্রমাগত ঘুরিয়া পঞ্চাশটা টাকা অনেক কষ্টে

সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, গিয়াই টাকাগুলি মুক্তোর হাতে দিয়া বলিতে হইবে, তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি আমি করিতে চাহি না, নোটগুলি ভাল করিয়া গনিয়া দেখিয়া লও। মনে করিও না, আমি তোমার ভালবাসার মূল্য দিতেছি। টাকা দিয়া ভালবাসা ক্রয়ও করা যায় না, বিক্রয়ও করা যায়, না আমি তাহা জানি। কিন্তু আমি ইহাও জানি, অর্থ-হীন ভালবাসাবাসি করিবার সঙ্গতি তোমার নাই। সেইজন্য তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু আনিয়াছি। কয়েকদিনের জন্য অন্তত ব্যবসাটা বন্ধ কর। তুচ্ছ টাকার অজুহাতে আমাকে ফিরাইয়া দিবে, তাহা আমি সহ্য করিব না। টাকাটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় জিনিস নয়। এতকাল টাকা চিনিয়াছ, এইবার মানুষ চিনিতে শেখ। সামান্য টাকার জন্য এমন করিয়া নিজেকে যেখানে সেখানে বিলাইয়া দিও না। নিজেকে চেন।

কে, শঙ্কর নাকি? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকেই খুঁজছি।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, ভন্টুর মেজকাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে স্মিতমুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করকে দাঁড়াইতে হইল।

আমাকে ডাকছেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব ভাই? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার দরকার আছে। তোমার মাথা যে কত সাফ, সে তো আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

কিসের ভূমিকা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুক্তানন্দ বলিলেন, চল, স্কোয়ারটার ভেতর বসা যাক।

বেশি দেরি হবে কি? আমার একটু দরকারী কাজ ছিল।

না না, বেশি দেরি হবে না, দুটো কথা খালি।

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটা নির্জন জায়গা বাছিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, অঙ্কের ব্যাপার ভাই; তুমি ঠিক পারবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে একটা মূল্য-নির্ধারণ করে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও তোমরা। ব'স।

উপবেশন করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, কিসের মূল্য-নির্ধারণ?

আমার।

আপনার! মানে?

মানে-টানে কিছু নেই, আমারই।

শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার মনে হইল, হয়তো বাবাজী বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং নিজের বাজার-দর কত হওয়া উচিত, তাহাই তাহার কাছে জানিয়া লইতে চান। কিন্তু মুক্তানন্দের প্রশ্নে এ ধারণা অচিরেই অপনোদিত হইল।

অ্যাভারেজ বাঙালীর পরমায়ু কত ধরতে চাও তুমি? পঞ্চাশ? পঞ্চাশের কমই বরং হবে, বেশি নয়।

শঙ্কর বলিল, না।

আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে, বাকি রইল তা হ'লে আট বছর। এই আট বছরে কত উপার্জন করতে পারি আমি, একটা হিসেব কর দিকি। খুব বেশি ক'রে ধরলেও গড়-পড়তা মাসে ত্রিশ টাকার বেশি নয়। আট বছরে তা হ'লে কত হচ্ছে?

তিরিশ ইন্‌টু বারো মিন্‌টু আট—

ওসব ইন্‌টু-ইন্‌টু ছাড়, থোক্ টাকা কত হয় তাই বল।

শঙ্কর মনে মনে গুণ করিয়া বলিল, ছ হাজার আট শো আশি টাকা।

আচ্ছা, এইবার ওর থেকে আমার খাই-খরচ কাপড়-চোপড়ের খরচ সব বাদ দাও।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাবাজী বলিয়া চলিলেন, অ্যাভারেজ কত ধরবে? আমি মাছ মাংস খাই না অবশ্য, কিন্তু আলো চাল গাওয়া ঘি আমার চাই, কাপড়ও কম ক'রে বছরে খান-দশেক, জামা অন্তত গোটা চারেক ধর, তার পর ধর টুকিটাকি নানা রকম খরচা, বাঁচতে গেলেই হরেক রকম বখেড়া আছে তো!

আপনার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছি না আমি।

পারবে, পারবে গো। তুমি পারবে না তো পারবে কে? আগে অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি, আমার নিজের পার্‌সোনাল খরচ কত ধরতে চাও তুমি?

শঙ্কর যদিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি আজকালকার হিসাবে একটা লোকের খাওয়া-পরার খরচ ন্যূনকল্পে কত পড়িবে তাহা আন্দাজে বলিল, মাসে দশ টাকা ধরুন।

বাবাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

দশ টাকায় কি চলে আজকালকার দিনে! সস্তাগণ্ডার দিন কি আর আছে!

তাহার পর সস্মিতমুখে শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলিলেন, বেশ, দশ টাকাই ধর, তোমার কথা ঠেলব না আমি। দশ টাকা ধ'রেই হিসেব কর। তা হ'লে কিন্তু থাকারও একটা খরচ ধর। কলকাতা শহরে অমনই তো কেউ থাকতে দেবে না, মেসে থাকলেও সীট-রেণ্ট্ দিতে হবে। সেটাও ইনক্লুড কর। কত ধরবে সেটা—পাঁচ টাকা?

বেশ, পাঁচ টাকাই ধরুন। হ্যাঁ, পনেরো টাকার কমে চলে না একজনের আজকাল—

তা কি চলে কখনও! অথচ ভন্টু কথাটা কিছুতে বুঝছে না। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ধরতে ভুল হয়েছে—দুধ। দৈনিক অন্তত আধ সের ক'রে দুধ দরকার আমার। মাসে তা হ'লে কত হ'ল?

পনেরো সের।

টাকায় চার সের হিসেবে ধরলে—

প্রায় টাকা চারেক।

তা হ'লে পনেরো আর চারে উনিশ হ'ল?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এইবার অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি। ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে আয়, উনিশ টাকা ক'রে খরচা, বাঁচছে তা হ'লে—

মাসে এগারো টাকা ক'রে।

আট সাড়ে কত হয়, সেটা হিসেব কর এবার।

এগারো ইনটু বারো ইনটু আট—

মোটমাট কত বল, ইনটু কেন ?

শঙ্কর পুনরায় মনে মনে হিসাব শুরু করিল।

এক হাজার ছাপান্ন টাকা।

মোটে ! অথচ আমার নিজের অংশেই যে বিষয় রয়েছে, পৈতৃক নয়, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি আমি, তার দামই অন্তত তিন হাজারী টাকা। আমি অবশ্য সে বিষয়টা বন্ধক দিয়ে আমার গোয়াবাগানের সেই বন্ধুটির কাছ থেকে শ-পাঁচেক টাকা নিয়েছি, তবু তো আড়াই হাজার টাকা থাকে। ভন্টু মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে পাঁচ শো টাকা শোধ ক'রে ফেলে বিষয়টা নিয়ে নিক, ওর নামে আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি। আমাকে রেহাই দিক, এসব কচকচি আমার ভালই লাগে না।

এ রকম ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি ?

নিজের বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ভন্টু কষ্ট ক'রে সংসার চালাচ্ছে, আমি তার কাকা— আর তা ছাড়া, স্নেহও করি আমি ওকে, আমার উচিত তার কিছু ভার লাঘব করা। কিন্তু তুমিই তো হিসেব ক'রে দেখলে ভাই, বর্তমান বাজারে ওই এক হাজার ছাপান্ন টাকার বেশি সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাও যদি আমি ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পাই এবং এক-নাগাড়ে আট বচ্ছর খাটতে পারি। তার চেয়ে অত হাঙ্গামার দরকার কি, আমার মামার বাড়ির তরফ থেকে যে বিষয়টুকু আমি পেয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে আমায় রেহাই দাও। মাসে মাসে কিছু ফেলে দিলেই পাঁচশো টাকা দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে, তখন তিন হাজার টাকার বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ কর না তুমি।

মামার বাড়ির বিষয়টা কি আপনার একার ?

নিশ্চয়ই। ভন্টুর বাপ আর আমি তো সহোদর ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মায়ের বিষয় আমি পেয়েছি, ওতে আর কারও হক নেই। দাদামশাই ওটা মাকে দিয়েছিলেন আলাদা ক'রে।

কোথায় আছে বিষয়টা ?

আমার মামার বাড়িতে—হুগলী থেকে কিছুদূর ইন্‌টিরিয়রে।

ভন্‌টু কি বলছে ?

'ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাই না।' এতে হাঙ্গামাটা কি, তুমি বল তো ভাই ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনিই বা অত জোর-জবরদস্তি করছেন কেন ?

ওই যে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি তা হ'লে। একটা পেছটান্ থাকলে তো ধর্মে কর্মে মন বসে না। হরিদ্বারে দিব্যি একটি আস্তানা পেয়েছিলাম, কোথাও কিছু নেই, এক স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্নের দোষ নেই, কর্তব্যে খুঁত ছিল, স্বপ্নে তার আভাস পেলাম। ফিরে আসতে হ'ল। এবার ভাবছি, কর্তব্যের জড় মেরে তবে বেরুব। কিন্তু ভন্‌টু বাগড়া লাগাচ্ছে। হিসেব-টিসেব তুমি তো দেখলে ভাই, একটু বুঝিয়ে ব'লো তাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তানন্দও উঠিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, ভন্‌টুর মাথায় গোবর পোরা, হিসেব-টিসেব ও কিছু বোঝে না, তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও ভাই। তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে, বল তো ?

কোথায় আছেন আপনি ?

আমি আছি গোয়াবাগানেই। ভন্‌টুর ওখানে উঠি নি, দাদা আমাকে দেখলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, তা ছাড়া, ওদের টানাটানির সংসার, আমি গেলে বাড়তি একটা খরচ হবে তো। তার চেয়ে বিনোদের বাসাতেই আছি ভাল। দুজনেই একতন্ত্রের লোক।

বিনোদবাবুও কি সন্ন্যাসী ?

না, ঠাকুর তাকে ঘরে থেকেই সাধনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তেল মাখতে মাখতে গালি—

শঙ্কর অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, আমি তা হ'লে চলি এবার এস।

রাত্রি আটটা হইবে। শঙ্কর গিয়া দেখিল, মুক্তো নিজের ঘরে নাই। শুনিল, আঙুরের ঘরে একজন বড়লোক বাবু বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। সেখানে আমোদের এবং মদের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দশ-বারোজন নর্তকীর প্রয়োজন হওয়াতে পাড়ার যত নাচনেওয়ালী সেইখানে আহূত হইয়াছে। মুক্তোও সেখানে আছে। সংবাদটি দিয়া কালোজাম বলিল, আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি তাকে।

শঙ্কর অনুভব করিল, খবর দিলে মুক্তো আসিবে না। বলিল, আঙুরের ঘর কত দূর এখান থেকে, চলুন না, সেইখানেই যাওয়া যাক।

কালোজামকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে সেখানে যেতে দেবে না?

কালোজাম মুচকি হাসিয়া বলিল, ওদের কারুর এখন মানা করবার ক্ষমতা নেই, চারটে থেকে ক্রমাগত মদ খাচ্ছে সবাই। তবে পরের ঘরে বিনা নেমন্তন্নে যাওয়াটা ঠিক নয়।

মুক্তো কি করছে, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ভারি।

দেখাতে আমি পারি। জানলা খোলা আছে, ওদিকের ওই বারান্দার কোণটায় দাঁড়ালে সব দেখা যাবে। আসুন তা হ'লে চুপিচুপি।

চুপি চুপি! শঙ্করের আত্মসম্মানে একটু যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিবার সময় ছিল না। কালোজাম বলিল, আসুন।

সে অনুসরণ করিল।

কালোজাম তাহাকে লম্বা সরুগোছের বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে লইয়া গিয়া একটা খালি উপুড়-করা কেরোসিন-কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলিল, বসুন তা হ'লে এইখানে। র‍্যাপার দিয়ে পা-টাগুলো একটু ঢেকে বসুন,

মশা কামড়াবে না হ'লে। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি, দাঁড়ান, গিয়ে খুলে দিয়ে আসি।

কালোজাম চলিয়া গেল। নিটোল কালোজামের মত এই মেয়েটির সহৃদয়তায় শঙ্কর মুগ্ধ হইল।

সামনে একটু ছোট উঠানের মত, তাহার ও-পারেই আঙুরের ঘর। সেখান হইতে বাজনার আওয়াজ আসিতেছে। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা পুরা দমে চলিতেছে। কালোজাম গিয়া আঙুরের ঘরে উঁকি দিতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা হৈ-হৈ হল্লা উঠিল। কালোজাম ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মিনিট-পাঁচেক পরে জানালাটা খুলিয়া গেল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, মুক্তো নাচিতেছে। মাথার উপর একটা মদের গ্লাস রাখিয়া অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া তবলার তালে তালে মুক্তো নাচিতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কর চাহিয়া রহিল; মুক্তোর এমন রূপ তো সে দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। চক্ষু দুইটি আবেশময়, প্রতি অঙ্গ হইতে রূপ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কয়েকটা মাতাল লুব্ধদৃষ্টিতে বসিয়া দেখিতেছে, একটা মোটাগোছের লোক মদ খাইতেছে, জড়িতস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং নাচের তালে তালে বীভৎসভাবে পা দোলাইতেছে।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে কি করিত বলা যায় না; কিন্তু কালোজাম আসিয়া পড়িল এবং বলিল, চলুন, ভেতরেই বসবেন, এখানে যা মশা! মুক্তোকে চুপিচুপি ব'লে এসেছি, সে আসবে এখুনি।

শঙ্কর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কালোজামের পিছু পিছু আসিয়া মুক্তোর ঘরে প্রবেশ করিল।

কালোজাম বলিল, আপনি এইখানেই বসুন একটু, আমি যাই, আমার লোক এসেছে।

লোকে যেমন নির্বিকার ভাবে আপিস-ঘরে ঢোকে, তেমনিই

নির্বিকার ভাবে কালোজাম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। শঙ্কর বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। মুক্তোর নাচ দেখিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হঠাৎ আঙুরের ঘর হইতে একটা খুব হাসির হররা উঠিতেই শঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে গিয়া বারান্দার সেই অন্ধকার কোণটায় পুনরায় হাজির হইল। দেখিল, মুক্তো নয়, আর একটি মেয়ে উঠিয়া নাচিতেছে। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। পুরুষের মত মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, পুরুষের জুতা পায়ে দিয়া নাচিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এত মদ খাইয়াছে যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, তথাপি নাচিতেছে, এবং তাহার নাচ দেখিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে, মেয়েটিও হাসিতেছে। হঠাৎ শঙ্করের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। সে বারান্দা হইতে নামিয়া আঙুরের ঘরের দিকে যাইবে বলিয়া পা বাড়াইতেছে, এমন সময়ে মুক্তো আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, ও-দিকে কোথা যাচ্ছেন? আমার ঘরে চলুন। এতদিন পরে আজ এলেন যে?

শঙ্করের আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। মুক্তোকে কাছে পাইয়া আসন্নপ্রসবা-নর্তকী-সমস্যার তীক্ষ্ণতা সহসা ভোঁতা হইয়া গেল, মুক্তোর পিছু পিছু সে মুক্তোর ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

মুক্তো আঁচলের ভিতর হইতে এক ডিশ মেটেচচ্চড়ি বাহির করিয়া বলিল, খান।

শঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে মুক্তোর পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তো মদ খাইয়াছে, চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখে মুখে অপূর্ব একটা মদির প্রাখর্য!

নিন, এইগুলো খান।

শঙ্কর বলিল, খিদে নেই।

তবু খান।

খেতে আমি আসি নি, আমি এসেছি তোমার কাছে। সম্ভব হ'লে এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব আমি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুক্তো বলিল, নরক!

নরক নয় তো কি?

আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার! এ নরকে এসে আমাদের উপকার করবার জন্যে কে পায়ে ধ'রে সেধেছিল আপনাকে, শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? নরক! আপনাদের সগ্‌গে আপনারাই থাকুন গিয়ে, আমরা সেখানে যেতে চাই না, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি আমরা।

মুক্তোর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

নিন, খান।

খাব না।

আশ্চর্য লোক আপনি! এই সেদিন ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছিলেন—তোমায় ভালবাসি মুক্তো, আজ বলছেন—এখানটা নরক! এত বাজে কথাও বলতে পারেন আপনারা!

সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি।

সত্যি?

ফিক করিয়া মুক্তো হাসিল এবং বলিল, তা হ'লে খান এগুলো।

আমি খাব না।

লক্ষীটি।

অতিশয় স্নেহভরে গায়ে মাথায় হাত দিয়া মুক্তো শঙ্করকে বিছানায় বসাইল এবং নিজে মেঝেতে বসিয়া খাইবার জন্ত তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, মা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ভুলাইয়া খাওয়ায়।

শঙ্কর বলিল, আমাকে তুমি ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল তো।

খান আগে, তারপর বলছি।

শঙ্কর আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইতেই মুক্তো উঠিয়া পড়িল। বলিল, আমি যাই একবার ও-ঘরে।

না, ওখানে যেতে দেব না আমি।

সে কি হয়? টাকা নিয়েছি—

টাকা ফেরত দাও, এই নাও।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া শঙ্কর মুক্তোর হাতে দিল। মুক্তো স্মিতমুখে নোটগুলি গনিয়া দেখিতেছিল—শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, আমাকে ভালবাস কি না বল আগে।

সত্যি কথা শুনবেন?

বল।

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, একটুও না। আপনার মত গঙ্গাজলমার্কা ছেলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

তবে আমাকে আসতে দাও কেন?

ভদ্রতার খাতিরে। অত সগ্‌গ-নরক বিচার করে যারা, তাদের আমরা ভালবাসতে পারি না। আপনারা জাপানী ফানুষ, দুদিন একদিনই দেখতে বেশ।

তাহার পর নোটগুলি গনিয়া বলিল, এ কটা টাকায় আমার কি হবে? ওদের সাত দিন মাইফেল চলবে, এক শো টাকা অগ্রিম দিয়েছে, বকশিশটা-আশটাও মিলবে। নিন আপনার টাকা, আপনি বাড়ি যান। গরিবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু? সোন্দর দেখে বিয়ে করলেই পারেন একটা। মুখ টিপিয়া হাসিয়া কোমর দোলাইয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল।

মুক্তো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফুটা দিয়া শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া যখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, মুক্তোর ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরায়। কিন্তু পর-মুহূর্তেই

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং আঙুরের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইবার নতুন ধরনের নাচ দেখাব একটা, তিনটে গেলাস চাই, মাথায় একটা নেব, দু হাতে দুটো।

এই নূতন প্রস্তাবে বাবুরা হৈ-হৈ করিয়া উঠিলেন।

মুক্তো পুনরায় নাচ শুরু করিল।

শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, একটু দূরে ওরিজিনাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটাকে চাপিয়া চক্ষু দুইটি ছোট করিলেন এবং তাহার পর গরম-জামার বুক পকেট হইতে একটি বৃহদাকৃতি নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, দশটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোঁফ-দাড়ি অন্তর্নিরুদ্ধ আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইল, মনে হইল, যেন এখনই বোমার মত সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া পড়িবেন; কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। এই নাবালকটার সহিত বিতণ্ডা করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। শঙ্করের প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তিনি সোজা মুক্তোর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন এবং সশব্দে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর ফুটপাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতেছিল। অপমানে, অক্ষমতায়, বিরাগে, অনুরাগে, হতাশায়, ক্ষোভে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার ভাষা নাই। মুক্তো তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কিন্তু মুক্তোকে তো মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছে না! সেই নৃত্যপরা তন্বীকে—

মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।

শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মেমসায়েব? কোন্ মেমসায়েব?

ওই যে গাড়িতে ব'সে রয়েছেন।

শঙ্কর দেখিল, রাস্তার ওপারে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইতেই শৈল জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, এস শঙ্করদা, তুমি এমন সময়ে এখানে যে?

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই এখানে হঠাৎ?

আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তুমিও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে নাকি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ঠিক ধরেছিস তো! তোর কাছে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আহা!

সহাস্য সকোপ কটাক্ষে চাহিয়া শৈল ভ্রূলতা আকুঞ্চিত করিল। তাহার পর বলিল, চল, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাই। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় অতটা দূর হেঁটে যেতে হবে তো আবার!

হাঁটা আমার খুব অভ্যেস আছে, তুই যা।

অতটা অহঙ্কার ভাল নয়, এস।

তুই যা না।

এস বলছি, ভাল হবে না।

শঙ্কর গাড়িতে না উঠিয়া পারিল না, উঠিয়া গিয়া শৈলর পাশে বসিল এবং ড্রাইভারকে হস্টেলের ঠিকানাটা বলিয়া দিল। শৈল বলিল, 'শিরিফরহাদ' কেমন লাগে?

চমৎকার!

বড্ড আজগুবি কিন্তু।

এটা শৈলর মুখের কথা। আসলে সে 'শিরিফরহাদ' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষণিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, রাগ করেছ আমার ওপর? কেন বল তো?

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, রাগ করব কেন ?

নিশ্চয় রাগ করেছ, একবারও তো যাও না আজকাল। আমি কেমন এস্রাজ বাজাতে শিখেছি, তোমায় শোনাতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি তো আজকাল যাওয়াই ছেড়েছ। কেন যাও না শঙ্করদা, একবারটি গেলে পড়ার কি এমন ক্ষতি হয় বল তো ?

রিনির কথা শৈলর মনে পড়িল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গ সে তুলিল না।

শঙ্কর বলিল, যাব একদিন।

তোমাকে চিনি না আমি, যাবে যা তা আমি জানি।

হস্টেলের নিকট গাড়ি থামিল।

শঙ্কর নামিতে নামিতে বলিল, ঠিক যাব।

কবে ?

উত্তরের জন্য শৈল সাগ্রহে শঙ্করের মুখের পানে চাহিল।

তা ঠিক বলতে পারি না এখন।

শৈল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল আগেকার মত শঙ্করদা বলিবে, কালই যাব নিশ্চয় এবং তাহার নিশ্চয়তার অনিশ্চয়তা লইয়া শৈল তাহাকে একটু ঠাট্টা করিবে। কিন্তু শঙ্করদা বেশ ওজন করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে। আগে তো শঙ্করদা এমন ছিল না!

এস একদিন, বুঝলে ?

যাব।

গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর পিছনের লাল বাতিটার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদূর গিয়াই গাড়ি মোড় ফিরিল। শঙ্কর তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। নির্জন পিচ-ঢালা রাস্তাটা রহস্যময় ভাষায় তাহাকে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

১১

রাজমহলে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার স্বাভাবিক রীতি-অনুযায়ী একদল ছেলে জুটাইয়া খেলায় মত্ত ছিলেন। এ খেলাটা অবশ্য বাঘ-বক্‌রি নয়, কলসী-ভাঙা খেলা। বাঘ-বকরি অপেক্ষা অধিক উত্তেজনাজনক। মাঠের মাঝে একটা খালি কলসী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এক-একটি বালকের চোখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে বেশ দুই-চারি পাক ঘুরাইয়া তাহার হাতে একটি লাঠি দেওয়া হইতেছে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় যদি সে কলসীটিকে গিয়া লাঠির ঘায়ে ভাঙিতে পারে, তাহাকে নগদ এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—মুকুজ্জেমশাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেশ একদল বালক জুটিয়া জটলা করিতেছে। মুকুজ্জেমশাই এক-একজনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িতেছেন এবং বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ ঠিক বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছে, কেহ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কেবল ইতস্তত করিতেছে, কেহ কলসীর পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বারম্বার দিক পরিবর্তন করিতেছে, কেহ অভিযোগ করিতেছে যে চোখ বড় বেশি জোরে বাঁধা হইয়াছে,—নানা বালক নানা রকম করিতেছে, কিন্তু কেহই কলসী ভাঙিতে পারিতেছে না। মুকুজ্জে-মশাই হাসিতেছেন।

একে একে অনেকগুলি বালকই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। পারিলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে ভাল হইত, এক টাকার বেশি খরচ হইত না। কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন মুকুজ্জেমশাই অনুভব করিলেন এবং নিকটেই একটি ময়রার দোকান থাকায় তাহা অসম্ভবও হইল না।

মোট কথা, মহানন্দে খেলা-পর্ব শেষ হইয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই যে বাড়িটাতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়িরই সম্মুখে অবস্থিত খোলা মাঠটাতে এই সব হইতেছিল। মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতে

যাইবেন, এমন সময় দুই-তিনটি বালক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল যে, আজ কিছুতেই তাঁহার যাওয়া হইবে না। গতকল্য ক্লিওপেট্রার যে গল্পটা রাত্রে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেটা শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, আজ আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই।

তবে আপনি গল্প আরম্ভ করলেন কেন?

অত্যন্ত অভিমান-ভরে আট-নয় বছরের একটি বালক ঠোঁট ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই ভারি বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আমি গিয়েই একটা ভাল বই পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তাতে ক্লিওপেট্রার গল্প আছে, আরও অনেক ভাল গল্প আছে।

পরশুদিন সেই যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বললেন, সেটাও আছে?

ওটা তো গল্প নয়, সত্যি কথা।

না, আপনি আজকের দিনটি থালি থেকে যান।

কলকাতায় আমার বড্ড দরকার আছে যে কাল। না গিয়ে উপায় নেই। তা না হ'লে তোমাদের ছেড়ে কি আমার যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতার সেই ভিড়ে?

আবার কবে আসবেন আপনি?

আবার শিগগিরই আসব।

কথাটা বলিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে পড়িল, সেবার অর্থাৎ প্রায় বৎসর খানেক পূর্বে তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখনও একদল বালক-সঙ্গী তাঁহার জুটিয়াছিল এবং আসিবার সময় তাহাদেরও তিনি আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন যে শীঘ্রই ফিরিবেন। কর্মের আবর্তে পড়িয়া তাহাদেরও বিস্মৃতই হইয়াছেন, যাওয়া দূরের কথা।

তথাপি তিনি হাসিয়া আবার বলিলেন, শিগগিরই আসব আবার।

ছেলের দল ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতেই মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আজই তো আপনি যাবেন?

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে তাহার পানে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের এ হাসি চেনে, বুঝিল, আজই তিনি যাইবেন।

মনোরমার বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ছিপছিপে গড়নের চেহারা। এই বয়সে মেয়েরা সাধারণত একটু মোটা হয়, কিন্তু মনোরমা তাহাও হয় নাই, এখনও সে তন্বী আছে। সৃষ্টিকর্তা মনোরমা-নির্মাণে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনোরমার অঙ্গে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নাই। ঠোঁট দুইটি এত পাতলা, দাঁতগুলি এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মাগ্র, চোখ দুইটি বড় বড় না হইয়াও এমন শ্রীসম্পন্ন, চিবুকটি ছোট হইয়াও এমন মানানসই, সমস্ত দেহটা লঘু হইয়াও এত লালিত্যময় যে, বিধাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু এই তন্বী নারীটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া অদৃশ্য কি যেন একটা আছে, তাহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না, দৃষ্টি আপনিই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত মুখচ্ছবিতে যেন একটা নীরব নিষেধ লেখা রহিয়াছে। যেন বলিতেছে, এদিকে চাহিও না। তাহার পরিমিত আলাপে, শান্ত কণ্ঠস্বরে, ধীর গমন-ভঙ্গিমায় তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, যে ধারণার প্রতিবাদ তাহার কঠিন মুখভাবে, সূক্ষ্ম নাসার সূক্ষ্মতর কম্পনে, দৃঢ়নিবদ্ধ পাতলা ঠোঁট দুইটিতে এবং সর্বোপরি তাহার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। শান্তকণ্ঠে তাহার মৃদু কথাগুলি শুনিলে মনে হয়, তাহার মনে কোন ক্ষোভ বা অশান্তি নাই, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে দেরি হয় না যে, প্রাণপণ শক্তিতে সে একটা বিরাট আর্তনাদের কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং [illegible] এই নিদারুণ দ্বন্দ্বকে গোপন করিতে গিয়াই তাহার সমস্ত শক্তি [illegible] নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জোরে কথা কহিবার অথবা চলিবার [illegible]ও যেন আর অবশিষ্ট নাই। দৈনিক জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনে যদি বলিতে অথবা চলিতে না হইত, সে নির্বাক নিশ্চল হইয়া নির্জনে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হয়, সমাজ তো নির্জন নয়।

বালবিধবা মনোরমাকে তাই চলিতে হয়, বলিতে হয়, কাজকর্ম করিতে হয়। কিন্তু সে এত সংক্ষিপ্ততার সহিত এগুলি করে যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, সঙ্গোপনে কি একটা গোপন বেদনাকে সে সর্বদা পালন করিতেছে এবং পাছে কেহ তাহা বুঝিতে পারে—এই আশঙ্কায় নিরুদ্বেগের একটা মুখোশ পরিয়া আছে। তাই কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাহার চোখে মুখে এমন একটা জ্বালা প্রকটিত হইয়া উঠে, দর্শককে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হয়।

মনোরমার জীবন দুঃখময়। সেই কবে, কতদিন আগে বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় সে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, ফুলশয্যার রাত্রেও লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল, তাহার পর আর স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই। তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন। স্বামীর মুখ মনোরমার মনে নাই। যখন বিবাহ হইয়াছিল, কতই-বা তাহার বয়স। দশ বৎসরও নয়। হিন্দু-বিধবাজীবনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার চাপেও কিন্তু মনোরমার যৌবন নিষ্পিষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যায় নাই বলিয়াই সমাজের চক্ষে সে পতিতা। কিন্তু কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা ঠিক নয়। গুণ্ডায় তাহাকে হরণ করে নাই। সে স্বেচ্ছায় তারাপদের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা তারাপদকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল এবং আত্মীয়স্বজনেরা যদি পুলিসের হাঙ্গামা না তুলিতেন, হয়তো তারাপদর সঙ্গেই তাহার জীবনটা সুখেই কাটিয়া যাইত। (যাইত কি?—মাঝে মাঝে এখন তাহার নিজেরই সন্দেহ হয়।) পুলিসের ভয়ে তারাপদ অন্তর্ধান করিল। আত্মীয়স্বজনেরা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন; কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। পদস্খলিতাকে ক্ষমা করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বাপ মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মনোরমা সংসারের মধ্যে কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বাপ্-মার মৃত্যুর পর তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ভাইদের সংসারে ভ্রাতৃজায়াদের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও হয়তো মনোরমা ভিটা আঁকড়াইয়া কোনক্রমে পড়িয়া থাকিতে পারিত ; কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সে থাকাতে তাহার ভাইঝিদের বিবাহ হইতেছে না, তাহার অতীত কলঙ্কটা তাহাকে ঘিরিয়া এখনও সজীব হইয়া আছে এবং তাহাদের বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, তখন সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, দুই চক্ষু যেখানে লইয়া যায় সেইখানেই সে চলিয়া যাইবে, দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিবে, ভাইদের সংসারে আর থাকিবে না। যৌবন তখনও অটুট ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত রূপও ছিল, কাশীধামে উপনীত হইয়া মনোরমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য একাধিক ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক, একটি বিপত্নীক কাশীবাসী প্রৌঢ় এবং গুটিচারেক ছোকরার বল-বিক্রম-দরদ-অনুরোধ-ইঙ্গিতের আবর্তে পড়িয়া সে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখা দিলেন। মুকুজ্জেমশাই লোকটি কে, কেন তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে চাহিতেছেন, কি করিয়া তাহার খবর পাইলেন, মনোরমা কিছুই জানিত না। তিনি আসিয়া বলিলেন, শুনলাম, তুমি বিপদে পড়েছ, যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও আসতে পার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখে মুখে কথায় বার্তায় মনোরমা কি দেখিল তাহা মনোরমাই জানে, সে নির্ভয়ে রাজী হইয়া গেল। কেবল বলিল, আমাকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন ?

তা এখনও ঠিক করি নি। আমি কোথাও বেশি দিন থাকি না, তবে তোমাকে ভালভাবে রাখবার বন্দোবস্ত করব কোথাও না কোথাও।

সেই হইতে মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে আছে এবং এ যাবৎ যত পুরুষের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুকুজ্জেমশাইই একমাত্র লোক, যিনি তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার ; তাহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, ভদ্রপরিবারে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট—

কিন্তু কখনও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনোরমার মনে পড়ে না। প্রায় বারো-তেরো বৎসর মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে ; কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সেই একরকম—সৌম্যমূর্তি, সদাহাস্যমুখ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সদাচঞ্চল ব্যক্তি।

ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছেন।

শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, খাবার এনে দিই তা হ'লে ?

এবেলা আর খাব না, খিদে নেই, ওবেলাই যা খাওয়া হয়েছে তা হজম হয় নি এখনও।

মুকুজ্জে মশাইয়ের মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, মকদ্দমার কি বুঝলেন ?—ভবেশবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করতে বললেন।

ভবেশ ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিলেন, মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে ইতস্তত করিয়া মনোরমা পুনরায় আর একটি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ওঘরে কাল যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বলছিলেন, সেটা কি সত্যি ?

মুকুজ্জেমশাই চকিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কি ক'রে শুনলে ?

আমি বারান্দায় ছিলাম। ওটা গল্প, না, সত্যি ?

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল নীরবে মনোরমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, সে কথা জেনে তোমার লাভ ?

মনোরমা কিছু না বলিয়া আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন জানতে চাইছ, বল না ?

এমনই।

উত্তর না দিয়া মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিলেন। বলিলেন, এবারে যেতে হবে, ট্রেনের বেশি সময় নেই। ভবেশের স্ত্রীকে ডাক।

মনোরমার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর সামান্য যেন একটু কম্পিত হইল, সে কিন্তু কিছু বলিল না। মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অবগুণ্ঠনবতী একটি বধূ আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিল।

কোন ভয় নেই মা, ভবেশ ঠিক ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই বাহির হইয়া গেলেন।

১২

গতকল্য শঙ্করের নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আসিয়াছিল, তাহাই সে একা বসিয়া পড়িতেছিল। নিজের লেখাটাই বার বার করিয়া পড়িতেছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম রচনা। অনেক দিন আগের লেখা একটা কবিতা। সোনাদিদির কথা মনে পড়িল। সোনাদিদিই লেখাটা কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি রিনির উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু লাইনগুলার ফাঁকে ফাঁকে সোনাদিদির মুখখানা যেন উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেদিনের কথাটা শঙ্করের মনে পড়িল, যেদিন সে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মিষ্টিদিদি এবং সোনাদিদির শরণাপন্ন হইয়াছিল। সলজ্জ স্নিগ্ধ সংযতশ্রী রিনির মুখখানি এখনও মনে আঁকা রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। মনের যে সুনিভৃত মণিকোঠায় বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি টাঙানো থাকে, রিনির ছবিও সেইখানে টাঙানো রহিয়াছে। রিনির নিকট হইতে কতটুকু বা সে পাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেইটুকুই সুন্দর করিয়া কখন যে তাহার মন সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে এতদিন জানিতেই পারে নাই। স্মৃতিপটে অঙ্কিত রিনির আলেখ্যের পানে চাহিয়া শঙ্কর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। রিনির জন্য মন আর উন্মুখ নহে, উন্মুখ হইবার অধিকার তাহার নাই এবং সেজন্য দুঃখও আর নাই। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, ভালই হইয়াছে। নিজের যে পরিচয় সে ক্রমশ পাইতেছে তাহাতে মনে হয়, রিনিকে সে সুখী করিতে

পারিত না। তাহার মনের কলুষ একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গ্লানিময় করিয়া তুলিতই। কলুষ তাহারই মনের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। মিষ্টিদিদি উপলক্ষ মাত্র। তিনি না থাকিলেও অন্য উপায়ে ইহা ঘটিত। রিনি নষ্ট হইয়া যাইত, রিনির সম্বন্ধে তাহার স্বপ্নটাও ভাঙিয়া যাইত, বাস্তবের রূঢ় আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না।

বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াও আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া থাকিতে পারে মুক্তো। শঙ্করের মাংসলোলুপ অথচ স্বপ্নবিলাসী মনকে আশ্রয় দিতে পারে সে-ই। অপর কাহারও পক্ষে, বিশেষত ভদ্রঘরের সুনীতি-শৃঙ্খলিত সভ্য রমণীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন ভদ্রমনা নারীই পশুটাকে সহ্য করিতে পারে না, অন্তত না পারার ভান করে। মুক্তোর পশু লইয়াই কারবার, সুতরাং সে বিষয়ে কোনরূপ ভণ্ডামি বা ছদ্মবেশ তাহার নাই। পশুদের হাটে নিজেকে সে নিলামে চড়াইয়া দিয়াছে, যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিবে সে বিনা দ্বিধায় তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিছক কেনা-বেচার অন্তরালেও কিন্তু একজন আছে, যাহাকে টাকা দিয়া কেনা যায় না, যাহাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, তাহাকে ঘিরিয়াই শঙ্করের স্বপ্ন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া বেশ কিছু টাকা যোগাড় করা যায়! এক-আধ শো টাকা নয়, বেশ কিছু মোটা টাকা, যাহার বিনিময়ে সে মুক্তোকে পাইতে পারিবে। নিজের দৈন্যে নিজের উপরই তাহার ঘৃণা হইতে লাগিল। সামান্য টাকার জন্য এই অপমান, এই বঞ্চনা এই আত্ম-অসম্মান! যেমন করিয়া হউক, উপার্জন করিতে হইবে, বড়লোক হইতে হইবে। অকারণে ফিজিক্স মুখস্থ করিয়া এম. এস.-সি. পাস করার কোন সার্থকতা নাই। ওরিজিনাল মূর্খ কিন্তু ধনী, সেইজন্যই মুক্তোর উপর তাহার ন্যায্য অধিকার বেশি।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, মুক্তো কি পড়িতে পারে? এই মাসিক-পত্রিকাটা তাহাকে দিয়া আসিলে কেমন হয়? এ কবিতা কি মুক্তো বুঝিতে পারিবে?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দুইখানিই খামের চিঠি। একটি বেশ মোটা, হাতের লেখা দেখিয়াই শঙ্কর বুঝিল সুরমার চিঠি। ইদানীং অনেক দিন সে সুরমার কোন চিঠি পায় নাই। দ্বিতীয় চিঠিখানি বাবার। বাবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, প্রয়োজনীয় কথার বেশি আর কিছু নাই। লিখিয়াছেন, মা ভাল আছেন আজকাল, শঙ্কর আগামী মাসে যেন একবার বাড়ি আসে, তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা তিনি শেষ করিয়া ফেলিতে চান। লিখিয়াছেন, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়াছিলে। আশা করি, এতদিন চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ এবং তাহা অসাধারণ কিছু নহে। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় শিরীষবাবুর কন্যার সহিত কথাবার্তা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেনা-পাওনার কথা এখনও অবশ্য কিছুই ঠিক হয় নাই। সে দিক দিয়া তাঁহাদের তরফে যদি কোন বাধা না উঠে, তাহা হইলে অন্য কোন আপত্তির কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যতদূর শুনিয়াছি এবং ফোটোতে যতদূর দেখিয়াছি, মেয়েটি সুশ্রী। তুমি যদি ইচ্ছা কর, পাত্রীটিকে দেখিয়া আসিতে পার। কলিকাতাতেই তাহারা থাকে। তোমার পত্র পাইলে শিরীষবাবুকে লিখিব, তোমার সহিত দেখা করিয়া মেয়ে দেখার বন্দোবস্ত করিতে। তুমি আগামী মাসে নিশ্চয় একবার আসিবে।

শঙ্কর ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিল যে, সে ঠিক করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। ইহা লইয়া তাহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয়। বিবাহ করা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। চিঠিখানা লিখিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিতে বলিল। এক কাপ চা-ও ফরমাশ করিল।

সুরমার চিঠিটা খুলিতেই কতকগুলি ফোটো বাহির হইয়া পড়িল। নানা রকম ফোটো। একটা কুকুরের, একটা ফুলের, একটা ক্রন্দনাকুল একটি শিশুর, একটা মেঘের, একটা সমুদ্রের, আরও কয়েকটা নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুরমা লিখিতেছে।—

শঙ্করবাবু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। অর্থাৎ আপনার চিঠিখানা পাওয়ার পর এতদিন কেটে গেছে যে, চিঠিখানাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে যেন মনে করবেন না, যেখানে সেখানে অবহেলাভরে ফেলে রেখেছিলাম এবং অবশেষে তা ওয়েস্ট্-পেপার-বাস্কেট-বাহিত হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। মোটেই তা নয়। বরং পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে অত্যধিক যত্ন ক'রে সেটা রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ অ্যাটাচি কেসের কোন্ পকেটে, কোন্ টেবিলের কোন্ ড্রয়ারে অথবা কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে যে সেই সযত্নরক্ষিত চিঠিটি আত্মগোপন ক'রে রইল, উত্তর দেবার সময় কিছুতেই তা আবিষ্কার করা গেল না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। চিঠির উত্তরে আমরা যখন চিঠি লিখি, তখন সব সময়ে আমরা যে চিঠির উত্তরই লিখি তা নয়, উত্তর দেবার উপলক্ষ্য ক'রে নিজের লিপিকুশলতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। সব সময়ে তাতে প্রশ্নের উত্তর থাকে না, আবার অনেক সময় অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও অযাচিত উত্তর থাকে। কারও চিঠি পেলে মনে যে সাড়া জাগে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা যা করি তাই তার উত্তর। অনেক সময় নীরবতাই হয় শ্রেষ্ঠ উত্তর। অনেক সময় আবার আসল উত্তরটাকে আড়াল করবার জন্যই অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করতে হয়; অনেক সময় পাতার পর পাতা লিখলেও উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আবার অনেক সময়—। কিন্তু এ আমি করছি কি! আপনি কবি মানুষ। আপনাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া যে নিউ-কাস্‌ল শহরে কয়লা বহন করার চেয়েও হাস্যকর। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছেন। ভাবছেন বোধ হয়, এতদিন পরে চিঠির উত্তর এল—তাও আবোল-তাবোল?

সুতরাং আর নয়, ও-প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা দিলাম। এতদিন আপনার চিঠির যে উত্তর দিই নি, তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। ফোটোগ্রাফিতে আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনরাত ওই নিয়েই আছি। দিনে ফোটো তুলি, রাত্রে ডেভেলপ করি। কয়েকটা নমুনা

পাঠালাম, কেমন লাগল সত্যি ক'রে জানাবেন তো? খুব কঠোর হয়ে বিচার করবেন না, তা ব'লে। এই আমার প্রথম হাতে-খড়ি, সেটা মনে রাখবেন। ছোট ছেলেটির কান্নার ছবিটি খুব মিষ্টি, নয়? একটি পার্সী ভদ্রমহিলার ছেলে এটি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে, বেশ মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রায় কণ্ঠস্থ। আপনার সেই কবিতাটাও ওঁকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছি, খুব ভাল লেগেছে ওর। ভাল কথা, আপনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন না কি? কই, কোন লক্ষণই তো দেখতে পাই না! লিখলে নিশ্চয় কোথাও দেখতে পেতাম।

আপনার বন্ধুর কোন খবর কি পেয়েছেন ইদানীং? আমি অনেকদিন কোনও খবর পাই নি। পত্রলেখক-হিসাবে বোধ হয় কোনকালেই ওঁর প্রসিদ্ধি ছিল না। আপনিই ভাল বলতে পারবেন, কারণ আপনারা বাল্যবন্ধু। আমার সঙ্গে পরিচয় যদিও অল্পদিনের (আমি তো আগন্তুক বললেই হয়), কিন্তু এই অল্প পরিচয় সত্ত্বেও এ কথাটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পত্রলেখক-হিসাবে ওঁকে প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিতেও ইতস্তত করা উচিত। অত্যন্ত কাজের মানুষ অর্থাৎ প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক যাঁরা, শুনেছি, অপব্যয় করবার মত সময় নেই তাঁদের এবং যে চিঠি দু কথায় লেখা যায় তার জন্যে দু শো কথা লেখাটা অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করেন তাঁরা। দু শো কথা একসঙ্গে লেখবার ক্ষমতা আছে কি না, সে প্রশ্ন না তুলেও এটা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, দু শো কথা লেখবার ধৈর্য ওঁদের নেই। আপনার বন্ধুটির প্রথম প্রথম যা-ও বা একটু ধৈর্য ছিল, আজকাল তার থেকেও চ্যুত হয়েছেন তিনি। হয়তো পড়ার চাপ, নয়তো বা আর কিছু। অনেক সময় প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়।

কবিরা এখনও নারীদেরই প্রহেলিকা ব'লে থাকেন, আমার মনে হয়, খুব সম্ভব সেটা প্রথার খাতিরে। এককালে হয়তো নারীরা সত্যই প্রহেলিকা ছিল এবং বিস্মিত পুরুষদের মন একদা তার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল ব'লেই

কাব্যে তার এত উল্লেখ দেখা যায়। যুগ যুগ ধ'রে পুরুষদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে নারী কিন্তু আর প্রহেলিকা নেই, নারী-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই তাঁরা সমাধান করেছেন। নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ী-নক্ষত্র আজকাল পুরুষজাতির নখদর্পণে। তবু কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টির সম্মুখে এখনও নারীরা নিজেদের রহস্যময়ীরূপে প্রকট রাখবার চেষ্টা করেন, এবং আমার বিশ্বাস, পুরুষেরা জেনে শুনেও মুগ্ধ হবার ভান করেন। অর্থাৎ আজকাল বিজ্ঞান-মহিমায় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন। আপনারা তা দেখে যে হেসে লুটিয়ে পড়েন না, সেটা আপনাদেরই ঔদার্য, ভণ্ডামি বা শিভাল্‌রি—যাই বলুন। আমার বরং পুরুষদেরই প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রকোপ আপনারাও এড়াতে পারেন নি, এবং যদিও আমাদের ধারণা, আপনাদের চরিত্রের অনেকখানিই আমরা বুঝে ফেলেছি। আপনাদের আমরা সমস্ত বুঝে ফেলেছি—এই ধারণাই আরও বিভ্রান্ত করেছে আমাদের। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু আমরা পাই, আপনাদের ততটুকুই হয়তো কিছু কিছু বুঝি আমরা; কিন্তু আমাদের আয়ত্তের বাইরে আপনাদের যে সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের কিছুই পরিচয় নেই এবং সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে সবজান্তার মত চলতে যাই ব'লে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, এবং সেই হোঁচটের নানা মূর্তি নানা রূপে দেখা দেয়। কখনও মূর্ছা যাই, কখনও আত্মহত্যা করি, কখনও কবিতা লিখি, কখনও বা কোন আন্দোলনে যোগদান করি। আমি ফোটোগ্রাফ নিয়ে মেতেছি। কিন্তু ওই অপরিচয়ের অন্ধকারটাই যে লোভনীয়!

যাক। নিজের কথা নিয়েই অনেকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করলাম, আপনার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় নি। মিষ্টিদিদির খবর অনেকদিন পাই নি। শৈল ঠাকুরঝিও কোন চিঠিপত্র দেন না। কেমন আছেন তাঁরা? রিনি দেবী কেমন আছেন? এখনও কি আপনি তাঁর পাঠাভ্যাসে সহায়তা করছেন নাকি? পুরুষদের মধ্যে যে অংশটুকু প্রহেলিকা নয়, কাচের মত স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর—যেটুকু, সেটুকুর সম্বন্ধে সচেতন করা বৃথা ব'লেই কিছু বললাম না।

আশা করি, আপনি এবং রিনি উভয়েই নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অনেকক্ষণ ধ'রে বকছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বোধ হয় এতক্ষণ। আমারও নতুন প্রিণ্টগুলো শুকিয়েছে, তুলতে হবে এইবার। ফোটোগুলো কেমন লাগল জানাবেন। প্রীতি-সম্ভাষণ নিন। ইতি—সুরমা।

ভৃত্য চা দিয়া গেল এবং বলিল যে, নীচে কমন-রুমে এক ভদ্রলোক শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শঙ্কর বলিল, এইখানেই নিয়ে আয় ডেকে।

একটু পরেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অপূর্বকৃষ্ণ স্মিত আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। বিনীত নমস্কার করিয়া অপ্রস্তুত মুখে রুমালটা পকেটে পুরিতে পুরিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আশা করি, আপনার কাজের কোন ব্যাঘাত ক'রে বিরক্ত, মানে—

কিছু না, বসুন। চা খাবেন?

না। অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি আমি।

কোন দরকার আছে নাকি আমার সঙ্গে?

অপূর্ববাবু পুনরায় রুমাল বাহির করিলেন এবং গলা, ঘাড় কানের পিছন প্রভৃতি মুছিয়া যেন কিছু শক্তিসংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মরিয়া হইয়া শঙ্করের চোখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, মিস মল্লিকের সঙ্গে কি দেখা হয় আজকাল আপনার?

দেখা না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?—বিস্মিত শঙ্কর প্রশ্ন করিল। অপূর্ববাবু কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন, সত্যই তো শঙ্করবাবুর সহিত বেলা মল্লিকের দেখা না হওয়ার কোন সঙ্গত বাধা থাকিবার কথা নয়। এ প্রশ্ন করার কোনও অর্থ হয় না। অকারণে অনর্থক একটা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া অপূর্ববাবু মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার মুখভাবেও সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আবার রুমাল বাহির করিতে হইল। শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, বেলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কতদিন আগে?

আমার ? আমার তো দেখা করার তেমন সুযোগ হয় না, রবিবার ছাড়া আমার ছুটি তো তেমন— মানে— তা ছাঁড়া আপিস আজকাল বড় স্ট্রিক্ট, রবার্টসন সায়েব—

রবিবার তো মাসে চারটে ক'রে আছে।—বলিয়া শঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মিস মল্লিক রবিবারে বাড়ি থাকেন না, আমি গিয়েছিলাম দু দিন। অথচ পিয়ানোর ভাল ভাল গৎ যোগাড় করেছি কয়েকটা, মানে—শুনলাম, উনি আজকাল পিয়ানোও—

শঙ্কর বলিল, পিয়ানো! পিয়ানো পেলে কোথা ? শুনি নি তো ?

মিস্টার বোসের একটা পিয়ানো আছে, উনি মিসেস বোসকে এস্রাজ শেখাতে যান, সেই সময় পিয়ানোটাও বাজান শুনেছি। মানে—ওদের বেয়ারাটা বলছিল—

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, বেশ তো, আপনি কি করতে চান ?

অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, কয়েকটা ভাল গৎ পেয়েছিলাম, খুব ভাল বিলিতী গৎ, সেইগুলো ওঁকে আর কি, মানে—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—

উপহার দিতে চান ?

অপূর্ববাবু একটু হাসিলেন, চক্ষু দুইটি একটু নত করিলেন এবং সমস্ত মুখভাবে নারী-সুলভ কমনীয়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, না না, উপহার ঠিক নয়, আমি অর্থাৎ—

নির্বিকারভাবে শঙ্কর বলিল, বেশ তো, ডাকে পাঠিয়ে দিন না, দেখা যখন হচ্ছে না।

ডাকে ? তা বেশ বলেছেন, সিওর পাবেন তা হ'লে, কি বলুন ? আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো বলতে পারবেন, কখন উনি বাড়ি থাকেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমিও একদিন, মানে—

উনি কখন বাড়িতে থাকেন, তা আমিও ঠিক জানি না। প্রায়ই অবশ্য থাকেন না, অনেকগুলো টুইশনি নিয়েছেন কিনা!

তা শুনেছি আমি। তা হ'লে—

অপূর্ববাবু আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ডাকেই তা হ'লে পাঠিয়ে দেব। ওঁর নাম্বারটা কি বলুন তো, টুকে নিই, ঠিক মনে নেই—

পাঞ্জাবির পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিতে গিয়া কতকগুলি মেয়েদের মাথার কাঁটা বাহির হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। কুণ্ঠিত অপূর্ববাবু চাদর সামলাইতে সামলাইতে সেগুলি কুড়াইতে লাগিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, ওগুলো আবার কি?

ওগুলো, মানে—আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে কিনতে দিয়েছিল আমাকে—

কাঁটাগুলি কুড়াইয়া মিস বেলা মল্লিকের ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত চলিয়া গেলেন। শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

১৩

মানুষের সহিত পশুর প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য তো আছেই, অনেক সময় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকে। এক-একজন লোকের সহিত এক-একটা পশুর অদ্ভুত রকম মিল, দেখিলেই একটা বিশেষ পশুর কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে লোকটি হাওড়ায় একটা মুদীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে দেখিলেই ঘোড়ার কথা মনে হয়। মুখটা ঠিক ঘোড়ার মুখের মত—খানিকটা যেন লম্বা হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা লম্বা চুল, দাঁতগুলাও লম্বা লম্বা এবং এবড়ো-খেবড়ো, যেন একটা আর-একটার ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দাঁতেই বিশ্রী হলুদ রঙের ছোপ। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, পরনের কাপড়টাও ময়লা, কিন্তু বেশ কায়দা করিয়া মালকোঁচা মারিয়া পরা। দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু ভয় হয়, ভদ্রলোকের চোখ দুইটি দেখিলে।

বড় বড় কিংবা খুব ছোট ছোট নয়, মাঝারি ধরনের সাধারণ চোখ। এককালে হয়তো সাধারণ চোখের মতই খানিকটা সাদা এবং খানিকটা কালো অংশ ছিল, এখন কিন্তু সাদা অংশটি পীতাভ এবং কালো অংশটি বাদামী গোছের হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে ইহাতে হয়তো ভীতিকর কিছু দেখা যাইবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই ভয় হইবে। ভদ্রলোক যদিও জ্ঞাতসারে সর্বদাই চোখের দৃষ্টিতে একটা সহৃদয়তার সুন্দর পরদা টাঙাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হইলেই পরদা সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরালে যে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা মানুষের নয়—পিশাচের। পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া ভদ্রলোক খোলা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছেন এবং লক্ষ্য করিতেছেন, মুদীর দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কখন কমিবে। মুদীর দোকান নির্জন না হইলে তাঁহার সওদা খরিদ করা হইবে না।

একটু পরেই মুদীর দোকান নির্জন হইল এবং খগেশ্বরবাবু ওরফে যতীনবাবু ওরফে কেষ্টবাবু ওরফে তিন নম্বর আগাইয়া গেলেন এবং মুদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কর্তা, আমার সওদাটা এবার দাও দিকি।

কি চাই বলুন ?

বেশি কিছু নয়, আঁধ-পোটাক সুপুরি। সবগুলি কিন্তু কানা হওয়া চাই।

মুদী একটু বিস্ময়ের ভান করিল। বলিল, সবগুলো কানা ? কি হবে কানা সুপুরি দিয়ে ?

হলুদ রঙের দন্তগুলি বিকশিত করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ওষুধ।

কিসের ওষুধ ?

চুলকোনির।

মুদী বাছিয়া বাছিয়া আধ পোয়া কানা সুপারি ওজন করিয়া দিল এবং প্রসঙ্গত বলিল, কাবুফর্মা লেনের মোড়ে একটা বিড়িওয়ালা আছে, চুলকোনির অব্যর্থ ওষুধ সে জানে। খগেশ্বর ঠিকানাটা টুকিয়া লইলেন। এই ঠিকানাটারই প্রয়োজন। এই ঠিকানা অনেক কানা-সুপারি-ক্রেতাকে দিবার জন্য মুদীও পয়সা খাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল।

কারফরমা লেন চিৎপুর-অঞ্চলে। একটি ট্যাক্সি সহযোগে খগেশ্বর রওনা হইলেন। কারফরমা লেনের কাছাকাছি আসিয়া ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিলেন এবং কিছুটা দূর হাঁটিয়া গিয়া দেখিলেন, কারফরমা লেনের মোড়ে সত্যই একটা বিড়ির দোকান রহিয়াছে। থাকিবেই, তাহা খগেশ্বরবাবু জানিতেন। জনৈক বৃদ্ধ মিয়া বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছিল।

খগেশ্বর আগাইয়া গিয়া বলিলেন, মিয়াসাহেব, ভাল গোলাপী বিড়ি চাই এক বাণ্ডিল।

মিয়াসাহেব বিড়ি দিল।

খগেশ্বর বলিলেন, আর একটি মেহেরবানি করতে হবে। শুনেছি, তুমি খুজলির ভাল দাবাই জান, ব'লে দিতে হবে সেটি আমাকে।

মিয়াসাহেব সবিস্ময়ে বলিল, খুজলির দাবাই! আমি জানি, তা কে বললে আপনাকে?

এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে খগেশ্বর বলিলেন, যে মুদীর কাছ থেকে কানা সুপুরি কিনলাম আধ পোয়া, সেই তো তোমার নাম বাতলালে মিয়াসাহেব।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিয়াসাহেব একবার খগেশ্বরের পানে চাহিল। বলিল, দেখি সুপুরি।

মিয়াসাহেব সুপারিগুলি একটি একটি করিয়া নিরীক্ষণ করিল। হাঁ, সবগুলিই কানা বটে। বলিল, দাবাই আমার কাছে নেই, আছে হাড়কাটা গলির হীরেমন বিবির কাছে। তাকে গিয়ে বলুন, আমার খুজলি হয়েছে, আপনার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারখানার ধুলো আমার একটু চাই। এই বললেই যা চাইছেন, তা পাবেন

মিয়াসাহেব গম্ভীর মুখে পুনরায় বিড়ি পাকাইতে শুরু করিল। মিয়াসাহেব আর কোন কথা বলেন না দেখিয়া খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা নিতে হ'লে সুপুরিগুলি রেখে যেতে হবে।

বেশ।

সুপারিগুলি হস্তগত করিয়া মিয়াসাহেব হীরেমন বিবির ঠিকানাটা দিল।

হাড়কাটা গলিতে হীরেমন বিবির দ্বারস্থ হইয়া খগেশ্বর দেখিলেন যে, হীরেমন নামটা শুনিয়া অন্তর যেরূপ উন্মুখ হইয়া উঠে, বিবি আসলে সেরূপ কিছু নহেন। এককালে হয়তো রূপসী ছিলেন, এখন কিন্তু কুশ্রী, নানা-রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ বারাঙ্গনা। রুক্ষ কেশ, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার দেহ। একটা খাটের উপর বসিয়া আছে, হাঁপানির টান উঠিয়াছে।

স্বল্পান্ধকার ঘরটাতে প্রবেশ করিতেই হীরেমন অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, কে, কি চাই?

খগেশ্বর তাঁহার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারের ধূলি প্রার্থনা করিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হীরেমন বিবি বলিল, আপনি ক নম্বর?

তিন নম্বর।

কাকে কাকে চেনেন আপনি?

খগেশ্বরবাবুকে, হারাণবাবুকে, যতীন্দ্রবাবুকে, কেষ্টবাবুকে আর ম্যানেজারবাবুকে।

তা হ'লে এই রসিদটায় সই ক'রে দিন।

হীরেমন অতি কষ্টে উঠিল এবং একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটি তালা-লাগানো ছোট বাক্স এবং একটি কাগজ বাহির করিল। কাগজে লেখা ছিল, হীরেমন বিবির নিকট ঔষধ পাইলাম।

বুইটেতে সই ক'রে দিন।

খগেশ্বর পকেট হইতে একটি ছোট কাপিং পেন্সিল বাহির করিয়া বাঁ হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিলেন, তিন নম্বর। এই স্বল্প পরিশ্রম করিয়াই হীরেমন বিবি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাঁপানিটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া সে বলিল, এই বাক্সটা নিয়ে যান। ওর ভেতরে সব লেখা আছে। বাক্সে হরফওলা তালা লাগানো আছে। তালা খোলবার কৌশল আপনি জানেন তো?

না।

আমিও জানি না।

তা হ'লে খুলব কি ক'রে?

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে যে অন্ধ ভিখিরীটা আঁচল পেতে ব'সে থাকে মেডিকেল কলেজের সামনে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন—ক পয়সায় দিন চলে তোমার? সে যা উত্তর দেবে, সেই কথাটি অক্ষর সাজিয়ে ঠিক করলেই তালা খুলে যাবে।

খগেশ্বর বাক্সটা লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হীরেমন বিবি বলিল, বলবেন ম্যানেজারবাবুকে, আমি মরছি, তাঁর কি একটুও দয়া হয় না আমার ওপর? মাসে মাত্র দশ টাকায় কি চলে আমার?

হীরেমন বিবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

খগেশ্বর বলিলেন, বলব আমি।

বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ম্যানেজারবাবুকে বলিলেই যদি টাকা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খগেশ্বর সিংহকে তাহা হইলে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া এখানে আসিতে হইত না।

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে মেডিকেল কলেজের সামনে একটা অন্ধ ভিখারী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল—এক পয়সা দিলা দে রাম—

খগেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোড়টা অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইতেই নিম্নস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, ক পয়সায় দিন চলে তোমার?

ভিক্ষুক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

খগেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষুক মৃদু কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিল; বাক্সা লায়া হায় তো সেভেন, নেই লায়া হায় তো ঢন্‌ঢন্।

খগেশ্বর সরিয়া গিয়া একটা ল্যাম্প-পোস্টের নিকটে দাঁড়াইয়া এলোমেলো ইংরেজী অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া seven কথাটি সাজাইয়া ফেলিলেন। তালা খুলিয়া গেল।

বাক্সের ভিতর একটি ঠিকানা ও চাবি রহিয়াছে। চাবির গায়ে একটি কাগজে লেখা 'খিড়কি-দরজা'। ম্যানেজারবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

ঠিকানায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। চাবি দিয়া খিড়কি-দরজা খুলিয়া খগেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রাঙ্গণে খগেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, উপরের ঘর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খগেশ্বর পকেট হইতে একটা দিয়াশালাই-কাঠি বাহির করিলেন এবং সেটা নাকে দিয়া খুব জোরে একবার হাঁচিলেন। হাঁচির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। উপরে উঠিবার সিঁড়িটাও আলোকিত হইল। খগেশ্বর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং গিয়াই বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটাতেই তিনি ফরাশে উপবিষ্ট ছিলেন। সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়ানো, মুখে প্রসন্ন হাস্য। বাড়িতে জনপ্রাণী আর কেহ নাই।

এই যে শ্রীগরুড়, এসে পড়েছ দেখছি!

বিনীত নমস্কার করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তো? মুদী, বিড়িওয়ালা, হীরেমন আর অন্ধ ভিখিরী এই চারজনকে পার হয়ে এসেছ নিশ্চয়?

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খগেশ্বর বলিলেন, তাই এসেছি।

ম্যানেজার স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন দেখিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলাম না।

কর্তার কত বিচিত্র খেয়াল, আমিই কি ছাই সব বুঝতে পারি! যা বলেন,

হুকুম তামিল ক'রে যাই। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ শুনে কর্তা বললেন, ওকে সোজাসুজি ঠিকানা দিও না। মুদী, বিড়িওয়ালা আর হীরেমনের কাছে মুখটা চিনিয়ে তবে যেন আসে। সেই রকম ব্যবস্থাই করলাম। হ'ল অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয়।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি! লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

খগেশ্বর বলিলেন, উদ্দেশ্যটা কি কিছু বুঝলেন?

ঠিক অবশ্য বুঝি নি। যতদূর আন্দাজ করছি সেটা এই যে, ওই মুদী, ওই বিড়িওয়ালা আর ওই হীরেমন ইদানীং কর্তাকে কিছু মাল সাপ্লাই করেছে। ভবিষ্যতে তুমি যদি দেহাত থেকে কোন টাটকা মাল আমদানি ক'রে আনতে পার—ওদের কারও হেফাজতে এনে দিলেই মালটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেইজন্যেই সম্ভবত তোমার মুখটা চিনিয়ে দিলেন ওদের। কাজের লোক ওরা, মাল যোগান দেয়, পাহারা দেয়, পাচার করে। এসব অবশ্য আমার আন্দাজ। কর্তার কথা খোদ কর্তাই জানেন। যাক ওসব কথা। তোমার কথাই শুনি। আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছ কেন শুনি? সংক্ষেপে বল।

খগেশ্বর সংক্ষেপেই বলিলেন, টাকা—

টাকা? কত টাকা?

যা দেবেন। দিন চলা ভার হয়েছে আমার। চাকরি গেছে, পরিবার গেছে, মেয়ে গেছে, কি-ই বা আছে! সবই তো জানেন আপনি। আপনার কর্তার সেবাতে জীবনটাই উচ্ছুগ্গু করেছি বলতে গেলে।

ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল খগেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, গাঁজা কতটা ক'রে খাও আজকাল?

আজ্ঞে, দৈনিক চার আনার।

সৌদামিনীর কাছে পাও-টাও কিছু?

একটা আধলা না। গেলে দেখাই করে না। নিজের মেয়ে-পরিবার কে

এমন দুশমনের মত ব্যাভার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। না খেতে পেয়ে মরছিল, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটত, আপনার কাছে এনে দিলাম, আপনি বললেন, কর্তার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে। নিজের চোখেও দেখলাম। এখন বেশ সোনাদানা প'রে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে মশাই, আর বললে বিশ্বাস যাবেন না ম্যানেজারবাবু, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

খগেশ্বরই পুনর্ব্বার কথা কহিলেন, কর্তা কি আজকাল যান-টান ওদের কাছে?

রামোঃ! কর্তার শখ ওই দু-এক দিনই। দু দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নতুনের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। নতুন মাল সন্ধানে থাকে তো বল, ভাল দাম দিয়ে কিনবেন। হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ পেতে পার।

একটা ভালর চেষ্টায় আছি—

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, বেশ তো, যোগাড় কর।

আপাতত কিছু চাই আমার, বড় অভাবের মধ্যে আছি।

বৃদ্ধ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কুড়িটি টাকা খগেশ্বরকে দিলেন এবং বলিলেন, এখন এই নিয়ে যাও, দিন পনেরো পরে এসো আবার?

এই বাড়িতেই?

না, এ বাড়িতে নয়, এ বাড়ি বদলাতে হবে। আর বল কেন, সাত দিন অন্তর অন্তর বাড়ি বদলাতে হচ্ছে। ঠিকানা ঠিক পাবে এবার যেমন ক'রে পেলে। এবার অবশ্য মুদী বিড়িওলা আর হীরেমন থাকবে না। অন্য লোকদের মারফৎ আসবে। কর্তার হুকুম এই। প্রত্যেকবার নতুন রকম সঙ্কেতের তালা দিতে হবে। এবারকার তালাটা ঠিক খুলেছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেভেন কথাটা হতেই খুলে গেল তালা।

তালা চাবি আর বাক্স দিয়ে যাও সব। এবার অন্যরকম তালা দিতে হবে।

এই যে।

খগেশ্বর তালা-সমেত কাঠের বাক্স ও খিড়কির চাবিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিলেন।

সহসা চাপা গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ওটা কিসের শব্দ?

একজন আমলার জ্বর হয়েছে, সে-ই ও-রকম করছে ও-ঘরে প'ড়ে প'ড়ে—ও কিছু নয়।

দ্বিতলে অপর প্রান্তে অজ্ঞান বন্দিনীর কথা খগেশ্বরকে বলিবেন, এমন কাঁচা লোক বৃদ্ধ নহেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খগেশ্বরকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও এখন। বড় ক্লান্ত আছি আজ, ঘুমুব এবার।

খগেশ্বর হাত জোড় করিলেন।

ওই তো তোমার দোষ শ্রীগরুড়, কিছুতেই তোমার খাঁই মেটানো যায় না।

আরও দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

খগেশ্বর ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

খগেশ্বর চলিয়া গেলে ম্যানেজার ধীরে ধীরে উঠিলেন ও খিড়কির দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কুব্জ দেহটা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গোঙানিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ চীৎকারে পরিণত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, এইবার জ্ঞান হইয়াছে, আর দেরি করা অনুচিত হইবে।

বারান্দাটা পার হইয়া ওদিকে একটা ঘরের দিকে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেই ঘরটার ভিতর হইতেই চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘরের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

হতবুদ্ধি মেয়েটির চীৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর-মুহূর্তেই আরও তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মান্তিকরূপে তাহা অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আর কিছু শোনা গেল না।

১৪

অচিনবাবুর কারখানি নিঃশব্দগতিতে আসিয়া বেলার বাড়ীর সম্মুখে থামিল। জনার্দন সিংহের মারফৎ নিজের কার্ডখানি পাঠাইয়া দিয়া অচিনবাবু স্টিয়ারিংয়ের উপর ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই বেশবাস সম্বৃত করিয়া স্মিতমুখে বেলা বাহির হইয়া আসিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনিই কার্ড পাঠিয়েছেন ?

অচিনবাবু মোটর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে নিখুঁত ভদ্রতা বিকিরণ করিয়া অতিশয় সুষ্ঠু ভঙ্গীতে একটি নমস্কার করিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা অশোভন হইতেছে দেখিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

উভয়ে আসিয়া বাহিরের ঘরটাতে উপবেশন করিলেন। অচিনবাবু হাসিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিলেন, একটি দয়া করতে হবে মিস [illegible]ক।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মেয়ে বেলা নহেন। ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন। অচিনবাবু বলিলেন, আপনার বাজনার খ্যাতি চারিদিকে শুনতে পাই, আপনার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই তাও জানি, তবু এসেছি নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে।

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না ?

লিলুয়ায় একটা বাগান-বাড়ি ভাড়া নিয়ে চ্যারিটি পারফরম্যান্স করছি আমরা। নাচ, গান, বাজনা থাকবে সব রকমই। এর থেকে যা টাকা বাঁচবে, সেটা ভাল কাজেই খরচ হবে। মেয়েদের একটা ইস্কুল করবার ইচ্ছে আছে আমাদের। আপনাকে একটা কিছু বাজাতে হবে সেখানে—এস্রাজ সেতার যা হোক। আমি নিজে কারে ক'রে নিয়ে যাব, কারে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাব—ঘণ্টা-দুয়েকের ব্যাপার।

কখন হবে ?

দিন-দশেক পরে, সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু।

সন্ধ্যেবেলায় আমার ছুটি তো নেই, বাজনা শেখাতে যেতে হয় এক জায়গায়।

বেশ তো, কোথায় বলুন না, একদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব আমি, সে ভার আমি নিচ্ছি।

সেটা ঠিক হয় না।

না না, মিস মল্লিক, কাইণ্ড্লি আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমাদের চাইই।

আমাকে মাপ করুন, আমার সময় কম।

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, দেখুন, একটা সৎকার্যের জন্যে একটু ত্যাগস্বীকার যদি না করেন, তা হ'লে—

বেশ, আপনাদের স্কুলে আমি না হয় কিছু চাঁদা দেব।

সে তো দিতেই হবে, এটা হ'ল উপরি পাওনা। আপনি না থাকলে ফাংশনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, আমি কথা দিতে পারলাম না কিন্তু।

বেশ, আর একদিন আসব আমি, কথা আপনাকে দিতেই হবে।

বেলা স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। অপ্রত্যাশিত এই বিপদটার হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, মনে মনে সেই চিন্তাই তিনি করিতেছিলেন। অচিনবাবু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। সৎকার্যের জন্যে কিছু করা একটা মহাপুণ্য তো বটেই, তা ছাড়া এর আর একটা দিকও আছে। অনেক বড় বড় লোকের কাছে টিকিট বিক্রি করছি আমরা, তাঁদের কাছেও আপনার গুণের পরিচয়টা দেওয়া হবে। যাই বলুন, মিড্ল্ ক্লাস পিপ্ল তো আপনাদের গুণের যথোচিত মূল্য দিতে পারে না।

অচিনবাবু আরও হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু বেলা সহসা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখব। আসুন তা হ'লে।

বেলা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অচিনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-মুখে অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইলেন, জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিটা খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিয়া তাহার পর সেটা নাড়িয়া নিবাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দগতিতে গাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

অচিনবাবুর গাড়ি চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর গুপ্তের গাড়িখানি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর গুপ্ত গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং জনার্দন সিংহের সেলামের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় বেলার সহিত তাঁহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য কাঁপিয়া থামিয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া বেলা সহজকণ্ঠেই বলিলেন, আমি বেরুচ্ছিলাম, আপনার কি বিশেষ কোন কাজ আছে?

তোমাকে কিছু বলতে চাই।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুদিন হইতে বেলাকে, অবশ্য বেলার সম্মতিক্রমেই, 'তুমি' বলিতে শুরু করিয়াছেন।

আমাকে? বেশ বলুন।

এখানে সে কথা বলা যাবে না, চল, মাঠে যাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেলা কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, তাই চলুন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।

কি, বল?

আপনার বলবার মত যত কথা আছে, আজই শেষ ক'রে ফেলতে হবে

এর জন্যে মাঠে যতক্ষণ ব'সে থাকতে বলেন, আজ ব'সে থাকব। কাল থেকে কিন্তু আর নয়।

প্রফেসর গুপ্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা তিনি বলিলেন, বেশ তাই হবে।

তা হ'লে একটু দাঁড়ান, এখুনি আসছি আমি।

বেলা দেবী ভিতরে গেলেন ও মাঠে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চলুন।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে, মাঠে অন্ধকার নামিতেছে। একটি নির্জন স্থান বাছিয়া বেলা ও প্রফেসর গুপ্ত উপবেশন করিলেন। মোটরে যদিও উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন, কিন্তু একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

প্রফেসর গুপ্তই প্রথমে কথা কহিলেন, তুমি মানুকে কি সত্যিই আর বাজনা শেখাবে না?

ও ঘটনার পর আর তো আপনার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছিলেন আমার জন্যে—এ কথা শোনার পর আর কি আপনার বাড়িতে যাওয়া চলে, আপনিই বলুন? ভাগ্যিস বেঁচে গেছেন, না বাঁচলে কি হ'ত বলুন তো?

সেটা কি আমার দোষ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার দোষ সত্যি আছে কি না, সে অপ্রিয় আলোচনা করবার অধিকার আমার নেই। আমার নিজের কোন দোষ নেই, এইটুকুই আমি জানি। আর সেটা আপনিও জানেন। অথচ—

আমার দোষ স্খালনের চেষ্টা আমি করছি না, কারণ এটাকে আমি দোষ ব'লে মনে করি না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা হয়তো প্রকাশ করেছি, ভাতে দোষের তো কিছু নেই।

আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে নিশ্চয় দোষের আছে। আপনি বিবাহিত, সমাজের নিয়ম মেনেই আপনার চলা উচিত। হঠাৎ আমাকে ভাল লাগবার কারণই বা কি, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, সে কথা আপনি প্রকাশ করছেন কেন ?

প্রফেসর গুপ্ত ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভালবাসা কোন দিন কোন আইন মেনে চলে নি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, এর বেশি আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি জীবনে সুখী নই বেলা।

প্রফেসর গুপ্তের একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সুখী নন কেন ? আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালবাসতে পারেন নি ?

পারলে আমার এ দুর্দশা হ'ত না।

পারেন নি কেন ? আপনার স্ত্রী তো লোক খারাপ নন।

লোক খারাপ কি ভাল, তা বিচার ক'রে কেউ কাউকে ভালবাসে না। মন্তর প'ড়ে বিয়ে করলেই ভালবাসা জন্মায় না। মনের মিল হওয়াটাই আসল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এতটুকু মনের মিল নেই—কোন দিক থেকেই নেই। আমার মানসিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এতটুকু সম্পর্ক নেই। আমি উপার্জন করব, তিনি খরচ করবেন, আমার চালচলনের প্রতি তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টি রাখবেন, কোন মেয়ের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা দেখলে তা নিয়ে কথায় কথায় শ্লেষ করবেন, কোন কারণে যদি তাঁর স্বার্থে একটুও আঘাত করি, তা হ'লে তাই নিয়ে গঞ্জনা দেবেন, কথায় কথায় প্রকাশ করবেন যে, তাঁর মত মহিয়সী মহিলা আমার মত লোকের হাতে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেলেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঝগড়া অথবা তর্ক ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য কোন প্রকার আলাপ বহুকাল হয় নি, হওয়া সম্ভবও নয়। রাস্তার একটা অশিক্ষিত কুলি অথবা অমার্জিত গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে তিনি সর্বদাই তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং

সর্বদাই সন্দেহ করেন যে, হয়তো আমি তাঁকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি অবশ্য সে সন্দেহের ন্যায্য খোরাক যে সরবরাহ না করি তা নয়, করি— কারণ আমার মন সর্বদাই ক্ষুধিত।

একটু থামিয়া প্রফেসর গুপ্ত পুনরায় বলিলেন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম যে, তোমার মধ্যে আমার মন হয়তো আশ্রয় পাবে। সব কথা শুনলে হয়তো তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, হয়তো একটু প্রশ্রয় পাব। আমার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গী ক'রে এক ডেলা আফিং খেয়েছেন ব'লেই তাঁর দুঃখটা তুমি বড় ক'রে দেখো না। আমার দুঃখ আরও গভীর।

প্রফেসর গুপ্ত নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রফেসর গুপ্তই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

তুমি কিছু বলছ না যে?

বলবার কিছুই নেই।

কিছুই নেই?

না।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা বলিলেন, আপনার আর কিছু কি বলবার আছে?

সবই তো বললাম।

তবে চলুন, এবার ওঠা যাক।

বেলা উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ওদিকে কোথা? আমার কার যে এদিকে। রাস্তা ভুলে গেলে নাকি?

রাস্তা ভুলি নি। আমি ট্যাক্সি ক'রে ফিরব। আপনি বাড়ি যান।

বেলা ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

১৫

মৃন্ময়কে আজকাল প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইতেছে। কি যেন এক ছাই কাজ জুটিয়াছে—বাড়িতে একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই। এ রকম চাকরি করার চেয়ে অনাহারে থাকাও বরং ঢের ভাল। আজ এখানে, কাল সেখানে, একদিনও কি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার জো আছে! যেন চরকির মত বেড়াইতেছে। একটা মানুষ কতই বা ঘুরিতে পারে, সকল জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। হাজার হউক, মানুষ তো, কল তো আর নয়। উপরওয়ালা সাহেবদের জ্ঞান-গম্যি দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছুই নাই। উনি না হয় ভালমানুষ লোক, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যান, তাই বলিয়া তাঁহারই উপর সব কাজের ভার চাপাইতে হইবে? আক্কেলকে বলিহারি যাই। ইত্যাকার নানারূপ চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি হাতের লেখা লিখিতেছিল। যদিও চিনু এখনও পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হাসির হাতের লেখা সত্যই উন্নতি লাভ করিয়াছে। খানিকটা লিখিয়া হাসি সোজা হইয়া বসিল, খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত দিয়া সেটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর খাতাখানাকে একটু দূরে সরাইয়া নানাভাবে নিজের লেখাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই হাতের লেখায় স্বামীকে চিঠি লিখিলে তাহা কি খুব হাস্যকর হইবে? উনি হাসিবেন? কক্ষনও না। বরং খুশিই হইবেন। আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কালই একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। খুব লুকাইয়া কিন্তু। ঠাকুরপো যেন না জানিতে পারে। ঠাকুরপো জানিতে পারিলে কিন্তু লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। জ্বালাইয়া মারিবে। এমনই তো ফাজিলের চূড়ামণি। চিঠিটা লিখিয়া ঝিয়ের মারফৎ রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এমন সময় কে আসিল?

বউদি, কপাট খোল।

চিন্ময়ের গলার স্বর। ঠাকুরপো আজ এত সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল কেন? হাসি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, মাত্র আড়াইটা বাজিয়াছে। এত সকাল সকাল আসিবার মানে কি? অকারণ ভয়ে হাসির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। খারাপ খবর-টবর পায় নাই তো? নীচে পুনরায় কড়া নাড়িয়া চিন্ময় ডাকিল, বউদি!

হাসি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কপাট খুলিতেই চিন্ময় বলিল, ঘুমুচ্ছিলে তো?

আহা, ঘুমুব কেন, লিখছিলাম। তুমি এখন এলে যে?

ক্লাস হ'ল না, প্রফেসরের অসুখ করেছে।

চিন্ময় উপরে চলিয়া গেল। কপাট বন্ধ করিয়া হাসিও উপরে আসিল। হাসির হাতের লেখা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, সুন্দর হচ্ছে তো লেখা তোমার বউদি!

যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না।

হাসি হাতের লেখার খাতাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠাট্টা নয়, সত্যি, বেশ হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি ডিক্‌টেশন লিখতে পার?

ডিক্‌টেশন কি আবার?

আমি বলব, তুমি শুনে শুনে লিখবে।

তা আমি পারি বোধ হয়।

ঘোড়ার ডিম পার।

নিশ্চয় পারি।

এই নাও কাগজ, লেখ।

ভুল হ'লে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।

না না, ঠাট্টা করব কেন? লেখই না আগে. দেখি।

হাসি কাগজ কলম লইয়া বসিল।

চিন্ময় বলিতে লাগিল—

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তুমি নটার সময় গোলদীঘির পূর্বদিকের একটা গেটে থাকিও। ইতি—ক খ গ ঘ

লেখা হইয়া গেলে চিন্ময় বলিল, কই, দেখি! বাঃ, চমৎকার হয়েছে! থাক্ আমার কাছে এটা।

কাগজখানা সে পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

হাসি প্রশ্ন করিল, ওর মানে কি?

মানে আবার কি, যা মনে এল তাই বললাম।

চিন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে? এ কাগজটা এখন থাক্ আমার কাছে। এক মাস পরে আবার তোমাকে দিয়ে লেখাব খানিকটা, তারপর দুটো মিলিয়ে দেখব, উন্নতি হয়েছে কি না! —এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

এসেই যাচ্ছ কোথায় আবার?

মাঠে। খুব ভাল ম্যাচ আছে একটা, দেখে আসি।

খিদে পায় নি? খাবে না কিছু?

না।

চিন্ময় বাহির হইয়া গেল।

হাসি পুনরায় লিখিতে বসিল।

১৬

যেমন করিয়া হউক রোজগার করিতে হইবে। উপার্জন করিতে না পারিলে মানুষের কোন মূল্যই নাই। টাকা দিয়া প্রেম কিনিতে যাইবার প্রয়াস হাস্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রের প্রেম করিতে যাইবার প্রয়াস অধিকতর হাস্যকর। যে নিঃস্ব, তাহার এই মানসিক বিলাসের অধিকার নাই। তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য যতই না কেন প্রচুর থাকুক, বাহিরের ঐশ্বর্য না থাকিলে তাহা খনির তিমিরগর্ভে রত্নরাজির মত চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবে।

অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাহিরের ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। খনিকে খনন না করিলে মণির সন্ধান মিলিবে কিরূপে? মণি আবিষ্কার করিবার পর খনিত্র অনাবশ্যক, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্বে খনিত্র না হইলে চলে না। খনিত্র একটা চাইই। কিছু টাকা না থাকিলে কিছুই করা যায় না। টাকাটা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, তাহাও টাকা না থাকিলে প্রমাণ করা যায় না। অর্থ থাকিলে তবেই তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহত্ত্ব প্রকট করা সম্ভব, কপর্দকহীন দরিদ্রের মুখে ত্যাগের মহিমার কথা মানায় না। অর্থের অপেক্ষা প্রেম বড়, এ কথার মর্ম মুক্তোকে বুঝাইতে হইলে প্রথমেই মুক্তোকে পাওয়া দরকার এবং সেজন্য টাকার প্রয়োজন। মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহার মনে নিজেকে শঙ্কর নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস নিজের উপর তাহার আছে। কিন্তু মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়াই যে দুরূহ! অত টাকা কোথায় পাইবে সে? অবিলম্বে উপার্জন করা দরকার, কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব? এই কলিকাতা শহরে কে তাহাকে চেনে? চিনিলেও বা কত টাকার চাকরি সে পাইতে পারে? বড় জোর মাসে পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অল্প টাকায় মুক্তোকে তো পাওয়া যাইবে না। কেহ কিছু টাকা ধার দেয় না? মাসে মাসে তাহাকে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু কে-ই বা ধার দিবে? সহসা শঙ্করের শৈলর কথা মনে পড়িল। সে বড়লোকের পত্নী। তাহার হাতে কিছু টাকা থাকিতে পারে, তাহার নিকট হইতে কোন ছুতায় ধার করিয়া আনাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাহার পরে ধীরে ধীরে টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টুইশনি হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

রবিবারের দুপুর। শঙ্কর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল, উঠিয়া বসিল। শৈলর সহিত আজই দেখা করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা

করিলে একটা টুইশনিও হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিতও দেখা করা দরকার। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈল একদিন যাইতেও বলিয়াছিল তাহাকে। এখন হয়তো সে একা আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। শঙ্কর তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি কিন্তু শঙ্করকে চিনিয়াছিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, চিনিতে পারছেন ?

চিনিতে না পারিলেও সব সময় সেটা বলা যায় না। শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবুই পুনরায় বলিলেন, চেনবার কথা অবশ্য নয়, একটিবার মাত্র তো দেখা। প্রফেসর মিত্রের বাড়িতে টি-পার্টিতে— হয়েও গেল অনেক দিন।

শঙ্করের মনে পড়িল। সোনাদিদি ইঁহাকে শঙ্করের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাও মনে পড়িল, সোনাদিদি ইঁহার নাম দিয়াছিলেন—অগতির গতি। ভদ্রলোক নাকি পরোপকারী। শঙ্কর আর একবার প্রকাশবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। খদ্দরের মোটা কোট ও মোটা চাদর গায়ে, কয়েক দিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি মুখে, চক্ষুতে সরল দৃষ্টি। প্রকাশবাবু ঠিক তেমনই আছেন।

প্রকাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনার কবিতাটা পড়লাম কাগজে, ভারি সুন্দর লাগল। আমাদের একটা কাগজ বার হচ্ছে, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

আচ্ছা।

সেই হস্টেলেই থাকেন তো এখন ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, যাব একদিন। এখন চলি, নমস্কার।

নমস্কার।

প্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। শঙ্কর পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিবার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে! শৈলর কাছে হাত পাতিয়া টাকা চাহিবে! শৈলর টাকা লইয়া সে—। না, তাহা অসম্ভব। তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

শঙ্কর ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিল। একেবারে বিপরীত দিকে চলিতে শুরু করিল। দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হইবে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য, টাকাটাই শেষে এত বড় হইয়া দাঁড়াইল! মুক্তো তাহাকে চায় না—টাকা চায়! আশ্চর্য!

কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুক্তো আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি, হঠাৎ আপনি যে এ সময়ে?

এলাম।

মুক্তো একদৃষ্টে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, বসুন। আসছি এখুনি।

শঙ্করকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। অবকাশ দিলেও যে শঙ্কর বিশেষ কিছু বলিতে পারিত, তাহা নয়। বলিবার মত কোন বক্তব্য তাহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল না। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল, মুক্তো ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিবে; বলিবার তো কিছু নাই। সত্যই কি কিছুই নাই? সত্যই কি মুক্তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না? মুক্তোর মুখ দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া তাহা তো মনে হয় না!

আপনি এখানে হামেসা কি করতে আসেন মোসায়, বলেন তো?

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, লুঙ্গি-পরা গুণ্ডা-গোছের একটা লোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ঘাড়ে একদম চুল নাই, সামনে ঘোড়ার মত চুল, মাংসল মুখে নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, অধরোষ্ঠের নীচে এক গোছা মিশকালো ক্ষুর, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে—কিন্তু পুরাপুরি নাই, মাঝখানে খানিকটা কামাইয়া ফেলাতে মাত্র ঠোঁটের দুই পাশে খানিকটা করিয়া ঝুলিতেছে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে লোকটার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মোতলবখানা কি মোসায়ের ?

শঙ্কর নির্বাক।

জোবাব দিচ্ছেন না যে বড় ?

তোমাকে জবাব দেব কেন, তুমি কে ?

আমি তোমার বাপ। সালা হারামিকা বাচ্চা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। খবরদার।

শঙ্কর হঠাৎ ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মুক্তো ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি কাণ্ড! বাঘা, এসব কি হচ্ছে ?

বাঘা বলিল, বাঃ, তুমিই তো বিবিজান আসতে বললে হামাকে। আভি বলছো, এসব কি হচ্ছে ? গরদনিয়া না দিলে কি এ হারামির বাচ্চা নিকল্‌বে ?

আচ্ছা, যা তুই।

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঘা বাহির হইয়া গেল। যেন পোষা কুকুর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, লোকটা কে ?

ও বাঘা। আমাদের আপনার লোক।

আপনার লোক মানে ?

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, আপনার লোক মানে কি, তা জানেন না ? যারা বিপদে আপদে রক্ষে করে, তারাই আপনার লোক। ওরা ছাড়া আমাদের আপনার লোক আর কে আছে, বলুন ?

শঙ্কর বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপদে আপদে রক্ষা করে! অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, চা আনতে দিয়েছি।

শঙ্কর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করবাবু, একটি কথা শুনে যান, দুটি পায়ে পড়ি আপনার—শুনুন—শুনে যান—

শঙ্কর আর ফিরিয়া চাহিল না। যতক্ষণ দেখা গেল, মুক্তো শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। কতটুকুই বা গলি, শঙ্কর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। মুক্তো তবু সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুণ্যলেশহীন অন্ধকার পতিতা-জীবনে একটিমাত্র পুণ্য-প্রেরণার শিখা জ্বলিয়াছিল। সেই শিখার ইন্ধন যোগাইতে গিয়াই সে নিঃস্ব হইয়া গেল। শঙ্করের মত ছেলেকে সে নষ্ট করিতে চাহে নাই। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যেমন করিয়া হউক, পঙ্কিলতা হইতে ইহাকে সে রক্ষা করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু হার মানে নাই। শঙ্করকে পঙ্ককুণ্ড হইতে সত্যই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখন তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় উন্মথিত করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, তাহা স্বস্তির নিশ্বাস নহে। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছিল—তুমি এ কি করিলে, এ কি করিলে—ও যে চলিয়া গেল! মুক্তো বুঝিয়াছিল, শঙ্কর আর আসিবে না, শূন্য গলিটার পানে চাহিয়া তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া এমন একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্লাইণ্ড্ লেন, বাহির হইবার পথ নাই। ফিরিতে হইল। কিছুদূর আসিবার পর দেখিতে পাইল, একটা বাড়ির দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বাহির হইয়া সামনের দরজার কড়া নাড়িতেছে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই গলি থেকে বেরুবার রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারেন? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বলিল, আর একটু এগিয়ে ডান দিকে গেলেই রাস্তা পাবেন।

শঙ্কর আগাইয়া গেল, আগাইয়া গিয়া সত্যই দেখিল, ডান দিকে বাহির হইবার পথ রহিয়াছে। আরও খানিকটা গিয়া বউবাজারে পড়িল। সামনেই একটা ট্রাম পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। একটু পরেই কিন্তু নামিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে পয়সা ছিল না এবং সে কথা মনেও ছিল না। শঙ্কর আবার হাঁটিতে লাগিল। গলির সেই মেয়েটির মুখখানি মাঝে মাঝে মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি! মুক্তোর মুখখানিও মনে পড়িল। পড়ুক, কিন্তু মুক্তোর কাছে সে আর যাইবে না। যাইবার আর উপায়ও নাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকাপতন হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন হইতে সে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া শঙ্করের চোখে পড়িল, একটা পাগলা ডাস্ট্‌বিন হইতে এঁটো ভাত তুলিয়া খাইতেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। শঙ্করের মনে পড়িল, এই লোকটাই কিছুদিন আগে সারকুলার রোডে মাথায় কাগজের টুপি পরিয়া সকলকে নির্বিকার চিত্তে সেলাম করিয়া বেড়াইতেছিল। এখনও নির্বিকার চিত্তে ডাস্ট্‌বিন হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেছে। ভন্টু অথবা বক্‌সি মহাশয় দেখিলে মোস্তাককে চিনিতে পারিত।

শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে হস্টেলের দিকেই ফিরিতে লাগিল। মুক্তোর কাছে আর যাইবে না, ইহা ঠিক করিবার পর হইতে শঙ্করের মন যেন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন কারাবাসের পর যেন সহসা মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার নামে একটা জরুরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিতেছেন।

অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবার একটা অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

১৭

যদিও সে মনে মনে এরূপ কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। আসিয়াই যে দুই জন কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্বে যখন সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল যে তাহার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তখন তাহাই তাহার সত্য মনোভাব ছিল। কিন্তু এখন তাহার আর সে মনোভাব নেই। দুই দিনে সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহে মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। মুক্তোকে সে পাইবে না, পাইতে পারে না এবং এখন পাইতে চাহেও না। তাহার পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সে যে মানে মানে দূরে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্য সে আনন্দিত। পঙ্কিল স্পর্শ! এখন মুক্তোর স্পর্শকে পঙ্কিল স্পর্শ মনে হইতেছে।

বাড়িতে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সর্বাগ্রে চুপিচুপি সংবাদটি দিল—ইঁহারা তাহার বিবাহের সম্বন্ধে পাকা কথা কহিতে আসিয়াছেন। সাড়া পাইয়া মা বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার সমস্ত শরীরের রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুষ্ক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। চোখ-মুখের দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় অর্থহীন ভাবে শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শঙ্কর প্রণাম করিল। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি আশীর্বাদ করিলেন। মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, আয়, ভেতরে আয়।

শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শঙ্করকে বিছানায় বসাইয়া হাত দিয়া চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মৃদু হা[illegible]ল, একবারও মাকে মনে পড়ে না?

শঙ্কর এতদিন যে [illegible]রিতেছিল, সে অন্য জগৎ। অনেকদিন

পরে সহসা মায়ের কাছে আসিয়া সে যেন নিজেকে ঠিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না। মায়ের কথা শুনিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল। মুখে বলিল, কলেজের ছুটি ছিল না—

মা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হাত-মুখ ধো, খাবার আনি।

বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্করের মনে সহসা সেকালের মায়ের মুখখানা ফুটিয়া উঠিল—যখন মা টকটকে লালপাড় শাড়ি পরিতেন, যখন তাঁহার মুখখানি মহিমায় প্রদীপ্ত ছিল। পরক্ষণেই পাগলিনীর ছবিটাও মনে পড়িল। জানালার গরাদের সঙ্গে হাত বাঁধা, অসংলগ্ন আর্ত চীৎকার! এখন আবার এ কি চেহারা—সশঙ্কিত, অসমর্থ, ক্লান্ত—সমস্ত জীবনশক্তিকে কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

অম্বিকাবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তুমি চা-টা খেয়ে বাইরে এস একবার, ওঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন একটু।

ওঁরা কারা?

শিরীষবাবু আর মুকুজ্জেমশাই—শিরীষবাবুর বন্ধু। শিরীষবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

যদিও শঙ্করের মত বদলাইয়াছিল, তথাপি সে বলিল, আমি তো বলেছিলাম—

জানি, চিঠি পেয়েছি তোমার। কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না, আই অ্যাম সরি। চা-টা খেয়ে বাইরে এস।

আমার মতের কি কোন দাম নেই বলতে চান?

তোমার নিজের দামই যখন এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত, তখন তোমার মতের দাম সুনিশ্চিত হবে কি ক'রে?

তার মানে?

এটা কি সত্যি কথা নয় যে, আমার দামেই তুমি সমাজে এখনও পর্যন্ত বিকোচ্ছ? সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমার অভিরুচি এবং অভিমতই মানতে হবে তোমাকে। তোমার স্বতন্ত্র মত তখনই সহ্য করব, যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যতক্ষণ তা না করতে পারছ, ততক্ষণ আমার কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে।

শঙ্করের মাথার ভিতর যেন দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কে যেন সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিল। ইচ্ছা হইল, তখনই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়; কিন্তু সে পারিল না। কিছুই পারিল না। একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিল না। বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, চা-টা খেয়ে এস বাইরে—ডোন্‌ট বি এ ফুল।

শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মানসপটে মুক্তোর মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল, যেন শুনিতে পাইল, মুক্তো বলিতেছে—এ কটা টাকায় কি হবে, এই নিন আপনার টাকা, গরিবের ছেলের এ সব ঘোড়ারোগ কেন বাপু!

টাকা, টাকা, টাকা! টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সম্মান করে না, এমন কি পিতাও না। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তরবাসী আত্মসম্মানহীন কাঙালটা বিবাহ করিবার লোভে এতবড় অপমান সহ্য করিয়াও উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে কথাবার্তা চলিতেছে। শঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। শিরীষবাবু মিনতিসহকারে বলিতেছিলেন, দেখুন, আমি অতি দরিদ্র, অত টাকা আমি দিতে পারব না। একটু বিবেচনা করতে হবে।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, বিবেচনা ক'রেই বলছি। আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু বেশি নয়।

আমার পক্ষে বেশি। আপনি দয়া না করলে—

দেখুন, যারা কথায় কথায় দয়া প্রার্থনা করে, সেই সব আত্মসম্মানহীন লোকের ওপর আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা ক'মে যায়। যখন পড়তাম, তখন

কয়ালীচরণ ব'লে একটি ছেলে আমাদের মেসে থাকত। তার অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তার আত্মসম্মানের জন্যেই তাকে আমরা সবাই খাতির করতাম। আমাকে 'দাদা, দাদা' বলত, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল; কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার ওই আত্মসম্মানবোধের জন্যে। সেদিন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। সে জ্যোতিষচর্চা করছে শুনে তার কাছে আমার এক আত্মীয়ের কুষ্ঠি নিয়ে গেলাম দেখাতে। সে প্রথমেই বললে, অম্বিকদা, দশ টাকা দক্ষিণা লাগবে কিন্তু। আমি তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, দশ টাকা আপনার কাছে না নিলেও আমার চ'লে যাবে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানটা খোয়াবেন কেন? আমাদের দেশের লোক কিছুতে এ সামান্য কথাটা মনে রাখে না। তারা সর্বদাই সকলের কাছে গলবস্ত্র হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে। আশা করি, আপনি তাদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

শিরীষবাবু এই তীক্ষ্ণ বক্তৃতাটি শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, সত্যি বড় দরিদ্র আমি।

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে বসিয়া ছিলেন; বলিলেন, আচ্ছা, টাকার যোগাড় করা যাবে। উনি যা বলছেন তা ঠিকই।

শিরীষবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু তো বেশি নয়—

শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, আমি এক পয়সা চাই না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, বিনাপণেই আমি বিয়ে ক'রে আসব। মেয়েও দেখতে চাই না আমি।

সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

অম্বিকাবাবু শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া সিগারের ছাইটা ধীরে ধীরে ঝাড়িলেন। তাহার পর শিরীষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা হ'লে তো মামলা মিটেই গেল। সংসার-সমুদ্রে বিনা নৌকোতে পাড়ি দেবার সাহস ম্যাকাজীবনের আছে দেখছি। আপনাদেরও যদি ওর দুঃসাহসের ওপর ভরসা

থাকে, দিন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে—আই হ্যাভ নো অব্‌জেকশন। আমি ওদের স্থবিধের জন্যই নৌকার চেষ্টায় ছিলাম।

চক্ষু বুজিয়া জ্রকুঞ্চিত করিয়া তিনি সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন। মুকুজ্জেমশাই একদৃষ্টে শঙ্করের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না, বাহির হইয়া গেল।

১৮

অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করের বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, অম্বিকাবাবু বিবাহে যোগদান করেন নাই। শঙ্কর বন্ধুবান্ধব কাহাকেও, এমন কি ভন্টুকেও, খবর দেয় নাই। শিরীষবাবু অমিয়াকে গহনাপত্র ছাড়া নগদ এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শঙ্কর সে টাকা গ্রহণ করে নাই। সত্য সত্যই বিনাপণে সে অমিয়াকে বিবাহ করিল। শুভদৃষ্টির সময় শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেয়েটি তো অচেনা নয়, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছে! হঠাৎ মনে পড়িল, কিছুদিন আগে একটা ব্লাইণ্ড্‌ লেনে ঢুকিয়া সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই মেয়েটিই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

অমিয়াও সবিস্ময়ে দেখিল যে, একাগ্রমনে শিবপূজা করা সত্ত্বেও ক্যালেণ্ডারের শিবের চেয়ে তাহার স্বামী ঢের বেশি সুন্দর হইয়াছে। শান্তি, বিলু, কমলি, টগর, এমন কি রেণুদির বরের চেয়েও তাহার বর দেখিতে ভাল।

কেমন চমৎকার চোখ দুইটি!

১৯

শঙ্কর হস্টেলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনের এই প্রধান ঘটনাটি কত সহজে ঘটিয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই

যে, সে বিবাহ করিবে। সহসা সে আবিষ্কার করিল যে, তাহার জীবনের গতিকে যতবার সে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর সে ঠিক করিয়াছিল, অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশসেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারি করিয়া, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি করিয়া এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিয়া অদ্ভুত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুকাল তাহার কাটিয়াছিল। এ উন্মাদনা কিন্তু বেশি দিন রহিল না। আই.এস-সি. এবং বি.এস-সি. পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশসেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশসেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। সুতরাং ঠিক করিয়াছিল, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চাই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু এসব মফস্বলীয় কল্পনা কলিকাতায় আসিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর নিজেকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করিল। দেখিল, তাহার মন অনিবার্য টানে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য। আরও আবিষ্কার করিল যে, নারী-সঙ্গ-বর্জিত জীবন আর যেই যাপন করিতে পারুক, সে পারিবে না। তাহার একজন সঙ্গিনী চাই। তাহার এই অন্তর্নিহিত কামনার টানে মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো আকস্মিকভাবে আসিল ও চলিয়া গেল। অমিয়ার মুখখানি তাহার মনে পড়িল। কত ছেলেমানুষ এবং কত লাজুক! ফুলশয্যার রাত্রে লজ্জায় চোখই খুলিল না। কোথায় ছিল এই অমিয়া? কোন্ অজ্ঞাতলোক হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার জীবনে এমন কায়েমী আসন দখল করিয়া বসিল?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চিঠি দিয়া গেল। বাবার চিঠি। শঙ্কর এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিতেছিল, তবু সে পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

কল্যাণবরেষু,

বিবাহ-ব্যাপারে তোমার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। অপরের টাকা না লইয়া স্বাবলম্বী হইবার সাহস তোমার আছে, ইহার প্রমাণ তুমি দিয়াছ। শক্তিও যে আছে, সে প্রমাণও আশা করি দিতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাস হইতে তোমার খরচ দেওয়া আমি বন্ধ করিলাম। যে সমর্থ, তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে অসমর্থ অসহায় লোক অসংখ্য। নিজেদের আত্মীয়—তোমার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করিয়াছে। যে টাকাটা তোমাকে দিতাম, তাহা তাহাকে দিলে সে বেচারা বোধ হয় এম.এ.-টা পাস করিতে পারিবে। টাকাটা তাহাকেই দিব স্থির করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্পর্ধার অনুরূপ শক্তি ও আত্মসম্মান দান করুন। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

তৃতীয় অধ্যায়

১

একটি সংকীর্ণ গলি-পথে বাইকটি ঠেলিয়া ভন্টু চলিয়াছিল, বাইকের পিছনের চাকাটায় গোলমাল হইয়াছে, হাওয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র সারাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পকেট শূন্য। একেবারে শূন্য নয়, একটি অর্ধভুক্ত কাঁচা পেয়ারা আছে। সকালে আপিস যাইবার মুখে মৃন্ময়ের বাসায় সে কিছু টাকার চেষ্টায় গিয়াছিল। মৃন্ময় চিন্ময় কেহই বাড়িতে ছিল না, ছিল হাসি। পেয়ারা কিনিয়া সে গোয়াভা জেলি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছিল। হাসির নিকট হইতে টাকা চাওয়া যায় না, কিন্তু পেয়ারা চাওয়া যায়। গোটা-দুই ডাঁশা পেয়ারা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাগ্যিস করিয়াছিল, তাই আপিসের পর কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছে। এখন চলিয়াছে নিবারণবাবুর নিকট, ধারের চেষ্টায়। অবিলম্বে কিছু টাকার প্রয়োজন। এক-আধ টাকা নয়, সাড়ে পাঁচ শত টাকা। করালীচরণ দ্রাবিড় যাইবে বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যেমন করিয়া হউক টাকাটা তাহাকে দিতেই হবে। কি কুক্ষণেই যে সে করালীচরণের টাকায় হাত দিয়াছিল! এ টাকা না পাইলেও তাহার সংসার নিশ্চয়ই চলিয়া যাইত। খুচখুচ করিয়া টাকাগুলি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন মহা মুশকিল! হঠাৎ সাড়ে পাঁচ শত টাকা যোগাড় করা কি সহজ? বউদিদির অলঙ্কারগুলিও নাই। দাদা তাহার কিয়দংশ পূর্বেই সাবাড় করিয়াছিলেন, তাঁহার বি.এস-সি. পরীক্ষার ফী জমা দিবার সময় রুলি-জোড়া গিয়াছিল, ফন্তির অসুখের সময় হারটা গিয়াছে। নিরাভরণা বউদিদি শাঁখা লোহা ও সিঁদুরের সহায়তায় সধবার ঠাট কোনরকমে বজায় রাখিয়াছেন। বিভূতিকায় এ বিষয়ে মুখে অবশ্য কখনও কিছু বলেন না, কিন্তু না বলিলেও

ভন্টু সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা কি করিবে, গহনা গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তো তাহার নাই। বরং মনে হইতেছে, বউদিদির গহনাগুলি এ সময়ে থাকিলে কাজে লাগিত। তিন দিন হইতে সে করালীচরণকে এড়াইয়া চলিতেছে, টাকা না লইয়া তাহার সহিত দেখা করা অসম্ভব। শঙ্করের বহুদিন হইতে দেখা নাই। সেদিন হস্টেলে গিয়া সে যাহা শুনিল, তাহা অবিশ্বাস্য। শঙ্কর নাকি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে—হস্টেলের দারোয়ানটা বলিল। দারোয়ানের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ভন্টু নয়। সে আরও খোঁজ করিয়া জানিল, ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কালদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না! ইদানীং সে যে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দিত না, তাহার কারণ এতদিনে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কয়েকদিন পূর্বে ওরিজিন্যাল অর্থাৎ দশরথের মুখেও সে অতিশয় চমকপ্রদ একটি সংবাদ শুনিয়াছে। আধুনিক ছোকরাদের গালাগালি প্রসঙ্গে তাহাদের হ্যাংলামির উদাহরণস্বরূপ ওরিজিন্যাল শঙ্কর নামক একটি যুবকের উল্লেখ করিলেন। সে নাকি লুকাইয়া ওরিজিন্যালের রক্ষিতার নিকট যাতায়াত করে। কলেজের দুই-একজন প্রাক্তন সহপাঠীর নিকটও ভন্টু শঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছিল এবং সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, 'চাম্‌ প্যান্‌চস্' ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে। এখন যদি ছোকরার একবার নাগাল পাওয়া যাইত, বড় ভাল হইত। আর যাই হোক, রাস্‌কেল্‌টার মাথা বড় সাফ—কাব্যিরোগেই উহাকে খাইয়াছে।

মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়ের বিষয়টি বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি নাকি কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত কোন নির্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভন্টুর মনে হইল, বাবাজীর বিষয়টা হস্তগত করিয়া লইলে মন্দ হইত না। এ সময়ে অন্তত তাহা কাজে লাগিতে পারিত! বাবাজী তো দিতেই চাহিয়াছিলেন।

অন্ধকার গলি। গলির দুই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি খোলার ঘর। কোন ঘরে কলহের, কোন ঘরে বেগুনভাজার, কোন ঘরে হারমোনিয়মের, কোন ঘরে শিশুর ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে। ভন্টুর এসব দিকে লক্ষ্য নাই। বাইকটি ঠেলিতে ঠেলিতে নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি কথাই সে কেবল ভাবিতেছে, হঠাৎ এত টাকার কথা নিবারণবাবুর কাছে পাড়িবে কি করিয়া!

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র লীলায় বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র বিধানে জীবনধারার বিচিত্র বিকাশ। এই বৈচিত্র্যকে আমরা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করি না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে বিস্মিত হই। বস্তুত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতনে প্রত্যাশিত বলিয়া কিছু নাই। কোন কিছুকে আমরা প্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি আমাদের কল্পনার দৈন্যবশত। আমাদের আরও একটা অভ্যাস—আমরা নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যাশা করি, এবং নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধার প্রতিকূল কিছু ঘটিলেই তাহাকে 'অপ্রত্যাশিত' আখ্যা দিয়া বিস্মিত অথবা মর্মাহত হই; ভুলিয়া যাই যে, বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণায় প্রত্যাশিত, ঈষৎ-প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত—সর্বপ্রকার ঘটনাই ঘটে। আমরা ইহা জানি, বিচারের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে এতদনুসারে চলি না। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা আশা করি যে, আমাদের সংস্কার, সুবিধা এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু ঘটিবে। কিন্তু তাহা ঘটে না,—কাহারও জীবনে ঘটে না, নিবারণবাবুর জীবনেও ঘটিল না। নিজের মেয়েকে কেহ মন্দ ভাবে না, নিজের বন্ধুর চরিত্রে বিশ্বাস করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সুবিধাজনক স্বাভাবিক ধারণার আরামদায়ক আবেষ্টনীতে মন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও আমরা ঘুমাই। সুতরাং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত রকমে চমকিত হইতে হয়। সকালে উঠিয়া দেখি, চোরে সিঁধ কাটিয়াছে অথবা ঘরে

আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিবারণবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাস্টার আসামিকে লইয়া সরিয়াছে।

২

ছোট স্টেশনটি এতক্ষণ নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত ছিল। রাত্রি বারোটার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহা সজীব হইয়া উঠিল। একটা গাড়ি আসিবে। স্টেশনের বাহিরে গভীর অন্ধকার ঝিল্লীস্বরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে কেবল মাঠ। একটি সরু রাস্তা স্টেশন হইতে মাঠের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। স্টেশনের নিকট রেলের দুই-একটি কোয়ার্টার ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নাই। আশেপাশে কেবল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। অমাবস্যা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। ট্রেন আসিল, দুই মিনিট থামিল এবং চলিয়া গেল। ট্রেন হইতে জন-দুয়েক যাত্রী নামিলেন, চিন্ময়ও নামিল। নির্দেশমত এই স্টেশনেই তাহার নামিবার কথা। অন্য যাত্রীদের সহিত চিন্ময়ও স্টেশনের বাহিরে সরু রাস্তাটার উপর আসিয়া হাজির হইল। অন্য যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। চিন্ময়ও একা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলের আসিবার কথা, কিন্তু কই, কেহই তো আসে নাই! এই অন্ধকারে পথ চেনাও মুশকিল! চিন্ময় অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

আপনি কি জাফরানপুর যাবেন?—কোমল বালককণ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করিল।

আপনি কে?

আমি আপনাকে নেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

তাই নাকি! আচ্ছা, এদিকে এস।

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি নিকটে সরিয়া আসিল।

আলোর কাছে চল, দেখি, তুমি কে!

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়া স্টেশনের আলোকে চিন্ময় চিনিতে পারিল। কলিকাতায় তাহাদের দলপতি দূর হইতে একদিন এই বালকটিকেই চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

চিন্ময় প্রশ্ন করিল, কতদিন পূর্বে তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে ?

ও-মাসের পঁচিশে।

তারিখটাও মিলিয়া গেল।

চল, তা হ'লে যাওয়া যাক।

আবার তাহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক প্রশ্ন করিল, আপনার নাম কি ?

বাইশ নম্বর।

চলুন।

তরুণকান্তি পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোর। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চিন্ময় অন্ধকারে মাঠে নামিয়া পড়িল। সমস্ত সন্ধ্যাটা গুমোট করিয়া ছিল, এখন বেশ ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার ! চিন্ময় সহসা লক্ষ্য করিল, ছেলেটি তাহার পাশে পাশে নয়, আগে আগে চলিয়াছে।

তুমি আগে আগে যাচ্ছ কেন ?

আমি আগেই থাকি—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।

কেন বল তো ?

বালক কোন উত্তর দিল না। সে কিন্তু চিন্ময়ের সহিত চলিতে পারিতেছিল না, চিন্ময় তাহাকে বারম্বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। তখন সে ছুটিয়া আবার খানিকটা আগাইয়া যাইতেছিল। চিন্ময়কে সে কিছুতেই আগাইয়া যাইতে দি'বে না।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, অমন ছুটে ছুটে এগিয়ে যাবার দরকারটা কি ? একসঙ্গে পাশাপাশি যাই চল না।

না, আমি এগিয়ে থাকব।

কেন ?

এমনই।

চিন্ময় যে কার্যে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা মানা। এই কিশোর তাহাকে জাফরানপুর অবধি পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে অন্য উপায়ে কর্মস্থলে পৌঁছিতে হইবে। উভয়ে নীরবে মাঠ পার হইতে লাগিল। উভয়েই বেশ দ্রুতপদে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গী আগাইয়া থাকিবার জন্য প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিন্ময় প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

অত ছুটে চলবার দরকার কি ?

আসুন না আপনি।

তুমি পাশাপাশি না চললে আমি যাব না।

আসুন না।

তুমি কেন এগিয়ে থাকতে চাও, না বললে আমি যাব না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ছেলেটি অবশেষে বলিল, এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে। আমার টর্চ আনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

তাতে কি হয়েছে ?

আপনাকে যদি সাপে কামড়ে দেয় ? আমার উপর ভার আছে আপনাকে জাফরানপুরে নিরাপদে পৌঁছে দেবার। আপনি আসুন।

তোমাকে যদি সাপে কামড়ায় ?

আমার চেয়ে আপনার প্রাণের দাম ঢের বেশি। আসুন।

৩

শঙ্কর বিবাগী হইয়া যায় নাই।

পিতার পত্র পাইবার পরদিন সে হস্টেল ছাড়িয়া দিল, জিনিসপত্র ও বই বিক্রয় করিয়া খুচরা ধারগুলা শোধ করিয়া ফেলিল এবং উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে

অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। পকেটে সাড়ে বারো আনা পয়সা মাত্র সম্বল। বিরাট কলিকাতা নগরীতে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। শঙ্কর সহসা অনুভব করিল, কলিকাতায় ধনীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের স্থানাভাব। ধনীর প্রাসাদ আছে, দরিদ্রের ফুটপাথ আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের—চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্রতাজ্ঞানবিশিষ্ট মধ্যবিত্তেরই মুশকিল। এখানে বিনা পরিচয়ে অথবা বিনা পয়সায় ভদ্রভাবে কোন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। শঙ্করের যাহারা পরিচিত, তাহারা এত বেশি পরিচিত যে, শঙ্কর অসঙ্কোচে তাহাদের নিকট যাইতে পারে না। কোন্ লজ্জায় সে শৈলর বাড়ি যাইবে! তাহাকে সে চিরকাল অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট যাইবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে! এই একই কারণে ভন্টুর নিকট যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া ভন্টুদের অবস্থা সে ভাল করিয়াই জানে। তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। শিরীষবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, থাকিলেও শঙ্কর এমন দীনবেশে শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিত না। প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে একটা টুইশনির বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রফেসর গুপ্ত কি অবিলম্বে একটা টুইশনির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন? যখন প্রয়োজন ছিল না, তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাকে একটা টুইশনি তিনি যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এখনও কি পারিবেন? শিয়ালদহের সামনে একটা মুসলমানী দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় কিছু রুটি-মাংস কিনিয়া শঙ্কর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। স্টেশনের ঘড়িটাতে দেখিল, আড়াইটা বাজিয়াছে। রবিবার প্রফেসর গুপ্ত হয়তো বাড়িতেই আছেন। তাঁহার বাড়ির দিকেই শঙ্কর অগ্রসর হইল। কোনক্রমে দশ-পনেরো টাকার মত একটা টুইশনিও যদি জুটিয়া যায়! পথ চলিতে চলিতে মায়ের কথা তাহার মনে পড়িল। বাবা যে খরচ বন্ধ করিয়াছেন, মা কি তাহা জানেন? খুব সম্ভবত জানেন না। বাবা মায়ের দুর্বল মস্তিষ্ককে পারতপক্ষে বিচলিত করিতে চাহিবেন না। সে যে বিবাহ করিয়াছে, সে কথাও কি মা জানেন না? কিংবা

হয়তো সব জানেন, বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। জানুন আর নাই জানুন, শঙ্কর নিজে তাঁহাকে কখনও জানাইবে না। বাবাকে নিজের অবস্থার কথা জানানোর সরল অর্থ বক্রপথে পিতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যাওয়া। তাহা সে মরিয়া গেলেও করিবে না। সহসা অমিয়ার কথা তাহার মনে হইল। সে শিরীষবাবুর সঙ্গেই তাঁহার নূতন কর্মস্থল দিনাজপুরে গিয়াছে। অমিয়ার শিশুর মত সরল মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। নিতান্ত সরল! শঙ্করকে পাইয়া যেন বর্তিয়া গিয়াছে। এমন স্বামী যেন কাহারও নাই, হইতে পারে না। এতটা সরলতা কিন্তু শঙ্করের ভাল লাগে নাই। শঙ্করের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশুপ্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তিক সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালবাসার কি বোঝে ও! শঙ্কর যেন নূতন রকম একটা দামী পুতুল এবং তাহারই একান্ত নিজস্ব—এই আনন্দেই অমিয়া বিভোর। শঙ্করের মনের নিগূঢ় আকুতির বিচিত্র পিপাসার কোন খবর রাখা উহার পক্ষে সম্ভবই নয়। ও যদি কুটিল হইত, অপাঙ্গের বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে ব্যাহত করিতে পারিত, তাহা হইলে শঙ্করের ভাল লাগিত। এ অতিশয় সরল, অত্যন্ত সহজ। বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সঙ্কোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোন জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।

প্রফেসর গুপ্তের বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। প্রফেসর গুপ্ত ও মিষ্টিদিদি দক্ষিণ দিকের নির্জন বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। বাড়িতে বালক ভৃত্যটি ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না।

শঙ্করকে দেখিয়া মিষ্টিদিদিই হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে, বসুন।

নির্বিকারভাবে মিষ্টিদিদি কথাগুলি বলিলেন, শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

মুখখানা বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যে! বসুন না।

শঙ্কর উপবেশন করিল।

প্রফেসর গুপ্ত বালক-ভৃত্যটিকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা ফরমাশ করিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কাব্য-আলোচনা হচ্ছিল। 'কিং লিয়ারে'র গনেরিল আর রেগ্যনকে কেমন লাগে তোমার?

শঙ্করের 'কিং লিয়ার' পড়া ছিল না, তবু বলিল, ভালই লাগে।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, ভাল লাগে আপনার? আপনার রুচি বদলেছে তা হ'লে বলুন। আগে তো ঝাঁজওয়ালা জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না আপনি।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, ওর রুচির খবর রাখেন নাকি আপনি?

সামান্য একটু পরিচয় নিয়েছিলুম একদিন। একদিন একটু ঝাঁজালো সস্ চাখিয়েছিলুম, খেতে পারলেন না। কম ঝাঁজালো আরও খাবার ছিল, সেগুলো পর্যন্ত খেতে পারলেন না, উঠে যেতে হ'ল ওঁকে।

তাই নাকি! আমার তো ধারণা ছিল, শঙ্কর খুব ঝালের ভক্ত।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল কি না তাহা সে নিজেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি হাসিমুখে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর, আছেন কেমন বলুন? অনেক দিন আপনার কোন খবর পাই নি। পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

ওমা, সে কি! এটা আপনার এগ্‌জামিনের বছর না?

প্রফেসর গুপ্তের চক্ষু দুইটিও প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেন, হঠাৎ হ'ল কি?

বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন, তাঁর অমতে বিনাপণে বিয়ে করেছি ব'লে।

মিষ্টিদিদি মুখে একটা বিস্মিত সহানুভূতির ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দুইটি হইতে একটা চাপা হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ তাঁর অমতে বিয়ে করতে গেলে কেন?

একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের ওপর অনুকম্পা হ'ল।

মিষ্টিদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম, বুঝি আর কিছু।

শঙ্কর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, আপনি ভাববেন বইকি।

এই কথায় মিষ্টিদিদি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে শঙ্করের ব্যঙ্গোক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারিল না। চায়ের পেয়ালার বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মিষ্টিদিদি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমি এবার চলি তা হ'লে। আপনি একটা লোকের চেষ্টায় থাকবেন কিন্তু, আমরা আমাদের সমিতি থেকে আট আনা ক'রে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই সমিতির। অত সস্তায় কোন ট্রেন্‌ড্‌ নার্স পাওয়া যাবে না মানি, ট্রেন্‌ড্‌ নার্সের দরকারও নেই, পাহারা দেবার মত একজন লোক পেলেই হ'ল। বেখোরে খাট থেকে প'ড়ে-ট'ড়ে না যান ভদ্রলোক। ওবুধ খাওয়ারও হাঙ্গামা নেই। ওষুধ দিচ্ছেন আমাদের প্রকাশবাবু, হোমিওপ্যাথি, পনরো দিন অন্তর এক ফোঁটা।—এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, আচ্ছা, চেষ্টায় থাকব—অত সস্তায় কোন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।

ওর চেয়ে বেশি দেবার ক্ষমতা আমাদের সমিতির নেই। অত দেবারও ক্ষমতা নেই, মিসেস স্যানিয়ালের বোন চুনচুনের স্বামী ব'লেই আমাদের ইণ্টারেস্ট্‌। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা যোগাড় করেছি আমরা।

টি. বি. ব'লে সন্দেহ করেছেন, সেইটেই হয়েছে আরও মুশকিল কিনা—ডাক্তাররা তাই বলেছে, আমরা কি করব বলুন?

একটু হাসিয়া মিষ্টিদিদি আবার বলিলেন, কি ক'রে চুনচুন যে ওই রোগা কুচ্ছিত লোকটার লাভে পড়ল, তাই ভেবে অবাক লাগে আমার।

প্রফেসর গুপ্ত মিষ্টিদিদির মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখে মৃদু একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদিও হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, মনে রাখবেন কথাটা। মিসেস স্যানিয়াল আমার ওপর ভার দিয়েছেন, আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না যেন। শঙ্করবাবুকেও বলুন না ব্যাপারটা খুলে, উনিও হয়তো কোন লোকের সন্ধান দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় ঘোরেন তো, পুরুষমানুষ হ'লেও চলবে। তাহার পর হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, উঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমার। এবার চলি আমি।

মিষ্টিদিদি চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

মিসেস মিত্রের একজন বান্ধবীর বোন চুনচুন কিছুদিন আগে যতীন হাজরা ব'লে একটি লোককে লুকিয়ে বিয়ে করে। যতীন হাজরার তিন কুলে কেউ নেই, প্রেসে না কোথায় একটা কাজ করত, কোন রকমে চ'লে যাচ্ছিল। এখন সেই যতীন হাজরার হয়েছে টি. বি.—নার্স করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনকে কিছুতে সেখানে যেতে দেবে না। ওদের সমিতি থেকেই তাঁর চিকিৎসার খরচ চলছে, তাঁর থাকবার জন্যে একটা ঘরও ভাড়া ক'রে দিয়েছেন ওঁরা, এখন সেবা করবার একজন লোক চাই। রোজ আট আনা ক'রে পাবে সে। আছে এমন লোক তোমার সন্ধানে?

আমিই করতে পারি।

তুমি!

আপত্তি কি, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা টুইশনির চেষ্টায় যতদিন সেটা না জুটছে, ততদিন এই করা যাক।

সত্যি সত্যি তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে নাকি? ব্যাপারটা কি খুলে বল তো?

ওই তো বললাম, বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, বেশ তো, টুইশনি ক'রেই পড়াশোনা কর। পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।

ডিগ্রী লাভ করার কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমান যুগে টাকাটাই আসল, সময় নষ্ট না ক'রে টাকা রোজগারের চেষ্টাতেই লেগে যাওয়া উচিত।

কিন্তু টাকা রোজগারের পথে বাঙালীর ছেলের ডিগ্রীটাই আসল সম্বল। ওটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।

ডিগ্রী সম্বল ব'লেই বাঙালীর ছেলের এত দুর্দশা।

তা হ'লে কি তোমার মতেও লেখাপড়া করাটা অনর্থক?

যারা লেখাপড়ার জন্যেই লেখাপড়া করতে চায়, তারা তা করুক এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপযুক্ত হোক। আমি ভেবে দেখেছি, আমার দ্বারা ও সম্ভব নয়।

তার মানে?

বিদ্যার্থী হবার মত মনের জোর নেই আমার। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযুক্ত নয়।

তুমি যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। বালক-ভৃত্যটি এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। শঙ্কর নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

তুমি টুইশনি ক'রেই টাকা রোজগার করবে ঠিক করেছ? ব্যবসা হিসেবে ওটা তো খুব প্রশস্ত পথ নয়।

যতদিন অন্য কোন একটা উপার্জনের পথ না পাই, ততদিন টুইশনি ক'রেই চালাব। তা ছাড়া উপায় কি? আপনি আপাতত যা হোক কিছু একটা যোগাড় ক'রে দিন আমাকে।

একটি আই.এস-সি. ছেলেকে কোচ করতে পারবে ?

পারব।

কত মাইনে চাও ?

আপনি যা ঠিক ক'রে দেবেন।

গোটা চল্লিশ হ'লে চলবে ?

চলবে।

ছু বেলা পড়াতে হবে কিন্তু।

তাই পড়াব।

আচ্ছা, বলব তাঁদের তা হ'লে। একটি জুনিয়র প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কথা বলেছেন, দরে বনছে না, সে ভদ্রলোক ষাট টাকা চান। তুমি চল্লি টাকায় রাজী তো ?

হ্যাঁ। কবে থেকে পড়াতে হবে ?

আসছে মাস থেকে।

ততদিন তা হ'লে এই টি.বি. রোগীটার সেবা করা যাক।

ওসবের মধ্যে আবার গিয়ে কি করবে ? রোগটা ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক।

তা হোক, তবু আমি যাব

[illegible] পাগল তো ! তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক বেশি। বিয়ে করেছ।

শঙ্কর উত্তরে শুধু একটু হাসিল

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তোমার সেই বান্ধবীটির খবর শুনেছ ?

কোন্ বান্ধবীটির ?

বেলা মল্লিক।

না, অনেকদিন কোন খবর জানি না।

সে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে জুটেছে।

তার মানে ?

একদিন বেলা সিনেমার সেকেণ্ড্ শো থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার বাড়ির ঠিক সামনে একটা বুড়ো সাহেব অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে রয়েছে। চতুর্দিকে জনপ্রাণী কেউ নেই। বেলা জনার্দনকে ডেকে ধরাধরি ক'রে অজ্ঞান সায়েবকে ঘরে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, একজন ডাক্তার ডাকলে এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে সায়েবকে চাঙ্গা ক'রে তুললে।

সায়েবটা নিশ্চয় মাতাল।

না, তার স্ট্রোক হয়েছিল। অর্ধেক শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।

তারপর ?

সায়েবের জ্ঞান হবার পর জানা গেল, সায়েব খাঁটি বিলিতী সায়েব, এখানে একটা সায়েবী দোকানে বড় চাকরি করে, কিছুদিন পর রিটায়ার ক'রে দেশে ফেরার কথা, এমন সময় এই বিপদ।

বেলার বাসার সামনে এল কি ক'রে ?

সায়েব নাকি এক ট্যাক্সিতে ছিল, ট্যাক্সিতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। যত দূর মনে হচ্ছে, ওই ট্যাক্সিওলাই বেগতিক দেখে ওই নির্জন গলিতে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে স'রে পড়েছে। অজ্ঞান সায়েবকে নিয়ে সে আর ঝামেলায় ঢুকতে চায় নি।

তারপর ? এ যে রীতিমত রোমাণ্টিক ব্যাপার !

Truth is stranger than fiction.

তারপর কি হ'ল ?

তারপর যোগাযোগও বেশ অদ্ভুত, সায়েবের তিন কুলে কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে একটি পিয়ানো। বেলাও নাকি মিস্টার বোসের বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, শৈলর পিয়ানোটা ও বাজাত শুনেছি।

ফলে বেলা এখন রোজ সন্ধ্যেবেলায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত সায়েবকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। সায়েবের 'কার' এসে ওকে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়।

মাইনে নিশ্চয় পান এর জন্যে ?

সেটা ঠিক জানি না আমি। তবে সায়েব জাত, কারও কাছে অমনই কিছু নেয় না। নিশ্চয়ই কিছু দিচ্ছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

প্রফেসর গুপ্তও বাতায়ন-পথে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল, মানুতুরা কি এখানে নেই নাকি, কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ?

না, ওরা অপর একটা বাড়িতে আছে। মানুতুর বিয়ে—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মিসেস মিত্রকে আপনি কি একটা চিঠি দেবেন ? না, আমিই মুখে গিয়ে বলব ?

তুমি ওই যক্ষ্মারোগীর সেবা না ক'রে ছাড়বে না ?

না।

তবে আর চিঠি লেখার দরকার কি, নিজেই গিয়ে বল।

তবু একটা লিখে দিন।

[illegible] করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তা হ'লে প্যাডখানা আর কলমটা নিয়ে এস ওই টেবিলটা থেকে।

শঙ্কর আনিয়া দিল।

প্রফেসর গুপ্ত লিখিলেন—

মিসেস মিত্র,

অন্য লোক খোঁজার দরকার নেই। শঙ্করই সেবা করতে রাজী হয়েছে। সস্তায় এত ভাল লোক পাওয়া যেত না কালকের এনগেজমেন্টের কথা মনে আছে তো ? ইতি—

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রফেসর গুপ্ত আসন্ন এন্‌গেজ্‌মেণ্টটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ইভার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রায় দুই মাস হইল বেচারা চিঠি লিখিয়াছে। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া তিনি ইভাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখিয়া তখনই সেটা পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে 'কুমারসম্ভব'খানা লইয়া উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই শ্লোকটিতে আটকাইয়া গেল—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা-
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥

—শুচিস্মিতা কৃশোদরী তপস্যারতা উমা গ্রীষ্মকালে অনন্যদৃষ্টিতে সূর্যের পানে চাহিয়া আছেন। তুষারশীতল হিমালয়ের কন্যা উমা, যে হিমালয়ে—

ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥

—সেই হিমালয়ের সুকুমারী কন্যা উমা শ্মশানবিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অগ্নিপরিবেষ্টিতা হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রফেসর গুপ্তের সহসা মনে হইল, এই দুরূহ তপশ্চরণ আজকাল আর কেহ করে না। শিবই আজকাল নানা উপহার লইয়া উমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

৪

অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রাজমহলের ভবেশবাবু ছাড়া পাইয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইয়ের এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। কোন একটা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকি-

না পারিলে তিনি কেমন যেন স্বস্তি পান না। একটা কিছু জুটিয়াও যায়। মুকুজ্জেমশাই হরেরামবাবুর নিকটে গিয়াছিলেন। মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হরেরামবাবু পোস্ট-মাস্টারি করেন। নিতান্ত নিরীহ লোক, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। থাকিবার অবসরই নাই। সকাল হইতে শুরু করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত আপিসের কাজকর্ম শেষ করিতেই কাটিয়া যায়। নিড়বিড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভালমানুষ। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু হরেরামবাবুকে বড় ভালবাসেন এবং বছরে অন্তত একবার আসিয়া হরেরামবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। এবারে আসিয়া কিন্তু কিছু অধিক দিন থাকিতে হইল। পাকেচক্রে অবস্থা একটু জটিল হইয়া উঠিল।

হরেরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোম্বল তাঁহাকে মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভোম্বলের বয়স দশ-এগারো বছর মাত্র। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঘ-বকরি খেলায় সে মুকুজ্জেমশাইকে বার বার তিন বার হারাইয়া দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়াছিলেন যে, ভোম্বল যদি তাঁহাকে তিন বার উপর্যুপরি হারাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভোম্বল যাহা খাইতে চাহিবে মুকুজ্জেমশাই তাহাই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবেন। বিজেতা ভোম্বল মাংস খাইতে চাহিয়াছে। মুরারিপুর যদি শহর হইত অথবা হরেরামবাবু যদি একটু কম নিষ্ঠাবান হইতেন, তাহা হইলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা অসম্ভব হইত না। মুরারিপুরে কসাইয়ের দোকান নাই, হরেরামবাবু বৃথা-মাংস পছন্দ করেন না। মুকুজ্জেমশাই অনুরোধ করিলে হরেরামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো রাজী হইতেন; কিন্তু কাহারও প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত করা মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা লইয়া আছে, থাকুক—ইহাই তাঁহার মত। সুতরাং হরেরামবাবুকে এ অনুরোধ তিনি করিলেন না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তিনি যাহা করিলেন, তাহা প্রিন্সিপ্‌ল্‌সম্মত হইলেও হরেরামবাবুর পক্ষে আরও সাংঘাতিক হইল।

হরেরামবাবুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, হরেরাম, আসছে অমাবস্যাতে, এস, কালীপুজো করা যাক।

মনিঅর্ডার-রেজিস্ট্রি-ভি.পি.-ইন্‌সিওর-বিক্ষুব্ধ হরেরাম প্রথমে কথাটা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিলেন না।

কি বলছেন?

আগামী অমাবস্যাতে, এস, কালীপুজো করা যাক।

কালীপুজো?

হরেরাম আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি সমস্ত দিন আপিস লইয়া ব্যস্ত থাকেন; ভোম্বলের সহিত মুকুজ্জেমশায়ের বাজির কোন খবরই তিনি রাখেন না। বস্তুত ভোম্বল এবং মুকুজ্জেমশাই ছাড়া আর কেহই এ খবর জানে না। বিস্মিতনেত্রে হরেরাম চাহিয়া রহিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, শাক্তবংশের ছেলে তুমি, কালীপুজো করবে তাতে হয়েছে কি? তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। একটি কালীমূর্তি আর একটি ভাল দেখে কালো পাঁঠা যোগাড় করতে হবে।

মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত হরেরামের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আপত্তি করা বৃথা। মুকুজ্জেমশাই যাহা ধরেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না। তা ছাড়া, দেবীপূজায় আপত্তি তুলিতে তাঁহার ধর্মভীরু মন ভীত হইল। বলিলেন, অমাবস্যার আর কদিন বাকি?

দশ দিন।

এর মধ্যে কি সব হয়ে উঠবে?

এর মধ্যে ছোটখাটো মূর্তি একটা হবে না? খোঁজ কর, গ্রামে নিশ্চয় গড়তে পারে কেউ।

মাথা চুলকাইয়া হরেরাম বলিলেন, দেখি বংশীকে ব'লে। আমি কিছুই জানি না।

বংশী পিওন

বংশীর সহায়তায় সাত-আট দিনের মধ্যে ছোট একটি প্রতিমা এবং নধর একটি পাঁঠা যোগাড় হইয়া গেল। ভোম্বল উল্লসিত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠাবান পিতার সন্তান হইলে কি হয়, মাংসের প্রতি তাহার খুব লোভ। মাংস খাইতে পায় না বলিয়া লোভটা আরও বেশি। তাহার ভারি আনন্দ হইল। পিতামাতার জ্ঞাতসারে সে অবশ্য বেশি হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহস করিল না। বাঘ-বকরি খেলার তুচ্ছ বাজির জন্য মুকুজ্জেমশাই এত কাণ্ড করিতেছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হরেরামবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইবেন। নিরীহ হরেরাম চটিয়া গেলে মার-ধোর অথবা হাঁক-ডাক করেন না, নীরবে উপবাস করিতে থাকেন। সুতরাং সহসা কেহ তাঁহাকে চটাইতে চাহে না। মুকুজ্জেমশাই বাঘ-বকরি-প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত করিলেন না। ভোম্বলও ভালমানুষের মত চুপ করিয়া রহিল।

বংশীর আনুকূল্যে মুকুজ্জেমশাই কালীপূজার আয়োজন যখন শেষ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকম একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক চিঠি আসিয়া হাজির। তাহার সার মর্ম—মুরারিপুরের কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী অভিযোগ করিয়াছেন যে, মুরারিপুর পোস্ট-অফিসে নাকি কালীপূজা করা হইতেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা হরেরামবাবুকে পোস্ট-অফিসে কালীপূজা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কোন গভর্মেণ্ট অফিসে এরূপ পূজাদি করা নিয়মবিরুদ্ধ।

ভোম্বল অত্যন্ত দমিয়া গেল। সঙ্কল্পিত এবং আয়োজিত দেবীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরামবাবুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। দমিলেন না মুকুজ্জেমশাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওর জন্যে আর ভাবনা কি, ওই সামনের মাঠটায় একটা চালা তুলে ফেলে সেইখানেই পুজো করা যাবে। পোস্ট-অফিসে পুজো নাই বা করলাম আমরা, কি বল ভোম্বল ?

ভোম্বল ভালমানুষের মত একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিকটে উপবিষ্ট বংশীকে সম্বোধন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি দু-চারটে

জনমজুর ডাকাও, বুঝলে বংশী—একটা ছোটখাটো চালা তুলতে আর কতক্ষণ যাবে? গ্রীষ্মকালে মাঠের মাঝখানে বরং ভালই হবে। ও জমিটা তো রামকিষুণের—সে বোধ হয় আপত্তি করবে না। তাকেও তুমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে এস।

বংশী রামকিষুণের অনুমতি লইবার জন্য চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, রামকিষুণের আপত্তি তো নাই-ই, সে বরং খুশিই হইয়াছে। সাধুবাবা ওখানে কালীমায়ীর পূজা করিবেন, ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আরও যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুজ্জেমশাই বংশীকে চালা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং খড় বাঁশ প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পূজার যাবতীয় খরচ মুকুজ্জেমশাই-ই বহন করিতেছেন, হরেরামের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে রাজী হন নাই।

আয়োজিত কালীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরাম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন. এখন কর্তৃপক্ষের অমতে কালীপূজা করিতে আবার তিনি মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। যদিও পোস্ট-অফিসে করা হইতেছে না, একেবারে পোস্ট-অফিসের সীমানার বাহিরেই-হইবে; তথাপি কর্তৃপক্ষের অমতেই তো হইবে! চাকরির যা বাজার, কোথা হইতে কি হইয়া যায়, কে বলিতে পারে? অথচ নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান হইয়া আয়োজিত পূজা না করাটাও—। এক দিকে মা-কালী, অন্য দিকে পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,—নিরীহ নিষ্ঠাবান হরেরাম মর্মান্তিক দোটানায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই মা-কালীর পক্ষে, নিরুপায় হরেরামকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

মুকুজ্জেমশাই মহা উৎসাহে জনমজুর লইয়া রামকিষুণের মাঠে চালাঘর তুলিতে লাগিয়া গেলেন। ভোম্বল মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট হইতে ফর্দ ও টাকা লইয়া ডাল ঘি গরমমসলা প্রভৃতির সন্ধানে বাজারের নানা দোকানে

ঘুরিতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই এত রকম মসলার ফিরিস্তি দিলেন যে, মুরারিপুরে সবগুলি মেলাই মুশকিল হইয়া উঠিল। সির্কা এবং জাফরান এ দুইটি দ্রব্য তো কোথাও মিলিল না।

বেলা তিনটা নাগাদ চালা খাড়া হইয়া গেল। চালার ব্যাপার শেষ করিয়া মুকুজ্জেমশাই মাংসের ব্যাপারে মন দিলেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছিলেন, রাত্রে পূজা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংসটি রাঁধিয়া ফেলিবেন। তিনি নিজেই রাঁধিবেন। ভোম্বল এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী গোল গোল করিয়া নৈনিতাল আলু ছাড়াইতেছে। আলু ছাড়ানো হইয়া গেলে আলুগুলির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ভাজা মসলা পুরিতে হইবে। মুকুজ্জেমশাই নানা রকম মসলা ভাজিয়া গুঁড়া করাইতেছেন। অনেক কষ্টে জিওলপুর গ্রামের দৌলতরাম মাড়োয়ারীর নিকট জাফরান পাওয়া গিয়াছে। সির্কা পাওয়া যায় নাই। মুকুজ্জেমশাই টক দই দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কালীপূজার আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গো-শকটে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় হাজির হইলেন। তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন হইতে মুরারিপুরে আসিতে হইলে গো-শকট ছাড়া অন্য কোন যান নাই, সুতরাং মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে গো-শকটেই আসিতে হইয়াছে। প্রকাশ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বলিলেন, তিনি মুরারিপুর পোস্ট-অফিস ভিজিট করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলমান, সেই হেতু সকলে অনুমান করিতে লাগিল যে, তাঁহার কালীপূজা-সম্পর্কিত আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। চাকুরিজীবী নিরীহ হরেরাম বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই ছিদ্রিত আলুগুলিতে মসলা পুরিতে পুরিতে একটু হাসিলেন এবং হরেরামকে বলিলেন, তুমি তোমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সামলাও গিয়ে,

এখানে আসবার দরকার নেই তোমার। আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি।

হরেরাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামলাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই ভোম্বলদের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র গল্প বলিতে বলিতে মাংস রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কালীপ্রতিমা আসিয়া চালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন, গ্রামের পুরোহিত মহাশয় পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি থমথম করিতেছে। চালাঘরের পাশেই একটি তোলা উনুনে মুকুজ্জেমশাই মাংস রান্না করিতেছেন, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। নিকটেই ভোম্বল ও তাহার তিন-চারজন সঙ্গী গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয়ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। জমির মালিক রামকিষুণ ও তাহার সম্বন্ধী খুবলালও সোৎসাহে জাগিয়া বসিয়া আছে। যদিও রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাহারও চোখে ঘুম নাই। মুকুজ্জেমশাই খুব জমাইয়া একটি ভূতের গল্প শুরু করিয়াছেন।

আগামী কল্য বেলা দশটার আগে ট্রেন নাই। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে পোস্ট-অফিসেই রাত্রিবাস করিতে হইতেছে। তিনি কালীপূজা সম্পর্কে হরেরামবাবুর কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া আপিসের কাগজপত্র নাকি তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ভোম্বল মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি নাকি খাতাপত্র দেখিয়াছেন। পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলভীসাহেব তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিপাটীরূপে আহার করাইয়াছেন। বংশী বলিল, এই উপলক্ষ্যে মৌলভীগৃহে মুরগীও নাকি নিহত হইয়াছে। এখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে নিদ্রিত। মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে,

ভূতের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—এমন সময় পোস্ট-আফিসের বাহিরের ঘর হইতে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

সাপ—সাপ!

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, বংশী, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে দেখ। শুধু বংশী নয়, খুবলাল, রামকিষুণ, পুরোহিত, ভোম্বল সকলেই আগাইয়া গেল। সত্যই সাপ বাহির হইয়াছে। বিরাট এক কেউটে পোস্ট-অফিসের কোণে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। সাপটাকে মারা গেল না, কোথায় যে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল বোঝা গেল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পোস্ট-অফিসে শুইতে চাহিলেন না। শশব্যস্ত হরেরাম তাঁহাকে কোথায় শুইতে দিবেন চিন্তায় পড়িলেন। রামকিষুণ বলিল, মৌলভীসাহেবের বাড়িতে খবর পাঠানো হোক। তাহাই হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মৌলভী-সাহেবের ঘরটাতে শুইতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চোখ বুজিলেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় সর্পটা হিংস্র ফণা উদ্যত করিয়া তর্জন করিতেছে। অতি প্রত্যুষেই তিনি মুরারিপুর ত্যাগ করিলেন। রামকিষুণ প্রথমে ব্যাপারটা ভালভাবে প্রণিধান করে নাই; কিন্তু পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভক্তিভরে মুকুজ্জেমশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সাধুবাবাটি তো সহজ লোক নহেন! এত বড় অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সে যেন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড কেউটে আসিয়া হাজির হইয়া গেল! ম্লেচ্ছ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পলাইতে পথ পাইল না! রামকিষুণের এতাদৃশ ভক্তিবাহুল্যে মুকুজ্জেমশাই কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—লোকটা মাদুলি অথবা মন্ত্র চাহিয়া না বসে! এই জাতীয় অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার জীবনে অনিবার্যভাবে জুটিয়া গিয়াছে, আর সংখ্যা বাড়াইতে তিনি চান না। রামকিষুণ মাদুলি কিংবা মন্ত্র চাহিল না; কিন্তু অনুরোধ করিল, আরও দুই-চারিদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। তাহার কন্যার 'গওনা' অর্থাৎ দ্বিরাগমন আর কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। সে সময় পর্যন্ত যদি

সাধুবাবা 'কিরপা' করিয়া থাকিয়া যান, বড় ভাল হয়। তাঁহার আশীর্বাদ নবদম্পতীর জীবনের অমূল্য সম্পদ হইবে।

মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। ভোম্বল মাংস খাইয়া খুশি হইয়াছে, কালীপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ স্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। হরেরামবাবুর কাজকর্মে কোনরূপ গাফিলতি ধরা পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চিন্তচিত্তে মুকুজ্জেমশাই এবার যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ রামকিষুণের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার বাধিতেছিল, অথচ মুরারিপুরে আর তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। এক স্থানে বেশিদিন থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি রামকিষুণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। জরুরী পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রামকিষুণও আর আপত্তি করিল না। পত্রখানি হাসির। হাসিকে তিনি মুরারিপুরের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধারণত তিনি কাহাকেও ঠিকানা দিয়া আসিতে চান না। কিন্তু হাসি নূতন লিখিতে শিখিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে চিঠি লিখিবে বলিয়া জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঠিকানা আদায় করিয়া লইয়াছিল; হাসির চিঠি পাইয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হাসি লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বড় বিপদে প'ড়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। ঠাকুরপো তার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি ব'লে একদিন সন্ধ্যের সময় চ'লে যায়। সেই থেকে ঠাকুরপো আর ফেরে নি। এখন শুনছি, সে নাকি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, তার কাছে বোমা আর রিভলবার পাওয়া গেছে। ঠাকুরপো এখন হাজতে। আজ শুনছি, ওঁরও নাকি চাকরি থাকবে না। উনি যখন মজঃফরপুর গিয়েছিলেন, তখন ওঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁদের

সঙ্গে মিস্টার ঘোষ ব'লে কে এক মুখপোড়া নাকি কাজ করে—চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। আমার চিঠির ভেতরে সে কি দেখতে পেয়েছে জানি না, কিন্তু তা নিয়ে নাকি ওঁর চাকরি যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি শিগগির চ'লে আসুন। আমি বাবাকেও চিঠি লিখলুম। ইতি—

হাসি

পুনশ্চ—

দেখেছেন, আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই। তাড়াতাড়িতে আপনাকে প্রণাম দিতেই ভুলে গেছি। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি—

হাসি

মুকুজ্জেমশাই সেই দিনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

নীরব গম্ভীর রাত্রি।

মরণোন্মুখ যতীন হাজরার শয়নশিয়রে শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতেছে। আপেল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি দুই-চারিটি ফলও টেবিলে সাজানো আছে। মিষ্টিদিদি এগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যতীনবাবু একটিও স্পর্শ করেন নাই। যতীনবাবু লোকটি অদ্ভুতপ্রকৃতির। আর কিছু নয়, অদ্ভুত রকম নীরব। শঙ্করের সহিত একটিও কথা হয় নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। অতিশয় ক্লান্তি-ব্যঞ্জক কোটরগত চক্ষু দুইটি বুজিয়া সর্বক্ষণই চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন। নীরবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কাছে এমন আত্মসমর্পণ শঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। শঙ্কর যতীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্য করে, তাঁহার গলার দুই পাশের শিরা দুইটা অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সন্ধ্যার পর কাশিটা বাড়িয়া উঠে। প্রয়োজন হইলে নিজেই উঠিয়া বাথ-রূমে যান, একটি বালক-ভৃত্য খাবার আনিয়া দুই

বেলা তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়, প্রকাশবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া আসেন। প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরেই অতি সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা যতীনবাবু বলেন; প্রকাশবাবু চলিয়া গেলে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। শঙ্কর যে দিবারাত্রি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে, তাহা তিনি মোটে লক্ষ্যই করিতে চান না। শঙ্কর পাড়ার একটা সস্তা হিন্দু হোটেলে আহারাদি সমাধা করিয়া আসে। (নিজের গরম ওভার-কোটটা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে।) এবং নির্বাক হইয়া এই যক্ষ্মারোগীর মরণশিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকে।

হয়তো থাকিত না, কিন্তু চুনচুনের জন্য থাকিতে হয়। সকলের বারণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রে চুনচুন লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে আসে। গভীর রাত্রে শঙ্কর কপাট খুলিয়া দেয়, চুনচুন চোরের মত আসিয়া প্রবেশ করে। চুনচুন প্রবেশ করিলে শঙ্কর বাহিরে চলিয়া যায়। চুনচুন বেশিক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ থাকে, শঙ্কর ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুন খুব রোগা, খুব কালো, কিন্তু চোখ দুইটি তাহার সুন্দর। চোখ দুইটি বড় নয়, কিন্তু অপরূপ। চুনচুনের সমস্ত অন্তরের ছবি যেন ওই কালো চোখ দুইটি। গভীর রাত্রে এই গোপন অভিসার শঙ্করের মনকে উতলা করিয়া তোলে। প্রেমাস্পদকে গোপনে বিবাহ করিয়া চুনচুন গোপনেই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হিতৈষিণী দিদি এবং দিদির বান্ধবার দল চুনচুনকে কিছুতেই তাহার স্বামীর সংস্রবে আসিতে দিবে না, এমন কি মৃত্যুকালেও নয়। ছোঁয়াচে রোগের অজুহাতে এ যেন প্রতিশোধ লওয়া। আজ যদি মিসেস স্যানিয়ালের ওই রোগ হয়, চুনচুনকে কি তিনি কাছে যাইতে দিবেন না? কিন্তু এসব লইয়া দিদির সহিত তর্ক করিবার কল্পনা করাও চুনচুনের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় মার্জিতরুচি মৃদুপ্রকৃতির মেয়ে। শঙ্করের মনে হয়, অতিশয় নিগূঢ়প্রকৃতির। তাহা না হইলে গোপনে বিবাহ করিতে পারিত না, গভীর রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিত না। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুন সমাজের সহিত ইতরের মত কলহ করিতে চায়

না, কিন্তু নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চায়। প্রকাশ্যভাবে চলিবার যদি বাধা থাকে, বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সে অকারণে শক্তিক্ষয় করে না, গোপনতার আশ্রয় লয়। নিদ্রিত যতীনবাবুর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কর চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুনকে ঘিরিয়া তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক হইয়া না উঠিলে শঙ্কর এই নীরব মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মাথার শিয়রে এমনভাবে হয়তো দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারিত না। পাশের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। আর একটু পরেই চুনচুন আসিবে। দ্বারে মৃদু করাঘাতটির প্রত্যাশায় শঙ্কর সজাগ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, শঙ্করের খেয়াল ছিল না। সে টেবিলের এক ধারে বসিয়া 'অ্যানা ক্যারেনিনা' পড়িতেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল, যতীনবাবু [illegible] তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল।

শুনুন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁহার বিছানার কাছে উঠিয়া গেল। যতীনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার একটি উপকার করবেন দয়া ক'রে?

কি, বলুন?

যতীন হাজরা কয়েক মুহূর্ত শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া [illegible]। তাহার পর বলিলেন, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?

নিশ্চয়।

যতীনবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দেখুন, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাঁচব না। আমার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে আসছে।

আবার চুপ করিলেন।

শঙ্কর নীরবে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যতীনবাবু বলিলেন, মারা যাব সে জন্যে দুঃখ নেই, আমার সবচেয়ে দুঃখ যে ম'রেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরও অশান্তি ভোগ করার জন্যে আমার মনটা বোধ হয় বেঁচে থাকবে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

যতীনবাবু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি তাকে বলবেন যে, অনুতাপে আমার বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ক দিন খালি তার কথাই ভেবেছি, আর কোন কিছু ভাববার শক্তিও নেই আমার।

আপনি কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রীর।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, চুনচুনের নয়, আমার প্রথম স্ত্রীর। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম। সে নিষ্পাপ জেনেও তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ত্যাগ ক'রে এসেছিলাম। সে এখনও বেঁচে আছে। আপনি একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে? তাকে বলবেন যে, আমি—

যতীনবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বলবেন, আমার পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জ্ব'লে পুড়ে অনুতাপ করতে করতে আমি মরেছি। আপনি দয়া ক'রে একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে। গিয়ে বলবেন যে, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারই কথা ভেবেছি, মনে মনে তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছি—

শঙ্কর বলিল, চুনচুন, মানে—মিসেস হাজরা কি এ কথা কিছুই জানেন না?

না। লুকিয়ে বিয়ে করেছি ওকে, সে অনেক ইতিহাস—বলবার এখন সময় নেই।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বললেই

ভুলে যায়, অতি সহজেই ভুলে যায়। আপনি ওকে যেন ওসব কথা বলবেন না, বৃথা কষ্ট পাবে। এ কি—এ কি—এখন [illegible] অন্ধকার হয়ে আসছে যে—আপনি—তার—

[illegible] হইয়া গেল।

প্রথম স্ত্রীর ঠিকানা আর শঙ্করকে বলা হইল না। নির্বাক শঙ্কর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

প্রথম দিন ভন্টু কথাটা পাড়িতে পারে নাই। ওইরূপ নিদারুণ সংবাদ শোনার পর টাকার কথা পাড়া সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে জিনিসটা সহজ হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আজ না পারিয়া উপায় নাই। কাল রাত্রে করালীচরণ স্বয়ং নাকি টাকার তাগাদায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যে সে বাড়িতে ছিল না! বউদিদি বলিলেন যে, সে বাড়িতে নাই শুনিয়াও করালী নড়িতে চাহেন নাই। ভন্টুর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, ভন্টু যেন অতি অবশ্য অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। দ্রাবিড়ী লদ্‌কোলদ্‌কির নেশায় চাম গ্যানচঅ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে রিক্ত হস্তে তাঁহার সহিত দেখা করিলে রক্তসিক্ত হইয়া ফিরিতে হইবে। সুতরাং অশোভন [illegible] নিবারণবাবুকে আজ না খজলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে? মুখবন্ধটা কি প্রকারে করা যায়—ভন্টু ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কথাগুলি গুছাইয়া মনে মনে মহড়া দিয়া লইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঠিক কথাগুলি কিছুতেই মনে আসে না। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে যা হোক করিয়া ব্যাপারটা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। হইলও তাহাই। ভন্টু গিয়া দেখিল, নিবারণবাবু ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভন্টুকে দেখিলে পূর্বে

যেরূপ সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিতেন, এখন তাহার কিছুই করিলেন না। ক্লান্ত কণ্ঠে কেবল বলিলেন, আসুন।

ভন্টু উপবেশন করিল। ভন্টু কবি নয়, তবু তাহার মনে একটা উপমার উদয় হইল। লোকটা যেন নিবিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, কোন খবর-টবর পেলেন ?

কিছু না। পুলিসে খবর দিয়েছি আমি।

ভন্টু নীরব রহিল।

সহসা নিবারণবাবু উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, এর জন্যে যত টাকা লাগে, খরচ করব আমি। ও-ব্যাটাকে আমি দেখে নেব যেমন ক'রে হোক।

ভন্টু তথাপি নীরব।

আস্‌মিকে জানতেন তো, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মেয়ে সে ; স্কাউণ্ড্রেলটা নিশ্চয়ই কোন রকম ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। বুঝছেন না আপনি ?

ভন্টু সুযোগ পাইল, হাসিয়া বলিল, খুব বুঝছি। আস্‌মির কতই বা বয়েস, দাজিও হ'লেও বা কথা ছিল।

দাজিও ওসব কিছু বোঝে না. আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম। এই রাস্কেলটা জুটেই না এই হাল হ'ল !

ভন্টু একটু হাসিয়া বলিল, সে কি আর আমি জানি না ! এতদিন আপনার বাড়িতে আসছি যাচ্ছি, আপনার মেয়েদের গলার স্বরটি পর্যন্ত শুনতে পাই নি কোনদিন।

ওই যে বললাম আপনাকে, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম।

নিবারণবাবুর গুষ্টির ধারা কি রকম, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভন্টু আসে নাই ; সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। আসল কথাটা কোন্ ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নিবারণবাবু বলিলেন, পুলিসের পাল্লায় পড়লে টিট্ হবেন বাছাধন।

ভন্টু বলিল, পুলিসের হাঙ্গামা করলে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয় !

কাগজে হয়তো এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, আপনাকে আবার দাঁজির বিয়ে দিতে হবে তো।

হ'লেই বা, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না বলতে চান?

ভন্টু নিবারণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিল, আপনার মত সরল ধর্মভীরু লোক দুনিয়ায় খুব বেশি নেই নিবারণবাবু।

নিবারণবাবু কোন উত্তর দিলেন না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। ভন্টুও আর কোন কথা বলিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, লোকটি অতিশয় ভালমানুষ এবং ভালমানুষি জিনিসটা নির্বুদ্ধিতারই রূপান্তর।

সহসা নিবারণবাবু ভন্টুর দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, দাজির জন্যে দিন না একটা পাত্র জুটিয়ে ভন্টুবাবু। মেয়েটা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভারি কষ্ট হয় আমার। টাকা আমি খরচ করব। তিন হাজার নগদ, গয়না, দানপত্র—যথাসাধ্য দেব আমি। ভদ্রবংশের ছেলে দিন একটি যোগাড় ক'রে, গরিব হ'লেও ক্ষতি নেই, ওদের ভরণপোষণের যা হোক একটা বন্দোবস্ত আমি ক'রে যেতে পারব। আমার ওই মেয়েরা ছাড়া আর কে আছে বলুন? তাও তো আসমিটা—

নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত ভন্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দুই-এক মিনিট সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল এবং তাহার পর বলিল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে একটা প্রস্তাব করি।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?

নিবারণবাবু সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ফারিতচক্ষে ভন্টুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, আমার ওই কুৎসিত মেয়েটাকে নেবেন আপনি?

ভন্টু বলিল, দেখুন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি আমার অবস্থা ভাল ক'রেই জানেন। দু-কুড়ি সাতের খেলা কোনক্রমে খেলে যাচ্ছি, তা-ও চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। যা মাইনে পাই, তাতে কুলোয় না। দাদার চেঞ্জের খরচ, সংসারের খরচ, সব আমাকে ওই মাইনে থেকে চালাতে হয়। চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। আপনি যদি কিছু টাকাকড়ি দেন, ধার-টারগুলো শেষ ক'রে একটু ঝাড়া-হাত-পা হতে পারি। টাকার জন্যেই আমার বিয়ে করা। এক জায়গায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা ধার আছে, দু-এক দিনের মধ্যে দিতে না পারলে অপমানিত হতে হবে। আমি আপনার কাছেই টাকাটা চাইব ভাবছিলাম, আপনার এই অবস্থা দেখে কেবল চাইতে পারছিলাম না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল—আপনি স্বজাতি, পাল্‌টি ঘর, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আপনারও কন্যাদায় উদ্ধার হয়, আমিও একটু ঝাড়া-হাত-পা হই। বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। চিঠিও আসছে নানা জায়গা থেকে—

নিবারণবাবু বলিলেন, আপনি [illegible]কে দেখেছেন ভাল ক'রে?

যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট।

আপনার বাবা রাজী হবেন তো?

চেষ্টা করব।

নিবারণবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি চেক-বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কত টাকা চাই বললেন আপনার?

সাড়ে পাঁচ শো।

নিবারণবাবু তৎক্ষণাৎ চেক লিখিয়া দিলেন।

কথা তা হ'লে পাকা তো?

একদম পাকা।—এই বলিয়া ভন্টু হেঁট হইয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইলেন। এবার আর নিবারণবাবু আপত্তি করিলেন না।

৭

প্রথম চিঠি লেখার উৎসাহে কিছুদিন পূর্বে হাসি চিন্ময়কে লুকাইয়া যে চিঠিখানি স্বামীকে লিখিয়াছিল, তাহা যে মৃন্ময়ের সহকর্মী মিস্টার ঘোষের হাতে পড়িয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিবে, তাহা হাসির কল্পনাতীত ছিল। মৃন্ময়ও কল্পনা করে নাই যে, হাসি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে। মৃন্ময় জানিত, হাসি নিরক্ষর। হাসি যে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোজ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল, এ খবর মৃন্ময়ের অজ্ঞাত ছিল। মৃন্ময়কে অবাক করিয়া দিবে বলিয়া হাসি ঘুণাক্ষরেও মৃন্ময়কে কিছু জানায় নাই। মজঃফরপুরের কাজ সারিয়া মৃন্ময় যখন কলিকাতায় চলিয়া আসে, তখন সেখানকার পোস্ট-অফিসে বলিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার নামে যদি কোন চিঠিপত্র আসে তাহা যেন কলিকাতায় তাহার অফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ধারণা ছিল, যদি কোন চিঠি আসে, তাহা অফিসেরই চিঠি হইবে। সুতরাং বাড়ির ঠিকানা দিয়া আসিবার কল্পনাও তাহার মাথায় আসে নাই।

হাসির চিঠি যখন মজঃফরপুর ঘুরিয়া কলিকাতার অফিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃন্ময় অফিসে ছিল না। অফিসে ছিলেন মিস্টার ঘোষ, দৈবক্রমে চিঠিখানা তাঁহারই হাতে পড়িয়া গেল। দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি কোন দাবা-খেলোয়াড় ভাল একটা চাল হঠাৎ আবিষ্কার করিলে যেমন আনন্দিত হইয়া উঠেন, মিস্টার ঘোষ ঠিক তেমনই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এই তো বাজি মাত হইয়া গিয়াছে! ঠিক এই হাতের লেখারই তো তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন! অসঙ্কোচে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কে এই হাসি? যেই হউক, মৃন্ময়বাবুর সহিত বেশ মাখামাখি আছে দেখা যাইতেছে। উত্তেজনায় আনন্দে মিস্টার ঘোষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে অর্ধ-বিকশিত ক্রূর একটা হাসি নীরবে যেন বলিতে লাগিল, এইবার তো লোকটাকে কবলে

গিয়াছে! একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে, এতদিন বাছাধন ডুবিয়া জলপান করিতেছিল। মিস্টার ঘোষ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বাজিমাত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, এক ঢিলে দুইটি পক্ষীই নিহত হইয়াছে। সেদিন যে অ্যানার্কিস্ট ছোকরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার নিকট যে চিঠির টুকরাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার লেখা আর মৃন্ময়বাবুর এই হাসির লেখা তো হুবহু এক। লিপি-সমস্যার সমাধান এইবার সহজে হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, চাকরি-জগতে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের নিষ্কলঙ্ক চাকুরি-জীবনে বেশ মোটা একটা কলঙ্কও লাগিয়া দেওয়া যাইবে। চিন্ময় নামে যে ছোকরা ধরা পড়িয়াছে, শোনা যাইতেছে, সে নাকি মৃন্ময়বাবুরই সহোদর ভাই। এই হাসিটা মৃন্ময়ের কে হয়?

পরদিনই খোদ বড় সাহেব মৃন্ময়কে তলব করিলেন। মৃন্ময়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, চিন্ময় তোমার কে হয়?

ভাই।

হাসি তোমার কে হয়?

স্ত্রী।

এরা যে এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তুমি জানতে?

না।

সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই বলছি।

সাহেব ক্ষণকাল মৃন্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, যাও।

মৃন্ময়ের শ্বশুর মহাশয় পুলিসের বড় চাকুরে। তাঁহারই খাতিরে এবং চেষ্টায় মৃন্ময় ও হাসি রেহাই পাইয়া গেল, অর্থাৎ তাহাদের জেল হইল না। মৃন্ময়ের চাকরিটি কিন্তু গেল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, চাকুরিবিহীন মৃন্ময় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং হাসি তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ

দিতেছে যে, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। এই হতভাগা চাকরি গিয়াছে ভালই হইয়াছে। অন্য চাকরি একটা জুটিয়া যাইবেই। এত লোকের জুটিতেছে, মৃন্ময়েরই জুটিবে না?

মুকুজ্জেমশাই কলিকাতায় আসিয়া আর একটি সংবাদ পাইলেন। শিরীষবাবু লিখিতেছেন, বেহাইমশায় নাকি শঙ্করের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা ভয়ানক সংবাদ। আমি কি করিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, আমিই কোনক্রমে তাহার পড়ার খরচ চালাইব, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। উত্তরে শঙ্কর লিখিয়াছে যে, সে চাকুরির চেষ্টা করিতেছে, আর পড়াশোনা করিবার তাহার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি একবার সুযোগ পান, তাঁহার সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। আমি যেমন করিয়া হউক তাহার পড়ার খরচ চালাইব।

এই দুইটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মুকুজ্জেমশাই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিনের মত খোরাক পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সক্রিয় হইয়া উঠিল।

৮

সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইতেছিল—

"একটি শিক্ষিত বাঙালী পাত্রের জন্য বাঙালী পাত্রী চাই। পাত্রী যে-কোন জাতির হইলেই চলিবে, কিন্তু শিক্ষিতা পাত্রী অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না। অক্ষরপরিচয়হীনা বয়স্থা পাত্রীই প্রয়োজন। পণ লাগিবে না। পাত্র শিক্ষিত উপার্জনক্ষম। ...নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।"

এ দেশে অশিক্ষিতা পাত্রীর অভাব নাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও ঘরে ঘরে বিরাজমান, তথাপি এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আশানুরূপ সংখ্যায় আবেদন আসিয়া জুটিল না। "পাত্রী যে-কোন জাতি হইলেই চলিবে"—এই কথায় পুরাতন-পন্থীরা এবং "শিক্ষিতা অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না"—এই কথায় আধুনিক-পন্থীরা ভড়কাইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিলেন, লোকটার মাথায় ছিট অথবা কোন কুমতলব আছে। নিজে শিক্ষিত, জাত মানে না, অথচ অক্ষর-পরিচয়-হীনা বয়স্থা পাত্রী বিবাহ করিতে চায়—এ আবার কি রকম!

বেলার উপর চটিয়া প্রিয়নাথ মল্লিক অবশেষে বিবাহই করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক করিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিবেন না—কিছুতেই না। উহাদের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞাপনের ধরন দেখিয়া শিক্ষিতা অশিক্ষিতা কোন মেয়েই জুটিল না। একেবারেই যে জোটে নাই তাহা নয়, কিন্তু যে দুই-চারিজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বেলার গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া আর অগ্রসর হওয়া সদ্বিবেচনার কার্য মনে করেন নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলেই যে প্রিয়নাথ বিবাহ করিতেন তাহাও সুনিশ্চিত বলা যায় না। তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে বিজ্ঞাপনটি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল, কি হইবে এমনভাবে বেলার পথ চাহিয়া! সে যদি নাই আসিতে চায়, চুলায় যাক, আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইব। সত্য সত্যই বিবাহের সুযোগ উপস্থিত হইলে হয়তো তিনি পিছাইয়া যাইতেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া যখন কোন পাত্রীই পাওয়া গেল না, তখন ব্যাহত প্রিয়নাথ ক্ষোভে আক্রোশে মনে মনে গুমরাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের উত্তাপ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কেমন করিয়া বেলাকে জব্দ করা যায়। যেমন করিয়া হউক তাহার দর্পটা চূর্ণ করিতে হইবে, ছলে বলে কৌশলে—যেমন করিয়া হউক।

৯

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ভিজিয়া ভিজিয়াই শঙ্কর হাঁটিয়া চলিয়াছে। তখনও রাগে তাহার মাথার শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। অপদার্থ লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়! হাঁদা জরদ্গব ছেলেটাকে টাকার জোরেই রাতারাতি বুদ্ধিমান করিয়া তুলিবে ভাবিয়াছে! অঙ্ক কিছু তো জানেই না, বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, তাহাকে ফিজিক্স্ পড়াইতে হইবে! তাও না হয় চেষ্টা করা যাইত; কিন্তু উহাদের অর্থোত্তাপ অত্যন্ত বেশি, শঙ্করের পক্ষে অসহ্য। হস্তীমূর্খ ছেলেটার পিছনে শঙ্কর যে এতটা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ছেলের বাবা এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে বড় নয়। আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে বলিয়া বসিলেন, ওহে মাস্টার, আজ আমাদের চণ্ডীবাবু বলছিলেন যে, পড়াশোনা তেমন নাকি সুবিধে হচ্ছে না! ফিজিক্সের কি একটা কোশ্চেন করেছিলেন উনি, কিছুই বলতে পারলে না। চণ্ডীবাবু বলছিলেন, আর কটা টাকা বেশি দিয়ে কলেজের একজন প্রফেসার রাখলেই ভাল হয়। কি বলেন আপনি, হবে আপনার দ্বারা পড়ানো? টাকার জন্যে আমি ভাবি না, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ পান্নো—প্রফেসারই না হয় রাখি একটা—

শঙ্করের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, চণ্ডীবাবু কে?

একজন রিটায়ার্ড ইন্‌জিনিয়ার। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনিই কাল জীবুকে ডেকে দু-চারটে কোশ্চেন করলেন, ও তো কিছুই বলতে পারলে না, হাঁ ক'রে রইল।

শঙ্কর বলিয়া বসিল, ও হাঁ ক'রেই থাকবে, ওর দ্বারা কিছু হবে না। ওর মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না সহজে—

ঢোকাতে জানলেই ঢোকে। জীবু বলছিল, আপনি নাকি কেবল অঙ্কই কষান, ফিজিক্স্ কিছুই পড়ান না।

অঙ্ক না জানলে ফিজিক্স্ পড়া যায় না।

এই কথা শুনিয়া গড়গড়ায় একটা টান দিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে এমন টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন, যেন শঙ্কর হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব কিছু একটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

দেখুন, কারও রুটি আমি সহজে মারতে চাই না, কিন্তু মন দিয়ে একটু পড়াবেন-টড়াবেন।

আমি আর কাল থেকে আসব না, আপনি কলেজের প্রফেসারকেই বাহাল করুন।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন, মাইনেটা তা হ'লে চুকিয়ে দিই, দাঁড়ান। কদিন কাজ করেছেন আপনি?

আমার ঠিক মনে নেই।

দাঁড়ান, আমার টোকা আছে।

কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি আজ নিয়ে একুশ দিন কাজ করেছেন, মাসিক চল্লিশ টাকা হিসেবে আপনার আটাশ টাকা পাওনা—এই নিন। গুপ্তমশায়কে বলবেন যে আমি আপনাকে ছাড়াই নি, আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন। আমার ছেলে ওই কলেজেই পড়ে, গুপ্তমশায়ের কথায় প্রিন্সিপ্যাল ওঠেন বসেন শুনেছি, তাঁকে আমি চটাতে চাই না। আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন, এই কথাটা দয়া ক'রে জানিয়ে দেবেন তাঁকে।

আচ্ছা।

হনহন করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, এইবার কি করিবে? মাত্র এই কটি টাকা, কলিকাতা শহরে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। যে মেসে সে উঠিয়াছে, তাহার চার্জ মিটাইতেই তো কুড়িটা টাকা লাগিবে। নূতন কাজের সন্ধান করিলেই কি মিলিবে? তাহার উপর কয়দিন হইতে

যে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কোথাও বাহির হওয়াই মুশকিল। সমস্ত আকাশে চাপ চাপ মেঘ, দিবারাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, আকাশ নির্মেঘ হইলেই বা সে কি করিত, বৃষ্টির দোহাই দিয়া তবু কয়েকটা দিন অকর্মণ্যতাটাকে সহ্য করা যাইতেছে। আকাশ একদিন না একদিন নির্মেঘ হইবেই, কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান কি তাহা হইলেই হইয়া যাইবে?

শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, বেলা মল্লিক। অবাক হইয়া গেল। মাথায় ছাতা, পরনে ঘন নীল রঙের শাড়ি, বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হাই-হীল জুতা, গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সমস্ত অবয়বে এমন একটা আভিজাত্যমণ্ডিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্কর চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা মল্লিকই পুনরায় কথা বলিলেন, কোথায় চলেছেন?

মেসে।

আজকাল মেসে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, আপনি হস্টেলে থাকেন।

আপনি কিছুই শোনেন নি তা হ'লে?

না। শোনবার মত কিছু আছে নাকি?

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, শোনবার কিংবা শোনাবার মত কিছু অবশ্য নয়—

ভনিতা ছাড়ুন। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছুই নয়, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উদরান্নের জন্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

খরচ জুটল না।

তার মানে?

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া বলিল, তার মানে, ওই

টাকার অভাবে আপনাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হ'ল—এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। আপনি যে গরিবের ছেলে নন, তা আমি জানি।

বাবা বড়লোক তো আমার কি!

বেলা ভ্রূভঙ্গীসহকারে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, আপনার এখন সময় আছে কি?

প্রচুর, কেন?

তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, কেন বলুন তো?

এমনই একটু গল্প-সল্প করা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়ে গেছি।

চলুন।

১০

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। রবিবারে আপিসের তাড়া নাই। ভন্টু অদূরে একটি মোড়ার উপর বসিয়া নাকে, কানে, নাভি-বিবরে, পায়ের আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে তৈল-নিষেক করিয়া অতিশয় পরিপাটীরূপে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিতেছিল। এই একদিনে ভন্টু সাত দিনের মত তেল মাখিয়া লয়। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন তেল মাখিবার অবসর থাকে না। কোনক্রমে মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া এবং নাকে-মুখে যা হোক কিছু গুঁজিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আপিসে ছুটিতে হয়। এই রবিবার দিনই বেচারা প্রাণ ভরিয়া স্নানাহার করে। বউদিদিও রবিবারের দিন আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া থাকেন।

ভন্টু সশব্দে নাসারন্ধ্রে খানিকটা তেল টানিয়া লইয়া বলিল, বাকু কি ইটিং আপিস খুলেছেন?

তোমার আসবার আগেই বাবা খেয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি করছ কি, একেবারে আচার হয়ে গেলে যে!

ভন্টু কিছু না বলিয়া আবার খানিকটা তৈল নাসারন্ধ্রে সশব্দে টানিয়া লইল।

বউদিদি বলিলেন, ওই জন্তেই তো জামা-কাপড় তেল-চিটচিটে হয়ে যায়। সাবান দিলেও পরিষ্কার হতে চায় না।

অয়েলিশ অ্যাফেয়ারে বড় সুখ।

ভন্টু বাম তালুতে খানিকটা তৈল ঢালিয়া লইয়া গর্দানায় ঘষিতে লাগিল।

বউদিদি এক নজর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন ও বলিলেন, তোমার আর কি, তোমাকে তো সাবান কাচতে হয় না, যাকে কাচতে হয় সে-ই বোঝে।

ভন্টু গর্দানায় তেল মালিশ করিতে করিতে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে বলিল, বড় সুখ।

বউদিদি আর কিছু না বলিয়া বড়ি দিতে লাগিলেন।

দুই-এক মিনিট নীরবতার পর ভন্টু বলিল, আজ কি কি রান্না করেছ বউদি?

আলুর দম, পটল-ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মুড়ো দিয়ে মুগডাল—

বাবুকে ওই সমস্ত খেতে দিয়েছ নাকি?

তা দিয়েছি বইকি।

ধীরেন ডাক্তার বলছিল, ওঁকে এখন ওসব গুরুপাক জিনিস খেতে না দেওয়াই ভাল। চোখের কোল ফুলেছে, কিডনি খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঘরে ভালমন্দ রান্না হ'লে ওঁকে না দিয়ে কি পারবার জো আছে?

একটু থামিয়া বউদিদি বলিলেন, এমনিতেই তো পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড। সেদিন রাত্রে পরোটায় সামান্ত একটু ময়ান কম হয়েছিল, বললেন, এ পরোটা না পরেন্‌ঠা!

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আজকাল বাকু আর সে রকম করেন না, না বউদিদি?

কি রকম?

রাগ হ'লে 'খিদে নেই' ব'লে মশারি-টশারি ফেলে তার ভেতর ব'সে শ্রীমদ্ভাগবত পড়তে শুরু ক'রে দিতেন সেই যে!

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, না, অনেক দিন তো সে রকম করেন নি।

ভন্টু বাকুর ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, বাকু স্লিপিং আপিস খুলেছেন বোধ হয়। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হ্যাঁ, বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন।

ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল, পেটে ও পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে বলিল, আসল ব্যাপারের কতদূর কি সেট্‌ল্ করলে? বাকুর কাছে পেড়েছিলে কথাটা?

না, নিবারণবাবুর টাকা তুমি ফেরত দাও।

কেন, দার্জি মেয়েটি তো মন্দ নয়। চমৎকার সেলাই-ফোঁড়াই জানে।

রঙ কি রকম?

কালো, কিন্তু কুৎসিত নয়। অনেকটা কচি নিমপাতার মত, একটু লালচে আভা আছে।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, রঙের এসে যাচ্ছে না, আমার রঙই বা কি এমন ফরসা! কিন্তু যে বাড়িতে কেলেঙ্কারি ঘটেছে, সে বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না টাকার জন্যে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।

টাকা তো গভীর গাড্ডায়।

গাড্ডায় মানে?

করালীচরণকে দিয়ে এসেছি।

তোমাকে মানা করলুম, তবু তুমি দিয়ে এলে? ওকে দুদিন পরে দিলেই

তো চলত। এইবার তো তোমার দাদা এসে কাজে জয়েন করবেন, দুজনে মিলে কিছুদিন পরেই না হয় শোধ ক'রে দিতে টাকাটা।

কেতুরাজ করালীচরণকে তুমি চেনো না, তাই কলায়ের ডালের বড়ি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো বলতে পারলে। চিনলে সটান ঢোঁক গিলে বসতে, ও-কথা আর উচ্চারণ করতে না।

আহা!

দুই বগলে তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভনুটু বলিল, চাম লদ করালী দ্রাবিড়ে লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য!

তা হ'লে অন্য কোথা থেকে টাকা যোগাড় ক'রে নিবারণবাবুকে দিয়ে দাও। ও-বাড়ির মেয়ে ঘরে আনা চলবে না।

পাশের ঘর হইতে গদাম করিয়া একটা শব্দ হইল।

বউদিদি ভনুটুর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কেউ ঘুমোয় নি, সব মটকা মেরে প'ড়ে আছে তোমার ভয়ে।

ভনুটু তেল মাখিতে মাখিতে আগাইয়া গেল ও জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, একটা পাশ-বালিশ মাটিতে পড়িয়াছে। ছেলেরা সকলে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, সকলেরই চোখ মিটমিট করিতেছে।

এই ফনুতি, বালিশ ফেললে কে?

নুটি ঘাড় ফিরাইয়া নাকী সুরে বলিল, দাদা আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে খালি।

শনুটু, বেত না খেলে পিঠ সুড়সুড় করছে, নয়?

শনুটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিল না, চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পাশ-বালিশটা তুলে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ সব। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনেছি তো পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি সকলের।

ফনুতি পাশ-বালিশটা তুলিয়া লইল এবং সকলে আর একবার নড়িয়া-চড়িয়া শুইল।

বউদিদি আবার তাগাদা দিলেন, তুমি এবার চান কর, আর কত বেলা করবে, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

তুমি ভাত বাড় না, আমার চান করতে কতক্ষণ যাবে?

তোমাকে যেন চিনি না আমি! দাঁত মাজতেই তো এক যুগ যাবে এখন।

ভন্টু মুখ বিকৃত করিয়া বউদিদির মুখের পানে চাহিল।

আহারাদির পর ভন্টু ছোট একটি হাত-আয়না এবং ছোট একটি কাঁচি লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া গুম্ফসংস্কার করিতেছিল। বউদিদিও আহার সমাপন করিয়া ছেলেদের পাশেই একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তন্দ্রার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—স্বামী আসিয়াছেন, শরীর বেশ সারিয়া গিয়াছে, আর জ্বর হয় না, মুখের সে রুগ্ন ভাব আর নাই, গাল চিবুক বেশ ভারী হইয়াছে।

একটা মোটরের হর্নের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বাড়ির সামনে একটা মোটর আসিয়া থামিয়াছে। ভন্টু আয়না ও কাঁচি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল, কাহার মোটর তাহার বাসার সামনে আসিয়া থামিল! দরজা খুলিয়া ভন্টু বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার আপিসের বড়বাবু! কেরানীমহলের যিনি সর্বেসর্বা, স্বয়ং তিনি আসিয়াছেন। ভন্টুর আপিসের বড়বাবু বড়লোক। মোটা মাহিনা পান, তা ছাড়া ধনীর সন্তান। নিজের মোটর আছে। ভন্টু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

বড়বাবু মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, ভালই হ'ল, তুমিও এখন বাড়িতে আছ। তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।

হঠাৎ বাবুর সহিত বড়বাবু কেন আলাপ করিতে আসিলেন, তাহা বিস্মিত ভন্টু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও মুখে সোচ্ছ্বাসে আহ্বান করিল।

আসুন আসুন, ভেতরেই আসুন।

তাহার পর একটু সঙ্কোচভরে বলিল, বাবা কানে একটু কম শোনেন, একটু জোরে জোরে কথা বলতে হবে।

আচ্ছা।

ভন্টু বড়বাবুকে লইয়া বাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন ভন্টু আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে স্বপ্নাতীত আবুহোসেনী কাণ্ড! বড়বাবু নিজের মেয়ের সহিত ভন্টুর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বউদিদি উল্লসিত হইয়া

এখন স পাঁচ আনা পয়সা দাও দিকি।

কেন?

আমি মনে মনে হরির লুট মানসিক করেছিলাম, যাতে ওই নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়।

পাগল! উইন্টার ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল গভর্নরকে অগ্রাহ্য কর সোজা নাকি?

উইন্টার ক্যাপিটাল কি?

বউদিদি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ওখানে তোমার বিয়ে হতেই পারে না।

না না, ছি! অমন অসময়ে এক কথায় করকরে সাড়ে পাঁচশোটি টাকা গুনে দিলে, তা ছাড়া বৃশ্চিক রাশি, মকর লগ্ন, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, নিবারণকে এমনভাবে ল্যাডারিং করা কি ঠিক হবে?

ল্যাডারিং কথাটা ভন্টু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিল।

বউদিদি মানে বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, তার মানে?

মানে, নিশ্চিন্ত নিবারণ গাছে উঠে মজাসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এখন মইটা সরিয়ে নিলে লোকে বলবে কি?

লোকে যাই বলুক, ওখানে বিয়ে হবে না আজই তাঁকে ব'লে

এস—[illegible] কারও মত হচ্ছে না। কারও মত হবেও না। ও-কথা তুললে বাকু, তোমার দাদা, কেউ রাজী হবেন না। সকলের অমতে তুমি বিয়ে করবে নাকি ?

কিন্তু ফাইভ অ্যাণ্ড হাফ সেঞ্চুরির মহড়া সামলাব কি ক'রে ? সেটা ভাবছ না কেন ?

সে আবার কি ?

বেশ থাসা আছ তুমি ! সাড়ে পাঁচ শো টাকাটা তো স পাচ আনার সিন্নি দিলেই উবে যাবে না ? আর আমাদের গুষ্টিশুদ্ধুকে ছাতু ক'রে ফেললেও পাঁচ টাকা বেরুবে কি না সন্দেহ। তোমার গয়নাগুলি তো বহু পূর্বেই বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে উপায় কি সেইটে বল, সিন্নি নিয়ে লম্ফালেই তো চলবে না !

পণ হিসেবে বড়বাবু নিশ্চয় কিছু দেবেন, তার থেকেই দিয়ে দিও নিবারণবাবুকে।

বড়বাবু কত দেবে তার ঠিক কি ? যে রকম গোঁফ আর জুলপি লোকটার, কিছুই বিশ্বাস নেই।

বাঃ, নিশ্চয়ই দিতে হবে। বাকুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না।

বাকু তোমাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। বাকুকে শেখাবে তুমি !

বাকুও এই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য আঁকুপাকু করিতেছিলেন। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কই গো বড়বউমা, এস না একবার এদিকে। ভন্টুর আপিসের বড়বাবুর পেস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। চা-ও [illegible]াও। চা খেতে খেতে বেশ জাঁকিয়ে বিবেচনা করা যাক, এস।

বউদিদি ভন্টুর দিকে চাহিয়া বাকুর পিছু পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন এবং তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাকুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল—বলে, লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

বউদিদি চা চড়াইতে গেলেন।

ভন্টু পিছন হইতে তাঁহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল।

অন্ধকার রাত্রি।

করালীচরণ বক্‌সির ঘরে মোমবাতির ম্লান আলোকে অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। বোতলের মুখে গোঁজা যে মোমবাতিটি জ্বলিতেছে, তাহারও আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, আর বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বেশিক্ষণ টিকিবার আর প্রয়োজনও নাই। বক্‌সি মহাশয়ের গোছানো শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। মোমবাতির স্বল্পালোকে বক্‌সি মহাশয় নিবিষ্টচিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। সমস্ত মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ, চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দ্রাবিড়ে যাইবার মুখে এ কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল! পত্রের সহিত দলিল-গোছের কি একটা কাগজ ছিল। পত্রটি এবং দলিলখানি আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িয়া করালীচরণ সেগুলিকে লম্বা খামের ভিতর পুরিয়া ফেলিলেন। দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়া তারপর যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ভন্টুবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরিলে যে বাঁচা যায়! ভন্টুকে তিনি কিছু মাল এবং টিকিট কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা-দুই হইয়া গেল এখনও ফিরিতেছে না কেন? অধীর করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, দ্বারপ্রান্তে ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে

কে?

আমি।

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল, মোড়ের সেই পানওয়ালীটা। একমুখ হাসিয়া মিসি-লাগানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া পানওয়ালী বলিল, জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে আজ সকাল থেকে দেখছি, কোথাও যাওয়া হবে নাকি ঠাকুরের ?

করালীচরণ কিছু না বলিয়া তাহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন, এই অযাত্রাটা ঠিক যাইবার সময় আসিয়া হাজির হইয়াছে !

আমি যেখানেই যাই না, তোর তাতে কি ? দূর হ তুই এখান থেকে।

পানওয়ালী কিন্তু নড়িল না, স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।—আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বল তো ঠাকুর ? আমি তো তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কোন দিন করি নি।

করালীচরণের চোখটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তুই নড়বি কি না বল্ এখান থেকে ?

পানওয়ালী তথাপি নড়িল না।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন, তা না বললে আমি যাব না।

হারামজাদী ছোটলোক বেশ্যা, তোর মুখদর্শন করলে যে পাপ হয়, তা তুই জানিস না ? আবার কৈফিয়ৎ তলব করছেন !

পানওয়ালীর মুখের হাসিটা সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য আর একটু হাসিয়া বলিল, ওমা, এইজন্যেই এত রাগ ! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা আর কিছু ! মুখ দেখলে পাপ হয়, আর আমার কাছ থেকে সিগারেট পান নিলে বুঝি কিছু হয় না ? ধন্যি শাস্তর তোমাদের !

দূর হ বলছি।

করালীচরণ তাড়া করিয়া গেলেন। পানওয়ালী অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল।—উঃ, বড্ড দেরি করলেন আপনি ভন্টুবাবু, সব জিনিসপত্তর পেয়েছেন তো ?

হ্যাঁ।

ভন্টু দুই বোতল মদ, ছোট একটি কাচের গ্লাস, পাঁচ টিন সিগারেট, এক ডজন দেশলাই, দুই প্যাকেট মোমবাতি এবং টুকিটাকি আরও নানা রকম জিনিস টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

টিকিট করেন নি ?

নিশ্চয়। এই যে, নিন না।

ভন্টু ভিতরের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে টিকিট ও বাকি টাকা বাহির করিয়া দিল।

করালীচরণ আলমারির মাথায় দাঁড়কাকের খাঁচাটা দেখাইয়া বলিলেন, আর ওটার ?

ওটার সম্বন্ধে নানা বখেড়া। খাঁচার মাপ-জোক চাই, তা ছাড়া অনেক খরচ।

গভীর বিস্ময়ের সহিত করালীচরণ বলিলেন, খরচ ব'লে কি এতদিনের সঙ্গীটাকে এখানে ফেলে রেখে যাব নাকি ? কে খেতে দেবে ওকে ?

ভন্টু বলিল, সে ভার না হয় আমি নিচ্ছি ; আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, কোথায় ওই ঝামেলা নিয়ে ঘুরবেন ? তার চেয়ে ওকে এখানে রেখে যান, আমিই দেখাশোনা করব বরং।

আপনি ঠিক দেখাশোনা করতে পারবেন তো ?

ঠিক পারব।

দেখুন—

বলছি, ঠিক পারব।

তা হ'লে গোটা-বিশেক টাকা রেখে দিন আপনি। ওকে মাছ মাংস ছাতু দেবেন রোজ। আমও বেশ খায়। দেখবেন, যেন কষ্ট না পায়। আপনি ভার নিচ্ছেন ব'লেই ভরসা ক'রে রেখে যাচ্ছি।

টাকার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করব এখন।

না না, টাকাটা রাখুন, টাকাই হচ্ছে পেয়াদা, ওই তাগাদা দেবে আপনাকে। হাই নারায়ণ ! বিনা টাকায় কিছু হবার জো আছে আজকাল !

ভন্টুকে টাকা লইতে হইল।

এবার চলুন, স্টেশনে যাওয়া যাক তা হ'লে। ট্রেনের আর দেরি কত?

ঘণ্টাখানেক আছে আর।

মাত্র ঘণ্টাখানেক? চলুন, চলুন, আর দেরি নয়, ট্যাক্সি ডাকুন আপনি।

ভন্টু ট্যাক্সি ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ পুনরায় লম্বা খামটা হইতে চিঠি ও দলিলটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এবং পুনরায় সেগুলি খামে পুরিয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ভন্টু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে পানওয়ালী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভন্টু পানওয়ালীকে চিনিত। বাইক হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, ভালই হ'ল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেন বলুন তো?

বক্‌সিমশায়ের ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। উনি আমার ওপরই সব ভার দিয়ে গেলেন। তুমি পারবে দেখাশোনা করতে?

কি করতে হবে বলুন?

এই ঝাঁট-পাট দেওয়া আর কি, বক্‌সিমশায়ের একটা কাগ আছে, সেটাকেও খেতে-টেতে দিতে হবে। পারবে তুমি?

পারব।

তা হ'লে এই টাকা একটা রাখ, মাছ মাংস ছাতু আম যা দরকার কিনে দিও।

টাকার দরকার নেই।

বক্‌সিমশায় দিয়ে গেছেন যে।

আপনাকে দিয়ে গেছেন, আমাকে তো আর দেন নি। আপনি কেবল একটি উবগার করবেন।

বিস্মিত ভন্টু বলিল, কি ?

ওঁকে জানাবেন না যে, ওঁর ঘরের ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া ভন্টু বলিল, কেন ?

মিসি-মণ্ডিত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া পানওয়ালী উত্তর দিল, আমি ওঁর ছুচক্কের বিষ ছিলুম।

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

পানওয়ালী পুনরায় হাসিয়া বলিল, দিন, চাবি দিন। ওঁকে জানাবেন না কিন্তু।

জানাব কি ক'রে, ওঁর ঠিকানাই জানি না।

আচ্ছা, উনি কোথায় গেলেন বলুন তো ?

দ্রাবিড়ে।

সে আবার কোথা ? সেখানে কেন ?

পড়তে।

প'ড়ে প'ড়েই সারা হ'ল। দিবারাত্রি আর কোন কাজ নেই।

পানওয়ালী মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, মানুষে এত পড়ে কেন বলুন তো ? যত পড়ে, ততই তো মাথা গোলমাল হয়ে যায় দেখছি।

ভন্টু সহসা অনুভব করিল, 'নাই' পাইয়া মাগী বোধ হয় লদ্‌কালদ্‌কিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। গম্ভীরভাবে বলিল, লেখাপড়ার মর্ম সবাই বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি ?

ইনি খুব বিদ্বান, না ?

লদ্‌কালদ্‌কি ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভন্টু এ কথার জবাব দিল না। বলিল, চাবিটা রাখ তা হ'লে। কাগটাকে খেতে-টেতে দিও। কাল আবার আসব আমি।

সে বাইকে সওয়ার হইল।

চাবিটা হাতে করিয়া অন্ধকার গলিতে পানওয়ালী করালীচরণের রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রে ঘরটা খুলিতে তাহার সাহস হইল না।

১২

মৃন্ময় গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজেকে নিতান্ত একা মনে হইতেছিল। এই সেদিন পর্যন্ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না, এখন অখণ্ড অবসর। নিমেষের মধ্যে সমস্ত যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। চিন্ময়টা গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিতেছিল! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সহসা মৃন্ময়ের স্বর্ণলতাকে মনে পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই তো সে পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল। অন্বেষণ তো করা হয় নাই, চাকরিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, খুনে, জালিয়াৎ—ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, স্বর্ণলতাকে অন্বেষণ করিবার সে অবসর পাইল কই? প্রথম প্রথম প্রত্যহই তাহার মনে হইত, হাতের কাজটা শেষ করিয়া স্বর্ণলতার খোঁজ করিবে, কিন্তু হাতের কাজ কোন দিনই শেষ হয় নাই। শেষে স্বর্ণলতার কথা তাহার মনেও পড়িত না। মানুষ কত সহজে ভোলে! দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক দাবি এত প্রবল, এত অনিবার্য এবং এত সর্বগ্রাসী যে, অতীতকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাহারা নিকটে রহিয়াছে, যাহাদের সর্বদা দেখিতেছি, তাহাদেরই সকলকে সর্বতোভাবে মনে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সচেতন মনের পরিসর বড় ক্ষুদ্র, সমভাবে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। স্বর্ণলতার মুখখানা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, সেই নিটোল গৌর মুখখানি, প্রদীপ্ত কালো চোখ দুইটি, অধরে অর্ধবিকশিত মৃদু হাসি। নিমীলিত নয়নে মৃন্ময় স্বর্ণলতার মানসমূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার

মনে হইল, স্বর্ণলতা যেন মৃদুগুঞ্জনে বলিতেছে, আমাকে খোঁজ নাই বলিয়াই তোমার এই শাস্তি। আমাকে খুঁজিবার জন্যই বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছিলে, কিন্তু হাসি এবং চাকরি—ইহারাই তোমাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, আমার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এত প্রবঞ্চনা সহিবে কেন? সহসা একটা গানের সুর ও হাসির হল্লা গঙ্গাবক্ষ হইতে ভাসিয়া আসিল। মৃন্ময় চাহিয়া দেখিল, একদল লোক নৌকা-বিহার করিতেছে, সঙ্গে একজন গায়িকা। হার্‌মোনিয়ম ও ডুগি-তবলা সহযোগে গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

একটু তফাতে একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, ছোকরা একেবারে ব'খে গেল! দেখুন দিকি কাণ্ডখানা, ছি ছি ছি!

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, আপনি চেনেন নাকি?

চিনি না! আমাদেরই পাড়ার রাসু দত্তের মেজ ছেলে বিশু দত্ত। সোনাগাছিতে আজকাল কাপ্তেনি ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি কাণ্ডখানা ছোকরার!

বিশু দত্ত নামটা মৃন্ময়ের চেনা চেনা ঠেকিল। চাকুরিচ্যুত না হইলে এখনই আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মৃন্ময় বিশু দত্তের অনুসরণ করিত। একটা চুরির তদন্ত করিতে করিতে বিশু দত্তের নামটা মৃন্ময়ের কর্ণগোচর হয়। বিশু দত্ত নাকি নিজের সুন্দরী রক্ষিতাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করিয়া বড় বড় লোককে আকৃষ্ট করে এবং তাহাদিগকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের আংটি, ঘড়ি, টাকা প্রভৃতি অপহরণ করে। ঠিক নিজ হস্তে করে না, তাহার রক্ষিতাই নাকি তাহার নির্দেশ অনুসারে অপহরণ করে। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্বে এক শূন্য নাচের আসর হইতে পুলিস কর্তৃক সংগৃহীত একটি নর্তকীর পদাঙ্ক লইয়া সে বহু মাথা ঘামাইয়াছিল। উক্ত নর্তকীই নাকি বিশু দত্তের চতুরা প্রণয়িনী, মদ-বিহ্বল এক মাড়োয়ারী-সন্তানের বহুমূল্য একটি হীরক অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিল। মাড়োয়ারীর বন্ধুবর্গ পুলিসে খবর দেন, পুলিস আসিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই, নর্তকীর

পদার্থটি কেবল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, তাহার বন্ধু মিস্টার মজুমদার এখনও হয়তো ব্যাপারটা লইয়া তদন্ত করিতেছেন। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে নৌকাবিহারী বিশু দত্তের সন্ধান পাইয়া মৃন্ময় উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন কিন্তু সমস্তই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। সে অসাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। মৃন্ময় একমনে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

১৩

বেলা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, না শঙ্করবাবু?

কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

কি ক'রে, তা বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক কি না বলুন? এই নিন, বড় কাপটাই আপনি নিন, এই নিয়ে তিন কাপ হ'ল কিন্তু।

তা হোক। খেতে তো আজ দেরি হবে, কত রাত্তির হবে বলুন দেখি?

এগারোটার কম নয়। একা হাতে সব করতে হবে তো!

আপনার কজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন?

বেশি নয়, একজন।

তারপর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আপনিও চেনেন তাকে।

কে?

চুনচুন।

শঙ্কর বিস্মিত হইল।

আমি যে চুনচুনকে জানি, তা আপনাকে কে বললে?

বেলা স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি সব জানি।

সব জানেন, মানে? আর কি জানেন?

আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুকালে শুশ্রূষা করেছিলেন এবং আপনার দশ টাকা যা পাওনা হয়েছিল তা আপনি নেন নি।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইল।

এত খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?

চুনচুনের কাছ থেকেই।

দুই-এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার ন্যায্য পাওনা দশ টাকা আপনি নিলেন না কেন?

এমনিই।

এমনিই? নিছক এমনিই?

বেলা দেবী ফিক করিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, কেন নেন নি, তাও আমি জানি।

কি বলুন তো?

বলব না। ইকমিকের আঁচটা ঠিক আছে কি না দেখে আসি। একটু বসুন আপনি।

বেলা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বেলার আগ্রহাতিশয্যে শঙ্কর মেসের বাসা উঠাইয়া দিয়া বেলার বাসাতেই আসিয়া বাস করিতেছে। দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া শঙ্কর প্রথমে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু বেলা কিছুতেই শোনেন নাই। তাঁহার যুক্তি—লোকে কি বলিবে, না বলিবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিলে মাথাই ঘামিয়া সারা হইয়া যাইবে, আর কিছুই হইবে না। শঙ্কর একদা বিপন্ন বেলাকে আশ্রয় দিয়াছিল, এখন ঘটনাচক্রে শঙ্কর বিপন্ন হইয়াছে, বেলার কি উচিত নয় এখন তাহাকে দুই-চারি দিনের জন্যও আশ্রয় দেওয়া এবং বেলার যখন সে সুবিধা রহিয়াছে? বেলার আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িল, সমাজের নিষ্কর্মাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। পরের আচরণের সমালোচনা ক'রেই বেচারারা সময় কাটায়। ওই তাদের মানসিক রোমন্থনের একমাত্র জাবর, তার থেকে

তাদের বঞ্চিত করাটা কি উচিত? আমার তো মনে হয়, ওদের মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু আচরণ করা কর্তব্য।

একরূপ জোর করিয়াই বেলা শঙ্করকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইতেছে না। বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু এ কথাও সে মনে মনে বারম্বার স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না যে, ভাগ্যে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, না হইলে সে কি মুশকিলেই পড়িত! টুইশনি ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রফেসর গুপ্ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রফেসর গুপ্তের কথাগুলি তাহার কানে বাজিতেছে—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বনে যাও। কলকাতা শহরে বাবুয়ানি ক'রে থাকবে, অথচ আত্মসম্মানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সইতে পারবে না, তা হয় না। তা ছাড়া, অমন সজারুর মত বিবেক নিয়ে কোথাও কিছু করতে পারবে না তুমি, আজীবন কেবল কষ্ট ভোগ করবে। স্থানকালের উপযোগী নতুন বিবেক তৈরি ক'রে নাও।

সুতরাং টুইশনির জন্য প্রফেসর গুপ্তের নিকট পুনরায় আর যাওয়া চলে না। কিন্তু বেলার কাছেই বা আর কতদিন থাকা চলিবে? কিন্তু বেলা অবশ্য বার বার বলিতেছেন যে, যতদিন না একটা কাজ হয় ততদিন আপনি আমার বাসায় থাকুন। কিন্তু তাহা শঙ্কর পারিবে না। অবিলম্বে যেমন করিয়া হউক তাহাকে বেলার বাসা ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু যে বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে তাহা নয়, অন্তর-গুহা-নিবাসী পশুটা বারম্বার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শঙ্কর যদিও ইহা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, প্রলুব্ধ পশুর কবলে পড়িয়া বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা আর যাহারই থাক্, বেলার নাই। বিধিদত্ত এক অদ্ভুত বর্মে তিনি আবৃত। আক্রমণ করিলে পশুটাই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, বেলার কিছু হইবে না। সমস্ত জানিয়াও কিন্তু পশুটা প্রলুব্ধ হয়, বরং বেশি করিয়া হয়। সুতরাং এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হইয়া পড়িতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু অপসৃত হইবার

কোন পথই শঙ্কর দেখিতে পাইতেছে না। কোথায় যাইবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাই বা কয়দিন সম্ভব? তাহার বর্তমান তমসাচ্ছন্ন জীবনে বেলা মল্লিকই এখন একমাত্র আলো, যাহার সাহায্যে সে অন্তত খানিকটা পথ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, বেলা মল্লিক শুধু আলো নয়, শিখাও। একটু অসাবধান হইলেই তাহা দহন করে, এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মন অসাবধান হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। মাত্র কয়েকদিন বেলা মল্লিকের সহিত আলাপ করিয়া শঙ্কর ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। বেলা আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্রয় দিবেন না। হাসিতে হাসিতে যে কথাগুলি বেলা আজ সকালে বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্করের মনে পড়িল। শঙ্কর বেলাকে বলিয়াছিল, আর কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না মিস মল্লিক, একটা বিয়ে করুন।

আমি তো এক্ষুনি রাজী, কিন্তু পাত্র কই?

কি রকম পাত্র চাই আপনার?

গোটা এবং সুস্বাদু।

তার মানে?

তার মানে—সুস্বাদু পেয়ারা হ'লেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা গোটা হওয়া চাই। তার আধখানা আর একজন কামড়ে খেয়ে গেছে, সে রকম জিনিস আমার চাই না। কারও উচ্ছিষ্ট জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে। তাই ব'লে গোটা নিম, গোটা মাকাল বা গোটা কুমড়োর প্রতিও লোভ নেই আমার।

সে রকম পাত্রের অভাব কি?

বেলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠভঙ্গীসহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, সব এঁটো।

কটা লোক দেখেছেন আপনি?

যে কটা দেখেছি, তাই যথেষ্ট। হাঁড়ির ভাত একটা ছুটো টিপলেই

বোঝা যায়, বাকিগুলোর অবস্থা কি রকম। দেশসুদ্ধ ব্যাটাছেলে হয় হাঁদা, না হয় এঁটো।

হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গটা উঠিয়াছিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাসির অন্তরালবর্তী সত্যটা শঙ্কর উপলব্ধি না করিয়া পারে নাই।

ইক্‌মিকের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেলা দেবী ফিরিয়া আসিলেন।

বড্ড দেরি হয়ে গেল, নয়? বেগুনগুলো পোড়ালাম, বিরিঞ্চি করব।

এত রকম রান্না আপনি শিখলেন কোথা থেকে?

'পাকপ্রণালী' থেকে।

চুন্‌চুনকে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন সব নিরামিষ রান্না করেছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, চুন্‌চুনের জন্যে ভারি দুঃখ হয় আমার।

বেলা দেবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সাবধান, দুঃখ হওয়াটাই কিন্তু প্রথম ধাপ।

তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয়, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনই ফল।

কেন?

ও-রকম বোকার মত লুকিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল ব'লে।

বাঃ, ভালবেসেছিল, বিয়ে করবে না?

ভালবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে? বেশ তো যুক্তি আপনার! সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে না করাই বরং ভাল, ভালবাসাটা ঘষা পয়সার মত হয়ে যায় না।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনি থামুন তো, এসব ব্যাপারে আপনার নিজের যখন কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তখন এ বিষয়ে আপনার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নই আমি। ওসব কেতাবী কথা আমিও জানি।

অভিজ্ঞতা নেই, আপনি জানলেন কি ক'রে?

আমি জানি।

কিছু জানেন না। কিংবা জেনেও না-জানার ভান করছেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর বলিল, অর্থাৎ, আপনি বলতে চান, আপনি কাউকে ভালবেসেছেন, অথচ তাঁকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠেন নি?

আকুল হয়ে উঠলেও দমন করেছি সে আকুলতা। আমার আকুলতা আমার আত্মসম্মানজ্ঞান আচ্ছন্ন করতে পারে নি কখনও, পারবেও না

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, যে ভালবাসা আত্মসম্মানজ্ঞানকে বিপর্যস্ত ক'রে দিতে না পারে, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়।

আপনি পুরুষের দিক দিয়ে ভাবছেন, আমি বলছি ভদ্র মেয়ের মনোভাব।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হইত, কিন্তু দ্বারের বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ হওয়াতে আর হইল না।

বেলা দেবী উঠিয়া পড়িলেন।

সায়েবের ওখান থেকে মোটর এল। আপনি বসুন, আমি চট ক'রে ঘুরে আসছি এক্ষুনি।

আজ না গেলে কি হয়?

আর কিছু না, কিছুই বলবেন না; কিন্তু বড় কষ্ট পাবেন। এত অসহায় যদি দেখেন তাঁকে—। আমি যাব আর আসব।

সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তা হ'লে বলুন।

হ্যাঁ, ঠিক মা আর ছেলের মত।

হাসিয়া বেলা পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি ততক্ষণ 'ওল্‌ড্ কিউরিয়সিটি শপ'-খানা পড়ুন। আমি বেশি দেরি করব না। আর ইতিমধ্যে যদি ঢুনঢুন এসে পড়ে, তা হ'লে তো ভালই হবে।

মুচকি হাসিয়া বেলা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসপটে চুন্‌চুনের মুখখানা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চুন্‌চুনের কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল।

১৪

সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোটগুলি সযত্নে ভিতরের পকেটে রাখিয়া ভন্টু নিবারণবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি করিয়া নিবারণবাবুকে কথাটা বলিবে, তাহা সহসা তাহার মাথায় আসিল না। বেচারা তাহার সহিত দার্জির বিবাহ দিবেন বলিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছেন! সহসা এমন করিয়া তাঁহার আশাভঙ্গ করিতে হইবে! নিবারণবাবুর আশাভঙ্গ করিতে ভন্টুর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! তা ছাড়া, লোকটা দাগী লোক, একবার একটা গুরুতর ঘা খাইয়াছেন। অকারণে আবার একটা আঘাত করা সত্যই অন্যায় হইবে। কিন্তু আঘাত না করিয়া ভন্টুর উপায়ও নাই। যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের খামখেয়ালী বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের প্রেতাত্মাই সম্ভবত জুলফি-দার বড়বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তিনি ভন্টুকে জামাই না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ইহার জন্য যত অর্থ লাগে, তাহা তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া তিনি ভন্টুর গতিবিধি, চরিত্রবল, কর্মতৎপরতা, কর্তব্যবোধ—সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কোনরূপ বাধাকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চান না। বাধার যতগুলি ঐরাবত ভন্টু খাড়া করিয়াছিল, জুলফি-দারের উৎসাহস্রোতে সমস্তগুলিই ভাসিয়া

গিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কে ভন্টুর সঙ্গত অসঙ্গত যতগুলি দাবি ছিল, সমস্তই তিনি মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত। অসঙ্গত দাবিগুলি শুনিয়া জুলফি-দার বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এগুলির দ্বারা ভন্টুর চরিত্রের মহত্তর দিকটাই নাকি তাঁহার নিকট আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভন্টু বড়বাবুকে বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে যত টাকার অলঙ্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে টাকার দ্বারা যেন ঠিক এক ধরনের দুই সেট গহনা গড়ানো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়ে এক-গা গহনা পরিয়া আসিবে এবং তাহার বউদিদি—গুড ওল্ড্ বিড্ডিকার—নিরাভরণা হইয়া থাকিবেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সংসারের জন্যই বউদিদির গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, বউদিদির গহনা আগে না হইলে সে কোন ক্রমেই পূর্ণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিতে পারিবে না। বড়বাবু এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। ভন্টুর দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবাহরূপ দায়িত্ব লইবার পূর্বে সে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করিতে চায়, কিন্তু এখন তাহার যাহা বেতন, তাহার দ্বারা সে প্রিমিয়ম চালাইতে পারিবে না। বড়বাবু প্রিমিয়ম চালাইতে রাজী হইয়াছেন। বড়বাবুর ভাষায়—মানি ইজ নো কোশ্চেন—তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র চান। তিনি ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন; মেয়েটি সুশ্রী, তাঁহার টাকাও আছে। কিন্তু তিনি বড়লোকের ঘরের বয়াটে অকর্মণ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে চান না। তিনি চান গরিবের ঘরের সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, কর্মঠ একটি যুবক এবং ভন্টুর মধ্যে তাহা তিনি পাইয়াছেন। টাকার জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আপিসের বড়বাবু শ্বশুর হইলে অনিবার্যভাবে চাকরিরও উন্নতি হইবে। তাহার প্রমোশনের জন্য বড়বাবু ইতিমধ্যে রেকমেণ্ড করিয়াছেন। মেয়েটিও দেখিতে ভাল, কুষ্ঠিতেও নাকি রাজ-যোটক হইয়াছে। এতগুলি প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিবারণবাবুর কালো মেয়েকে বিবাহ করিবে এতবড় আদর্শবাদী ভন্টু নয়। নিজের সুবিধার জন্যই সে দার্জিকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, এখন অধিকতর সুবিধার খাতিরে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে

মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বড়বাবুকে নিবারণবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় বড়বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে নগদ সাড়ে পাঁচ শত টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন টাকাটা অবিলম্বে নিবারণবাবুকে ফেরত দিয়া আসিতে। কথাটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। একটা অজুহাত তো খাড়া করিতে হইবে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভন্টু শেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, আজই সে নিবারণবাবুকে টাকাটা দিবে না। আজ দার্জির কুষ্ঠিটা চাহিয়া আনিবে এবং পরদিন গিয়া বলিবে যে, কুষ্ঠির মিল হইল না। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। তাহার পর টাকাটা ফেরত দিলে দেখিতে শুনিতে সব দিক দিয়াই ভদ্র হইবে। সব ক্ষেত্রে সরল সত্য কথা বলিলে কি চলে?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ভন্টু যখন নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন নিবারণবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দার্জিই সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল এবং বাহিরের ঘরটা খুলিয়া ভন্টুকে বসিতে বলিল। ভন্টু দার্জিকে সামনাসামনি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। দার্জি অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াইল না, বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ভন্টু বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ির ছাদে একজন প্রৌঢ়া বিধবা বড়ি দিতেছিলেন এবং আপন মনেই কাহার উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছিলেন, ভন্টু অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই শুনিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া ভন্টু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দার্জি সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কি?

যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি বল?

দার্জি কিছুক্ষণ আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমার ইচ্ছে নয় যে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে ভন্টু কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল,

কয়েক মুহূর্ত তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিস্মিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, ইচ্ছে নেই কেন?

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া দার্জি মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনি আমাকে বিয়ে করছেন খালি টাকার জন্যে।

ভন্টু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দার্জিই পুনরায় বলিল, তা ছাড়া আমি ভিন্ন বাবাকে দেখবার এখন কেউ নেই। আপনি দয়া ক'রে ভেঙে দিন বিয়েটা। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

আর কিছু না বলিয়া দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ রকম ঘটনা যে বঙ্গদেশে ঘটিতে পারে, তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত ছিল। একটু পরেই নিবারণবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিতেই ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসঙ্কোচে তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল, মাপ করবেন নিবারণবাবু, বাবা বউদি—কেউ মত দিচ্ছেন না।

নিবারণবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

সে কি? মানে—

কিছুতেই মত হচ্ছে না, কি করি বলুন?

আমি একবার গিয়ে যদি—

না, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

নোটের তাড়া হাতে করিয়া নিবারণবাবু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৫

মুকুজ্জেমশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া তিনি মৃন্ময়

এবং শঙ্করের জন্য চাকরির চেষ্টা করিতেছিলেন। একরূপ জোর করিয়াই তিনি হাসিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শঙ্করের কিন্তু কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছিলেন না। শিরীষবাবু তাহাকে যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, তাহা একটি মেসের ঠিকানা। মুকুজ্জেমশাই সেখানে গিয়া শঙ্করের দেখা পান নাই; কয়েক দিন পূর্বেই নাকি শঙ্কর সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হয়তো শঙ্কর শিরীষবাবুকে তাহার নূতন ঠিকানা জানাইয়াছে—এই আশায় মুকুজ্জেমশাই শিরীষবাবুকে পুনরায় পত্র দিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত জবাব আসে নাই। মৃন্ময়কে লইয়া পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তির ও আপিসের দ্বারে মুকুজ্জেমশাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে মুকুজ্জেমশাই যেমন একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এই চাকুরি অনুসন্ধানেও তিনি ঠিক তাহাই করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইংরেজী বাংলা কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকা কেনা হয়। মৃন্ময় অথবা শঙ্করের উপযুক্ত যেখানে যত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেন সর্বত্রই একটি করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া দেন। কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় থাকিলে নিজে গিয়া অথবা মৃন্ময়কে পাঠাইয়া তদ্বির করেন। এ পর্যন্ত তিনি কুড়ি জায়গায় দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু দমেন নাই। মৃন্ময় দমিয়া গেলে হাসিয়া বলিয়াছেন, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা ভুলে গেলে—'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ'? দমে গেলে চলবে কেন? চেষ্টা থাকলে ঠিক একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই, দেখ না তুমি।—বলেন আর হাসেন। মৃন্ময় লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সেদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে মৃন্ময় বাসায় একা ছিল। মুকুজ্জেমশাই একবিংশ দরখাস্তটির তদ্বির করিতে স্বয়ং বাহির হইয়াছিলেন। মৃন্ময় একা শুইয়া শুইয়া নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। বাল্যকালে, পিতা-মাতা মারা গিয়াছেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের যৎসামান্য সাহায্যে এবং প্রাইভেট

টুইশনি করিয়া বহুকষ্টে সে এম. এ. পাস করিয়াছে। নিজে পছন্দ করিয়া স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের জন্যই দূর-সম্পর্কের সেই আত্মীয়টির সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আত্মীয়টির ইচ্ছা ছিল, বিবাহ-বাজারে মৃন্ময়কে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করিবেন। কিন্তু আদর্শবাদী মৃন্ময় তাহা ঘটিতে দেয় নাই। সে নিজে পছন্দ করিয়া দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিল এবং অনেক আশা করিয়া এই কলিকাতা শহরেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছিল। অতিশয় আকস্মিক-ভাবে তাহার সে সংসার ছারখার হইয়া গেল। মনের আবেগে তখন মূর্খের মতন সে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই করিয়া বসিল! স্বর্ণলতাকে খুঁজিবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকরি লইল। একবার ভাবিল না যে, পুনরায় বিবাহ করা মানেই—স্বর্ণলতাকে অপমান করা, তাহার স্মৃতির সম্মুখে একটা যবনিকা টাঙাইয়া দেওয়া। স্বর্ণলতার সগুবিরহে সে ভাবিয়াছিল যে, হাসিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনুরাগিণী পত্নীর সুনিবিড় সান্নিধ্যকে ঔদাসীন্যভরে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কি এতই সহজ! তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্যভাবে হাসি মৃন্ময়ের মনে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্ণলতার কথা এখন জোর করিয়া মনে করিতে হয়। তাহার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য প্রথম প্রথম সে প্রতিদিন তাহাকে পত্র লিখিত। কিন্তু তাহাও ক্রমশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্বর্ণলতার পত্রগুলি সে যে চন্দনকাঠের বাক্সটাতে রাখিত, সে বাক্সটা তো হাসির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ের গরম জামা কাপড় যে ট্রাঙ্কটাতে থাকিত, সেই ট্রাঙ্কটাতেই চন্দনকাঠের বাক্সটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে ট্রাঙ্কটা তো হাসি লইয়া গিয়াছে। এতদিন সে ট্রাঙ্কের চাবি মৃন্ময়ের কাছে থাকিত, যাইবার সময় হাসি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দনের বাক্সটার কথা মৃন্ময়ের মনেই ছিল না। স্বর্ণলতার কথা হাসি কিছুই জানে না। হাসি এখন বেশ লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে, সে যদি চিঠিগুলা পড়ে। মৃন্ময় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন নাকি ?

আছি, আসুন।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মৃন্ময় বুঝিল, পাশের বাড়ির এম. এ.-পরীক্ষার্থী বিকাশবাবু আসিয়াছেন। ভদ্রলোক এবার ফিলজফিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতেছেন। মৃন্ময়ও ফিলজফিতে এম. এ. শুনিয়া বিকাশবাবু মৃন্ময়ের নিকট সাহায্য লইবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন। কাল মৃন্ময় বাড়ি ছিল না, বিকাশবাবু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট মৃন্ময় তাহা শুনিয়াছিল। মৃন্ময় উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বিকাশবাবু আসিয়াই বলিলেন, মুকুজ্জেমশাই কোথায় ?

তিনি বেরিয়েছেন।

হি ইজ এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান। অদ্ভুত লোক মশাই, কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না, আমি একটু হতাশ হয়েই ফিরছিলুম; মুকুজ্জেমশাই বললেন, পরীক্ষা নাকি কাল থেকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, মৃন্ময়বাবুকে আজ একবার পেলে ভাল হ'ত। মুকুজ্জেমশাই আমাকে তখন কয়েকটা কোশ্চেন সাজেস্ট্ ক'রে দিলেন, বললেন, এগুলো ভাল ক'রে দেখে যেও, পড়তে পারে। আমি তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম, মুকুজ্জেমশাই যে এম. এ.-র ফিলজফির কোশ্চেন সাজেস্ট্ করতে পারেন, তা আমার ধারণারই বাইরে ছিল। যাই হোক, বললেন যখন, দেখে গেলুম। আমাদের অবস্থা তো বোঝেন—ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস অ্যাট এ স্ট্র। গিয়ে দেখি, ঠিক পড়েছে মশাই। উনিও নিশ্চয় এম. এ., নয় ? কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মৃন্ময়ও বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, আমি ঠিক জানি না, উনি নিজের কোন পরিচয় কাউকে দেন না।

ফিরবেন কখন ?

ঠিক বলতে পারি না। এলে খবর দেব আপনাকে।

দেবেন তো কাইণ্ড্‌লি, নেক্স্‌ট পেপারটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

আচ্ছা।

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন পরিচয় পাইয়া মৃন্ময় যদিও বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিস্ময় তাহার মনকে এখন ততটা অধিকার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মন একটি মাত্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, হাসির হাতে যদি স্বর্ণলতার চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?

১৬

শৈলর দিন কাটিতেছিল, কারণ সময়ের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অমোঘ নিয়মে সূর্য উঠে এবং অস্ত যায়, মানবের সুখদুঃখে দিশাহারা হইয়া এক মুহূর্তের জন্যও শ্লথগতি হয় না। বড় অফিসার মিস্টার এল. কে. ঘোসের পত্নী শৈলবালারও জীবনের দিনগুলি একে একে আসিতেছিল এবং যাইতেছিল। শৈল সুখী ছিল না। শৈল সুখী ছিল কি না—এ প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুখের উপকরণ হিসাবে যে সব জিনিস আহরণ করিবার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হই যাহার জন্য নিজেকে ক্লিষ্ট করি, অপরকে বঞ্চিত করি, মনুষ্যত্বকে খর্ব করি—সুখের সে উপকরণগুলির অভাব শৈলর ছিল না। শৈল বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পত্নী। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা কিছুরই অভাব নাই। স্বামী রূপবান পদস্থ ব্যক্তি। শৈলর সহিত তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেনই না, বরং শৈলর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে স্বামীর নৈতিক কর্তব্যবোধ মিস্টার এল. কে. বোসের একটু বেশি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাড়িতে ঠাকুর চাকর দাই বাবুর্চি বেয়ারা গিজগিজ করিতেছে, শৈলকে গান-বাজনা এবং ইংরেজী শিখাইবার জন্য মিস মল্লিককে বাহাল করিয়াছেন, শৈলর নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা একখানা মোটরও তিনি সেদিন তাহার জন্মদিনে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। শৈল তথাপি সুখী নয়। তাহার কারণ, অন্তরের

অন্তরতম প্রদেশে যে উৎস উৎসারিত হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ সুখী হয়, শৈলর অন্তরে সে উৎস ছিল না। শৈল স্বামীকে প্রিয়তম করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। শৈল স্বামীকে ভয় করে, তাঁহার নানাবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। মিস্টার বোসের কর্মব্যস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে নিয়মিত। তিনি নিক্তির ওজনে কর্তব্য করেন, চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান, উপরওয়ালা সাহেবদের বিষয়ই তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্থান তাঁহার জীবনে নাই। যতটুকু আছে, তাহা সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য। ঝকঝকে বাঁধানো কতকগুলি মূল্যবান সংস্করণের নামজাদা পুস্তক দামী আলমারিতে সাজানো আছে, প্রতি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি ছবিও ঝুলিতেছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে; পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে; রেডিওর চলন তখন ছিল না, থাকিলেও লেটেস্ট মডেল নিশ্চয় মিস্টার বোসের গৃহ অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু মিস্টার বোসের অন্তরে ইহাদের কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই; মনে মনে তিনি এসব কবিত্ব-টবিত্বকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। শৈলর সহিত মাঝে মাঝে ইহা লইয়া আলোচনা হয়। মিস্টার বোসের ভাষায়—এ সমস্ত ওয়ার্থলেস অকর্মণ্য লোকদের উপজীব্য; পৃথিবীতে যাহারা কাজের লোক, তাহাদের ওসব লইয়া মাতামাতি করিবার অবসর কই? সুতরাং শৈলর নূতন-শেখা সুরটি শুনিয়া মুগ্ধ হইবার, নূতন প্যাটার্নের সেলাইটা দেখিয়া তারিফ করিবার অথবা নূতন শোনা নাটকটার কাহিনী ধৈর্যভরে শুনিবার ইচ্ছা মিস্টার বোসের নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়া অবকাশও নাই। তিনি নিখুঁত কর্মতৎপরতার সহিত নিজের নিখুঁত কর্মজীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন। নিম্নতম কর্মচারীরা সকলে জানে, বোস সাহেব ভারি স্ট্রিক্ট লোক, কোন কিছুরই বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শৈল মাঝে মাঝে ভাবে, তাহার স্বামী যদি একটু কম নিখুঁত হইত, একটু কম বুদ্ধিমান হইত, একটু কম মাহিনার চাকরি করিত, তাহা হইলে হয়তো সে সুখী হইত। এমন প্রবল রকম নিখুঁত লোককে ভয় করা চলে, শ্রদ্ধা করা চলে, ভালবাসা যায় না।

শৈলর মাঝে মাঝে শঙ্করদার কথা মনে পড়ে। বাল্যকালে শঙ্করদা তাহার সঙ্গী ছিল, তাহার অসঙ্গত মান ভাঙাইবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত! শঙ্করদা আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসিবে? বিবাহ হইয়াছে, নূতন বউ লইয়া সে হয়তো আনন্দেই আছে। মিস মল্লিকের সহিত শঙ্করদার মাঝে মাঝে নাকি দেখা হয়! মিস মল্লিককে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে শঙ্করদা নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইতে লজ্জা করে, ভয়ও হয়।

১৭

সকালের টুইশনি সারিয়া বেলা দেবী এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরিলেন। স্নানাহার করিয়া আবার বাহির হইতে হইবে। দুপুরে আরও গোটা-দুই টুইশনি আছে। মেয়েদের গানের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বেলা মল্লিকের পসার বেশ জমিয়া গিয়াছে। প্রথমত মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী শিক্ষকেরই বেশি চাহিদা, দ্বিতীয়ত বেলার শুধু রূপ নয়—গুণও আছে। গান-বাজনায় বেশ দখল হইয়াছে, হারমোনিয়ম, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো—এই চারিটি যন্ত্র খুব ভালভাবে বাজাইতে পারেন এবং ছাত্রীদের খুব যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন। বেতনও যে খুব অসম্ভব রকম বেশি তাহা নয়, সুতরাং গীত-বাদ্য-জিজ্ঞাসু ছাত্রীমহলে বেলা দেবীর চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি সময়ের অভাবে আজকাল অনেক ছাত্রীকে ফিরাইয়া দিতেও হইতেছে। দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সত্য

সত্যই নিজের পায়ে সমর্থভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। দাদার প্রতি মনোভাবও অনেকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর কিছুদিন পরে দাদার নিকট তিনি ফিরিয়াও যাইতেন। মনের ভিতর এই যুক্তিটা ক্রমশ অঙ্কুরিত হইতেছিল—এখন আর ফিরিয়া যাইতে আপত্তি কি, এখন তো আমি সত্য সত্যই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দাদার অর্থ অথবা অনুগ্রহের উপর আর তো নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। অন্য সব টুইশনি ছাড়িয়া দিলেও ওই বৃদ্ধ সাহেবটি যাহা দেন, তাহাতেই তাহার একার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। বেলা দেবী ফিরিয়া আসিয়াই একখানি পত্র পাইলেন—প্রিয়নাথ মল্লিকের পত্র। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িলেন, সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিতেছেন—

বেলা,

এতদিন পরে বুঝিলাম, কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে এবং এতদিন পরে তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হইয়া গেল। এতদিন তোমাকে আমি পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমার স্বাধীনভাবে থাকিবার অসামাজিক ইচ্ছাকে তোমার খামখেয়ালী জেদী প্রকৃতিরই স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমিও পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়ে, শাসনের গণ্ডি ডিঙাইয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে চাও। শঙ্করবাবু নামক ব্যক্তিটি যে তোমার প্রণয়ী, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন তোমার আচরণে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আশ্চর্য হইয়া কেবল ভাবিতেছি, তোমার সামাজিক জ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে! লোকটাকে প্রকাশ্যভাবে ঘরে স্থান দিয়াছ! তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, এখনও তুমি যদি ভালভাবে থাকিতে

চাও, আমার কাছে ফিরিয়া এস। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ জানিবে।

ইতি—তোমার দাদা

প্রিয়নাথ মল্লিক

বেলা পত্রখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দাদার নিকট ফিরিয়া যাইবার যে ইচ্ছাটি মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। শঙ্করকে প্রকাশ্যভাবে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় ক্ষুব্ধ জনার্দন সিংহও চাকরিতে জবাব দিয়া গিয়াছে। এই পত্রখানি বেলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় আঘাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক্, বেলা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শঙ্করবাবুর যতদিন না কোথাও চাকরি হইতেছে, ততদিন বেলা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না, ইহাতে যে-ই যাহা বলুক না কেন!

বেলা দেবী পাশের ঘরে গেলেন। ইক্‌মিক কুকারটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, একটু গরম আছে, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া লইতে হইবে, শঙ্করবাবু হয়তো এখনই আসিয়া পড়িবেন। তেলের শিশিটা এবং সাবানের কৌটা লইয়া বেলা বাথ-রুমে গেলেন। বাথ-রুমের ভিতর যে তৃতীয় আঘাত উদ্যত হইয়া ছিল, তাহা বেলা প্রত্যাশা করেন নাই। বাথ-রুমের জানালা গলাইয়া কে একটা প্রকাণ্ড খাম মেঝের উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জনার্দন সিং নাই, সুতরাং ও-পাশের ছোট দেওয়ালটা অতিক্রম করিয়াই কেহ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল এবং জানালা গলাইয়া ইহা রাখিয়া গিয়াছে। বিস্মিত বেলা দেবী খামটা তুলিয়া লইলেন। বেশ মোটা লম্বা খাম। খাম খুলিয়া বেলা দেবীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গেল। খামের ভিতর অতিশয় অশ্লীল ছবি এবং ততোধিক অশ্লীল একটা চিঠি। চিঠিটা দরখাস্তের আকারে লেখা, নীচে আট-দশজনের নাম। প্রণয়ী-হিসাবে ইহারা সকলেই যে শঙ্করের অপেক্ষা বেশি যোগ্য, তাহাই অতি অশ্লীল ভাষায় বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ

করিয়াছে। বেলা কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর খামখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহা স্পিরিটে ভিজাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। খামখানা যখন নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন আবার তিনি বাথ-রূমে ফিরিয়া গেলেন।

একটু পরেই শঙ্কর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে চুন্‌চুন। চুন্‌চুনকে দেখিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ও, তাই এত দেরি! আমি ভাবছিলাম, শঙ্করবাবু চাকরির সন্ধানে বুঝি বিবাগীই বা হয়ে গেলেন। চুন্‌চুনের সঙ্গে কোথায় দেখা?

শঙ্কর বলিল, আমিই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

বেলা চুন্‌চুনের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোরা সার্ভিস সিকিওরিং বিউরো খুলেছিস নাকি?

চুন্‌চুনের মুখ বিষণ্ণ, তবু এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, না, শঙ্করবাবু গিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর খোঁজে।

প্রকাশবাবুর খোঁজে কেন?

শঙ্কর বলিল, প্রকাশবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন। তাঁর জানা-শোনা একটা প্রেসে প্রুফ-রীডারের একটা কাজ নাকি খালি আছে।

কত মাইনে?

প্রকাশবাবুর দেখাই পেলাম না। চুন্‌চুনের দিদির সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি সব শুনে দয়ার্দ্র হলেন, বললেন, যতদিন আপনার কোন কাজ না হয়, ততদিন না হয় আমার ছেলে দুটিকে পড়ান আর আমাদের বাড়িতে থাকুন।

বেলা দেবী অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া একটু হাসিলেন।—আপনি রাজী হয়ে এসেছেন তো?

না হয়ে উপায় কি ?

একটু থামিয়া শঙ্কর আবার বলিল, এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম, আপনার দাক্ষিণ্যে আর কত দিন বাস করা যায় বলুন ?

বেলা ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সংবাদে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য শঙ্করের এই আকুলতায় তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তবু তিনি হাসিয়া বলিলেন, বেশ করেছেন। এখন চলুন খাওয়া যাক, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চুনচুন, তুই খেয়ে এসেছিস তো ?

চুনচুন বলিল, হ্যাঁ।

তিনজনে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

১৮

বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী কুমারিকা অন্তরীপে বেশিদিন বাস করিতে পারিলেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষে স্থানটি উপযোগী হইলেও বাবাজী একটি মহা অসুবিধায় পড়িলেন। মনের মত তেমন কোন বাঙালী কাছে-পিঠে নাই। একেবারে বাঙালী-বর্জিত স্থানে কি থাকা যায় ? শুধু সমুদ্র দেখিয়া মন ভরে না। কাছাকাছি কথা বলিবার মত একজনও লোক না থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে যে! সেখানকার ভাষা বাবাজীর পক্ষে দুর্বোধ্য, ইংরেজী ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দী বলিয়া কতদিন চালানো যায় ? তা ছাড়া, আর একটা কথাও বাবাজীর বার বার মনে হইতে লাগিল। স্বদেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বসবাস করাটা কি ঠিক ? হাজার হোক স্বদেশ। আত্মীয়স্বজনও আছে ; ভন্টুও আছে, তা ছাড়া ঠাকুরও ওই দেশেই থাকেন—সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদূরে থাকিতে মুক্তানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা রাজী হইল না। দেশের কাছাকাছি নির্জন স্থান দুর্লভ নয়। গঙ্গার ধারে অমন ঢের জায়গা পড়িয়া আছে এই গঙ্গা-হীন বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সংসারের

জালে অবশ্য তিনি নিজেকে জড়াইবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া এখানে পড়িয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আর একটা কথা, টাকাও ফুরাইয়া আসিতেছিল। অর্থাভাবে পড়িলে এই অচেনা অজানা জায়গায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? নিজের অতবড় বিষয়টা বাধা দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিন শত টাকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও টাকা পাঠাইবার জন্য বন্ধুকে পত্র দিয়াছিলেন, কোন উত্তর আসে নাই; এ বিষয়েও উদাসীন থাকা তাঁহার উচিত বলিয়া মনে হইল না। ভন্টুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। ভন্টু লিখিয়াছে যে, সে মেজকাকার বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে চাহে না। মেজকাকার বিষয়ের ব্যবস্থা মেজকাকা নিজেই করুন। বাবাজীর মনে হইল, চিঠিতে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। হইবেই না বা কেন! হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এই বয়সেই সমস্ত সংসারের বোঝাটা তাহার উপর পড়িয়াছে। বিষ্টুটা এক পাল ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়া তুচ্ছ একটা অসুখের ছুতায় দিব্য সমুদ্রের ধারে গিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। ভন্টুর অগ্রজ বিষ্ণুবাবুর প্রতি পুরাতন ক্রোধ বাবাজীর অন্তরে নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক চিন্তা করিয়া তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কুমারিকায় আর থাকা চলিবে না। তল্পিতল্পা গুটাইয়া তিনি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯

মোটরের দালাল অচিনবাবুর অদম্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই একদিন প্রিয়নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বেলাকে কিছুতেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া অচিনবাবু অবশেষে প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং হিতৈষীর ছদ্মবেশে তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়া অচিনবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, ভগ্নীর উপর বিরূপ হইলেও প্রিয়নাথ ভগ্নীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এখনও সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার বাসনায় অচিনবাবু প্রিয়নাথের বিরক্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন আসিয়া প্রিয়নাথকে বেলার গতিবিধির অতিরঞ্জিত নানা কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বেলার বাসায় শঙ্করের অভ্যাগমে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়া গেল, বেলা যে সত্য সত্যই কি ভাবে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তাহা উদাহরণ-সম্বলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন। এমন কি মোটরে চড়াইয়া একদিন রাত্রে তিনি প্রিয়নাথ মল্লিককে বেলার-বাসায়-প্রবেশোন্মুখ শঙ্করকে দেখাইয়া পর্যন্ত দিলেন। স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া প্রিয়নাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তখনই মোটর হইতে নামিয়া তিনি একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতেন, অচিনবাবু অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন প্রিয়বাবু বেলাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা অচিনবাবু জানিতেন না। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

আপনি চিঠি লিখে দিয়েছেন?

নিশ্চয়।

কি লিখলেন?

সোজা সত্য কথা, লিখে দিলাম—তোমার স্বাধীনতার মর্ম সব বুঝতে পেরেছি, ভাল চাও তো এখনও ফিরে এস।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হাস্যময় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, অত সোজায় আসবেন না তিনি।

প্রিয়নাথ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে অচিনবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া শুইয়া ছিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন?

অচিনবাবুর মুখে এতটুকু হাসি নাই, কেবল চোখ দুইটি হাসিতেছে।

কি বলুন?

ইচ্ছে করছে, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে ওকে এখানে নিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে আটকে রেখে দিই।

অচিনবাবুর চোখের হাসি মুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি যেন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য কণ্ঠস্বরে সংক্রামিত হইল না। অতিশয় ধীরভাবে যেন একটা নিঃসংশয় মত তিনি ব্যক্ত করিতেছেন এমনভাবে বলিলেন, মিস মল্লিককে যদি আনতে চান, জোর ক'রেই আনতে হবে। কেবল মুখের কথায় তিনি আসবেন না।

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার খানিকক্ষণ অচিনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, ভাবছেন কি?

ভাবছি, সত্যই কি জোর ক'রে ওকে আনা যায় না কোন রকমে?

তা যাবে না কেন? তবে একটু রিস্‌কি ব্যাপার।

তাহার পরই অচিনবাবু বানাইয়া একটি গল্প বলিলেন। যশোরে একবার নাকি এক স্বামীগৃহবিমুখা বধূকে তিনি জোর করিয়া মোটরে তুলিয়া স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং সে ক্রমশ নাকি পোষ মানিয়াছিল।

একে আনতে পারেন আপনি?

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি চকচক করিতে লাগিল। এই প্রশ্নটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। কারণ পুলিস-কেস হ'লে আমি একা হাঙ্গামায় পড়তে চাই না। আপনি হলেন ওর ন্যাচারাল গার্জেন, এ রকম জোরজবরদস্তি করবার খানিকটা অধিকার আছে আপনার।

নিশ্চয়ই আছে। পুলিসকে সব কথা খুলে বললে—দে উইল সি মাই পয়েণ্ট। এ তো মগের মুলুক নয়, ব্রিটিশ রাজত্ব।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি পুনরায় হাস্যময় হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ আবার কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন, করুন। চোখের সামনে বোনটাকে এমনভাবে উচ্ছন্ন যেতে দিতে পারি না। পুলিস-কেস হয় হোক, কুচ পরোয়া নেই, আই শ্যাল রিস্‌ক্ ইট।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অচিনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার বেশি কিছু ছিল না। এই সম্ভাবনাটা মনে উদিত হইবামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তিনি সমস্তটা ভাবিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের অজুহাতে এবং প্রিয়নাথকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বেলাকে জোর করিয়া কি ভাবে অপহরণ করা সম্ভব, তাহা অচিনবাবু অবিলম্বে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। গোলমালে প্রিয়নাথকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া বেলাকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা যাইবে, এই অংশটুকু এখনও তাঁহার ভাবা হয় নাই। এই অংশটুকু পরিপাটীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পরিপাটীরূপে চিন্তা না করিয়া অচিনবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই জাতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অচিনবাবু অঙ্কের মত সমস্ত জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কষিয়া লইয়া তবে কার্য আরম্ভ করেন। মনে মনে সমস্ত জটিলতার সমাধান করিয়া এবং পূর্বাহ্নেই তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তবে অচিনবাবু কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই অংশটুকুর সমাধানও যে তিনি সুচারুরূপে করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। তাহার পর, অর্থাৎ বেলা দেবীকে একবার আয়ত্তাধীনে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অচিনবাবুর ধারণা, মেয়েমানুষ অনেকটা বুনো জানোয়ারের মত। সহজে ধরা দেয় না, ধরা দিলেও প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমশ পোষ মানে এবং অবশেষে খেলা দেখায়।

অচিনবাবুর মোটরকার নিঃশব্দগতিতে কড়েয়ার দিকে ছুটিতে লাগিল। ম্যানেজারবাবু সম্প্রতি যে নূতন বাসাটায় উঠিয়া আসিয়াছেন, তাহা কড়েয়াতে একটা গলির মধ্যে। ম্যানেজারবাবু যদি মোটা রকম দক্ষিণা দিতে রাজী হন, তাহা হইলেই এই বিপজ্জনক ব্যাপারে অচিনবাবু হাত দিবেন, নতুবা নয়। সম্প্রতি তাঁহার কিছু টাকারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে, মেয়েটার জন্য একটা ভাল পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু তাহারা নগদ দশ হাজার টাকা চায়। অত টাকা অচিনবাবুর হাতে নাই। অচিনবাবুর মোটর একটা গলি পার হইয়া সারকুলার রোডে পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। সারকুলার রোড নির্জন। অচিনবাবু মোটরের স্পীড বাড়াইয়া দিলেন।

২০

ম্যানেজারবাবুকে ঘন ঘন বাসা পরিবর্তন করিতে হয় বটে, কিন্তু কখনও কোন ছোট বাসায় তিনি যান না। প্রকাণ্ড দুই-তিন মহলা বাড়ি না হইলে তাঁহার চলে না। কড়েয়ার বাড়িটাও প্রকাণ্ড। এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে ম্যানেজার একা বসিয়া ছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছোট ইলেক্‌ট্রিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিতেছিল এবং আর এক কোণে একটি ঘন বেগুনী রঙের ছোট বাল্‌ব অন্ধকারকে যৎসামান্য আলোকিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারেন না। দিবসেও তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে পরদা ফেলিয়া সূর্যালোককে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অন্ধকার-বিলাসী তাঁহার মন অন্ধকারেই নিশাচরের মত সঞ্চরণ করিতে চায়। বহুকাল ধরিয়া তাঁহার ক্ষুধিত বাসনা অতৃপ্ত আবেগে নিবিড় অন্ধকারে যে জটিল রহস্যময় পথে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে যে পথ অফুরন্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আলোকপাত করিয়া সে পথের সীমারেখা দেখিয়া কি হইবে? সীমা তো আছেই, কিন্তু তাহা দেখিয়া

লাভ কি? অতলস্পর্শী যে গহ্বরটা সুনিশ্চিতভাবেই একদিন তাঁহাকে গ্রাস করিবে, তাহার বিভীষিকাকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়াল করিয়া রাখিতে চান অথবা একা অন্ধকারে বসিয়া এই সবই তিনি কল্পনা করেন—তাহা বলা শক্ত। ম্যানেজারবাবুর মনের খবর কেহ জানে না, কিন্তু ইহা তাঁহার অনুচরবর্গেরা সকলেই জানে যে, অন্ধকার, বড় জোর ঈষৎ-আলোকিত অন্ধকার, তাঁহার প্রিয় আবেষ্টনী।···বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। খুব সম্ভবত অচিনবাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য তিনি খবর পাঠাইয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দিয়া চিঠিখানা লিখাইয়া খগেশ্বরকে পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে নূতন মালটিকে হস্তগত করা যাইবে না। অচিনবাবু চিঠিখানা লিখিতে রাজী হইবে তো? কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর জরা-শিথিল মুখমণ্ডল নীরব হাস্যে আরও কদাকার হইয়া উঠিল। রাজী হইবে না! কিছু টাকা কবুল করিলেই রাজী হইবে।

বেঁটে গ্যাট্টাগোঁট্টা ছোকরাটি নিঃশব্দে আসিয়া ছায়ামূর্তির মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

কি?

নীচে মোটরকারের দালালবাবুটি এসেছেন।

বেশ, সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাও।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

নীচে প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সিঁড়িটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। অচিনবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। দ্বার উন্মুক্তই ছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরের বেগুনী বাল্‌ব নিবিয়া গিয়া সাধারণ একটি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অচিনবাবু প্রবেশ করিতেই ম্যানেজারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনার ভাগ্য ভাল, কিছু টাকা লাভ হয়ে যাবে আপনার আজ। তাই ডেকে

পাঠিয়েছিলাম আজ আপনাকে। মাত্র দুটি লাইন একটি চিঠি লিখে দিতে হবে, এর জন্তে কর্তামশাই নগদ এক শো টাকা স্যাংশন করেছেন। আসুন, বসুন।

কিসের চিঠি ?

আরে মশাই, বসুনই না আগে।

অচিনবাবু উপবেশন করিলেন।

ম্যানেজারবাবু সত্য মিথ্যা মিশাইয়া একটি গল্পের অবতারণা করিলেন, কিছুদিন আগে, মনে আছে, যমুনা ব'লে একটি মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন আপনি ?

গল্পের এ অংশটুকু সত্য।

অচিনবাবু বলিলেন, মনে আছে, তাকে তো কোন রকমেই বাগাতে না পেরে শেষটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দিয়েছিলেন তো ? কর্তার আর একটি এজেন্ট কিন্তু তার নাগাল পেয়েছে।

ম্যানেজারবাবু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকাল অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু মুশকিলেও পড়েছেন তিনি। মেয়েটির এখনও আপনার ওপর অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটা বলছে যে, অচিনবাবু যদি আমাকে যেতে লেখেন, তা হ'লে আমি কলকাতা যেতে পারি।

অচিনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, কিন্তু আমি যখন তাকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম, তখন তো সে আসতে চায় নি ! এই এজেন্টটি কে ?

জানেন তো কর্তার কড়া হুকুম, একজন এজেন্টের নাম আর একজনের কাছে করা চলবে না।

যমুনা মেয়েটা আবার আসতে চাইছে ? আশ্চর্য !

স্মিতমুখে ম্যানেজার বলিলেন, তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন ?

তাহার পর বলিলেন, আরে মশাই, আপনিও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? দিন না দু লাইন লিখে, আমারও হুকুম তামিল করা হোক, আপনারও

কিছু লাভ হোক। তারপর কর্তা তাঁর এজেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে—আপনারই বা কি, আমারই বা কি ?

ম্যানেজার আর কালবিলম্ব করিলেন না, কুব্জ দেহটাকে সোজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহকোণে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া আনিলেন, তাক হইতে চিঠি লিখিবার প্যাড এবং ফাউন্টেন-পেন পাড়িয়া আনিয়া বলিলেন, নিন, লিখে দিন চিঠিখানা।

কি লিখব ?

লিখুন না—কল্যাণীয়াসু, তুমি লোকটির সহিত অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমিই ইহাকে পাঠাইয়াছি। বিশেষ দরকার আছে। বাস্, নামটা সই ক'রে দিন, ঠিকানাটাও দিয়ে দিন।

অচিনবাবু যথাযথ লিখিয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্রখানি হস্তগত করিয়া এক শত টাকার নোটখানি অচিনবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক। তারপর আর সব খবর কি বলুন ?

অচিনবাবু খবর বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নোটটি পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, ভাল খবর আছে একটা।

কি বলুন তো ?

খুব ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, কায়দা ক'রে সাপটে নিতে পারলে মালের মতন মাল একখানা।

বলুন, বলুন।

ম্যানেজারবাবু কুব্জ দেহটাকে উন্নমিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। অচিনবাবু রঙ এবং রস দিয়া বেলা মল্লিকের বর্ণনা শুরু করিলেন।

—

ঘণ্টাখানেক পরে সমস্ত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, আপনি যেমন বলছেন, তেমন জিনিস যদি হয়, টাকার জন্যে কর্তামশাই পেছপাও হবেন না।

মেয়েমানুষের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন তিনি, আরও ওড়াবার তাকতও আছে তাঁর। তবে জিনিসটি সরেস হওয়া চাই।

জিনিস খুব সরেস।

তা হ'লে টাকার জন্যে ভাবনা নেই।

হাজার দশেক খরচ হতে পারে।

হাজার বিশেক হ'লেও কর্তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না, জিনিস যদি ভাল হয়।

আমি বলছি, জিনিস খুবই ভাল।

তা হ'লে লেগে পড়ুন, টাকার জন্যে ভাববেন না।

অচিনবাবু উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার মোটরখানি নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। অচিনবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবুর ঘরে পুনরায় বেগুনী বাল্ব জলিয়া উঠিয়াছিল। অচিনবাবু-বর্ণিত বেলা মল্লিকের কাল্পনিক মূর্তিটি ঘিরিয়া তাঁহার লেলিহান বাসনা ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। স্ফীতনাসারন্ধ্র, মুদিতচক্ষু তিনি নিস্পন্দ হইয়া এক কোণে বসিয়া ছিলেন। দ্বারে আবার শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সেই ছায়ামূর্তি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি আবার?

সেই জু মেয়েটি ম'রে গেল।

ও। আচ্ছা প্যাক ক'রে ফেল তা হ'লে। বড় প্যাকিং কেস আছে তো?

আছে।

প্যাক ক'রে সেই বুড়ো জু-টার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেটও একখানা দিয়ে গেছেন, সেটাও নিয়ে যেও। সেই বুড়ো জু-ই মড়ার ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কাল। এখুনি সরিয়ে ফেল তার বাড়িতে, দেরি ক'রো না।

ম্যানেজার এমন অনাকুলিত চিত্তে আদেশ দিলেন, যেন একটা কাচের পাত্র অসাবধানে ভাঙিয়া গিয়াছে, টুকরাগুলা সরাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন।

ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঘন বেগুনী রঙের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে নিষ্ঠুর নীরবতা পুনরায় ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

২১

মৃন্ময় ছিল না।

অতিশয় তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখাইয়া হাসির নিকট চলিয়া গিয়াছিল। অজুহাতটার তুচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করেন নাই, বরং সস্নেহ কৌতুকভরে তাহার যাওয়াটার সমর্থনই করিয়াছিলেন। সত্যই তো মৃন্ময় কি রকম ধরনের চাকরি লইবে, সে সম্বন্ধে হাসির সহিত একটা পরামর্শ করা কর্তব্য বইকি! মৃন্ময়ের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়া উচিত। মৃন্ময় চলিয়া গেলে মুকুজ্জেমশাই অনুকম্পাভরে ভাবিয়াছিলেন, আহা বেচারা, একটা বলিষ্ঠ রকম অজুহাত খাড়া করিতে পারে নাই, চাকরি সম্বন্ধে হাসির মতামতও লইতে গিয়াছে! যেন বহু মনিব আসিয়া চাকরির জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

মুকুজ্জেমশাই আরও একটা কারণে মৃন্ময়কে ছুটি দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃন্ময় ক্রমশ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। এমনিই সে বড় একটা হাসে না, কিন্তু এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। হাসি বাপের বাড়ি যাইবার পর সেই গাম্ভীর্যের উপর একটা বিষাদের কালিমাও যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই ভাবিলেন, যাক, দিনকতক হাসির নিকট ঘুরিয়া আসুক, আমি একাই যতটা পারি করি।

মৃন্ময় কিন্তু হাসির নিকট গিয়াছিল সেই চিঠিগুলির সন্ধানে।

মুকুজ্জেমশাই এবং হাসির অভিভাবক ভদ্রলোক যদিও মৃন্ময়ের গৃহত্যাগিনী পত্নীর কথা জানিতেন, কিন্তু হাসিকে সে কথা বলেন নাই। সে পত্নীর নামও তাঁহারা জানিতেন না, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মৃন্ময়ের অন্তরলোকে যেসব অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁহারা কোনদিন পান নাই। সুতরাং স্বর্ণলতাকে লিখিত চিঠিগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছিল, মুকুজ্জেমশাই বাসায় একা ছিলেন। বেশ ভালই ছিলেন। সমস্ত সকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সমস্ত দুপুর পূর্বলিখিত দরখাস্তগুলির সম্বন্ধে তদ্বির করিয়া এবং সমস্ত সন্ধ্যা নূতন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত লিখিয়া তাঁহার ভালই কাটিতেছিল। প্রতিদিন দুপুরে বাহির হইবার মুখে রাত্রের লেখা দরখাস্তগুলি টাইপ করাইবার জন্য দিয়া আসিতেন। শিরীষবাবুর নিকট হইতে শঙ্করের নূতন ঠিকানাও তিনি পাইয়াছেন, শঙ্করের সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। সে একটা ছোটখাটো টুইশনি যোগাড় করিয়াছে এবং কি করিয়া প্রুফ দেখিতে হয় অধ্যবসায়সহকারে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিকাশবাবু নামক এম.এ.-পরীক্ষার্থী যুবকটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বিদ্বান অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া পুলকোচ্ছ্বাসের আতিশয্যবশত মুকুজ্জেমশাইয়ের কার্যে বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুজ্জেমশাই তাঁহার উৎসাহ-অনলে শীতল বারিসিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। অতিশয় নিরীহভাবে তিনি বিকাশবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি নিজে ফিলজফির 'ফ'-ও জানেন না, অন্যত্র তিনি একজন এম.এ.-পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নগুলি পড়িতে দেখিয়াছেন এবং সেগুলি তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই আকস্মিকভাবে বিকাশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে মূর্খ মানুষ, ফিলজফির কিছুই বোঝেন না। এই কথায় মুকুজ্জেমশাইয়ের সৌভাগ্যক্রমে বিকাশবাবু নিরস্ত হইয়াছেন এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট আসা কমাইয়া দিয়া সদ্য-দত্ত পরীক্ষার খবরাখবর করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। একা একা

নিজের আরব্ধ কার্যে মশগুল হইয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার মুকুজ্জেমশাই বাসায়। অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন খবর না দিয়া রাজমহল হইতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে কেহ নাই—একাই আসিয়াছে।

এ কি, তুমি যে হঠাৎ ?

মনোরমার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এমনই এলুম, ওখানে আর ভাল লাগছিল না।

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একা চ'লে এলে, ভয় করল না ?

না।

এ বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারলে কি ক'রে ?

ঠিকানা খুঁজতে গিয়েই দেরি হ'ল, আমি হাওড়ায় এসে পৌঁছেছি সকালের ট্রেনে।

তারপর ?

হাওড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি।

হাওড়া থেকে হেঁটে আসছ ?

পয়সা ছিল না।

মুকুজ্জেমশাই অবাক হইয়া গেলেন।

এমন ক'রে আসবার মানেটা কি ?

ওখানে আর ভাল লাগছিল না।—এইটুকু বলিয়া মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, হাজার প্রশ্ন করিলেও ইহার বেশি আর সে কিছুই বলিবে না।

যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোও গিয়ে। উঠোনের ও-পাশেই কল আছে। কলে বোধ হয় জল এসেছে এতক্ষণ।

মনোরমা ক্ষুদ্র পুঁটলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, মনোরমার এ আচরণের অর্থ কি? অর্থ যাহাই থাকুক, আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। স্বল্পভাষিণী মনোরমা যাহা বলিয়াছে, তাহার বেশি আর কিছু বলিবে না। মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্বে মুকুজ্জেমশাই ভবেশকে কুড়ি টাকা এবং মনোরমার হাতখরচ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই পাঁচ টাকা সম্বল করিয়াই মনোরমা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো, কিন্তু এখন তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ভবেশের কাছে মনোরমাকে রাখিয়া মুকুজ্জেমশাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। হঠাৎ মনোরমার হইল কি? ভবেশকে মুকুজ্জেমশাই ভাল করিয়াই চেনেন, মনোরমার সহিত সে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। সহসা মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে হইল, মনোরমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে হয়তো অনেকক্ষণ কিছুই খায় নাই। মুকুজ্জেমশাই উঠিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। উঠানে নামিয়া দেখিলেন, কলের কাছেও কেহ নাই, কল হইতে জল পড়িতেছে। মনোরমা গেল কোথায়? মৃন্ময় যে ঘরটায় শুইত, দেখিলেন, তাহার দরজাটা খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চৌকির উপর মনোরমা উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ যে কিছু একটা ঘটিবে, তাহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অনাথার প্রতি করুণাবশত। কর্তব্য ক্রমশ কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুজ্জেমশাইকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

কি হ'ল তোমার ?

মনোরমা নীরব।

মুকুজ্জেমশাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওঠ ওঠ, কি ব্যাপার সব খুলে বল তো ?

মনোরমা উঠিয়া বসিল এবং বেশবাস সম্বৃত করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হ'ল কি তোমার ? এ রকম করার মানে কি ?

মনোরমা খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া ক্রন্দনকম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি আর সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পার না ?

আপনার দয়া।

তার মানে ?

মনোরমা সহসা ঘুরিয়া বসিল। অশ্রুবাষ্পাকুল আরক্ত নয়ন দুইটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি কি মনে করেন আমি মানুষ নই, আমার প্রাণ ব'লে কোন জিনিস নেই, আপনি চিরকাল দয়া ক'রে যাবেন আর আমি তা চিরকাল সহ্য করব ? আপনার দয়া পাবার কি যোগ্যতা আছে আমার ? কেন শুধু শুধু আপনি এমন ক'রে চিরকাল আমার ভার ব'য়ে বেড়াবেন ? কাশীর একটা আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে কেন সকলের কাছে আত্মীয় ব'লে পরিচয় দেবেন, আপনার ওপর যখন সত্যিকার কোন দাবিই নেই আমার ?

কে বললে দাবি নেই ?

উৎসুক-নয়নে মনোরমা প্রশ্ন করিল, কিসের দাবি ?

প্রত্যেক মানুষের ওপরই প্রত্যেক মানুষের দাবি আছে।

কেন ?

কারণ মানুষ পশু নয়।

আপনি কি যেখানে যত অসহায় আছে, সকলকেই এমনই ক'রে সাহায্য করেন ?

ক্ষমতায় কুলোলে নিশ্চয়ই করতাম, সকলকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আরও কত লোক তো আছে, যারা আমার চেয়ে আপনার দয়া পাবার ঢের বেশি যোগ্য ? আপনি আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন ?

কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে আমার সামনে পড়ে, যথাসাধ্য তারই উপকার করবার চেষ্টা করি। তখন কাশীতে ছিলুম, হঠাৎ একজনের মুখে তোমার খবর পেলুম, তোমার কাছে গিয়ে তোমার মুখে সমস্ত শুনে কষ্ট হ'ল, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চাইলাম তুমিও স্বেচ্ছায় চ'লে এলে—এর বেশি তো আর কিছু নয়। তার পর থেকে আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছি।

মনোরমা চৌকি হইতে নামিয়া কাপড়-চোপড় আর একবার সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কি সহ্য করতে পারছ না ?

বললাম তো, আপনার দয়া।

সহ্য করতে পারছ না কেন ?

কারণ আমি পশু নই,—মানুষ।

নিজের উত্তরটাই এমন তির্যকভাবে নিজের কাছে ফিরিয়া আসায় মুকুজ্জেমশাই ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন যখন দেখিলেন, মনোরমা নিজের ছোট পুঁটলিটি লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

ও কি ? কোথায় যাচ্ছ ?

যেদিকে দু চক্ষু যায়, এমনভাবে কারও দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়া ঢের ভাল।

মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

পরমুহূর্তেই গুরুভার পতনের শব্দে সচকিত হইয়া মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়া দেখিলেন, মনোরমা সিঁড়ির উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; অজ্ঞান মনোরমাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রে মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একজন অপরিচিতা নারী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে।

আপনি কে?

আমি নার্স।

আপনি কি ক'রে এলেন?

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম, তিনিই আমাকে রেখে গেছেন।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ওই যে সন্ন্যাসী মতন কে একজন ছিলেন, তিনিই ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবুকে।

তিনি কোথায়?

তিনি আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কোথায় যেন গেলেন। কাল সকালে আসবেন ব'লে গেছেন। আপনি বেশি কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু নিষেধ ক'রে গেছেন।

মুকুজ্জেমশাই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলে—চাই না, চাই না, তোমার এত দয়া চাই না আমি।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

২২

চুন্‌চুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল নাতিসাধারণ-প্রকৃতির মহিলা। বলিষ্ঠ চওড়া-চওড়া গড়ন, শক্তিব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, একটু লক্ষ্য করিলে গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেখা যায়। মনোবৃত্তিও পুরুষভাবাপন্ন নির্ভীক বলিষ্ঠ। নারীসুলভ কমনীয়তা হয়তো তাঁহার এককালে ছিল, (না থাকিলে অধুনামৃত মিস্টার স্যানিয়াল কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন?) এখন কিন্তু তাঁহার মধ্যে নারীসুলভ কোন প্রকার মাধুর্য নাই। শুধু তাহাই নহে, বর্তমানে তিনি মাধুর্যবিরোধী, রূপসজ্জার কোন প্রকার আতিশয্য সহ্য করিতে পারেন না। কমনীয়তা এবং মাধুর্য লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়াই যে আজকালকার মেয়েরা অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মিস্টার স্যানিয়াল পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন এবং মিসেস স্যানিয়াল এই পাঁচ বৎসরকাল সাতিশয় দক্ষতার সহিত নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নিজের সংসার-তরণীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কি নিজের দূরসম্পর্কের ভগিনী চুন্‌চুনকে পর্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। হাব-ভাব-বিলাসিনী প্রসাধন-কুশলা সাধারণ রমণী হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না—এ কথা প্রায়ই তিনি পরিচিত-মহলে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে চুন্‌চুন লুকাইয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের সর্বসাবধানতা-উল্লঙ্ঘিনী দুষ্টা দক্ষতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকালকার ব্যাপার দেখিয়া মিসেস স্যানিয়ালের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সাবধানতার প্রাচীর যত উচ্চই হউক, আজকালকার মেয়েরা ঠিক তাহা ডিঙাইয়া যাইবে। মিসেস স্যানিয়াল প্রতিদিন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, ভগবান তাঁহাকে একটি মেয়েও দেন নাই, তাঁহার দুইটি সন্তানই পুত্র-সন্তান। মেয়েদের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ, তাঁহার ধারণা, আজকাল মেয়েগুলাই সমাজটাকে উচ্ছন্ন দিতেছে। মেয়েরা আশকারা না দিলে পুরুষের সাধ্য কি অগ্রসর হয়। মেয়েদেরই কর্তব্য,

অবাঞ্ছিত পুরুষসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলা। আজকাল কি ছেলে কি মেয়ে কর্তব্যজ্ঞান কাহারও নাই। এই যে তিনি চুনচুনকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার লুকাইয়া-বিবাহ-করা স্বামীর চিকিৎসার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও চুনচুনকে দূর করিয়া দেন নাই—সমস্তই কর্তব্যের খাতিরে। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তিনি যে কর্তব্যপরায়ণা, সৎপথবর্তিনী এবং নিষ্কলুষা—এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা শুধু যে তাঁহার নিজ সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে; তিনি নারীজাতির উন্নতিকল্পে একটি নারী-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, পাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রত্যহ বিনা-বেতনে এক ঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, উপযুক্তপাত্রে যথাসাধ্য দান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া, তাহার বিপন্ন অবস্থা শুনিয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মিসেস স্যানিয়াল তাহাকে নিজের ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে বাহাল করিয়াছেন। তাঁহার একটি ছেলে এবার কলেজে ঢুকিয়াছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। মিসেস স্যানিয়াল কিন্তু শঙ্করকে আকারে ইঙ্গিতে এই কথাটি বারম্বার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু শঙ্কর একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে এবং যেহেতু তিনি চুনচুনের স্বামীর শুশ্রূষা-সম্পর্কে শঙ্করের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন, সেই হেতুই তিনি শঙ্করকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন, অখিল-অনিলের জন্য গৃহশিক্ষকের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সৎ অথচ সমাজ-কর্তৃক-লাঞ্ছিত যুবককে সাহায্য করা যে কোন কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

শঙ্কর কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় আসিয়া ঠিক যেন দুইটি উপবাসী মৎকুনের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অখিল-অনিলের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। তাহারা শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধিকে যেন দোহন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বড় না মিলটন বড়, অ্যালজ্যাব্রা শিখিয়া কি উপকার হয়, মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ কি পরিমাণ, মহিলা-কবি তরু দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি, জোনাকি আলো দেয় কি উপায়ে, একই মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া বিভিন্ন গাছ

বিভিন্ন ফল কোঁটায় ও ফল ফলায় কি করিয়া, দুধ এবং ডিমের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পুষ্টিকর এবং কেন, মানস-সরোবরে নীলপদ্ম ফোটে কি না, ওয়াটারলু যুদ্ধে কোন্‌ পক্ষে কত সৈন্য ছিল—ইত্যাকার নানাবিধ জটিল প্রশ্নে তাহারা শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময় সহজ নয়, ছাত্রদের নিকট উত্তর দিতে অপারগ হইলেও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং উত্যক্ত শঙ্কর যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিত, পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিত না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সঙ্গতিহীন অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া শঙ্কর কিছুতেই ইহাদের উপর কৃতজ্ঞ হইতে পারিল না। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, কোন রকমে কোথাও একটা চাকরি জুটিলে এই উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত পরিবারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচে।

প্রুফ-রীডিং সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে এবং প্রকাশবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহার জানা-শোনা একটি প্রেসে তাহাকে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটিও একদিন আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার চাকরির জন্য নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যত দিন একটা কিছু না জোটে, তত দিন নাকি করিতে থাকিবেন। সেদিন তিনি শঙ্করকে দিয়া চার-পাঁচটি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই শ্বশুরবাড়ি-সম্পর্কিত লোক। শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য লইতে তাহার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়। যে আত্মসম্মানের জন্য সে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, সেই আত্মসম্মানকে খর্ব করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যাইবে কোন্‌ লজ্জায়? কাহারও নিকট সে কোন সাহায্য লইবে না, নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের উপরই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এই মুকুজ্জেমশাইকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। লোকটি অদ্ভুত-প্রকৃতির, তাঁহার নাকি সংসারের কোন

বন্ধন নাই, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপকার করা নাকি তাঁহার পেশা। তিনি বিশেষ কাহারও নন—তিনি সকলের। শিরীষবাবুর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাকি আকস্মিক।

শঙ্কর সেদিন যে দরখাস্তগুলিতে সহি করিয়াছিল, তাহার একটির ঠিকানা বোম্বাইয়ের একটি পোস্ট বক্স। একটা বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। বোম্বাই শহরে কে বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছে? সুরমার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সুরমার চিঠি অনেকদিন পায় নাই, উৎপলও বহুদিন পূর্বে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে শঙ্কর হয়তো সুরমাকে পত্র লিখিত, কিন্তু এখন আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। একদা যে সুরমা তাহার মার্জিত রুচি, সংযত অথচ সাবলীল সৌন্দর্য দিয়া তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে সুরমা অহরহ নিকটে থাকিলে হয়তো শঙ্করের মানসলোকে বিপর্যয় ঘটাইতে পারিত; কিন্তু সুরমা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্তরাল ধীরে ধীরে আপন অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় সুরমা কখন যে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শঙ্কর তাহা বুঝিতেও পারে নাই। দরখাস্ত-প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইল না।

এখন শঙ্করের মানসলোক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে আর একজন—অমিয়া নয়, চুনচুন। মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আসিয়া এবং চুনচুনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শঙ্কর চুনচুনের ঘনিষ্ঠতর যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে, কিছুতেই বিচলিত হয় না। মিসেস স্যানিয়ালের গৃহের যাবতীয় কর্ম চুনচুন একাই করে, কিন্তু এমন নীরবে এবং এমন হাসিমুখে করে যে, শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। কর্তব্যপরায়ণা নিষ্কলুষা মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনের দুষ্কৃতির জন্য কথায় কথায় তাহাকে শ্লেষাত্মক উপদেশ দেন, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ফাই-ফরমাশ করিয়া করিয়া একদণ্ড চুনচুনকে স্থির থাকিতে দেয় না, মিসেস স্যানিয়ালের দূর-সম্পর্কীয় অপুত্রক বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবু প্রত্যহ

সন্ধ্যাবেলা আসিয়া একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি ও ভ্রূ লইয়া একদৃষ্টে চুনচুনের দিকে চাহিয়া থাকেন (এবং মিসেস স্যানিয়ালের সহিত কর্তব্যমৌখিক সদালাপ করেন) ; কিন্তু চুনচুন এতটুকু বিরক্ত বা বিচলিত হয় না। ইহাদের সহিত অকারণ বাদানুবাদ করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট করে না, মুখে অসহায় ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে না, নীরবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে। শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই স্মিতমুখী শান্ত মেয়েটির মনের মধ্যে আর একজন চুনচুন বাস করে, তাহার লক্ষ্য স্থির আছে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য অনিবার্য সুনিশ্চিত গতিতে সে পথ অতিবাহন করিতেছে। বাহিরে অকারণে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে বিব্রত হইতে চাহে না, বাহিরের জগৎকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে বাহিরের জগতে অনাড়ম্বরে অতিশয় সাধারণ বেশে থাকে। আসলে সে অসাধারণ, আসলে সে বিদ্রোহিণী, প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে বরণ করে,—সামাজিক বা আর্থিক কারণে নয়। যতীন হাজরার যক্ষ্মাবিধ্বস্ত মুখচ্ছবি শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চুনচুনের প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইচ্ছা করে, ওই রহস্যময়ীর অন্তরের রহস্যালোকে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

শঙ্কর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে চুনচুনের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—

একখানা প্রকাণ্ড নীল রঙের মোটর সহসা শঙ্করের পাশেই থামিয়া গেল। মোটরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল শৈল।

শঙ্করদা, কোথায় চলেছ ?

শৈল !

তবু ভাল, চিনতে পেরেছ।

চিনতে পারব না, বলিস কি ?

কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

কোথাও না, এমনই হাঁটছি।

আমার সঙ্গে একটু মার্কেটে চল তা হ'লে। অনেক জিনিস কিনতে হবে, তুমি পছন্দ ক'রে দেবে।

তার মানে?

লক্ষ্মীটি, চল।

শৈল দ্বার খুলিয়া আহ্বান করিল, শঙ্কর 'না' বলিতে পারিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে নানা রঙের শাড়ি, জামা, উল, ছিট, বাসন, টী-সেট এবং টুকিটাকি আরও নানাবিধ জিনিস কিনিয়া শঙ্করকে লইয়া শৈল বাড়ি ফিরিল। মিস্টার বোস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সম্প্রতি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত ট্যুর করিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি ট্যুরে বাহিরে ছিলেন।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই।

এখনই যাবে কি! সে হবে না, ওপরে চল, কিছুই তো কথা হ'ল না।

শঙ্করকে উপরে যাইতে হইল।

উপরে গিয়া শৈল বলিল, এখনও তো আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।

কি কথা?

বউ কেমন হ'ল?

শঙ্কর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, কার বউ?

তোমার, তোমার গো, লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ভেবেছ, কেউ টের পায় নি বুঝি? সব জানি আমি।

শঙ্কর বুঝিল, আর লুকাইবার উপায় নাই।

কাউকে জানাই নি, তুই খবর পেলি কি ক'রে?

কুসুমি চিঠি লিখেছে। কুসুমিকে মনে পড়ে?

বিদ্যুৎঝলকের মত শঙ্করের মনে কুসুমির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। কুসুম শৈলর বাল্যসখী। শৈলর সঙ্গে প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিত, শঙ্করকে

দেখিলেই মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইত। কুসুমের কচি মুখখানা তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

কুসমি খবর পেলে কি ক'রে?

সে কপাল পুড়িয়ে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে যে। তোমাদের বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে। তুমি নাকি জ্যাঠামশাইয়ের অমতে বিয়ে করেছ?

হ্যাঁ।

কেন, অমিয়াকে খুব বেশি মনে ধরেছিল?

বড্ড।

উভয়েই মুচকি হাসিয়া পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর হাসিয়া বলিল, বিয়ের আগে তাকে আমি দেখিই নি।

তবে?

বিয়ে করবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু বাবা যখন পণের জন্যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দর-কষাকষি শুরু ক'রে দিলেন, তখন আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। রোখের মাথায় ঠিক ক'রে ফেললুম যে, বিনাপণে ওইখানেই বিয়ে করব।

শৈল ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

তাই করলুম।

জ্যাঠামশাই কি করলেন?

কি আর করবেন, রেগে আমার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে দিলেন।

ও মা, তাই নাকি? তারপর?—উৎকণ্ঠায় শৈলর দুইটি চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তুমি এখন কি করছ তা হ'লে?

শঙ্কর গম্ভীরভাবে মিথ্যা কথা বলিল, চাকরি করছি।

কোথায়?

একটা আপিসে।

কোথা থাক ?

একটা মেসে।

কোন্ মেসে, ঠিকানাটা বল না ?

কিছুদিন আগে শঙ্কর যে মেসটাতে ছিল, তাহার ঠিকানা বলিয়া দিল। শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার তাহার ইচ্ছা হইল, শঙ্করকে বলে, এখানে আসিয়া থাকিতে; কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হইল, একটু ভয়ও হইল, বলিতে পারিল না। বেয়ারা মোটর হইতে জিনিসগুলি নামাইয়া আনিয়াছিল, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, এগুলো কোন্ ঘরে রাখব মা ?

এখানেই নিয়ে আয়।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শৈল বলিল, ওমা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। দাদা যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। চিঠিপত্র পাও নি তুমি ?

না। কতদিন ফিরেছে ?

তা প্রায় মাস-দুই হবে। বম্বেতেই শুনছি থাকবে, কি একটা ব্যবসা করবে নাকি, শ্বশুর টাকা দিচ্ছে, শ্বশুর খুব বড়লোক তো।

ও।

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। সুরমার কথা একবার মনে হইল, উৎপলের মুখটাও মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া গেল, কিন্তু মনে তেমন কোন সাড় জাগিল না। কিছুদিন আগে তাহার যে মন উৎপল এবং সুরমাকে লইয়া মাতিয়াছিল, সে মন আর নাই। নূতন মন নূতন জগতে নূতন প্রেরণায় নূতন স্বপ্ন দেখিতেছে। দুইটি ভৃত্য ও বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জিনিসগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছিল, আবার বলিল, অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করলি তুই।

অনর্থক কেন ?

শাড়ি, আসন, টী সেট নিশ্চয়ই তোর যথেষ্ট আছে, তবু কি দরকার ছিল আবার কেনবার ?

কি নিয়ে থাকব তা না হ'লে ? ওদের নেড়ে-চেড়েই তো সময় কাটে। আঃ, চুলে দুলটা আটকে গেল, ছাড়িয়ে দাও না শঙ্করদা।

ছাড়াইয়া দিতে দিতে শঙ্কর বলিল, শাড়ি নেড়ে তোর সময় কাটে ? কি যে বাজে কথা বলিস !

সত্যি বলছি।

গান-বাজনা শিখছিলি যে ?

শিখেছি কিছু কিছু, শোনাব কাকে, ঘরের দেওয়ালকে ? সেইজন্যে আর ভাল লাগে না ওসব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কাজ, কাজ, কাজ—সবারই খালি কাজ।

একটু অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ঝাঁজটাকে মোলায়েম করিবার জন্য শৈল হাসিল।

কাজ না করলে চলে কই ?

না, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না, অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তোমার সেই কবিতাগুলো তোমার মুখে শুনব আবার।

কোন্ কবিতাগুলো ?

সেই যেগুলো ইস্কুলে লিখেছিলে।

সেগুলো কোথায় ?

আমার কাছে আছে। খাতাখানা চুরি করেছিলাম, মনে নেই ? বার ক'রে আনি, থাম—তুমি বিছানার ওপর ভাল ক'রে ব'স।

একরূপ জোর করিয়া শঙ্করকে বিছানার উপর বসাইয়া শৈল বাহির হইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে জীর্ণ-মলাট একখানা খাতা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, পড়।

নিজের লেখা সমঝদার শ্রোতাকে পড়িয়া শোনাইবার দুর্দমনীয় বাসনা শঙ্করের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; তবু সে বলিল, সত্যি বলছি, আমার কাজ আছে এখন।

লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি, এখনই চ'লে যেও না। চা আনতে বলছি, চা খেয়ে যেও, ততক্ষণ পড় না একটু, শুনি—বড্ড একগুঁয়ে তুমি শঙ্করদা।

শৈল ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমান করিল। শঙ্করের সেই বহুদিন আগেকার কিশোরী শৈলকে মনে পড়িল, সে-ও ঠিক এমনই করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কথায় কথায় মুখ ভার করিত।

দুই ঘণ্টা পরে শঙ্কর যখন শৈলর বাড়ি হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাটা সমস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শৈল তাহাকে ছাড়ে নাই। শৈলর শেষ কথাগুলি শঙ্করের কানে বাজিতেছিল—মাঝে মাঝে তুমি এসো শঙ্করদা, আমার বড্ড একা একা লাগে। আর বাজিতেছিল শৈলর প্রশ্নটা—বউ কেমন হয়েছে সত্যি বল না, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ; রঙ কেমন, আমার চেয়েও ফরসা ?

আসিবার সময় শৈল একটা কাগজে মুড়িয়া নূতন কেনা একখানা দামী শাড়ি অমিয়ার জন্য দিয়াছে। উপহার। শৈল কিছুতেই ছাড়িল না, শঙ্করকে লইতে হইল। প্যাকেটটা বগলে করিয়া শঙ্কর ধর্মতলার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের বারান্দায় সজ্জিত পুরাতন পুস্তকগুলি শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সরিয়া গিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। কি চমৎকার চমৎকার সব বই! লুব্ধ আগ্রহে সে বই বাছিয়া সাজাইতে লাগিল। এসব বই সে কোনদিন পড়িবে কি না, পড়িবার সময় পাইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিল না। একগাদা বই বাছিয়া ফেলিল।

আরও ঘণ্টা-খানেক পরে শঙ্কর যখন বাসায় ফিরিল, তখন তাহার বগলে একগাদা বই, কিন্তু শাড়ির প্যাকেটটি নাই। অর্ধমূল্যে শাড়িটি বিক্রয় করিয়া সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়াছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে স্তূপীকৃত বইগুলি সামনে রাখিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া তাহার মনটা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল যদি জানিতে পারে, কি মনে করিবে? অমিয়া শুনিলেই বা কি ভাবিবে?

চুন্‌চুন আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বই কোথা থেকে আনলেন?

কিনে আনলাম।

কেন?

পড়ব।

চুন্‌চুনের দৃষ্টিতে বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

শঙ্করের মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল।

২৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিজের শূন্য ঘরে বেলা মল্লিক একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ঘরের বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না। সকাল হইতে একটা বদখত চেহারার লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। এখনও লোকটা গলির মোড়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। বিগত কয়েক দিনে জানালার ভিতর দিয়া আরও অশ্লীল চিঠি ও চিত্র আসিয়াছে। জনার্দন সিং চলিয়া যাইবার পর অন্য কোন চাকরও যোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কয়েক দিন হইতে অবিরত চেষ্টা করিয়াও একটা চাকর জোটে নাই, মনে হইতেছে, ষড়যন্ত্র করিয়াই সকলে যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেলার নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

বেলা দেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে?

মিহি গলায় উত্তর আসিল, আমি অপূর্ব।

ও, অপূর্ববাবু! আসুন আসুন।

অপূর্ববাবুর মত লোক আসাতেও বেলা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দিতেই এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া, পাউডার-মণ্ডিত মুখে মৃদুহাস্য বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্কুচিত বিনীত অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। চক্ষু দুইটি কিন্তু গর্তস্থ। মুখের মধ্যে কেবল গালের হাড় দুইটি এবং দাঁতগুলি প্রবলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিতেছে।

স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে যে, অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছি।

অপূর্ববাবুর মুখভাব করুণ হইয়া উঠিল।

আসুন, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে!

আমি কতবার এসে ফিরে গেছি, আপনার দেখাই পাই না।

তাই নাকি?

যখনই এসেছি, আপনার ওই গোঁফ-ওলা দারোয়ান এক কথায় আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। আজ তো তাকে দেখতে পেলুম না! মানে—লোকটা একটু যেন—

অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন। পকেট হইতে ফিনফিনে পাতলা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ানটির সম্বন্ধে সত্য অথচ অরূঢ় কি বলিবেন, নির্ণয় করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বেলা দেবীই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

হ্যাঁ, লোকটা একটু রুক্ষ-গোছের ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি। ছাড়িয়ে দিয়েও কিন্তু মুশকিলে পড়েছি, একটা দারোয়ান না হ'লে চলছে না। একটা ভাল লোক পেলে এখুনি বাহাল করি।

আকস্মিক পুলকোচ্ছ্বাসে অপূর্ববাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আসিবার

সঙ্গে সঙ্গেই বেলা দেবীর এমন একটা উপকারে লাগিতে পারিবেন, ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার !

আজই তাঁহার আপিসের নেপালী দারোয়ানটা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, দেশ হইতে তাহার ভাই আসিয়াছে, অপূর্ববাবু যদি তাহাকে কোথাও লাগাইয়া দিতে পারেন, বড় উপকৃত হয় সে।

আছে আপনার সন্ধানে কোন লোক ?

আর একবার রুমালে মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, নেপালী রাখবেন ?

কেন রাখব না, যদি বিশ্বাসী হয় ?

আমার জানাশোনা একটি নেপালী আছে। ঠিক জানাশোনা নয়, মানে—আমাদের আপিসের যে নেপালী দারোয়ানটা আছে, তারই ভাই—তাকে আমি পার্‌সোনালি অবশ্য—তবে যতদূর মনে হয়—মানে, যদি বলেন, আমি নিজে গিয়ে, অর্থাৎ—

নিজের অসংলগ্ন বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন।

বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোথা থাকে সে ?

বড়বাজারে।

তার বাসাটা চেনেন আপনি ?

চিনি।

তা হ'লে চলুন, এখনই গিয়ে ডেকে আনা যাক তাকে।

এখনই ?

হ্যাঁ, এখনই—আজই বাহাল করব। একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে ভয় করে।

এখান থেকে এখন বড়বাজার যাওয়া মানে—

নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া অপূর্ববাবু পুনরায় বলিলেন, মানে নটা বেজে গেছে কিনা, যেতে আসতে প্রায়—

চলুনা না, ট্যাক্সি ক'রে যাই।

বেলার সহিত ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসিয়া যাওয়াটা যদিও লোভনীয়

ব্যাপার, কিন্তু ভাড়াও তো কম লাগিবে না! বেলা যদি নিজে হইতে ভাড়াটা না দেন, তাঁহার কাছে ভাড়াটা দাবি করাও তো শোভন হইবে না! তুচ্ছ এই দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অকারণে চার-পাঁচটা টাকা ব্যয় করা—অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ফাঁপরে পড়িয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কি, ভাবছেন কি?

ভাবছি, এখন কেন ট্যাক্সি ক'রে হাঙ্গামা করতে যাবেন, মানে—টুমরো আমি পজিটিভ্‌লি—কথা দিচ্ছি আপনাকে—

সহসা বেলার নজরে পড়িল, ওদিকের জানালাটা হইতে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। গলির মোড়ের সেই লোকটার কথাও বেলার মনে হইল।

বেলা বলিলেন, না, আজ রাত্রেই আমার একজন লোক চাই। ডাকুন একটা ট্যাক্সিই।

ট্যাক্সি, মানে—

অপূর্ববাবু পুনরায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বেলা বলিলেন, আশ্চর্য লোক তো আপনি! আমি ভাড়া দেব, আপনি ইতস্তত করছেন কেন?

না না, ভাড়ার কথা নয়, মানে—দেখি, কটা টাকা আছে আমার কাছে।

অপূর্ববাবু পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ হাতড়াইতে লাগিলেন।

আপনি ভাড়া দিতে যাবেন কেন? কি মুশকিল! যান, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসুন।

বেশ, তাই যাই।

বাধ্য বালকের মত অপূর্বকৃষ্ণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বেলার হঠাৎ লোকটার প্রতি অনুকম্পা হইল। ভদ্রলোক আসিতে না আসিতে তাঁহাকে এমন করিয়া ফরমাশ করাটা অনুচিত হইতেছে।

একটু চা খাবেন? চা খেয়ে বরং যান। আসুন, একটু চা-ই করা যাক

আগে, আমারও আজ বিকেলে চা খাওয়া হয় নি, চা-টা খেয়ে তারপর বেরুনো যাবে।

চা-পানান্তে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর ট্যাক্সি খুঁজিতে বাহির হইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। বেলা দেবী যদি চায়ের হাঙ্গামাটা না তুলিতেন, তাহা হইলে হয়তো অচিনবাবু-নিয়োজিত চরটি অচিনবাবু-নিয়োজিত ট্যাক্সিখানি ঠিক গলির মোড়টিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইত না।

অপূর্ববাবু বাহির হইয়া দেখিলেন, গলির ঠিক মোড়েই একটি কাল সিডান-বডি ট্যাক্সি রহিয়াছে, ডাকিবামাত্রই হর্ন দিতে দিতে সেটি অগ্রসর হইয়া আসিল। বিগত কয়েক দিবস হইতে বেলা দেবীকে কোন উপায়ে আরোহীরূপে পাইবার জন্য ট্যাক্সিখানি অচিনবাবু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আশেপাশে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেলা দেবীর গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাঁহার ঘরে অশ্লীল চিঠি ছবি ফেলিয়া উত্যক্ত করিবার জন্য এবং তাঁহার ঘরের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতিবার জন্য একটি চরও অচিনবাবু নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির প্রয়োজন হইতে পারে শুনিবামাত্র চরটি গিয়া ট্যাক্সিখানাকে ডাকিয়া আনিয়া মোড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বেলা দেবী এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, চল, বড়বাজার।

অপূর্ববাবু বেলার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, পিয়ানোর সেতারের এস্রাজের অনেক ভাল গৎ যোগাড় করেছি, অনেক দিন থেকে দেব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠছে না, মানে—

আজ আনলেই পারতেন।

আজও যে আপনার দেখা পাব, তা আশা করি নি। তা ছাড়া—

মোটর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

অপূর্ববাবু এবং বেলা দেবী কেহই লক্ষ্য করিলেন না যে, গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছে না। সিডান-বডি গাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে চলিবার পর গাড়িখানা সহসা থামিয়া গেল।

ড্রাইভার বলিল, আপনারা নামুন, গাড়ির তেল ক'মে গেছে। আমি আর একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি আপনাদের মোড় থেকে।

অপূর্ববাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, সে কি! তেল ফুরিয়ে গেছে, মানে, আগেই তোমার—

এরূপ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছেন বলিয়া অপূর্ববাবু নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িলেন এবং মুখভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, এক পয়সা ভাড়া দেব না তোমাকে।

এ সংবাদে ড্রাইভার বিচলিত হইল না, অ্যালবার্ট টেরিতে একবার হাত বুলাইল, বুক-খোলা জামার পকেট হইতে সুদৃশ্য একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, বেশ, তাই যদি আপনার ধম্মো হয়, দেবেন না। এখন আমার গাড়িটা ছেড়ে দিন দয়া ক'রে।

নামিতেই হইল।

ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অধিক জেদ না করিয়া গম্ভীরমুখে গাড়ি হাঁকাইয়া গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার গলি। কলিকাতা শহরেও যে এমন একটা অন্ধকার গলি থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করা শক্ত।

বেলা বলিলেন, চলুন, হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যাক, তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি নিলেই হবে।

বেশ, তাই চলুন। উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার!

অন্ধকার গলিটার দুই পাশের বাড়িগুলা বিরাটকায় জন্তুর মত মনে

হইতেছে। কোন বাড়িতে যে কোন লোক আছে মনে হয় না, চারিদিক নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, গলিটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূরে গিয়া বড়রাস্তায় পড়িয়াছে, কে জানে! খানিক দূরে গিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল, হেলিয়া-পড়া একটা থামের উপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল, তবু একটা আলো পাওয়া গেল, মানে—অন্ধকারে যেন ক্রমশ, ঠিক ভয় নয়, একটু যেন গা-ছমছমের মত—

অপূর্ব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। আচম্বিতে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাশের আর একটা ক্ষুদ্রতর গলি হইতে বলিষ্ঠ একটা লোক ছুটিয়া আসিল এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের কয়েকটা বাড়ির কপাট খুলিয়া গেল, দুই-একটা ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূপতিত অপূর্বকৃষ্ণকে ঘিরিয়া একটা ছোটলোকের জনতা কলরব শুরু করিয়া দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় বেলা দেবী ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই আত্মস্থ হইয়া আগাইয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, এই, এই, ছেড়ে দাও ওঁকে, উনি চোর নন।

জনতা হইতে কে একজন বলিল, ইস, ভারি দরদ যে দেখছি!

আর একজন ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে সায় দিল, হ্যাঁ, পীরিত একেবারে উথলে পড়ছে!

বেলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন, বলিষ্ঠ গুণ্ডাটা অপূর্ববাবুর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

এই, কি করছ? ওঠ, ওঠ বলছি, ছেড়ে দাও ওঁকে।

গুণ্ডাটা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ছেড়ে দেব কি ঠাকরুণ! আমার ঘড়ি চুরি ক'রে ভাগছিল শালা, ওকে আমি ছেড়ে দেব?

কই তোমার ঘড়ি?

এই যে, খ্যাখেন না—শালার পকেট থেকে টান মেরে বার করলাম।

রূপার চেনসুদ্ধ একটা নিকেলের ঘড়ি সে তুলিয়া দেখাইল।

ও ঘড়ি ওঁর কাছে ছিল না। শিগগির ওঠ বলছি তুমি।

মজা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া জনতার ভিতর হইতে রোগা-গোছের এক ছোকরা আনন্দাতিশয্যে মুখের ভিতর আঙুল পুরিয়া সিটি দিল।

আর একজন বলিল, নাঃ, এমন পীরিত মাইরি নাটক-নভেলেও দেখা যায় না।

ফতুয়া-পরা প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি, এই মাগীকে সুদ্ধু নিয়ে ওই ব্যাটাকে টানতে টানতে থানায় যাও। ছি ছি ছি ছি! ভদ্দরলোকের পোশাক প'রে যত ব্যাটা ছিঁচকে আঁদাড়ে পাদাড়ে ঘুরছে আজকাল! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা!

একটি দ্বিতল বাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি যুবকও সবিস্ময়ে সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। বেলা দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ওকে ছাড়বে কি না?

জনতার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, মাইরি আর কি!

এমন সময় একটা মোটরের হেড-লাইট পড়িয়া সমস্ত স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মোটরখানি নিঃশব্দ-গতিতে আসিয়া হর্ন দিয়া জনতার সম্মুখে থামিয়া গেল, অচিনবাবু স্টিয়ারিং ছাড়িয়া মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব আয়োজন অনুযায়ী পটভূমিকা ঠিক প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার স্বকীয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

অতীব বিস্মিতকণ্ঠে ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, এ কি, মিস্ মল্লিক নাকি! আপনি হঠাৎ এখানে? বাই জোভ!

বেলা মল্লিক যেন অকুলে কূল দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি অপূর্ববাবুকে উদ্ধার করুন আগে।

নিশ্চয়।

অচিনবাবু রুষ্ট ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়া গুণ্ডাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন এবং তাহাতে ঠিক যেন জাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। গুণ্ডাটা হঠাৎ অপূর্ববাবুকে ছাড়িয়া দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলিটার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটার অভিনয়দক্ষতায় অচিনবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। বেলা দেবী লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন, অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা কৌতুকের হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। গুণ্ডাটা পলায়ন করিতেই বেলা পুনরায় অপূর্ববাবুর কাছে গেলেন, দেখিলেন, মূর্ছিত অপূর্ববাবুর নিস্পন্দ দেহটা ধূলায় লুটাইতেছে; আদ্ধির পাঞ্জাবি ছিন্ন, নাগরা পদচ্যুত হইয়াছে। অপূর্ববাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটার উপর ঝুঁকিয়া বেলা ডাকিতে লাগিলেন, অপূর্ববাবু, অপূর্ববাবু, ও অপূর্ববাবু!

অপূর্ববাবুর তবু জ্ঞান হয় না। অচিনবাবু তখন অপূর্ববাবুর দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিলেন, ঝাঁকানি খাইয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, এবং জ্ঞান হইতেই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিস মল্লিক—অ্যাঁ—আমি কোথায়—মিস মল্লিক—আমি—আপনি—

প্রিয়নাথ মল্লিক মোটরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ভগ্নীর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচিনবাবু তো তাহা হইলে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অচিনবাবু আজকাল প্রায় প্রতিদিনই বলিতেছেন যে, শুধু শঙ্কর নয়, বেলার আজকাল নিত্য নূতন বন্ধু জুটিতেছে। আজ একটু আগেই অচিনবাবু প্রিয়নাথবাবুকে বলিয়াছিলেন, মিস মল্লিকের পুরানো গানের মাস্টারের সঙ্গে আজকাল খুব মাখামাখি। আমার এক চর এসে খবর দিলে, এখনই ওঁরা ট্যাক্সি ক'রে বেলগাছিয়া অঞ্চলে এক এঁদো আড্ডায় যাবেন ঠিক করেছেন। শুনে আমার রাগ হয়ে গেল মশাই; আমি একটা গুণ্ডা ঠিক করেছি,

অপূর্ববাবুকে ধ'রে বেশ ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয় যেন। এই সময় আমরাও চলুন যাই, মিস মল্লিককে পাকড়াও ক'রে আনা যাক যদি পারা যায়। বুঝলেন না, এ একটা মস্ত সুযোগ।

সত্যই তো, অপূর্ববাবুর সঙ্গে বেলা বেলগাছিয়ায় এই অন্ধকার গলিটায় আসিয়াছে! এখানে আসিবার তাহার কি কারণ থাকিতে পারে? ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথ বেলার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেলা অপূর্ববাবুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

না না, ভয় কি আপনার। চলুন, উঠুন, এই যে নিন, জুতো পায়ে দিন।

প্রিয়নাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, ঢের হয়েছে, আর সোহাগ জানাতে হবে না। বদমায়েস পাজি কোথাকার!

অগ্রজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেলা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অন্তত বাহিরে তাহার কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তিনি প্রিয়নাথের দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ববাবুকে বলিলেন, উঠুন, এই নিন, আমার কাঁধে হাত দিন।

প্রিয়নাথের চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শ্বাপদের মত দন্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বিচ, বিচ, এ কমান বিচ! কুকুরেরও অধম!

বেলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

অচিনবাবু কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। এই লোকটা সব মাটি করিল। এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া আনিলেন যে, বেলা মোটরে উঠার আগে কিছুতেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ না করেন। আত্মপ্রকাশ করিলে বেলা হয়তো মোটরে উঠিতেই চাহিবেন না। বেলাকে মোটরে উঠাইয়া

স্টার্ট দিয়া তবে আত্মপ্রকাশ করিলেই চলিত। সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। অচিনবাবুর প্ল্যান ছিল, অপূর্ববাবুকে পৌঁছাইয়া দিয়া বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া তিনি সোজা বাহির হইয়া যাইবেন। বেলার দাদাকে বলিবেন যে, তাঁহার একটু কাজ আছে, কাজটুকু সারিয়া তিনি তাঁহাকে এবং বেলাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন গুণ্ডা এবং একটা ট্যাক্সি তিনি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া একটি জনবিরল মাঠের কাছাকাছি তিনি মোটর থামাইবেন এবং কাজের ছুতায় নামিয়া গিয়া গুণ্ডাগুলিকে খবর দিবেন। তাহারা অচিনবাবুর অনুপস্থিতিতে আসিয়া বেলাকে হরণ করিবে এবং বেলার দাদাকে অচিনবাবুর মোটরে হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রিয়নাথের চোখের সম্মুখে গুণ্ডা কর্তৃক বেলা অপহৃত হইলে এবং পরে অচিনবাবু আসিয়া প্রিয়নাথকে উদ্ধার করিলে অচিনবাবুর সহিত বেলা-অপহরণের যে কোন সংস্রব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সহসা আত্মপ্রকাশ করাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

বেলার কাঁধে ভর দিয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অচিনবাবু সহাস্য মুখে সহৃদয় ভঙ্গীতে মোটরের দ্বার খুলিয়া বলিলেন, আসুন আসুন, চলুন, পৌঁছে দিই আপনাদের। আপনি উঠুন প্রিয়নাথবাবু। বেলার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়নাথবাবু উঠিয়া বসিলেন। অপূর্ববাবুও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আপনিও উঠুন।

অনেক ধন্যবাদ, আপনি অপূর্ববাবুকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিন, আমি যাব না।

চলুন না, আপনাকেও আপনার বাসায় নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, আমি এখন বাসায় ফিরব না।

বেশ তো, কোথায় ফিরবেন বলুন, সেইখানেই নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, তার দরকার নেই, আপনারা যান।

মোটরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে আসুন ওকে, সোজা কথায় ও আসবে না।

অচিনবাবু বলিলেন, আঃ, থামুন আপনি, কি যে বলেন! তাহার পর বেলার দিকে ফিরিয়া একটু অনুনয়ভরে বলিলেন, চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি, চলুন। এবং হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাত ছেড়ে দিন আমার।

আপনি যাবেন না?

না।

কারণটা কি?

আমার খুশি।

সহসা বেলার নজরে পড়িল, আজ সকাল হইতে যে লোকটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল জনতার মধ্যে সেও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলার সন্দেহ হইল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। বহুকাল পূর্বে প্রফেসর গুপ্ত অচিনবাবু সম্বন্ধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটাও মনে পড়িয়া গেল।

চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।—অচিনবাবু পুনরায় অনুরোধ করিলেন।

আমি যাব না, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন, অপূর্ববাবুকে পৌঁছে দিন আপনি।

জোর ক'রে যদি ধ'রে নিয়ে যাই, কি করতে পারেন আপনি?

মোটরের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া প্রিয়নাথ পুনরায় গর্জন করিলেন, জোর ক'রেই আনুন না আপনি, কি করে ও দেখি একবার!

আসুন, কি ছেলেমানুষি করছেন!

অচিনবাবু এবার একটু জোরেই বেলার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বেলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সহসা অচিনবাবুর গণ্ডে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রৌঢ়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একজন

মহিলাকে এরা সবাই অপমান করছে আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! কেউ একটু সাহায্য করবেন না আমাকে?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আর পাঁচজনের মত দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে দেখিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সহসা এই প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

সাহায্য! আরে, বলে কি? আমাকে সুদ্ধ জড়াতে চায়, কি আপদ!

আর কিছু না পারেন, আমাকে অন্তত সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিন। পুলিসের আশ্রয়ে তবু খানিকটা ভরসা পাব।

দ্বিতলের বাতায়ন হইতে যুবকের মুখটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সশরীরে তিনি বাহিরে আসিয়া বেলা মল্লিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আসুন, আমার এই বাইরের ঘরে এসে বসুন, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি।

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, এইবার ঠিক হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। এবং সমস্ত ঘটনাবলীর উপর যবনিকাপাত করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দিলেন।

বেলা মল্লিক অবিলম্বে গিয়া যুবকের বাহিরের ঘরে বসিলেন। অচিনবাবুর যদিও ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এখন ইহা লইয়া ধাঁটাধাঁটি করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া গম্ভীরভাবে মোটরে উঠিয়া মোটরে স্টার্ট দিলেন। প্রিয়নাথ এবং অপূর্ববাবু বেলার কাণ্ড দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দ-গতিতে মোটর গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনতাও ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

প্রফেসর গুপ্ত খোলা ছাদে বসিয়া কাব্য-আলোচনা করিতেছিলেন। দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল, পাশের তেপায়ার উপর রক্ষিত সুদৃশ্য কাচপাত্রে

স্তূপীকৃত বেলফুলগুলি হইতে মৃদু সৌরভ সমীরিত হইতেছিল, সবুজ রেশমের ঘেরাটোপ-দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক বাতির আলোকে পরিবেষ্টনী শ্যামস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একটি আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া আবেশবিহ্বল-নয়নে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন এবং প্রফেসর গুপ্ত তন্ময়চিত্তে মহাকবি ভাস বিরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটক পাঠ করিতেছিলেন—

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।
অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥

কাব্যের ছন্দ-মন্ত্রে উভয়েই স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা যে বিংশ শতাব্দী এবং তাঁহারা কলিকাতা শহরে আছেন—প্রত্যক্ষভাবে এ চেতনা প্রফেসর গুপ্তের অন্তত ছিল না। অতি-দূর বিগত রূপলোকের আবেষ্টনীতে উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর আনন্দ-শঙ্কা-শিহরণের মধ্যে নিজেকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল।

বাহিরের দুয়ারে কে কড়া নাড়িতেছে!

এখানে আবার কে আসিল! এই সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই প্রফেসর গুপ্ত আলাদা এ ছোট বাসাটি ভাড়া করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা আলাদা বাসায় থাকে, প্রফেসর গুপ্ত সকালে সেখানে থাকেন, রাত্রেও সেখানে ফিরিয়া যান, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। কলিকাতার নির্জন অংশে এই ছোট বাসাটি তিনি ভাড়া করিয়াছেন—সংসারের কলরব, স্ত্রীর মুখর ভাষণ এবং কৌতূহলী প্রতিবেশী-গণের আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অবসরটুকু বিনোদন করিবার জন্য। নির্বাচিত অন্তরঙ্গ দুই-চারিজন বান্ধব-বান্ধবী ভিন্ন এ বাসার ঠিকানাই কেহ জানে না। এত রাত্রে কে আসিল?

প্রফেসর গুপ্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

পাশের বাড়িতে নয় তো?

আবার শব্দ হইল।

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এই বাড়িতেই। যান, দেখে আসুন, কে এল! আমাকেও এবার পৌঁছে দিয়ে আসুন, রাত অনেক হ'ল। রিনিটা এতদিন ছিল, কোন ভাবনাই ছিল না।

প্রফেসর গুপ্ত উঠিতে উঠিতে বলিলেন, রিনি কি চ'লে গেছে?

হ্যাঁ, পরশুদিন ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে ওকে।

লক্ষ্ণৌ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত নামিয়া গেলেন।

কপাট খুলিয়া যাঁহাকে তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই, মিস বেলা মল্লিক অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রফেসর গুপ্তের মনে পড়িল, এই নূতন বাসাটার ঠিকানা দিয়া কিছুদিন পূর্বে তিনি বেলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা আসেন নাই। রাস্তার উপরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল এবং ট্যাক্সিতে একজন কে যেন বসিয়া ছিলেন।

হঠাৎ তুমি এ সময়ে যে?

যখন নেমন্তন্ন করেছিলেন, আসতে পারি নি, আজ বিপদে প'ড়ে এসেছি। আমাকে এক রাত্রির জন্যে আজ আশ্রয় দিতে পারবেন?

কেন, ব্যাপার কি?

আমি এখনই বাসায় ফিরে দেখলাম, আমার ঘরে তালা ভেঙে কে ঢুকেছিল। আমার চাকরবাকর এখন কেউ নেই, একা ও-বাসায় থাকতে ভয় করছে।

জনার্দন সিং কোথা গেল?

সে দেশে গেছে। আশ্রয় দিতে পারবেন এক রাত্রের মত?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, ভেতরে এস। মিসেস মিত্রও আছেন এখানে।

মিষ্টিদি?

হ্যাঁ।

দাঁড়ান, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে।

ট্যাক্সির নিকট গিয়া বেলা সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সে তাঁহাকে আবার বেলগাছিয়ায় পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য তিনি অগ্রিম ভাড়াও দিয়া দিলেন। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। প্রফেসর গুপ্ত ও বেলা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি, বেলা নাকি? তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে?

এমনই এলাম।—তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আজ থাকব রাত্রে এখানে।

তার মানে?

প্রফেসর গুপ্ত উত্তর দিলেন, ওর বাড়িতে তালা ভেঙে কে যেন ঢুকেছিল আজ, সেই ভয়ে ও পালিয়ে এসেছে, এখানে থাকতে চাইছে রাত্রে।

মিষ্টিদিদির মুখের হাসিটা একটু যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বেলা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত সহসা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি, তোমার কোমরে ওটা কি?

ছোরা। এখুনি কিনলাম।

কেন?

কাছে একটা থাকা ভাল।

মিষ্টিদিদিও ক্ষণকাল কুচকুচে কালো খাপটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন এবং পুনরায় আর একটু হাসিয়া পুনরুক্তি করিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বলা বাহুল্য, প্রফেসর গুপ্ত একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। প্রথমত, বেলার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই যে আকস্মিক, প্রফেসর গুপ্ত ইহার বিন্দুবিসর্গও যে পূর্বাহ্ণে জানিতেন না, তাহা হয়তো মিসেস মিত্র বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাঁহার হাসির অন্তরালে যাহা

বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তাহা আনন্দজনিত অথবা আনন্দজনক নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবিতেছিলেন, বেলাকে লইয়া কোথায় রাখা যায়? এ বাসায় প্রফেসর গুপ্ত থাকেন না, রাত্রে বাড়িতে ফিরিয়া যান, সেখানে বেলাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানেও বেলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া অসঙ্গত। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। বেলা এবং মিষ্টিদিদি নীরবে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রফেসর গুপ্ত ভাবিতেছিলেন, কি করা যায়!

সহসা মিষ্টিদিদি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

বেলা এখানে কোথা থাকবে? তার চেয়ে চলুক আমার সঙ্গে, রিনিটা চ'লে গিয়ে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্রফেসর গুপ্ত সোৎসাহে সায় দিলেন।

বেশ তো, সেই ভাল।

বেলাও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল মিষ্টিদিদির সাহচর্য মনোরম না হইলেও নিরাপদ। একটা রাত্রি কোনরকমে তাঁহার সহিত কাটাইয়া দেওয়া পারে। বেশ তো, তাই চলুন।

সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন।

২৬

শঙ্করের পক্ষে মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটির অত্যাচার আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা শঙ্করের অজ্ঞতার কিছু-না-কিছু নিদর্শন প্রায় প্রত্যহই গোপনে মাতৃসমীপে উপস্থাপিত করিত। কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়াল তাহা লইয়া শঙ্করকে সোজাসুজি কিছু বলা যদিও অকর্তব্য মনে করিতেন, কিন্তু বাঁকাপথে শঙ্করকে সচেতন করিয়া

দিতে ইতস্তত করিতেন না। যেমন আজ সকালে বলিতেছিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, অনিলটার সব বিষয়ে জানবার এমন আগ্রহ! আমাকে কাল থেকে ও বিরক্ত ক'রে মারছে পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে। আপনাকে হয়তো ভয়ে বলতে পারে নি, আপনি তো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান, পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় দয়া ক'রে দেখে আসবেন তো একটু, আপনারও হয়তো সব জানা নেই ও-সম্বন্ধে। আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। ভয়ে ভয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, এরূপ ভীতু প্রকৃতির বালক অনিলচন্দ্র নয়। সে শঙ্করকে পেঙ্গুইনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং শঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে। কারণ নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি-মানসে তো সে শঙ্করকে প্রশ্ন করে নাই, সে শঙ্করের বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য প্রশ্নটা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য একজন সহপাঠীর বাড়িতে একটা মাসিক-পত্রে পেঙ্গুইন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হইয়া বসিয়াছিল। শঙ্করকে বিব্রত করাই তাহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালকে মৃদু হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব পেঙ্গুইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনিলের জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত করিয়া দিবে। অনিল সম্বন্ধে সত্য সত্যই তাহার যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সে মিসেস স্যানিয়ালকে বলে নাই। অকস্মাৎ সহায়-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া ক্রমশ সে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে-ছিল যে, জটিল সংসার-পথে স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে সব সময় মুখের কথা এবং মনের কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখের রূঢ় সত্যভাষণ কেহই শুনিতে চাহে না। প্রফেসর গুপ্ত তাহাকে যে টুইশনিটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন, একটু মানাইয়া চলিলে তাহা থাকিত এবং তাহাকে এমন দুর্দশায় পড়িতে হইত না। স্পষ্ট-ভাষণের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া না আনিলে যে উপায় নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই মিসেস স্যানিয়ালকে বলিতে পারিল না, আপনার

পুত্র দুইটি ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ডেঁপোমির প্রশ্রয় দিলে উহারা উচ্ছন্ন যাইবে। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে আদর্শ মানবে পরিণত করিবার দায়িত্ব তাহার নহে। তাহার কর্তব্য সর্বাগ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া। যেমন করিয়া হউক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যতদিন তাহা না পারিতেছে, ততদিন একটা অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানকে উগ্রভাবে আস্ফালিত করিয়া লাভ নাই। যতদিন একটা কিছু না জুটিতেছে, ততদিন পেটভাতায় থাকিয়াও অখিল-অনিলের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। শঙ্কর ভাবিয়া পাইত না, অখিল-অনিল তাহাকে ক্রমাগত এমন জ্বালাতন করে কেন? শঙ্কর না জানিলেও একটা কারণ ছিল। শঙ্কর আসিবার পূর্বে চুনচুন ইহাদের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, শঙ্কর খুব বিদ্বান, নানা বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান। শঙ্করের বিদ্যাবত্তাকে পদে পদে বিমলিন করিয়া দিয়া তাহারা চুনচুনের উক্তি যে মিথ্যা, মিসেস স্যানিয়ালের নিকট তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইত। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই সম্ভবত তিনি শঙ্করকে বিদায় করিয়া দেন নাই। শঙ্কর যে প্রতিদিন দুই বেলা অখিল-অনিলের পাঠ্যবিষয়গুলি অতিশয় পরিশ্রমসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেয়—সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবুকে বলিয়া থাকেন, যদিও আমার অখিল-অনিলকে পড়াবার মত বিদ্যে শঙ্করবাবুর নেই, তবু ছেলেটিকে রেখেছি. বাড়িতে, ভদ্রলোকের ছেলে, বিপদে পড়েছে, হাজার হোক—। কাঁচাপাকা-গোঁফ-দাড়ি-ভ্রূ-সমন্বিত পীতাম্বরবাবু চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন, যাহার অর্থ—এই তো আপনার মত মহিয়সী মহিলার উপযুক্ত কথা। শঙ্কর-সম্পর্কীয় আলোচনা অবশ্য বেশিক্ষণ চলিত না। কারণ পীতাম্বরবাবু আসিলেই মিসেস স্যানিয়াল কোন না কোন ছুতায় চুনচুনকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে পীতাম্বরবাবুর দৃষ্টির সম্মুখবর্তী করিয়া দিতেন। এই ঈষন্নির্বোধ প্রৌঢ় বিপত্নীক দেবরটির স্কন্ধে চুনচুনকে চাপাইয়া দিবার সুবুদ্ধি সম্ভবত কর্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুদিন হইতে অঙ্কুরিত

হইয়াছিল। চুনচুন আবার কখন কি করিয়া বসে, সে সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পীতাম্বরবাবু শুধু বিপত্নীক নহেন, অপুত্রক এবং শাঁসালো। চুনচুনের সহিত ইঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে সব দিক দিয়াই সুখের হইবে—ইহাই কর্তব্যপরায়ণা মিসেস শ্যানিয়ালের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ তো আজকাল অনেকেই করিতেছে, ইহারাই বা করিবে না কেন? চুনচুন যদিও কিছু বলে নাই, তবু শঙ্কর দুই-চারি দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। কিন্তু, শুধু বুঝিয়া কি করিবে? চুনচুনকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কোন সঙ্গতিই এখন তাহার নাই। নিজের সামর্থ্য থাকিলে চুনচুনকে হয়তো সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন সে নিজেই নিরুপায়। চুনচুনের এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা শঙ্করকে আরও যেন উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব, একটা চাকুরি তাহাকে যোগাড় করিয়া ফেলিতেই হইবে।

অখিল-অনিলকে পড়াইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার পর শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশবাবুর সহিত দেখা করিয়া আজই সে ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, ওই প্রুফ-রীডারের চাকুরিটা তাহার হইবে কি না! প্রুফ সংশোধন করা বিদ্যাটা সে তো ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল দুপুরবেলাটা সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটায়। সাহিত্য, বিশেষত সাহিত্য-সমালোচনার বইগুলি তাহার বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশে সাহিত্য বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা যে কতদূর অসাহিত্য, ক্রমশ তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে। বিদেশী সাহিত্যের নকলে মৌলিকতা জাহির করিতে গিয়া যেসব অসুন্দর রচনা ছদ্মবেশে আসর জমাইতেছে, তাহাদের ব্যঙ্গ করিয়া সে কয়েকটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া শঙ্কর সহসা থামিয়া গেল। ঠিক বাহিরের ঘরে প্রকাশবাবু এবং আরও কে

একজন বসিয়া তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। উৎকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কই মশাই, প্রুফ-রীডার সেই যে ছেলেটির কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে আনলেন না তো?

বক্তা সম্ভবত প্রেসের মালিক।

প্রকাশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাকে হাতে রেখেছি, একটু অপেক্ষা করুন না মশাই দুদিন।

কেন?

আরে মশাই, ও হ'ল গিয়ে (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) পরের ছেলে। একটি নিজেদের ছোকরা যদি পাই, তা হ'লে আর ওকে ডাকি কেন, বুঝলেন না? আমাদের মাইতি মশায়ের একটি ভাইপো দেশ থেকে নাকি আসবে শিগগির শুনেছি, সে যদি আসে, তা হ'লে আর—। শঙ্কর আর দ্বারে করাঘাত করিল না, দাঁড়াইলও না। বিপরীত মুখে সোজা হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।…নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হইল, এইবার বাড়ি ফেরা দরকার, রাত হইয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একটা গলিতে ঢুকিবামাত্রই একটি দ্রুতগামী সাইকেলের সহিত ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। সাইকেল-আরোহী নামিয়া পড়িল।

এ কি, চাম গ্যান্ট্রণ্ড যে!

ভন্টু!

কোথাও লাগে নি তো?

না।

এত জোরে বেল দিচ্ছিলাম, তুই শুনতে পাস নি? থিঙ্কিং আপিস খুলতে খুলতে আসছিলি বুঝি? একদিন থিংকিং আপিস খুলবি দেখছি। অনেকদিন তোর খবর-টবর পাই না—ব্যাপার কি বল্‌তো, কোথা যাচ্ছিস?

বাসায়।

বাসা আবার কোথায় ?

গড়পার।

যদিও ভন্টু সব জানিত, তবু জিজ্ঞাসা করিল, হস্টেলে থাকিস না আজকাল ?

না।

চল্, আমাদের বাড়ি চল্। বিড্‌ডিকার আজ কৈশিয় অ্যাফেয়ারে ঢুকেছে, এতদিন পরে তোকে দেখলে খুশি হবে। কাল রবিবার, আমার ছুটি আছে, হোল নাইট প্রোগ্রামে ঢুকি চল্, আজ তোর সমস্ত হদিস ইন্‌ডিটেল আয়ত্ত করব।

শঙ্কর দোটানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভন্টুকে দেখিয়া ভালও লাগিতেছিল, অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল। যে ভন্টুকে সে এতকাল অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে সে নিজের সব কথা খুলিয়া বলিবে কি করিয়া ? কোনও একটা অজুহাতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু ভন্টু কিছুতেই ছাড়ল না।

শঙ্কর তখন বলিল, তা হ'লে বাসায় একটা খবর দিয়ে যেতে হয়, তা না হ'লে ওরা ভাববে।

বেশ, তাই চল্।

শঙ্কর যখন ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় রাত এগারোটা। ভন্টুর বউদিদি রান্নাবাড়া শেষ করিয়া ভন্টুর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ভন্টুর সহিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

ওমা, এতদিন পরে পথ ভুলে না কি ?

শঙ্কর একটু হাসিল।

ভন্টু বলিল, ও একটা চোর, চেন না ওকে।

এস, ব'স।

বউদিদি তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছ না কি ?

ভন্টু পুনরায় উত্তর দিল, ভুলে যাও সেসব কথা, মুড়ি মুলে খাবে ও এখন।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, শুনলাম, আপনি মাছ-টাছ অনেক রকম রান্না করেছেন, সেই লোভে এলাম।

বেশ তো।

ভন্টু বাইকটা উঠানে রাখিবার জন্য সেটাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর বউদিদিকে বলিল, আমি খবর-টবর না দিয়ে অসময়ে এলাম, কম প'ড়ে যাবে না তো ?

একমুখ হাসিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, যা আছে তিন জনে ভাগ ক'রে খাব।

ঘরের ভিতর হইতে দরাজ গলায় বাকু হাঁক দিলেন, ও বউমা, ভন্টু ফিরল ? চারদিকে যা দাঙ্গা হচ্ছে!

বউদিদি ঘরের ভিতর গেলেন।

ভন্টু ফিরেছে, বাঁচা গেল! ও, তাই নাকি ? শঙ্করও এসেছে, ভাল ভাল। কিন্তু চারদিকে ভীষণ দাঙ্গা, সব লোক ক্ষেপে উঠেছে, শঙ্করকে আজ আর যেতে দিও না এত রাত্রে, এইখানেই খাওয়াদাওয়া ক'রে শুয়ে থাক। 'বঙ্গবাসী' যা লিখছে—ভীষণ কাণ্ড।

বউদিদি হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভন্টু বাইক রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড বাকুল্যাণ্ড কি বলছেন ?

উনি আজ সন্ধ্যে থেকে নিজের আলোটি জেলে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজে বেরিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তুমি এতক্ষণ ফিরছিলে না, খুব ভাবছিলেন উনি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, দাঙ্গা তো বড়বাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে হয়েছিল, এখন তো আর কিছু নেই।

ভন্টু বলিল, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, তুই তার কি বুঝবি ?

বউদিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাবা যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পড়েন, ওঁর কাছে খবরটা আজ এসে পৌঁছেছে। উনি কানে তো একদম কিছু শোনেন না, 'বঙ্গবাসী' প'ড়েই বাইরের খবর যা কিছু পান।

ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, নতুন আলোটা বাকুর পছন্দ হয়েছে ?

খুব। কাউকে হাত দিতে দেন না, আমি সন্তর্পণে খালি তেলটি ভ'রে দিই। উনি নিজের হাতে চিমনি ডোম সমস্ত পরিষ্কার করেন। এ তুমি এক আপদ জুটিয়েছ বাপু।

কেন ?

ছাইয়ের গুঁড়ো, ফরসা ন্যাকড়া, কাঁচি—ওঁর বাতি জ্বালার তরিবৎ করতে করতে সমস্ত বিকেলটা যায় আমার।

ভন্টু শরীরের উপরাধ নাচাইতে নাচাইতে বলিল, বা কুর কুর কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বউয়ের কাছে ও-রকম ঢঙ করলে বউ কাছেও ঘেঁষবে না ব'লে দিচ্ছি। শঙ্কর-ঠাকুরপোকে বলেছ সব কথা ?

শঙ্কর বলিল, শুনেছি।

একমুখ হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, আপিসের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, অনেক দেবে থোবে।

ভন্টু ঠাকুর ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। শঙ্করকে বলিল, দেখ্‌ দেখ্‌, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডকে দেখবি আয়।

শঙ্করও উঠিয়া উঁকি দিয়া দেখিল, ধপধপে ফরসা বিছানায় বসিয়া পরিষ্কার-ওয়াড়-দেওয়া এবং দামী-তোয়ালে-আবৃত তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বাকু 'বঙ্গবাসী' পাঠ করিতেছেন। পাশে টুলের উপর প্রকাণ্ড গড়গড়া, রুপালী-জরি-লাগানো জমকালো নল, মাথার দিকে টেবিলে শুভ্র-ডোম-সমন্বিত সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প্‌। চশমার পুরু লেন্স্‌ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে।

শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন ধপধপে ফরসা মুখমণ্ডলে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস বসিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি দুইখানি আসন পাতিয়া গ্লাসে জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন, আর রাত ক'রো না, ব'স তোমরা।

উভয়ে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভন্টু বলিল, দাদা বোধ হয় আজ স্টার্ট্ করবেন বউদি।

বউদিদি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তাই তো লিখেছিলেন।

শঙ্কর খবরটা শোনে নাই, বলিল, দাদা ফিরে আসছেন নাকি?

বউদিদি নিজের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শরীর বেশ সেরে গেছে, জ্বর-টর আর হয় না।

জলের গ্লাস দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বউদিদি ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভন্টু বলিল, বউদি, শোন, মাছের মুড়োটা এই ছোকরাকে দিও। অত্যন্ত সৎকার্য করছেন ইনি আজকাল; বিয়ে ক'রে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রে-ট সোল!

বিবাহের কথায় বউদিদি শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অমন গোমড়া-গোছের মুখ ক'রে কেন ব'সে আছিস রে রাস্কেল! ভরপেট খেয়ে আজ ঘুমো, কাল জালফিদারিক ব্যাপারে ঢুকব, দেখি কি করতে পারি!

জাল্‌ফিদারিক মানে?

জুল্‌ফিদার শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করলে জাল্‌ফিদারিক হয় না?

তাতে কি?

আমাদের আপিসের বড়বাবুকে দেখিস নি কখনও?

না।

হি ইজ জুল্‌ফিদার দি গ্রেট—মাই প্রস্‌পেক্‌টিভ ফাদার-ইন-ল। কাল

তাকে খজলে দেখব, তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। আজ ভরপেট খেয়ে বাফেলোয়িং কর্‌।

বাফেলোয়িং শব্দটাও শঙ্কর বুঝিতে পারিল না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ভন্টু বলিল, মোষের মত ঘুমো।

বউদিদি দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, খাও, নেবু কেটে রেখেছি, নিয়ে আসছি।

ভন্টু বলিল, সেটি হচ্ছে না। তোমার যা কিছু আছে—পাই পয়সা সমস্ত নিয়ে এস, আর একখানা থালাও নিয়ে এস, যা আছে তিনজনে সমান ভাগ ক'রে খাব। আমরা ইডিয়টের মত গোগ্রাসে গিলে যাব আর তুমি উপোস ক'রে গ্রেট্‌নেসের লদ্‌কালদ্‌কি করবে, সেটি হচ্ছে না।

ব'স না তোমরা, বসছি আমিও।

আমাদের সামনে বসতে হবে, তোমাকে চিনি না আমি—থিফ কোথাকার!

বাবা বাবা, বড় জ্বালাতন কর তুমি ঠাকুরপো!

শঙ্কর বলিল, ভাগ ক'রে খাওয়ারই তো কথা হয়েছিল।

অগত্যা বউদিদি আর একটি থালা আনিতে গেলেন।

২৫

পরদিন সকালে শঙ্কর বাসায় ফিরিয়াই শুনিল যে, মুকুজ্জেমশাই কাল রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার পর আসিয়াছিলেন এবং শঙ্করকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাটা প্যারুপেন্‌টাইন লেনের। মুকুজ্জেমশাই বাসা পরিবর্তন করিয়াছেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় আর তিনি থাকেন না। সংবাদটা শুনিয়াই শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মিসেস স্যানিয়াল বলিলেন, আপনি এখন আবার বেরুচ্ছেন নাকি কোথাও?

হ্যাঁ।

অখিল ডিনামিক্সের কি যেন একটা বুঝতে পারছে না। কাল রাত্রে আপনি চ'লে যাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। ভেবেছিল, আপনি ফিরলে সকালেই বুঝিয়ে নেবে। কাল তো আপনি সারারাত বাইরে রইলেন, আজ আবার এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন! ওরে অখিল!

অখিল পাশের ঘরে বসিয়া ক্যারম খেলিতেছিল। শঙ্করের মেজাজটা ভাল ছিল না, তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, এখন আমাকে যেতেই হবে, আমি ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।

মিসেস স্যানিয়ালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল। মিসেস স্যানিয়াল শঙ্করের গমন-পথের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন এবং তাহার পর চুনচুনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, ক্রমশ গুণ বেরুচ্ছে ভদ্রলোকের। শুধু শুধু কি আর ভগবান কাউকে বিপদে ফেলেন! তা ফেলেন না। কি ছেলে, কি মেয়ে—আজকাল কারও কর্তব্যবোধ নেই, সেইজন্যেই এত দুঃখ তাদের। চুনচুন ঘরের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল, নীরবে তাহাই করিতে লাগিল। মিসেস স্যানিয়াল তাহার দিকে একটা রুষ্ট দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর দ্রুত পথ অতিবাহন করিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। সারা মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ভন্টু, ভন্টুর বউদিদি কাল তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে; ভন্টু তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক সে তাহার হবু-শ্বশুরকে ধরিয়া তাহাকে তাহাদেরই আপিসে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া দিবে। তাহাদের আপিসে শীঘ্রই একজন নাকি লোক বাহাল করা হইবে, বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে শুরু—দেড়শোর গ্রেড। ভন্টু বলিয়াছে, এখন এইটাতেই ঢোক্‌, তারপর ঝুনুফিদারকে দুয়ারে লিফ্‌ট করিয়ে দেব তোর। একবার সুড়ঙ্গ কেটে ঢোক্‌ তো। এই দেখ্‌ না, আমার আড়াইশোর গ্রেডে লিফ্‌ট হয়ে গেছে? চাকরির এমন একটা আশু এবং সুনিশ্চিত-প্রায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিন্তু শঙ্করের চিত্ত আনন্দিত হইয়া উঠে নাই।

মনের ভিতরটা কেমন যেন করকর করিতেছিল। যে ভন্টু বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, সে-ই তাহাকে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, আড়াই শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কিছু লাইফ ইন্সিওর করিয়াছে এবং শীঘ্র আরও করিবে। অথচ সে আত্মীয়পরিজন বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত ঝুটা একটা আদর্শের পতাকা স্কন্ধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আদর্শের মূল্য কি? তা ছাড়া, সত্যই কি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল? সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়—ঝোঁকের মাথায় নিজের ক্ষুধিত বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার জন্য। সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। ওই অতি-সরল হাবা-গোবা অমিয়া ইন্ধনের যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। বাসনা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার মত ক্ষমতা ওই ঘোমটা-দেওয়া জড়ভরত প্রকৃতির অমিয়ার মধ্যে নাই। শঙ্করের বারম্বার মনে হইতে লাগিল, সে ঠকিয়া গিয়াছে—ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর উপায় নাই, এই ভুলটাকে লইয়াই সারা জীবন চলিতে হইবে। ঈর্ষার ক্ষুদ্র কীটটা অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া দংশন করিতেছিল, নিজের দুরবস্থায় এবং ভন্টুর সচ্ছলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেমন যেন বিষাইয়া উঠিয়াছিল, মনে এতটুকু স্বস্তি ছিল না।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর অনেক খুঁজিয়া সে অবশেষে সার্পেন্টাইন লেনে মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। একটি ছোট দ্বিতল বাসা। নীচের বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নাই, আর একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন।

মুকুজ্জেমশাই কোথায়?

তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনার নামই কি শঙ্করবাবু?

হ্যাঁ।

বসুন, আপনাকে বসতে ব'লে গেছেন তিনি, এখনই আসবেন।

শঙ্কর নিকটের বেঞ্চিতে উপবেশন করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শঙ্করের

মুখের দিকে সস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলি[illegible], আপনাকে যেন কোথায় দেখছি ব'লে মনে হচ্ছে।

শঙ্করও হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আপনার মুখটাও চেনা চেনা ঠেকছে।

ভন্টু থাকিলে আসুনি-দারুজির পিতা নিবারণবাবুকে অবিলম্বে চিনিতে পারিত। শঙ্কর মাত্র একদিন ভন্টুর সহিত নিবারণবাবুর দোকানে চা পান করিতে গিয়াছিল; সুতরাং নিবারণবাবুকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছে মনে করিতে পারিল না। এই ছোট দ্বিতল বাড়িখানি নিবারণবাবুরই, মুকুজ্জেমশাই ভাড়া লইয়াছেন। নিবারণবাবু যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িটিও পাশেই। শুধু ভাড়াটে হিসাবেই নয়, মুকুজ্জেমশাই লোকটি পরোপকারপ্রবণ এবং নানাস্থানে তাঁহার অনেক [illegible] শোনা লোক আছে শুনিয়া নিবারণবাবু তাঁহার সহিত আলাপ [illegible] আসুনির কোন সন্ধানই এখনও মেলে নাই। পুলিসে সংবাদ দি[illegible] বটে, [illegible] পুলিস কিছু করিতে পারিতেছে না। নিবারণবাবু মনে [illegible]নে ঠিক করিয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইকে সব কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

আপনি বসুন শঙ্করবাবু, আমি উঠি। আপনাকে আটকাবার জন্যেই মুকুজ্জেমশাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে তিনি এই একটু বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।

মৃন্ময়বাবু এখানে আছেন নাকি?

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন, ওপরে আছেন। আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, আমাকে দোকানে বেরুতে হবে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। মৃন্ময়ের স্ত্রীর কথায় বহুদিন আগেকার একটা ছবি শঙ্করের মনে জাগিয়া উঠিল। মৃন্ময় মোটর চাপা পড়িয়া হাসপাতালে ছিল এবং তাহার স্ত্রীকে রাত্রে সেখানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা হাসির মুখখানা মনে পড়িল। সহসা রিনির মুখখানাও মনে পড়িয়া গেল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে রিনির বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করকে কি তাহার এখনও মনে আছে? শঙ্করকে কি সে

ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? বহুদিন পরে রিনির স্মৃতিকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা স্বপ্নলোক সৃজন করিতে লাগিল।

শঙ্কর এসে পড়েছ দেখছি!

অন্যমনস্ক শঙ্কর সচকিত হইয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই আসিয়াছেন, সঙ্গে মৃন্ময়। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু বসিলেন না, বলিলেন, তুমি এইখানেই খেয়ে যেও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, পালিও না যেন। আমি সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট থেকে আসছি এখনই ঘুরে।

ও বাসায় কে আছে?

ও বাসায় একটি রুগী আছে। আমারই চেনা-শোনা একজন, রাজমহল থেকে এসেছে; যে [illegible] ছাত্রে থাকত সেখানে, সে দু দিন থেকে আসছে না। তার একটা [illegible] ক'রে দিয়ে আসছি আমি এখনই। তুমি যেও না, বম্বে থেকে চিঠি এসেছে, হয়তো হয়েও যেতে পারে কাজটা। ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন তারা তোমার ফোটো চেয়েছে একখানা। আমি একজন ফোটোগ্রাফারকে ব'লে এলাম, সে বিকেলের দিকে আসবে।—মৃন্ময়, ও মৃন্ময়, তুমি এসে শঙ্করের সঙ্গে গল্প-সল্প কর ততক্ষণ।

শঙ্কর মৃন্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত কথা কহিতেছিল, কখন সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই।

আপনি যান, আমি বসছি।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর পুনরায় বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ফোটো চাহিয়াছে কেন? ফোটো লইয়া তাহারা কি করিবে? সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল, যিনি মাসিক-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, হয়তো তিনি একটি কন্যারত্নেরও স্বত্বাধিকারী। পছন্দসই একটি সহকারী সম্পাদক পাইলে তাহাকে জামাই-পদেও বরণ করিবেন। এবার ফোটো চাহিয়াছেন। ফোটো পছন্দ হইলে বোধ হয় কুষ্ঠি চাহিয়া পাঠাইবেন। মনে মনে শঙ্কর এক ব্যক্তিকে জামাই সহকারী

সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনায় রঙ চড়াইতে লাগিল। মেয়েটি হয়তো লাবণ্যময়ী পুষ্পিত-যৌবনা তন্বী, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি মাসে হয়তো একটি করিয়া কবিতা লিখিতে হইবে, হয়তো কবিতা তাহার পছন্দ হইবে না, হয়তো সেই বিম্বাধরোষ্ঠীকে বিগলিত করিবার সাধনায় নব নব ছন্দ উপমার অনুসন্ধানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। হয়তো—

সহসা উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া একটা উচ্চ নারীকণ্ঠস্বর তাহার কল্পনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জানি গো জানি, সব জানি—আমার কাছে আর অত ভালবাসা ফলাতে হবে না; তোমার স্বর্ণলতার কাছে ওসব সোহাগ জানাওগে যাও, তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই আমার।

স্বর্ণলতা! চকিতের মধ্যে শঙ্করের মনে বহুকাল পূর্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল। স্বর্ণলতার নামাঙ্কিত সেই চিঠিখানি এখনও তাহার কাছে আছে। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিল, তাহার চক্ষু দুইটি হইতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।—মৃন্ময় হাসিয়া বলিল।

তা হ'লই বা। আমি বেশ তো ব'সেই আছি।

একটু ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় বলিল, আমার সব কথা শুনেছেন আপনি?

না, কিছুই শুনি নি।

শোনবার কথা অবশ্য নয়, কারণ কাউকেই আমি জানাই নি, এমন কি অন্টুকে পর্যন্ত নয়। মুকুজ্জেমশাই অবশ্য জানেন সব কথা, কিন্তু তাঁকেও হালি, মানে—আমার স্ত্রী বলেছে, আমি বলি নি।

তাহার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা পাঁচজনকে ব'লে বেড়িয়ে লাভ কি বলুন?

মিনিটখানেক অস্বস্তিকর একটা নীরবতার পর শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

আমার এক ছোট্ট ভাই ছিল, চিনতেন তাকে আপনি? আপনাদের কলেজেই পড়ত।

কি নাম বলুন তো?

চিন্ময়।

শঙ্কর মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে পড়িল না। তথাপি বলিল, মনে হচ্ছে যেন নামটা শোনা।

আমার সেই ভাই বোমার দলে যোগ দিয়ে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে জেলে আছে এখন। আর সেইজন্যেই আমার চাকরিটি গেছে। আমি পুলিসের আই.বি.তে চাকরি করতাম। যার নিজের ভাই রেভলিউশনারি, তাকে আই.বি.তে রাখবে কেন? মৃন্ময় সহসা চুপ করিয়া গিয়া আবার বলিল, দুঃখ তাও নয়, আসল দুঃখ—। পুনরায় থামিয়া গেল, আবার তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক আলা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আবার জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আসল দুঃখ, I am a fallen man—আমার পতন হয়েছে, সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। I have bungled my whole life—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছি।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল, মৃন্ময় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট বসুন, আমি ব'লে আসি—আপনি খাবেন আজ দুপুরে। আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

শঙ্করকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

২৬

যে দিন মনোরমা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় অজ্ঞান হইয়া গেল, সেদিন হইতে মুকুজ্জেমশাই ও-বাসায় আর রাত্রিবাস করেন নাই। ডাক্তার, নার্স ডাকিয়া তিনি মনোরমার চিকিৎসার

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকা উচিত মনে করেন নাই। পরদিন গিয়া একজন রাঁধুনী ও একজন চাকরানী বাহাল করিয়া মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি রোজ আসব। বুড়ী রাঁধুনী তার ছেলেকে নিয়ে রাত্রে থাকবে, চাকরানীও রাত নটা পর্যন্ত থাকবে। আমার সঙ্গে আর একটি ছেলে আছে, তাই আমি আর একটি বাসা নিয়েছি। আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব তোমার, কোন ভাবনা নেই।

মনোরমা কোন আপত্তি করে নাই, বস্তুত কোন উত্তরই সে দেয় নাই। অজ্ঞান হইয়া যাইবার পর হইতে সে অসম্ভব রকম নীরব হইয়া গিয়াছে, মুকুজ্জেমশাই প্রত্যহ আসেন, খোঁজ-খবর করেন, সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার শেষ বক্তব্য যেন সে বলিয়া দিয়াছে, আর যেন তাহার বলিবার কিছু নাই।

আজ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা নাই। রাঁধুনী বলিল, সেও সকাল হইতে মনোরমাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঘরের ভিতর মুকুজ্জেমশাইয়ের নামে একটি পত্র পাওয়া গেল। অতি ক্ষুদ্র পত্র।

শ্রীচরণেষু, আমি চলিলাম। আমাকে খুঁজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। ইতি—

প্রণতা

মনোরমা

২৭

যদিও মিষ্টিদিদির স্বামী অধ্যাপক মিত্রের কিছুদিন হইতে 'হার্ট্ ট্রাবল' বাড়িয়াছিল, তথাপি তিনি একটি থিসিস লিখিতেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অধ্যাপক মিত্রের সহিত মিষ্টিদিদির সম্পর্ক কোনদিনই বেশি রকম ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। থিসিস লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক নাটকের প্রভাব

লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কিছুর খবর রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। মিষ্টিদিদি কখন বাড়িতে থাকেন, কখন থাকেন না, কখন আসেন, কখন যান, কাহার সঙ্গে মেশেন, কাহার সঙ্গে মেশেন না—এ সকল খবর রাখিবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না, কারণ এ সকল খবরের সহিত তাঁহার থিসিসের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক নাটকের কোন প্রভাব ইংরেজী নাটকে পড়িয়াছে কি না এবং পড়িয়া থাকিলে কতটুকু পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতেই তিনি ব্যস্ত। ইহা লইয়াই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কলেজে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে অতিবাহিত হয়। পুরাতন ভৃত্য জগদীশ তাঁহার স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়া কখন তাঁহার কলেজ যাইবার সময় হইল, কবে কোথায় কাহার সহিত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে, কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় বইগুলি হাতের কাছে রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। অর্থাৎ জগদীশ যদি স্ত্রীলোক হইত, তাহা হইলে জগদীশকে ব্যাকরণসম্মতভাবে প্রফেসর মিত্রের জীবন-সঙ্গিনী বলা চলিতে পারিত। মিষ্টিদিদি সামাজিক আসরে মিসেস্ মিত্র, কিন্তু মিত্রের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। সমাজের বাহিরে দুইজন দুই জগতের লোক।

মিষ্টিদিদির প্রতি প্রফেসর মিত্রের মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত-ধরনের। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যেন ভয় করেন। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে ভয়ে অভিভাবককে এড়াইয়া চলে এবং অভিভাবক কোন একটা কিছু লইয়া ব্যস্ত থাকিলে নিশ্চিন্ত হয়, প্রফেসর মিত্রও ঠিক তেমনই মিষ্টিদিদিকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন এবং মিষ্টিদিদি যা-হোক-একটা কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যে চেনেন না তাহা নয়, কিন্তু না চিনিবার ভান করেন। মিষ্টিদিদি নিকটে আসিলে সমস্ত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া এমন আন্তরিকতার সহিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসেন যে, মনে হয়, তিনি কিছুই জানেন না ; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির খোশামোদ করিতেছেন ; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির প্রীত্যর্থে

সব-কিছুই করিতে প্রস্তুত। মিষ্টিদিদি সরিয়া গেলেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়, জগদীশকে ডাকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিতে দুই-একবার তাকাইয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। শুধু যে মিষ্টিদিদিকে দেখিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা নয়, মিষ্টিদিদির ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটা তাঁহার পড়ার ঘরে ঢুকিলেও তিনি সমান অস্বস্তি বোধ করেন এবং অনুরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় আলতো আলতো হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। মিষ্টিদিদি অথবা মিষ্টিদিদির কুকুর উভয়ের সম্বন্ধেই প্রফেসর মিত্রের মনোভাব অনেকটা এক রকম, অধ্যয়নের অন্তরায় হিসাবেই যেন উভয়কেই তিনি ভয় করেন এবং উহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার নিজের ধারণা অর্থাৎ যে ধারণাটাকে তিনি সচেতন মনের সদরে কিঞ্চিৎ কপটতার সহিত প্রশ্রয় দেন তাহা এই যে, দুর্নিবার অধ্যয়ন-স্পৃহাই একটা নেশার মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং বহুবিধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই বিচ্যুতির জন্য তিনি সর্বদাই লজ্জিত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি যেন মিষ্টিদিদির স্বেচ্ছাচারকে সহ্য করেন; শুধু তাহাই নয়, স্বেচ্ছাচারের আবিলতরঙ্গে গা ভাসাইয়া মিষ্টিদিদি যে দয়া করিয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। প্রফেসর মিত্র কোন দিন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই—আসল গলদ কোন্‌খানে! নিজের দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি নিজের কাছেও নহে। সর্বগ্রাসী অধ্যয়ন-স্পৃহার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া মিত্রমহাশয় সুখে ছিলেন, দোষারোপ করিবার মত একটা কিছু না পাইলে তিনি পাগল হইয়া যাইতেন।

প্রফেসর মিত্র অ্যারিস্টোফ্যানিস পড়িতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। মিষ্টিদিদি বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ফিরিলেও তিনি সোজা উপরে চলিয়া যাইবেন, প্রফেসর মিত্রকে বিরক্ত করিবেন না, ইহাই চিরাচরিত

প্রথা। কিন্তু আজ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল, সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া মিষ্টিদিদি প্রবেশ করিলেন। সর্বাঙ্গে কমলা রঙের জরিদার শাড়ি ঝলমল করিতেছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। মনে মনে বিব্রত হইলেও প্রফেসর মিত্র নাক হইতে চশমাটি কপালে তুলিয়া আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, ও, তুমি! কোথায় গিয়েছিলে, সিনেমায়?

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, কি বই ছিল?

সিনেমায় যাই নি, প্রফেসর গুপ্তের বাড়ি থেকে আসছি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটি তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া এক হাত কোমরে দিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ঠামে মিষ্টিদিদি দাঁড়াইলেন, টেবিলে স্তূপীকৃত বইগুলির দিকে একবার চাহিয়া প্রফেসর মিত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঘৃণা যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল। প্রফেসর মিত্র বিচলিত হইলেন না, বলিলেন, ওঃ, প্রফেসর গুপ্ত। বেশ বেশ।

মিষ্টিদিদি কাজের কথা পাড়িলেন, আমাকে দুশো টাকার একখানা চেক দাও দিকি।

দুশো টাকার চেক? কেন?

কাল আমি দার্জিলিং যাব, এখানে আর ভাল লাগছে না।

ও। প্রফেসার গুপ্তও যাবেন নাকি?

না, একাই যাব।

প্রফেসর মিত্র আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। ড্রয়ার খুলিয়া চেক-বহি বাহির করিলেন এবং দুই শত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। মিষ্টিদিদি চেক লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। কাল সত্যই তিনি দার্জিলিং চলিয়া যাইবেন। প্রফেসর গুপ্তকে উতলা করিবার জন্যই অল্প কিছুদিন সরিয়া থাকা দরকার। বেলা যদিও পরদিন উঠিয়াই নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য প্রফেসর গুপ্তের দুর্ভাবনার বহরটা মিষ্টিদিদির নিকট মোটেই উপাদেয় মনে হয় নাই। আজ মিষ্টিদিদি প্রফেসর গুপ্তের সহিত ছদ্ম কলহ করিয়া আসিয়াছেন, কাল ছদ্ম অভিমান করিয়া

কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ-মানুষকে বশে রাখিতে হইলে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

২৮

মৃন্ময়ের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া, বিশেষত মৃন্ময়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, শঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা শুধু যে মুষড়াইয়া গিয়াছে তাহা নয়, কেমন যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের নিজের দুঃখও কম নয়, কিন্তু মৃন্ময়ের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শঙ্কর স্বেচ্ছায় খেয়ালের বশবর্তী হইয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছে, নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, দুঃখের ভারে ভগ্নমেরুদণ্ড হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাহার আদর্শ ঝুটা হইতে পারে, সে কিন্তু সে আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই, তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে। অর্থাৎ তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধন একটা বলিষ্ঠতা দ্বারা মহিমান্বিত। পিতামাতার বিরুদ্ধে অমিয়াকে বিবাহ করিয়া সে হয়তো ভুল করিয়াছে, কিন্তু সেই ভুলটাকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত সে নিজের অহঙ্কৃত পৌরুষকে অপমানিত করে নাই। সগৌরবে উন্নত শিরে নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভুলের লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে ও করিবে। এমন কিছুই করে নাই বা করিবে না, যাহা আত্মধিক্কারের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর অহরহ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। মৃন্ময়ের কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। হাসিকে বিবাহ করিয়া অন্তর্হিতা স্বর্ণলতার প্রেমে একনিষ্ঠ থাকিয়া পুলিসে চাকরি করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব—এই অসম্ভব আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া মৃন্ময় স্বাভাবিক নিয়মে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়া হাসিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিনিময়ে হাসির ভালবাসা সে পাইয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিয়া হাসি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হাসি যদি মৃন্ময়কে আর একটু কম ভালবাসিত

অথবা সে যদি আর একটু চাপা গম্ভীরপ্রকৃতির মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহার ঈর্ষাক্ষুব্ধ অন্তর এমন প্রখরভাবে হিংস্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে মৃন্ময়কে অকপটে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া এবং মনের ভাষার সহিত মুখের ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অকপটে সে মৃন্ময়কে এই প্রতারণার জন্য ধিক্কার দিতেছে। মৃন্ময়ের চাকুরিবিহীন জীবন হাসির বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আর একটা মুশকিল হইয়াছিল, কাহারও কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারিতেছিল না। কাহার নিকট বলিবে? সে মুখ-চোরা-প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে না। ভন্টু তাহার পরিচিত, কিন্তু ভন্টুর অভিধান-বহির্ভূত বাক্যাবলীকে সে ভয় করে। হয়তো তাহার মর্মান্তিক বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে কতকগুলা অদ্ভুত শব্দ সৃজন করিয়া বসিবে এবং যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকিবে। তা ছাড়া ভন্টুর পরিবারের সকলেরই সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আর একটা কারণে কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ইহারা কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে নাই, ইহাকে একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে ফেলিয়া তাহা লইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছে। মৃন্ময়কে তাহারা অবশ্য অনুকম্পার চক্ষে দেখিত, কিন্তু মৃন্ময় পুনরায় যখন বিবাহ করিল, তখন তাহা তাহাদের নিকট আর একটা স্থূল রসিকতার খোরাক যোগাইল মাত্র। সেজন্য মৃন্ময় ভন্টুকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

সেদিন শঙ্করকে নিকটে পাইয়া, শঙ্করের নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়া এবং তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হইয়া মৃন্ময় নিজের সমস্ত কথা শঙ্করকে খুলিয়া বলিয়াছিল। অনুরোধ করিয়াছিল, শঙ্কর যেন আবার আসে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ফেরত তাই সে পুনরায় একদিন মৃন্ময়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। দেখিল, মৃন্ময় একাই আছে, মুখুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়াছেন। শঙ্কর বলিল, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর মৃন্ময় বলিল, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

কেন?

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সে অন্য দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষণকাল নীরবতার পর সহসা মৃন্ময় বলিল, চানাচুর খাবেন?

আপত্তি কি!

মোড়ে একটা লোক চানাচুর বিক্রয় করিতেছিল, মৃন্ময় আগাইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর খরিদ করিয়া ফেলিল। মনিব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি পয়সা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাগটা উপুড় করাতে একটা আনি বাহির হইল। চানাচুরের দাম চুকাইয়া পয়সা দুইটি ব্যাগে পুরিতে পুরিতে বলিল, বাস্, দুটি পয়সা মাত্র বাকি রইল আর।

তিন ঠোঙা কিনলেন কেন?

একটা আমার স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যাব, ভারি ভালবাসেন চানাচুর খেতে।

হাসিয়া মৃন্ময় একটি ঠোঙা পকেটে পুরিল। আসলে চানাচুওয়ালাকে দেখিয়া হাসির কথাই তাহার মনে হইয়াছিল; হাসির জন্য কিনিতে গিয়াই ভদ্রতার খাতিরে আরও দুই ঠোঙা কিনিতে হইল।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে নীরবে উভয়ে হাঁটিতে লাগিল। মিনিট-খানেক পরে শঙ্কর সহসা দেখিল, মৃন্ময় পাশে নাই, সে যে কখন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, ভিড়ে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে নাই। শঙ্কর দেখিল, একটা শো-কেসের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া মৃন্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

কি দেখছেন?

কি চমৎকার শাড়িখানা দেখুন, কি অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রঙ!

মৃন্ময় খানিকক্ষণ শাড়িটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল, যাই, চলুন।

আবার উভয়ে চলিতে শুরু করিল।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মৃন্ময় আপন মনেই যেন বলিল, কে জানে! তাহার পর শঙ্করের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা বলুন তো?

কি বিষয়ে?

আবার নতুন ক'রে শুরু করলে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে?

নিশ্চয়।

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর দেখিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, না পাবার কোন কারণ নেই।

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না, আবার নীরবে দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বলিল, কিছুতেই জুটছে না, আশ্চর্য!

কি?

চাকরি।

আমারও তো সেই অবস্থা।

আপনার চাকরি তো হয়ে গেছে।

কে বললে?

আপনি আসবার একটু আগে ভন্টু এসেছিল। সে বললে, তার আপিসে যে চাকরিটা ছিল, সেটা আপনি পেয়ে গেছেন।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমিও ওই চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, ভন্টু বললে, সে তা জানত না। আমিও অবশ্য ভন্টুকে কিছু বলি নি, মানে—আপনি তো সবই জানেন।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, চলুন, ফেরা যাক। আর বেড়াতে ভাল লাগছে না।

বেশ, চলুন।

ফিরিবার পথে মৃন্ময় বলিল, একটা উপকার করবেন আমার?

কি?

আমি খবরের কাগজে মুড়ে আমার শালখানা লুকিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি ক'রে হোক, কিছু টাকা কাল এনে দিতে হবে। এসব জিনিস কোথায় বিক্রি করে আমার জানা নেই, আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া শঙ্কর দেখিল, মৃন্ময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

২৯

সমস্ত শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই নিবারণবাবুকে বলিলেন, আপনার মেয়ে দোষী কি নির্দোষ, সে কথা এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

নিবারণবাবু সকরুণভাবে মুকুজ্জেমশাইয়ের দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করুন আপনি, একেবারে নির্দোষ সে। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

আহা, আপনি অমন করছেন কেন? সে দোষী হোক নির্দোষ হোক, তাতে কিছু এসে যায় না।

খুব এসে যায়। সে নির্দোষ—এ বিশ্বাস না থাকলে কি তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি এমন উতলা হতাম?—নিবারণবাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, তার নিজের কোন দোষ নেই।

মুকুজ্জেমশাই হাসিমুখে উত্তর দিলেন, বেশ, বিশ্বাস করলাম।

নিবারণবাবু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিতেই মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমি তো আপনার কথাতে অবিশ্বাস করি নি, আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যদি দোষীও হয়, তা হ'লেও তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম।

নিবারণবাবু অবুঝের মত পুনরায় বলিলেন, না, সে দোষী নয়। মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, আর উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, তা হ'লে আপনি—

এ কাজে আমি কয়েকদিন পরে হাত দেব। শঙ্কর আর মৃন্ময়ের যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্য কোন কাজে হাত দিতে পারছি না। আর একজনেরও খোঁজ করতে হবে আমাকে। আপনাকে এ বিষয়ে আর বার বার এসে বলতে হবে না, আমার যথাসাধ্য আমি ঠিক যথাসময়ে করব। আচ্ছা, এবার আমি উঠি। বেরুতে হবে একবার।

আচ্ছা, আমি এখন যাই তা হ'লে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই কয়েকখানি টাইপ-করা দরখাস্ত গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবারণবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মৃন্ময়কে এবং শঙ্করকে তিনি দুই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি নিজে আরও দুই স্থানে যাইবেন, তা ছাড়া তিনটি আপিসে তিনখানি দরখাস্ত দিয়া আসিতে হইবে, পোস্টে না পাঠাইয়া সেখানকার পৈরবি-চুমরান্বিত বাবুদের হাতে দিলে বেশি ফলপ্রদ হইবে। শিরীষের পত্রখানিও অবিলম্বে পোস্ট করা দরকার, তাহা না হইলে সে আবার অকারণে ছুটি লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া পড়িবে। শঙ্করের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের সহসা মনে হইল, শিরীষকে বোধ হয় সুশীলাই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না করিলে শিরীষ মনে মনে হাজার চিন্তিত হইলেও একা এতদূরে আসিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহিত কি না সন্দেহ। কিছুদূর গিয়া মুকুজ্জেমশাই

থামিলেন এবং অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, সুশীলাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুর নামে লেখা খামটি জল দিয়া ভিজাইয়া খুলিয়া লিখিলেন—

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তুমি সম্ভবত শঙ্করের জন্য বেশি উতলা হইয়াছ এবং শিরীষকে উত্যক্ত করিতেছ। শিরীষ অবশ্য তাহা আমাকে লেখে নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি। শিরীষকে উত্যক্ত করিও না, শঙ্কর ভাল আছে, শীঘ্রই তাহার একটা চাকরি জুটিবেই। অমিয়াকেও চিন্তিত হইতে বারণ করিও। ইতি—

মুকুজ্জেমশাই

খামটি জুড়িয়া মুকুজ্জেমশাই আবার বাহির হইয়া গেলেন।

দিন-দশেক পরে শঙ্কর সহসা কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল যে, মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে সে আর থাকিবে না। নিজের জন্য নয়, চুনচুনের জন্যই তাহাকে মিসেস স্যানিয়ালের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার জন্য চুনচুনকে অহরহ বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইতেছে। চুনচুন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শঙ্করের আর সহ্য হইতেছে না। শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে বেলার বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেলার বাসাতেই বরং সে আপাতত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইবে, কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের ওখানে আর নয়। বেলার বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর কিন্তু অবাক হইয়া গেল। বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলিতেছে, দরজায় তালা-লাগানো। বেলা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে! শঙ্কর খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গেল কোথায়? পাশের বাড়ির একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, প্রায় পনেরো-ষোল দিন পূর্বে মিস মল্লিক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ইহার বেশি কোন খবর সে আর বলিতে পারিল না, আশে-পাশে কেহই পারিল না। আশ্চর্য এই কলিকাতা শহর! কেহ কাহারও খবর রাখে না, প্রতিবেশীর খবর রাখার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। এখানে অতি-পরিচিত লোকেরও নাগাল পাইতে হইলে বাড়ির রাস্তা এবং নম্বর জানা থাকা প্রয়োজন। ঠিকানার সূত্রটুকু হারাইয়া গেলে, এই বিরাট জনসমুদ্রে লোকটাই হারাইয়া যাইবে। যদি দৈবানুগ্রহে অকস্মাৎ কোনদিন দেখা না হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলাও হয়তো হারাইয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, প্রফেসর গুপ্তের নিকট খোঁজ করিলে হয়তো কোন খবর পাওয়া যাইতে পারে, এ বাড়িটা তো প্রফেসর গুপ্তেরই একজন বন্ধুর বাড়ি। প্রফেসর গুপ্তের বাড়িতে গিয়া শঙ্কর শুনিল, প্রফেসর গুপ্ত বাড়িতে নাই। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গলিটা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, আর একদিন আসিয়া খোঁজ করিবে। আরও খানিকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া সে ঠিক করিল, ভন্টুর বাসায় যাওয়া যাক, এতক্ষণ সে হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর দেখিল যে, আর একটু দেরি হইলে ভন্টুর সহিতও দেখা হইত না। এক-একদিন এ রকম হয়, কাহারও সহিত দেখা হয় না, যাত্রাটাই নিষ্ফল হইয়া যায়। ভন্টু বাইকে চড়িতে যাইতেছিল, শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম, জাল্‌ফিদারিক অ্যাফেয়ার সাক্‌সেস্‌ফুল, চাকরি হয়ে গেছে, দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌ লেটার পাবি। জুল্‌ফিদার প্রথমটা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই, কচলে কচলে ব্যাঙ তেতো ক'রে ফেললাম, শেষটা দিক হয়ে জুল্‌ফিদার রাজী হ'ল।

শঙ্কর বলিল, আমার কিন্তু ভাই একটা অনুরোধ আছে।

কি?

চল্‌, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। কোন্‌ দিকে যাচ্ছিস তুই?

আমি তোর খোঁজেই ম্যাডাম গুপ্তের বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। তুই যখন এসে পড়েছিস, তখন চল্, আর এক জায়গায় যাওয়া যাক, সেখানে যাওয়া দরকার।

ভন্টু ইতিমধ্যেই নিজস্ব ধরনে মিসেস স্যানিয়ালের নূতন নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

হাসছিস যে?

নামকরণটা বেশ হয়েছে।

ভন্টু কিছু না বলিয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া গলা হইতে 'গোঁক' 'গোঁক' ধরনের একটা শব্দ বাহির করিল।

কোন্ দিকে যাচ্ছিস তুই বল্ তো?

ওরিজিন্যালের কাছে।

মানে, দশরথবাবুর কাছে?

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে মুক্তোর মুখখানা মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল।

কি রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, ভাবছিস, আমি কিছু জানি না! ওরিজিন্যালের কাছ থেকে সব হদিস পেয়েছি তোর। কানা করালীও কিছু আভাস দিয়েছিল তোর কুষ্ঠি দেখে।

কিসের আভাস?

মোল্লা অ্যাফেয়ারের।

কাছা দেয় না বলিয়া ভন্টু নারী মাত্রকেই মোল্লা বলে, শঙ্কর তাহা জানিত। ওরিজিন্যালের নিকট হইতে ভন্টু মুক্তোর ব্যাপার শুনিয়াছে নাকি? শঙ্করের মুখটা একটু যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, শুনেছিস, বেশ করেছিস। এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ একটা হাসি হাসিয়া বলিল, চল্।

ভন্টু, অলক্ষিতে মুখ বিকৃত করিয়া একটু ভ্যাঙাইল এবং চলিতে শুরু

করিল। খানিকক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিল, ম্যাডাম গুপ্তের আস্তানা এবার ত্যাগ্ কর্ তুই। চাকরি তো হয়ে গেল, এবার আলাদা একটা বাসা কর্, বউকে নিয়ে আয়, ওসব মোল্লাফায়িং ছাড়্।

আমি চাকরি করব না।

ভন্টু যেন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িল।

চাকরি করবি না, মানে?

চাকরি করব না তা বলছি না, কিন্তু তোর এ চাকরিটা করব না। এটাতে তুই মৃন্ময়বাবুকে ঢুকিয়ে দে, ও ভদ্দরলোকের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।

ভন্টু নির্বাক বিস্ময়ে শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল। ছোকরা হন্তে কুকুরের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাথা গুঁজিবার একটা জায়গা নাই, কাল কোথায় কি ভাবে অন্ন জুটিবে তাহাও বোধ হয় অনিশ্চিত, অথচ ভাল একটা চাকরি হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে! যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া রাখাই ভন্টুর জীবনের মূলমন্ত্র। এ জাতীয় মনোবৃত্তি তাহার ধারণার অতীত।

মৃন্ময়কে না হয় ঢুকিয়ে দিলাম, কিন্তু তোর হাল কি হবে? তোর কি একটা ভয়-ডরও নেই?

শঙ্কর সহাস্যে উত্তর দিল, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?

শিশিরে কি ভয়?

মৃন্ময়বাবুর চাকরি পাওয়া আগে দরকার। ভদ্দরলোক কাপড়-জামা বিক্রি করতে শুরু করেছেন। আমাকে নিজের শালখানা বিক্রি করবার জন্যে দিয়েছেন, যদিও এখনও বিক্রি করতে পারি নি।

মোমবাতির এ রকম দুরবস্থা হয়েছে, অথচ আমাকে কিছু বলে নি তো!

শঙ্কর ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে আবার নীরবে চলিতে লাগিল।

তুই তা হ'লে তোর বাবার কাছে ফিরে যা, হাতে পায়ে ধ'রে মিটিয়ে ফেল্‌গে যা।

সে অসম্ভব।

উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি হঠাৎ? বাবার কাছে ফিরে যাবি না, চাকরি জুটিয়ে দিলে করবি না, একাধিক মোল্লা জুটিয়েছিস—

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল।

কোন ভয় নেই তোর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃন্ময়কে এ চাকরিটায় ঢুকিয়ে দে তুই।

তার মানে জুলফিদারকে ফ্রেশ খজলাতে হবে। খজলে খজলে লোকটাকে এমনিই তো ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলেছি, বেশি খজলালে আবার দক্ষচে না যায়!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। সে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তো মনের মধ্যে বারম্বার আনাগোনা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হাঁটিবা শঙ্কর বলিল, আমি আর দশরথবাবুর কাছে যাব না, তুই যা।

ভনটু মুখটা সূচালো করিয়া বলিল, কেন, লজ্জা করছে বুঝি?

অনর্থক একটা অপ্রিয় জিনিসের ভেতর গিয়ে লাভ কি?

ওরিজিন্যাল কমপ্লিটলি চেঞ্জড, সে মানুষই আর নেই। গুম হয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে, কথা-টথা একদম বলে না। যে মেয়েমানুষটাকে রেখেছিল, সেটা খুন হয়ে যাবার পর মিস্টার ফাইভ কেমন যেন হয়ে গেছে, ঝু ছাড়া হাঁপানিতে ধরেছে।

কে খুন হয়ে গেছে? মুক্তো?

খবরের কাগজে পড়িস নি তুই? মহা হৈ-চৈ হ'ল যে কদিন তাই নিয়ে।

খবরের কাগজের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক নেই। সত্যি জানিস তুই? কে খুন করলে?

কতকগুলো গুণ্ডা। তাকে খুন ক'রে তার গয়নাপত্তর টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ভাঙা তোরঙ্গ খালি প'ড়ে ছিল, ওরিজিন্যালের কাছে আছে সেটা।

খানিকক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে ওরিজিন্তালের বাসার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়িখানা যেন স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত খানিকটা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলো নাই। ভন্টু সাইকেলের ঘণ্টা বাজাইতেই সম্মুখের দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, কে, ভন্টুবাবু নাকি? কদিন আসেন নি, আমি ভাবছিলাম, কি হ'ল আবার আপনার! কেমন আছেন?

অবুস্থবু।

ভেতরে আসুন, একটু পরামর্শ আছে। সঙ্গে উনি কে?

চায় গ্যান্ঢঅ।

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

ভদ্রলোক পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানে কানে চুপি চুপি বলিল, ইনি হচ্ছেন নেপো, দই মারতে এসেছেন। ওরিজিন্তালের দূরসম্পর্কের ভাগনে হয়, নিঃসন্তান বড়লোক মামার দুঃখে বিগলিত হয়ে সেবা করতে এসেছে রাস্কেল। হাড় কিপ্‌টে।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ভন্টু বলিল, চল্‌, এবার যাওয়া যাক।

শঙ্কর ভিতরে গিয়া লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিল। লোকটি যুবক নয়, প্রৌঢ়। গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, গোঁফ দাড়ি নাই, গলায় কণ্ঠি, চোখে মুখে চতুরতার সহিত বৈষ্ণবভাবের অদ্ভুত একটা সমন্বয়। ভন্টু বলিল, আপনি কি এতক্ষণ অন্ধকারে ব'সে ছিলেন নাকি?

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিবামাত্র প্রশান্তভাবে চোখ দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন এবং কথাটা যেন ভালভাবে প্রণিধান করিয়া পুনরায় চাহিলেন।

কেরোসিনের আলো জেলে কতখানি অন্ধকার আমরা দূর করতে পারি, বলুন?

লং্‌কালদ্‌কি রেখে আসল কথাটা কি বলুন ?

মামা যে একেবারে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, তার উপায় কি করি বলুন আগে আপনি।—এইটুকু বলিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং খানিকক্ষণ বুজাইয়া রাখিয়া আবার খুলিলেন। শঙ্কর লক্ষ্য করিল যে, নিজের এবং অপরের কথোপকথনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি চক্ষু বোজেন এবং খোলেন। ইহার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিন।

উনি চাম্‌ গ্যানচঅ—শঙ্কর, আমার একজন পুরোনো বন্ধু। এবং শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন নেফিউ-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র কর—দশরথবাবুর ভাগ্নে, মামার জন্যে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন ক'রে ফেলছেন।

সতীশবাবু সবিনয়ে শঙ্করকে নমস্কার করিতে শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করিল।

ভন্টু বলিল, দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এখন ?

সতীশবাবু স্মিতহাস্যসহকারে চক্ষু দুইটি বুজিয়া এবং খুলিয়া বলিলেন, কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই, তিনি একটিও কথা বলবেন না, খালি বিরক্ত হবেন। আগে যা-ও দু-একটা কথা বলছিলেন, আজকাল তা-ও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। দূর থেকে অবশ্য দেখে যেতে পারেন।

বেশ তো, এসেছি যখন, দূর থেকেই দেখে যাওয়া যাক।

তা হ'লে আসুন দোতলায়। আলো-টালো নিয়ে যাব না, জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখে যান। লোকজন কেউ এলে বড্ড অস্বোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চ'লে গেছে। আপনিই যা মাঝে মাঝে খবর-টবর নেন।

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন এবং খুলিলেন।

ভন্টু কণ্ঠ হইতে বার-দুই গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মুক্তোর মৃত্যু-সংবাদে তাহার সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু দোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলাও অন্ধকার। প্রকাণ্ড দালানটার এক প্রান্তে শুধু মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল।

সতীশবাবু চুপিচুপি বলিলেন, ওই ঘরটাতে আছেন উনি, আপনারা চুপিচুপি এগিয়ে যান, একটু গেলেই জানলা দিয়ে দেখতে পাবেন।

কিছুদূর গিয়াই ওরিজিন্যালকে দেখা গেল। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, একটা কালো র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ওরিজিন্যাল বসিয়া আছেন। মুখটা ভাল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাইতেছে ততটুকুই যথেষ্ট ভীতিকর। সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, রগের এবং কপালের শিরাগুলি স্ফীত, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। একটা তীব্র ঘৃণা সমস্ত চোখে মুখে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। দুই হাতে দুইটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ওরিজিন্যাল হাঁপাইতেছেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু পুনরায় নামিয়া আসিল। ভন্টু যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা এখন উত্থাপন করা যদিও একটু অসমীচীন মনে হইল, তথাপি একবার চেষ্টা করিতে সে ছাড়িল না।

আচ্ছা, সাইকেলের একটা ভাল সীট সস্তায় বিক্রি ছিল, দশরথবাবু সেটা দেবেন বলেছিলেন আমাকে। সেটা কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন?

চক্ষু দুইটি বুজিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশবাবু চক্ষু দুইটি পুনরুন্মীলন করিলেন এবং অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি তো ওসব্বন্ধে কিছুই জানি না, দোকানের খবর নেবার কি আর অবসর আছে?

ওই মট্‌রা ব্যাটা যা করছে তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়—

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন ও খুলিলেন।

ভন্টু বলিল, কি বলুন ?

চিকিৎসা নিয়ে মহা বিভ্রাটে পড়েছি। এখানকার ডাক্তারদের ভাঁজ-ভোঁজ ধাঁত-ঘোঁত বিলি-ব্যবস্থা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি ভন্টুবাবু। দু বেলা আসছে যাচ্ছে, দামী দামী ওষুধ ফরমাশ করছে, নানারকম এগ্‌জামিন করাচ্ছে, কিন্তু ফল তো কিছুই হচ্ছে না, হু-হু ক'রে অর্থব্যয় হচ্ছে কেবল, দু দিন থেকে কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলি কি, হোমিওপ্যাথি করাব ? পাড়ায় একজন—

ভন্টু বলিল, যাই করুন, খরচের ত্রুটি করবেন না। হোমিওপ্যাথি করতে চান, ভাল ভাল রুই-কাতলাদের নিয়ে আসুন। 'যার নেই কোন গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথি'—এ রকম কোন বাজে চামাটুকে জোটাবেন না, ডাকতে হয় চাম্‌ লদ্‌ কাউকে ডাকুন। মানে—লোকে যেন এ অপবাদ দেবার সুযোগ না পায় যে, টাকার জন্যেই আপনি—

সতীশবাবু চক্ষু দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন ও নিমীলিত চক্ষেই মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, কাকে বলছেন আপনি ভন্টুবাবু ? তাহার পর চক্ষু খুলিয়া আর একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, দেখি আরও দু দিন।

শঙ্কর স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সহসা বলিয়া বসিল, মুক্তোর সেই তোরঙ্গটা একবার দেখতে পারি ?

ভন্টু বলিল, সেটা বোধ হয় ও-ঘরে আছে।

সতীশবাবু সোৎসুকে বলিলেন, কি বলুন তো ?

ভন্টু বলিল, সে আপনি জানেন না, আমি জানি, এ ঘটনা আপনি আসার পূর্বেই ঘটেছিল। এই পাশের ঘরের কোণেই তোরঙ্গটা আছে, আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,—চাম্‌ গ্যান্‌চঅ তুই, না দেখে তো ছাড়বি না, দেখি আলোটা একবার।

সতীশবাবু বলিলেন, ভাঙা হলদে তোরঙ্গটার কথা বলছেন? সেটা আমি পরশুদিন ভাঙা সব জিনিস-পত্তরের সঙ্গে বিক্রি ক'রে দিলাম যে। ভাবলাম, কি হবে ও ঝরঝরে ট্রাঙ্কটা রেখে? তাতে দুটি জিনিস মাত্র ছিল, একটি নীল রঙের খদ্দরের চাদর, আর একটি ফোটো। রেখে দিয়েছি সে দুটি, দেখতে চান তো দেখতে পারেন।

দেওয়ালের গা-আলমারি হইতে খবরের কাগজে মোড়া ছোট একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া সতীশবাবু শঙ্করের হাতে দিলেন। শঙ্কর পুলিন্দাটি খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কাহার ফোটো! এ যে চুনুচুনের স্বামী যতীন হাজরা! ফোটোর মুখখানা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া কে যেন ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে! আঁকাবাঁকা অক্ষরে নীচে লেখা, "স্বামী নয়—শয়তান।" খদ্দরের নীল চাঁদরখানাও শঙ্কর চিনিতে পারিল, সে-ই একদিন মুক্তোকে ইহা কিনিয়া দিয়াছিল।

রাত্রি-দশটা নাগাদ হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর অবশেষে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, যেমন করিয়া হউক মিসেস স্যানিয়ালের বাসা ত্যাগ করিবে, কিন্তু সে কথা তাহার মনেই ছিল না। রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সমস্ত মনে এই কথাটাই প্রবলভাবে শুধু জাগিতেছিল যে, যে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এবং বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে মুক্তো, যতীন হাজরা এবং চুনুচুনের জীবনে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেই বিচিত্র যোগাযোগের নামই কি অদৃষ্ট? এই যোগাযোগ কি কোন শক্তিমান বিধাতার নিগূঢ় অভিসন্ধি? না, এমনিই আকস্মিক যোগাযোগ? কোথায় আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, এই চলার কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া বোঝা সম্ভবপর কি না, কে আমাদের চালক—নানা প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে তাহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল।

কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া গেল। শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া

দেখিল, চুনচুন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল।

৩১

একটা বিরাট প্রান্তরে বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। সুরা-উন্মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ একদল পুরুষ অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গলায় নারী-মুণ্ডের মালা, কটি বেষ্টন করিয়া নারী-হস্ত-পদ-রচিত মেখলা। মুক্তোর দেহটা অদূরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দেহটা ঘিরিয়াই নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূরে একদল বন্দিনী—মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, শৈল, বিনি, চুনচুন—তাহাদের ঘিরিয়াও একদল উন্মত্ত পুরুষ পাশব চীৎকারে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, সকলের হাতে খড়্গ। নিকটে অভ্রভেদী একটা রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ···

সহসা শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, মাংসলোলুপ নরপশুদের উন্মত্ত চীৎকার তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল। খানিকক্ষণ মূহ্যমানের মত সে বিছানায় বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিতেই মিসেস স্যানিয়াল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, দু দিন থেকে আপনার এই চিঠিখানা এসে প'ড়ে আছে, আমার আর দিতেই মনে থাকে না। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, মনে থাকবে কি ক'রে, আপনার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। মিসেস স্যানিয়াল ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অগ্নিগর্ভ এবং কর্তব্যদ্যোতক একটা দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং শঙ্করকে চিঠিখানা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর খামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, দামী নীল রঙের খাম, হাতের লেখা চিনিতে পারিল না। খুলিয়া দেখিল, বেলার চিঠি—

শঙ্করবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও চিঠি লিখি নি এবং জীবনে আর হয়তো কখনও লেখবার সুযোগও হবে না। আজও না লিখলে চলত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চ'লে যাবার আগে আপনার সঙ্গে (কেবল আপনার সঙ্গেই) একবার দেখা ক'রে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যে চ'লে যাচ্ছি, এ খবর কাউকে জানালাম না; জানাতে ইচ্ছে হ'ল না। যে বুড়ো সায়েবটিকে রোজ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতাম, তাঁর সঙ্গে বিলেত চললাম। তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসারে আপন জন কেউ নেই, তিনি অনেক দিন থেকেই আমাকে বলছিলেন তাঁর সঙ্গে যেতে। দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে ছিল না ব'লে এতদিন রাজী হই নি। কিন্তু এখন দেখছি, এ দেশে আমার মত মেয়ের পক্ষে ভদ্রভাবে বাস করা অসম্ভব। এ দেশে যে কোন মেয়ে, তা সে সুরূপা কুরূপা যাই হোক, যদি ভদ্রভাবে থাকতে চায়, তা হ'লে তাকে বিয়ে ক'রে অর্থাৎ একজন পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে হবে—সে পুরুষটি যুবক বৃদ্ধ, মূর্খ বিদ্বান, সচ্চরিত্র দুশ্চরিত্র যাই হোন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে এইটেই হয়তো বাঞ্ছিত পরম গতি এবং সমাজের কল্যাণের পক্ষে এই হয়তো সুচিন্তিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আমি কিন্তু পারলাম না, আমার বিদঘুটে রুচি নিয়ে কিছুতেই এ ব্যবস্থা মানতে প্রবৃত্তি হ'ল না আমার। এর জন্যে অহরহ ক্ষণে ক্ষণে অপমানিত হয়েছি, কিন্তু দমি নি; তবে শেষটা হার মানতেই হ'ল। এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছি। কারণ এখন এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এ দেশে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। ও-দেশ নিরাপদ কি না জানি না, কিন্তু যত দূর শুনেছি তাতে মনে হয়, ওরা আর যাই করুক, নারীকে অপমান করে না। বহুকালব্যাপী স্বাধীনতার ফলে ওদের সে ভয় ঘুচেছে। এসব অবশ্য আমাদের কল্পনা, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যে কি, স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। সেখানেও যদি গিয়ে দেখি যে, ও-দেশও এ দেশেরই মত, তা হ'লে অনতিক্রম্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, আমরা কাগজে কলমে যতই

না কেন নিজেদের মহিমার ঢাক পেটাই, আসলে এখনও মেয়েরা পুরুষ-পদানত জীব ছাড়া আর কিছু নয়, এবং মানব-সভ্যতার পরিধি তার আদিম গুহা ছেড়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় নি।

আমাদের জাহাজ ওরা ছাড়বে। আমি বাসা ছেড়ে দিয়েছি, মিস্টার স্মিথের ফ্ল্যাটেই আছি, ৭৫০নং চৌরঙ্গী স্ট্রীট। আপনি যদি সময় ক'রে একবার দেখা ক'রে যান, বড়ই সুখী হব। আপনি আমাকে যে বায়রন-গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন, সেটা আমি সযত্নে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচব সযত্নে রাখব। কিন্তু আপনার একটি অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি—I could not accept Byron.

কাল নিশ্চয়ই আসবেন, সকালের দিকে আমি বাসায় থাকব॥ ইতি—

বেলা মল্লিক

শঙ্কর ক্যালেণ্ডারের পানে চাহিয়া দেখিল, আজ পাঁচ তারিখ। পরশুদিন বেলার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শঙ্কর কল্পনায় দেখিতে লাগিল, জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা তাহার পথপানে চাহিয়া আছেন।

৩২

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল।

এই সাতটা দিন শঙ্কর অনন্যমনস্কভাবে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাইয়া দিল। যেদিন সে বেলার চিঠি পাইল, সেই দিনই সে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভন্টুর আপিসে মৃন্ময়ের চাকরিটা হইয়া যাওয়াতে মুকুজ্জেমশাই শঙ্করের চাকরির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে একটি ভাল চাকরি খালি ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একজন পদস্থ

অফিসার সিমলায় ছিলেন, চিঠি লেখার চেয়ে নিজে গেলে বেশি কাজ হইবে ভাবিয়া মুকুজ্জেমশাই নিজেই সেখানে গিয়াছিলেন। মৃন্ময় কাজে যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং শঙ্করের দিনগুলি রাস্তায় এবং ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটিতেছিল। দিনে সে মৃন্ময়ের সহিত খাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং রাত্রে ফিরিত সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর। তাহার খাবার বাহিরের ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকিত। সে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল। তাহার অত্যুচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা সে হজম করিতে পারিতেছিল না; কারণ ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত যে, নিজের অহঙ্কারের প্রেরণাতেই সে মৃন্ময়ের উপকারটা করিয়াছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ। মৃন্ময় যদি না-ও থাকিত, তাহা হইলেও সে ভন্টুর আপিসে ভন্টুর অধস্তন কর্মচারী হইয়া কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু মৃন্ময় ইহা জানে না, সে শঙ্করকে দেখিলে এমন একটা মুখভাব করে, যেন সে দেব-দর্শন করিতেছে। শঙ্কর মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে, অনুপার্জিত এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় এবং এইজন্যই তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সান্নিধ্য যে কত কারণেই এড়ায়!

শঙ্কর শুধু যে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল তাহা নয়, সে সকলকেই এড়াইয়া চলিতেছিল। মানুষের সঙ্গই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মিলটন, শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথের জগতে পরিভ্রমণ করিয়া, অবাস্তব কল্পলোকের নর-নারীর সাহচর্যে সে নিজেকেও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছিল যে, এই অবাস্তব লোকের প্রাণীগুলিকেই বাস্তব জীবনের স্থায়ী অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ উহারা নির্ভরযোগ্য, চিরকাল উহাদের এক রূপ। শেলী কীট্‌সের স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেল কখনও বেসুরা গাহিবে না, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কখনও জরাগ্রস্ত হইবে না, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি চিরদিন এক সুরে এক ভাবে এক ভঙ্গীতে কথা বলিবে, ব্রুটাস কখনও দেশদ্রোহী হইবে না, ওফেলিয়া কখনও পাপীয়সী হইবে না, ইয়াগো কখনও মহাত্মা হইবে না। কিন্তু বাস্তব

জগতের ক্ষণভঙ্গুর মানুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া বুদ্বুদের মত অবশেষে একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। তাহাদের উপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইতে হইবে। কল্প-জগতের সার্থক সৃষ্টিগুলি অমর এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়াই নির্ভরযোগ্য। তাহারা আজ এক কথা—কাল আর এক কথা বলে না। স্বপ্নের পাথায় ভর করিয়া শঙ্করের মন দিব্যলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে রূঢ় মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া টেলিগ্রাম পাইল, সন্ন্যাসরোগে বাবা মারা গিয়াছেন। টেলিগ্রামটার দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ট্রেনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল না কেন? সমস্ত অন্তরটা মাঝে মাঝে মুচড়াইয়া উঠিতেছে, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, কিন্তু চোখে জল নাই। কিছুতেই সে কাঁদিতে পারিল না, ট্রেনের কামরায় একা শুষ্ক চক্ষে অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৩৩

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল মাস-দেড়েক পরে। আসিয়া স্টেশন হইতে সে সোজা ভন্টুর বাসায় গেল।

কবে এলি?

এখনই, সোজা স্টেশন থেকে তোর কাছেই এসেছি।

কেন?

তোর সেই কানা করালীর খবর কি বল্ তো?

তাকে নিয়ে কি করবি?

বাবা এক অদ্ভুত-উইল ক'রে গেছেন। আমি জানতাম না, করালীচরণ বক্‌সির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মায়ের নামে ব্যাঙ্কে একটা ফিক্সড্

ডিপোজিট ক'রে গেছেন, তারই সুদ থেকে মায়ের চ'লে যাবে। দেশের বাড়িটাও মাকে দিয়ে গেছেন। আর বাকি সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন করালীচরণ বক্‌সির ওপর। উইলে লেখা আছে—করালীচরণ যদি দেখেন যে, আমি নিজের পায়ে ভালভাবে দাঁড়াতে পেরেছি, তা হ'লে, এবং যদি তিনি সমীচীন মনে করেন, তা হ'লে তাঁর বাকি সম্পত্তি আমি নয়—আমার স্ত্রী পাবে। আমি নিজের পায়ে যদি ভালভাবে দাঁড়াতে না পারি, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি কোন সৎকার্যে দান ক'রে দিতে হবে, আমার স্ত্রী কিছু পাবে না।

ভন্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, করালীচরণ তো স্রাবিড়ে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তবু চল্, তার বাড়ির একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসা যাক। অনেক দিন যাওয়া হয়'নি সেখানে।

মহা মুশকিলে প'ড়ে গেছি ভাই, মা ভয়ানক মুষড়ে গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না আমাকে ; অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি। উইলের কথা মা জানে না। আমি করালীচরণকে শুধু বলতে এসেছি, এ কথা মাকে কিছুতে যেন জানানো না হয়। একটা চাকরি জুটলেই মাকে এনে নিজের কাছে রাখব আমি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তুই রাস্কেল, তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর ? সে চাকরিও তোর হয় নি, উনি যাবার আগেই লোক বাহাল হয়ে গেছে।

উভয়ে করালীচরণের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গলিতে ঢুকিয়াই পানওয়ালীর সঙ্গে দেখা হইল। ঠিক মোড়েই তাহার দোকান। দোকানে দুইজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া ছিল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র মিশিমণ্ডিত দন্ত বাহির করিয়া একমুখ হাসিয়া পানওয়ালী বলিল, ঘর খোলাই

আছে, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এই পান ক খিলি সেজে দিয়েই যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিপুণ ত্বরিতহস্তে চেরা পানগুলিতে সে চুন ও খয়েরগোলা মাখাইতে লাগিল। ভন্টু ও শঙ্কর বক্‌সিমশায়ের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু বলিল, দেখেছিস মাগীর আক্কেল, কপাট খুলে রেখে দিয়েছে, কেউ ঢোকে যদি! বক্‌সিমশায়ের অনেক জিনিসপত্তর আছে ঘরের মধ্যে, এই মোল্লাদের কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উভয়েই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিল। পচা ঘায়ের গন্ধ। মোস্তাক চৌকির উপর শুইয়া ছিল, তাহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল এবং মুখবিকৃতি করিতে করিতে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় তাহাদের স্যালিউট করিল। মোস্তাকের বাঁ পায়ের পাতায় ময়লা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘা। পুঁজরক্তে ন্যাকড়াটা ভিজিয়া রহিয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া বহু মাছি ভনভন করিতেছে। মোস্তাকের মুখময় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ধুলায় অযত্নে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত-বেদনাতুর। স্যালিউট করিয়া মোস্তাক আবার চোখ বুজিয়া চৌকির উপর শুইয়া পড়িল, কোন কথা বলিল না, যেন তাহার যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিল, আর কিছু করিবার নাই। ভন্টু ও শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ কে?

ও মোস্তাক, বক্‌সিমশায়ের বন্ধু।

পানওয়ালী আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওকে নিয়েই বিপদে পড়েছি বাবু। বলছে, পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চ'লে গেছে। পরশু থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু ওষুধ-বিষুধ কিছু লাগাতে দেবে না, পাড়ার ডাক্তারবাবুটির খোশামুদি ক'রে ডেকে এনে দেখালুম, তাঁর ব্যবস্থামত তুলো আইডিন ব্যাণ্ডেজ কিনে আনলুম; কিন্তু আনলে কি

হবে, ও পায়ে হাত দিতে দেবে কি? একে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

ভন্টু বলিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

পানওয়ালী ইহাতে আপত্তি করিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা আমি পারব না, হাসপাতালে শুনেছি বড় কষ্ট দেয় গরিবদের। ওরে পাগলা, ভাত খেয়েছিস?

মোস্তাক কোন জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পানওয়ালা ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল।

খেয়েছে দেখছি। কত ভাত ছড়িয়েছে! কাল তো সমস্ত রাত খেলে না, সকালে এসে দেখি, ভাতের থালা যেমনকার তেমনই প'ড়ে আছে; সে ভাত আবার কুকুরকে ধ'রে দিই। আ আমার কপাল, একেই বলে পাগল শাকচচ্চড়ি সব খেয়েছে, মাছটা খায় নি! মাছের পেটিটা দিলাম বেছে কাঁটা নেই ব'লে—ভাগ্যিস বেরালে নিয়ে যায় নি! নে, খা।

পানওয়ালী মাছের পেটিটা তুলিয়া মোস্তাকের মুখে ধরিল, মোস্তাক কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কাকটা কই?

ওধারে উঠোনে আছে। কি দস্যি কাক! পরশু হলুদজল ক'রে নাওয়াতে গেছি, এমন ঠুকরে দিয়েছে হাতে যে, জ্ব'লে মরি!

পানওয়ালী হাতের ক্ষত দেখাইয়া হাসিল। আচ্ছা, এই বইগুলোর কি করি বলুন তো? উই ধরেছে, ঝেড়ে ঝেড়ে রোদে দিয়েছিলুম। কবে আসবে? কোন খবর পেয়েছেন?

কিছু না।

খবর পেলে আগে থাকতে জানাবেন আমাকে একটু। তা না হলে আমাকে এখানে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে যাবে।

মিশি-মাখানো দাঁত বাহির করিয়া পানওয়ালী হাসিল।

বইগুলো চল তো দেখি। অনেক দামী বই আছে।

দেখুন না।

শঙ্কর চুপ করিয়া ছিল। পানওয়ালী, মোস্তাক এবং খাঁচায় পোষা দাঁড়কাকের সহিত একচক্ষু করালীচরণকে সংযুক্ত করিয়া তাহার মন এক বিচিত্র রসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই লোকটিরই হাতে বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছেন! সহসা একটা কথা মনে করিয়া লোকটার উপর শঙ্করের শ্রদ্ধা হইল। তাহার বিবাহ-সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করালীচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভন্টু আলমারি খুলিয়া দেখিতেছিল।

ওরে, এখানে একটা লম্বা খামে কি একটা দলিলের মত রয়েছে, দেখ্ তো, এটাই তোর ব্যাপার কি না!

হ্যাঁ, এ তো বাবার হাতের লেখা।

খুলিয়া দেখিল, বাবার উইলের একটা কপি এবং করালীর নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে অম্বিকাবাবু করালীচরণকে এই ভার গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্ত পড়িয়া শঙ্কর বলিল, এগুলো এখন এখানেই থাক্, করালীবাবু এলে তখন যা হয় করা যাবে।

ভন্টু পানওয়ালীকে বলিল, আমরা চললাম এখন।

পানওয়ালী চোখের ইশারায় ভন্টুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, পাগলাটাকে আপনি একটু ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে দিয়ে যান, যাতে ওষুধ লাগাতে দেয় আমাকে।

ভন্টু মোস্তাকের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, তুমি যদি ওষুধ লাগাতে না দাও, কালই তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব, সেখানে পা কেটে দেবে তোমার।

মোস্তাক চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পানওয়ালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভন্টু ও শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল।

শঙ্কর বলিল, চল্, মৃণ্ময়ের বাসায় যাই।

তুই যা, আমাকে জুলফিদারের কাছে যেতে হবে।—বলিয়া সে বাইকে সওয়ার হইল।

৩৪

মৃন্ময় বাড়িতে ছিল না। গিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল।

সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল তো?

হ্যাঁ।

শিরীষের সঙ্গে দেখা হ'ল? অমিয়া এসেছিল?

সকলেই এসেছিল। শ্বশুরমশায় চ'লে গেলেন, অমিয়া মায়ের কাছেই রইল।

তোমার বাবা কোন উইল ক'রে গেছেন নাকি?

শঙ্কর উইলের কথা খুলিয়া বলিল, মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট ইহা গোপন করার কোন প্রয়োজন সে দেখিল না। সব শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখ দুইটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিজের পায়ে তো তুমি দাঁড়িয়ে গেছই, চাকরি তোমার হয়ে গেছে।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া ইংরেজীতে লেখা একখানি চিঠি আনিয়া দিলেন। জনৈক পি. দত্ত তাহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'আদর্শ' নামক বাংলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি শঙ্করকেই কলিকাতায় আপিস খুলিবার ভার দিয়াছেন। মাসিক এক শত টাকা বেতনের মধ্যে একজন সহকারী সম্পাদক ও একটি ক্লার্ক নিয়োগ করিতে এবং একটি ভাল প্রেসে কাগজ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কাগজের ছাপা এবং গেট-আপ যেন ভাল হয়, প্রেসের বিল তিনি আলাদা দিবেন। লেখকদেরও যথোচিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। শঙ্করের পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতার ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির সব বন্দোবস্ত করিবেন।

উত্তেজনায় শঙ্করের কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিল। কে এই পি. দত্ত তাহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য বোম্বেতে বসিয়া আছেন?

মৃন্ময় উপরে ছিল, নামিয়া আসিল।

আপনার আর একখানা চিঠি এসেছে, আমার কাছে আছে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটি মোটা খামের চিঠি মৃন্ময় শঙ্করকে দিল। শঙ্কর দেখিল, সুরমার চিঠি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। আজ রাত্রেই আমি খুলনায় যাচ্ছি।

খুলনা? কেন?

দরকার আছে।

মুকুজ্জেমশাই মনোরমা এবং আসুমির খোঁজে বাহির হইতেছেন সে কথা আর বলিলেন না, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন।

লোকের সঙ্গ শঙ্করের আর ভাল লাগিতেছিল না; সুরমার পত্রটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গড়ের মাঠে একটি নির্জন অংশে বসিয়া শঙ্কর সুরমার পত্রখানি পড়িতেছিল। খামের ভিতর দুইখানি চিঠি ছিল—একটি সুরমার, আর একটি উৎপলের। সুরমা লিখিয়াছে—

শঙ্করবাবু,

এই আপনার কাছে আমার প্রথম চিঠি। অর্থাৎ এ চিঠির ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই আমার। এতদিন আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি, সেগুলোর হাতের লেখা আমার ছিল বটে, কিন্তু ভাব ভাষা আমার ছিল না। আপনার বন্ধু চিঠিগুলো বিলেত থেকে লিখে পাঠাতেন, আমি সেগুলো টুকে দিতুম। আপনার বন্ধুকে চেনেন তো? একটা অদ্ভুত রকম কিছু ক'রে মজা দেখতে পেলে আর কিছু চান না উনি। এমন কি সেবারে যে ফোটোগুলো পাঠিয়েছিলুম, সেগুলোও উনি বিলেত থেকে তুলে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর পাল্লায় প'ড়ে আপনার মতো এই

যে সামান্য চাতুরীটুকু করেছি, এর জন্যে আমি লজ্জিত এবং এর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—যদিও পনেরো আনা দোষ আপনার বন্ধুটিরই। উনিও এই সঙ্গে আপনাকে চিঠি দিচ্ছেন, তাতে সব কথা জানতে পারবেন। আমার নমস্কার নিন। আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

শ্রীসুরমা ঘোষ

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

এতদিন সুরমার বেনামীতে তোমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তোমার নাড়ী পরীক্ষা করা। কলকাতায় লক্ষ্য করেছিলাম যে, সুরমার সান্নিধ্যে তোমার নাড়ী কিঞ্চিৎ রসস্থ হয়েছিল। সে ধারণা আরও দৃঢ় হ'ল, যখন দেখলাম, তুমি আমার আসবার দিন হন্তদন্ত হয়ে হাওড়া স্টেশনে একরাশ লাল লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হ'লে। ট্রেনে যেতে যেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল, সুরমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলা গেল যে, তোমার ঈষৎ-সচেতন রস-পিপাসাকে উতলা ক'রে তুলতে পারে এমন একটা কিছু ক'রে দূর থেকে ব'সে মজা দেখতে হবে। চিঠি লেখাই সাব্যস্ত হ'ল, কিন্তু সুরমা নিজে কিছুতেই চিঠি লিখতে রাজী হ'ল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? আমাদের দেশের মেয়েরা সব বিষয়েই সর্বক্ষণ সিরিয়াস, রসিকতাকে নিছক রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা ওদের সাধ্যাতীত। যাই হোক, সুরমাকে অনেক কষ্টে রাজী করালুম যে, আমি চিঠিগুলো লিখে দেব, ও টুকে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার উত্তর এলে উত্তরগুলো আমার কাছে পাঠাবে। এটা অবশ্য আশা করি নি যে, তুমি 'যাও পাখি ব'লো তারে' মার্কা গোলাপী চিঠির কাগজে সবুজ কালি দিয়ে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্র লিখতে থাকবে। তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করেছিলুম যে, তোমার সভ্যভব্য চিঠির মধ্যেও এমন এক-আধটা খোঁচ থাকবে, যা উপভোগ ক'রে আমরা আনন্দ পাব। তুমি কিন্তু আমাদের নিরাশ করেছ। অমন নিরামিষ চিঠি বোধ হয় ভাইও বোনকে লেখে না। নিরাশ হয়ে অবশ্য আনন্দিতই হয়েছি এবং বুঝেছি, কলকাতায় সুরমার সান্নিধ্যে তোমার মনে যে রস-সঞ্চার

হয়েছিল, সে রকম রস-সঞ্চার যে কোন সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে যে কোন সুস্থ যুবকের মনে হওয়া জৈবিক ধর্ম অনুসারেই স্বাভাবিক। বিলেতে থাকবার সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য দু-চারবার হৃদয়ঙ্গম করেছি। রস-সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু রস-দমন করাটাই মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তোমার মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

যাক ওসব কথা, এইবার কাজের কথা বলি শোন। বিলেত গিয়েছিলাম ব্যারিস্টারি পড়তে, প'ড়ে এসেছি জার্নালিজ্ম্। অক্স্ফোর্ডের একটা ডিগ্রী অর্জন করেছি। সেই ডিগ্রী নিয়ে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোকের দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের দৈহিক নানা স্থানে প্রচুর তৈলনিষেক করতে পারলে হয়তো দেড়শো আড়াইশো টাকা বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করতে পারা যেত, কিন্তু তা করতে প্রবৃত্ত হ'ল না। তুমি তো ভাই জানই, চাকরি করা জিনিসটাকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। সেই-জন্যেই বোধ হয় কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আমাকে একটি শাঁসালো শ্বশুর জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর ব্যবসা ক'রে ব্যাঙ্কে যে টাকা সঞ্চয় করেছেন, তার পরিমাণ ঠিক কত আমি জানি না। তবে তিনি মেয়েকে (অর্থাৎ সুরমাকে) পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা অযাচিতভাবে হাতে এসে পড়াতে ঠিক করেছি যে, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী মাসিক-পত্র বেশ ভাল ভাবে বার করব। খুব ভাল মাসিক-পত্র আমাদের দেশে নেই, উঁচু আদর্শ রক্ষা ক'রে যদি চালাতে পারা যায়, নিশ্চয়ই ভাল ভাবে চলবে। বাংলা কাগজটার নাম দিয়েছি 'আদর্শ', ইংরেজীটার 'The Ideal'। ইংরেজী কাগজটা আমি এখানে থেকে চালাব, বাংলা কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি প্রথমে বাংলা কাগজটার একজন সহকারী সম্পাদকের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আবেদন-কারীদের মধ্যে একজন শঙ্করসেবক রায় দেখে সন্দেহ হ'ল যে, হয়তো এ আমাদেরই শঙ্কর। ফোটো চেয়ে পাঠালাম। ফোটো আসতে সন্দেহ দূর হ'ল। তোমার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে কোন উত্তর পাই নি, তাই ফোটো চাইতে হয়েছিল। তোমাকে সহকারী নয়, পুরোপুরি সম্পাদকই হতে হবে। পি. দত্তের সই-করা চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। পি. দত্ত অপর কেউ নয়, আমার বড় শ্যালী—প্রবীর

হয়। আমি ইংরেজী কাগজটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি, শ্রীবীর আমার হয়ে কাগজটার সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করছে।

এই সম্পর্কে আমার অনেক হিতৈষী বাঙালী-চরিত্রের অতীত নজির উদ্ধার ক'রে আমাকে সাবধান করেছেন যে, টাকাটা মারা যাবে অর্থাৎ তোমার অপটুতা অথবা অসাধুতা অথবা দুইই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে যে, আমি চমকে যাব। বন্ধু-প্রীতি বিষয়ে নাতিক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা ছেড়ে দিলাম, তার কারণ, জিনিসটা অত্যন্ত 'ভাল্‌গার' শোনাবে। দ্বিতীয়ত, টাকাগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছি, অপ্রত্যাশিতভাবে যদি যায়ও, বেশি লাগবে না আমার। তবে এ বিষয়ে আমার সত্যিকার মত কি, তা তোমাকে বলছি। বেশি জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। সাঁতার শিখতে গিয়ে দু-চারজন ডুবে মরে তা সত্যি, কিন্তু এই দু-চারজনের উদাহরণ আস্ফালন ক'রে সব সাঁতার-শিক্ষার্থীদের ভড়কে দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। বন্ধু হিসেবে তোমাকে এইটুকু শুধু অনুরোধ করছি যে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন ক'রে সাঁতারটা শিখে ফেল। অগাধ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাবার কৌশলটা আয়ত্ত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমাকে যত দূর জানি, অসাধ্যসাধন করবার শক্তি তোমার আছে। আর একটা কথা, যদি ডোব, আর কারও কিছু হবে না, তুমিই ডুববে। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু ক'রে দাও। আশা করি, অন্যান্য সব খবর ভাল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হলাম। শৈলর চিঠিতে তোমার সব খবর জেনেছি। অবিলম্বে উত্তর দিও। ইতি—

উৎপল

কে, শঙ্করবাবু নাকি, এখানে একা ব'সে কি হচ্ছে?

শঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, ঠিক পিছনে অচিনবাবু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভদ্রলোক যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শঙ্কর মোটেই টের পায় নাই।

এখানে কি করছেন?

এমনিই বেড়াতে এসেছি।

আচ্ছা, একটা খবর আমাকে বলতে পারেন? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, খবরটা জানবার জন্যে নেমে পড়লাম।

কি খবর?

মিস বেলা মল্লিক আজকাল কোন্ ঠিকানায় আছেন?

তিনি এ দেশে নেই, বিলেতে গেছেন।

বলেন কি, বিলেত! কার সঙ্গে?

একটি বুড়ো সায়েবকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন, তাঁরই সঙ্গে।

অচিনবাবু গভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

যাক, তা হ'লে তো মিটেই গেল। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

না, আমি এখন যাব না।

কবিতা ভাবছেন বুঝি?—মৃদু হাসিয়া অচিনবাবু কারে গিয়া আরোহণ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর বাসায় ফিরিল। ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল এবং হাসিয়া বলিল, তুই কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?

না, আমি এই ফিরছি।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল। আমি জুল্‌ফিদারের কাছে গিয়েছিলাম; সব বলছি, চ, জুল্‌ফিদার দি গ্রেট আবার এক হাত দেখিয়েছে। কড়া নাড়্।

কড়া নাড়িতেই মৃন্ময় দ্বার খুলিয়া দিল।

মৃন্ময়কে দেখিয়া ভন্টু বলিল, মিস্টার ক্যাণ্ডল, তুই আর মিসেস স্মাইল পরশুদিন সকালে আমাদের বাসায় যাস। শঙ্কর, তুইও যাস। পরশু রবিবার আছে, জুল্‌ফিদার আমাকে ব্রেসিং আপিস খুলবে ঠিক করেছে।

সে খাবার কি?

আশীর্বাদ করবে রে রাস্কেল, এটা বুঝতে পারছিস না? জুল্‌ফিদার কিন্তু এগেন এক হাত দেখিয়েছে।

কি রকম?

তোর কথা আজ আবার জুল্‌ফিদারকে বলেছিলাম। জুল্‌ফিদার বললে যে, আমাদের আপিসে তো আর চাকরি খালি নেই, তবে হল্‌ অ্যাণ্ডারসনে একটা পোস্ট্‌ শিগগিরই খালি হবে, সেটা আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঁর খুব ভাল চাকরি হয়ে গেছে।

কোথায়?

মৃন্ময় সব কথা খুলিয়া বলিতে ভন্টু খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

চোর কোথাকার, আমাকে তো কিচ্ছু বলিস নি এতক্ষণ! তা হ'লে চা খাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই। স্মাইলকে খুব কড়া ক'রে চা করতে বল্‌। চা খেয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

মৃন্ময় চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

আবার কোথায় বেরুবি এখন?

ওহো, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওরিজিন্যাল গন। তাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মারা গেলেন?

বেঁচে গেলেন বল্‌।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু বলিল, বাবাজীর কাণ্ড শুনেছিস?

না।

বাবাজীকে বিয়ের খবর দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম, বাবাজী কি উত্তর দিয়েছে দেখ্‌।

ভন্টু পকেট হইতে একটি পোস্ট্‌কার্ড বাহির করিয়া দিল।

কল্যাণবরেষু,

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল। তুমিও যে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুচরণের মত বিবাহ করিয়া এক দঙ্গল অপোগণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকিবে, ইহা আমি ভাবি নাই। আমি প্রায় পনেরো দিন হইল প্রয়াগে আসিয়াছি, ইচ্ছা ছিল, তোমাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সংসারের কীট তোমরা, সংসারের পাঁকেই সমস্ত জীবন কাটাও। আমাকে আর উহার মধ্যে টানিও না। দূর হইতে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। ওই অবস্থায় যতটা সুখ সম্ভব, ততটা সুখ যেন তোমাদের ভাগ্যে ঘটে। ইতি—

আশীর্বাদক

তোমার মেজকাকা

পড়িয়া শঙ্কর পোস্ট্‌কার্ডখানি ফেরত দিল।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, চাম চামাড়ি বাবাজী।

কিন্তু বাবাজীর চিঠিতে ভন্টু যে মর্মাহত হইয়াছে, তাহা সে হাসি দিয়া ঢাকিতে পারিল না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল।

চা খাইয়া ভন্টু চলিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে মৃন্ময় উপরের ঘরে উঠিয়া গেল, তাহার ঘুম পাইয়াছিল। নীচের ঘরে শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিত পি. দত্তের চিঠি পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিলেও সুরমা ও উৎপলের চিঠি পাইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এ চাকরি সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। শৈলর দাদা ও সুরমার স্বামী বাল্যবন্ধু উৎপলের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে জীবনযাপন করিতে পারিবে না। যাহাদের চক্ষে সে নিজেকে এতদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কাছে নিজের গৌরব খর্ব করিতে পারিবে না। ভন্টু এবং উৎপল শ্বশুরের প্রসাদে প্রসন্নমনে থাকুক এবং নিজেদের লইয়াই থাকুক, শঙ্করের উপর তাহাদের

কুপাবর্ষণ করিতে হইবে না। ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বালা করিতে লাগিল। সে আলমারি কাগজ কলম লইয়া আসিল এবং উৎপলের চিঠির জবাব লিখিয়া ফেলিল।—

ভাই উৎপল,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং তোমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিলাস-ব্যসনে মন না দিয়ে সাহিত্য-সেবায় মন দিয়েছ, এটাও আনন্দের কথা। আমি যদিও তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে স-ফোটো দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, যে ভার আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ সে ভার নিতে আমি অক্ষম। প্রথমত, তোমার সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আদর্শ না মিলতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন বন্ধুর অধীনে কাজ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বন্ধু প্রভু হ'লে উভয় পক্ষকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়। সাহিত্য-সেবা আমিও করব, কিন্তু এ ভাবে করতে পারব না। কারণ মনের প্রসন্নতা এবং স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্যচর্চা করা যায় না। তুমি অন্য লোক দেখ।

তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলে, তা থেকে যে আমি মানে মানে উত্তীর্ণ হয়েছি, এটা উভয়েরই সুখের বিষয়। সেদিন আমার সর্বস্ব ব্যয় ক'রে লাল লাল গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ—তখন আমি বোকা ছিলাম। নি-খরচায় ঠোঁটের কোলে একটু হাসি আর চোখের কোণে একটু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা বিকিরণ ক'রে কাজ হাসিল করবার আর্টটা তখনও ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে পারি নি। বোকার মত অর্থব্যয় ক'রে বসেছিলাম। এখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করছি যে, আমার বোকামিটাকে কেন্দ্র ক'রে তোমরা দুজনে আনন্দলাভ করেছিলে তো! পরোক্ষভাবেও বন্ধু-দম্পতিকে খুশি করতে পেরেছি—তাই বা কম কি!

তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সুরমার মত মহিলা তোমার সহধর্মিণী এবং সুরমার বাবার মত সজ্জন ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। আশা করি, ভাল আছ সব। মাঝে মাঝে গরিব বন্ধুর খবর নিও। ইতি—

শঙ্কর

চিঠিটা খামে পুরিয়া সে ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, চিঠিটা এখনই পোস্ট্ করিয়া দিলে ভা কারণ কি জানি আবার যদি মত বদলাইয়া যায়! পারিপার্শ্বিক টনার চাপে বিবেকের যুক্তি হয়তো নাও টিকিতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল, একটা টিকিটও আছে। খামে টিকিট আঁটিয়া কপাট খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিকটে কোন ডাকবাক্স ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর বড়রাস্তায় গিয়া পড়িল। বড়রাস্তাতেও খানিকক্ষণ হাঁটিয়া তবে সে ডাকবাক্স পাইল। চিঠিখানা পোস্ট্ করিয়া দিয়া যেন সে বাঁচিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কপাট খোলা। মনে পড়িল, সে নিজেই কপাট খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত সাহেবী-পোশাক-পরা এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সর্বাঙ্গে মদের গন্ধ। শঙ্কর খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ আবার কে?

গায়ে হাত দিয়া একটু ঠেলিতেই সাহেব উঠিয়া বসিলেন এবং মদিরাবিহ্বল চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে?

আমি এইখানে থাকি।

আপনি এখানে থাকেন? You mean this is your house?

আমার নিজের বাড়ি নয়, আমরা ভাড়াটে। আপনি কে?

মাই গড! এটা কি বীডন স্ট্রীট নয়?

আজ্ঞে না, এটা সার্পেন্টাইন লেন।

আই সী।

সাহেব খানিকক্ষণ খোলা দ্বারটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সাধারণত গেরস্ত-বাড়িতে এত

রাত্রে কপাট খোলা থাকে না, তাই ভাবলাম, বুঝি আমারই বাড়ি। আই অ্যাম সো সরি, এটা সার্পেন্টাইন লেন! আই অ্যাম সো সরি।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না।

শঙ্কর বলিল, বসুন, যাচ্ছেন কেন?

ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া সাহেব বলিলেন, আই সী, you are a gentleman. না, আমি আর বসব না, উঠি এবার।

ভদ্রলোকের টলমলায়মান অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর আবার বলিল, না না, বসুন।

O, you are a damned good fellow.

তাহার পর শঙ্করের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি স্টুডেণ্ট?

না।

No? But you look it. কি করেন আপনি?

কিছুই করি না আপাতত।

No? কিছু করবার ইচ্ছে রাখেন?

তাহার পর ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সাহেব বলিলেন, What is your propensity? To swindle or to dwindle? These are the two things one must choose between.

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটিকে নেহাত খেলো বলিয়া শঙ্করের মনে হইল না। শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। এই অদ্ভুত অতিথিটিকে তাহার বেশ লাগিতেছিল।

সাহেব বলিলেন, নিজে যদিও আমি একজন রটার, কিন্তু বাপের দৌলতে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। I can shunt you on to any one of those two lines, I mean, swindling and dwindling. There are marvelous possibilities in both of them. আপনার মনের ঝোঁক কোন্ দিকে?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আমি সাহিত্য-চর্চা করতে চাই।

O God Almighty, you are a poet !

That's funny and that's great !

সাহেব পকেট হইতে একটা কার্ড-কেস বাহির করিলেন; তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, Will you lend me your poet's plume please ?

শঙ্কর হাসিয়া দোয়াত কলম আগাইয়া দিল।

সাহেব কার্ডের পিছনে লিখিলেন, "Hiron, he is a gentleman. Please take him in your gang." তাহার নীচে নিজের নাম সই করিয়া কার্ডখানি শঙ্করের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, হিরণ is a bright boy—সেও সাহিত্যচর্চা করছে, at least that's his present pose—চ'লে যান তার কাছে। আমি উঠি—I am so sorry, I disturbed you.

সাহেব উঠিলেন।

আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব ?

No, thanks. মোটরে উঠে ব'সে স্টিয়ারিং ধরতে পারলে I am as steady as a rock.

সাহেব টলিতে টলিতে গিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর স্টার্ট করিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কার্ডখানি উল্টাইয়া দেখিল, নাম লেখা রহিয়াছে - যোগেন রায়।

কে এই যোগেন রায় ?

শঙ্কর কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনকে নানাভাবে নাড়া দিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার পর স্বপ্ন দেখিল, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়—অমিয়াকে।

৩৫

পরদিন সকালে উঠিয়াই শঙ্কর ঠিক করিল, হিরণবাবু বলিয়া কেহ আছে কি না খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে কার্ডখানি বাহির করিল এবং কার্ডখানির দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া গেল। সুরামত্ত যোগেন রায় সবই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা দেন নাই। নিজেরও না, হিরণবাবুরও না। শঙ্কর তবু বাহির হইয়া পড়িল। বীডন স্ট্রীটটা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেলা বারোটা-নাগাদ শঙ্কর যোগেন রায়ের বাড়িটা বাহির করিল বটে, কিন্তু যোগেন রায়ের দেখা পাইল না। শুনিল, যোগেনবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। হতাশ হইয়া শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা বুক্‌স্টলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্টলে নানারকম বই ও মাসিক পত্রিকা। শঙ্কর তাহার প্রিয় ও পরিচিত মাসিক-পত্রিকা 'সংস্কারক'খানা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরে তাহার নজরে পড়িল, 'ক্ষত্রিয়' নামে একটা নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ, সম্পাদক—জ্যোতির্ময় বসু। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—পিছনের দিকে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। "একজন সুদক্ষ প্রুফ-রীডার চাই। শ্রীহিরণকুমার রায়ের নিকট আবেদন করুন। ঠিকানা—"। ঠিকানা দেওয়া আছে। ইনি যোগেনবাবুর হিরণ নয় তো! শঙ্কর অবিলম্বে হিরণবাবুর ঠিকানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে শঙ্কর হিরণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া অধীর-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া একটি শাতিস্থূল সুদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, ঈষৎ কটা চুলগুলি ব্যাক্

ব্রাশ করা, বাঁ হাতের অনামিকায় দামী-পাথর-বসানো একটি আঙটি। ডান হাতে মোটা বর্মা চুরুট।

আপনিই আমাকে খুঁজছেন?

আমি হিরণবাবুকে খুঁজছি।

আমারই নাম হিরণ, কি চান আপনি?

আপনি কি যোগেন রায় ব'লে কাউকে চেনেন?

চিনি।

শঙ্কর কার্ডখানি তাহার হাতে দিল।

হিরণবাবু কার্ডে লেখা কথাগুলি পড়িলেন, কার্ডখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, যোগীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

শঙ্কর আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল।

যোগীনদা দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসেই একটা ইতিহাস ক'রে গেছেন দেখছি!

একটু থামিয়া হিরণবাবু বলিলেন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন?

শুনলাম, আপনারা একটা কাগজ বার করছেন, তাতে যদি আমাকে কোন কাজে—

আপনি লেখক?

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কিছু কিছু লিখি।

কি লেখেন?

বেশির ভাগই কবিতা।

বেশ, আপনার লেখা নিয়ে আসবেন।

কখন আসব?

আজ বিকেলেই আসতে পারেন।

শঙ্কর কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি

এখন একেবারে বেকার। গ্রাসাচ্ছাদনের মত একটা কোন কিছু যদি জুটিয়ে দিতে পারেন ভাল হয়, আমি যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।

কবিতা লেখা ছাড়া আপনার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে? কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শঙ্কর একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল, হিরণবাবুও বসিলেন।

আমি এম. এস-সি. পর্যন্ত পড়েছি, পরীক্ষা দিই নি।

বেশ করেছেন। পরীক্ষাটা দিলেন না কেন?

আর্থিক নানা কারণে, ফী জমা দেবার টাকা পাই নি।

যাক, তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম, পারমার্থিক কোন হেতু আছে বুঝি। রবীন্দ্রনাথের যে হেতু ডিগ্রী নেই, সেই হেতু আজকাল অনেকে ডিগ্রী না থাকাটাকেই কবি হওয়ার সপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি ব'লে মনে করেন। আপনার সে কম্‌প্লেক্স্‌ নেই দেখে সুখী হলাম। আপনি প্রুফ দেখতে পারেন?

পারি। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখলাম—

দেখেছেন? আমিই দিয়েছি ওটা। আপনাকে কাজটা দিতে পারি। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বার্‌বেল' ব'লে আমি একটা বই লিখিয়েছি কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে দিয়ে, সেটা ছাপা হচ্ছে। আপনি যদি তার প্রুফ ভাল ক'রে দেখে দিতে পারেন, দৈনিক এক টাকা হিসেবে আপনাকে এখনই আমি বাহাল করতে পারি।

আমি পারব।

আপনি কোথা আছেন?

আমার এক বন্ধুর বাসায় আছি। সেখানেই পেয়িং গেস্ট্‌ হয়ে থাকব আপাতত ভাবছি।

সেখানে যদি অসুবিধে হয়, আমার একটা আন্‌ইউজ্‌ড নতুন বাথরূম আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আপনি থাকতে পারেন ফ্রী-অফ কস্ট্‌।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, দেখি।

বেশ, তা হ'লে বিকেলে আসবেন, 'ক্ষত্রিয়' কয়েকখানা মাত্র বেরিয়েছে, আমাদের মতামত মিলিটারি, আমরা যা সত্য ব'লে মনে করি তা প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে মিথ্যা আবর্জনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে ব'লেও মনে করি। বিকেলে আসবেন, সেই সময় সব দেখাব আপনাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল

চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, কোথাকার অপরিচিত যোগেন রায় মদের ঝোঁকে তাহার খোলা দরজায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হিরণবাবুর ঠিকানা দিয়া গেলেন! জীবনের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার অন্তরালেই এক আকস্মিক যোগাযোগের রহস্য। জন্ম জীবন মৃত্যু—জীবনের এই অতি-প্রত্যাশিত ঘটনাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের দলেই। আনন্দের আতিশয্যে শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। হিরণবাবু লোকটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বেশ সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

সেই দিন বৈকালেই শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া হিরণবাবুর কাছে হাজির হইল। তাহার যেন তর সহিতেছিল না। গিয়া দেখিল, আড্ডা গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চেয়ার কয়টি অধিকৃত, তক্তপোশেরও অনেকখানি ভরিয়া গিয়াছে। ঘোরতর তর্ক চলিতেছে। সিগার-সিগারেটও এত বেগে পুড়িতেছে যে, ঘরের খানিকটা অংশ কুজ্ঝটিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। তক্তপোশের এক ধারে ট্রের উপর কতকগুলি চায়ের পেয়ালা ধূমায়িত হইতেছে এবং বালক-ভৃত্যটি একে একে সেগুলি তার্কিকদের হাতে ধরাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

হিরণবাবু বলিলেন, লেখা এনেছেন ?

এনেছি।

কই, দিন

শঙ্কর সসঙ্কোচে পকেট হইতে কবিতা দুইটি বাহির করিয়া দিল। আশা করিয়াছিল, হিরণবাবু তখনই সেগুলি পড়িবেন এবং পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হিরণবাবু সেসব কিছুই করিলেন না। লেখাগুলি একবার খুলিয়া পর্যন্ত দেখিলেন না, ড্রয়ার টানিয়া অতিশয় নির্বিকারভাবে সেগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আর একটি ড্রয়ার খুলিয়া 'ডাম্বেল, মুগুর ও বাবুবেশে'র একতাড়া প্রুফ শঙ্করকে দিয়া বলিলেন, কাল বিকেলবেলায়ই চাই।

একটা পেন্সিল কি কলম পেলে এখুনি আমি শুরু করতে পারি।

এত গোলমালে পারবেন ?

পারব।

বেশ, পেন্সিল দিচ্ছি আমি, বসুন। ওরে নব্‌নে, ও-ঘর থেকে টুল একটা নিয়ে আয়, এক কাপ চা দে বাবুকে।

টুল আসিল, চা আসিল। চা পান করিয়া শঙ্কর প্রুফ দেখিতে শুরু করিয়া দিল। আড্ডায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবক। শঙ্করের আগমনে তাঁহারা মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়াছিলেন, আবার শুরু করিয়া দিলেন। আলোচনা চলিতেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিক একজন বিদ্রোহী কবিকে লইয়া। তর্ক-মুখর চটুল বিদ্রূপাত্মক আলোচনা। শঙ্করের খুব ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু অনাহূতভাবে আলোচনায় সে যোগদান করিল না। নীরবে বসিয়া প্রুফগুলি দেখিতে লাগিল।

অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে তাহার সাহিত্যিক-জীবন শুরু হইয়া গেল।

৩৬

মৃন্ময় আপিস হইতে যখন ফিরিল, তখনও শঙ্কর ফেরে নাই। শঙ্কর আজকাল সকালে উঠিয়াই হিরণবাবুর কাছে চলিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনটা সে নিকটবর্তী একটা হোটেলে আনা-তিনেকের মধ্যে সারিয়া লয়; আরও তিন আনা দিয়া দুই প্যাকেট সস্তা

সিগারেট কেনে, রাত্রে মৃন্ময়ের বাসায় খায় এবং শোয়। ইহার জন্যে মৃন্ময়কে সে মাসে দশ টাকা করিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। মৃন্ময় প্রথমে কিছুতেই টাকা লইতে রাজী হয় নাই; কিন্তু যখন সে দেখিল, টাকা না লইলে শঙ্কর থাকিবে না, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। এই শঙ্করবাবু লোকটির ব্যবহার, চালচলন এবং আদর্শনিষ্ঠা মৃন্ময়কে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। নিজের আদর্শভ্রষ্ট জীবনে শঙ্করকে পাইয়া তাহার মন অনেকটা যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছিল; ভগ্নহাল ছিন্নপাল তরণীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ মাঝি থাকিলে নৌকা-পরিচালক মাঝি যেমন ভরসা পায়, শঙ্করকে পাইয়া মৃন্ময়ের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকে না, শঙ্করের জীবনযাত্রার সহিত এবং জীবনের আদর্শের সহিত মৃন্ময়ের জীবনযাত্রা অথবা আদর্শের কিছুমাত্র মিল নাই; শঙ্কর বন্ধের এই চাকরিটাও যে মনোবৃত্তির প্রভাবে লইল না, সে মনোবৃত্তির সমর্থন যদিও মৃন্ময় করে না; তবু মৃন্ময় মনে মনে শঙ্করের উপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছিল. তাহার একমাত্র কারণ—যখনই যতটুকু দেখা হয়, শঙ্কর সহানুভূতিসহকারে মৃন্ময়ের সমস্ত কাহিনী শোনে এবং আশ্বাস দেয় যে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। সব ঠিক হইয়া যাইবে—এতবড় আশ্বাস কয়জন এমন করিয়া দিতে পারে!

বাড়িতে ঢুকিতেই নীচের তলায় ডানহাতি ঘরটায় শঙ্কর থাকে। শঙ্কর, যাইবার সময় তালা লাগাইয়া দিয়া যায়—হাসির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, রাত্রির খাবার রাখিয়া যাইবার জন্য। মৃন্ময় ঢুকিয়া বন্ধ তালাটার পানে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করবাবু ফেরেন নাই তাহা হইলে। তাহার বগলে একটা প্যাকেট ছিল। শঙ্করবাবুকে আগে দেখাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু—। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় অবশেষে উপরে উঠিয়া গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে হাসি চুল বাঁধিতেছিল। হাসির সমস্ত মুখখানাতে কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। মৃন্ময় যে

স্বর্ণলতাকে ভালবাসে—এ কথা জানিয়া অবধি হাসির জীবনে অন্ধকার নামিয়াছে। স্বর্ণলতা যে মৃন্ময়ের পূর্বপক্ষের স্ত্রী, অপর কেহ নহে, ভালবাসাটা যে তাহার ন্যায্য পাওনা—এ বার্তায় সে অন্ধকার কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বরং স্বর্ণলতার প্রতি এই প্রেমটা যদি অবৈধ প্রণয় হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং মৃন্ময়কে এজন্য ন্যায়ত লাঞ্ছিত করিবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া হাসির আক্রোশ হয়তো কিছু কমিত। কিন্তু বিবাহিত বিগত স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী প্রেম পোষণ করে, তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে! মৃন্ময় প্রবেশ করিতেই সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং কাগজের বাক্সটা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কি?

কাপড়।

কার কাপড়?

ভবুটুর যে পরশু বিয়ে, ভুলেই গেছ?

ও।

চুলের বিনুনিটা ঠিক করিতে করিতে হাসি আগাইয়া আসিল।

কি কাপড় কিনলে?

মৃন্ময় হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল (হয়তো সেইজন্যই তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল), কোন উত্তর না দিয়া জুতার ফিতাই খুলিতে লাগিল। হাসি আগাইয়া আসিয়া কাগজের বাক্সের ডালাটা খুলিয়া ফেলিল।

দুখানা কাপড় কেন?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই মৃন্ময় উত্তর দিল, একখানা তোমার জন্যে। ওই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটা—

আমার শাড়ি চাই না।

বাক্সটা তাচ্ছিল্যভরে ঠেলিয়া দিয়া হাসি পুনরায় আয়নার কাছে গেল এবং দাঁত দিয়া ফিতাটি কামড়াইয়া পুনরায় প্রসাধনে মন দিল। মৃন্ময় এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তাহার লাল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, পছন্দ ক'রে এনেছি—

আমার চাই না।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া বলিল, তুমি মাইনে তো এখনও পাও নি, দাদামশাই যে টাকা দিয়ে গেছেন তার থেকেই তো সংসার চলছে, বাড়ি-ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, তুমি কাপড় কেনবার টাকা পেলে কোথা?

মৃন্ময় যে শঙ্করের সাহায্যে শালখানা বাঁধা রাখিয়াছিল, হাসি তাহা টের পায় নাই। মৃন্ময় হাসিকে এখনও সে কথা বলিল না, মিথ্যা কথা বলিল।

একটা চেনা দোকান থেকে ধারে এনেছি। মাইনে পেলে পরে দিয়ে দিলেই হবে।

ধার ক'রে বাবুয়ানি করবার দরকার কি?

মৃন্ময় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না; তাহার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

আগে হাসি এমন করিত না, স্বর্ণলতাকে আবিষ্কার করিয়া অবধি তাহার মন কেমন যেন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণলতা নাগালের বাহিরে, তাহার কিছুই সে করিতে পারে না, মৃন্ময়কে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাই সে মনের জ্বালা মিটাইতে চায়। অথচ হাসিই একদিন মৃন্ময়ের সামান্যতম কষ্ট দূর করিবার জন্য কি না করিতে পারিত!

৫৭

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার লেখক, প্রুফ-রীডার, ম্যানেজার এবং প্রকাশক হইয়া পড়িল। যদিও হিরণবাবু তাহাতে সংশ্লিষ্ট রহিলেন এবং প্রকাশ্যত হিরণবাবুর বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুর সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপা হইতে লাগিল, কিন্তু আসলে শঙ্করই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। হিরণবাবু এবং জ্যোতির্ময়বাবুর নিকট সাহিত্যচর্চা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু শঙ্করের ইহা অন্তরের বস্তু। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া

সে ইহার উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার একাগ্রতা দেখিয়া হিরণবাবু তাহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদা যে শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া সসংকোচে হিরণবাবুর নিকট আসিয়াছিল (একটি হিরণবাবু মনোনীত করিয়া ছাপিয়াছিলেন, অপরটি তাঁহার পছন্দ হয় নাই), আজ সেই শঙ্করের নিকটই হিরণবাবু নিজের লেখা আনিয়া বলিতেছেন, দেখ তো, এটা তোমার কাগজে চলবে কি না?

বস্তুত কাগজখানা যেন শঙ্করের নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উহা লইয়াই তাহার কাটিতেছে। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বারবেল' নামক পুস্তকের প্রুফ দেখিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, বাকি সময়টা সে 'ক্ষত্রিয়' লইয়া থাকে। তাহার নিজের মনের মধ্যে যে নিরস্ত্র ক্ষত্রিয় এতদিন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল, হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সুযোগ লাভ করিয়া সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক-মার্কা ডেঁপো ছোকরাদের চাবকাইয়া পিঠের ছাল ছাড়াইয়া দিবে সে। ইহারা অতীতের মহত্ত্ব স্বীকার করে না, দেশের লোকেদের চেনে না, বিদেশী আলট্রা-মডার্নিজমের নকলে 'নতুন কিছু' করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে চায় এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের নপুংসক কামনা-কণ্ডুয়নকে কখনও সুবোধ্য, কখনও দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে। ইহাদের ভণ্ডামিটাকে চূর্ণ করিতে হইবে। অতিশয় উত্তেজনার মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছে। অনেকগুলি ভাল লোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে। ভাল লোক মানে, লোকগুলিকে শঙ্করের ভাল লাগিয়াছে। জ্যোতির্ময়বাবু—যিনি নামে কাগজের সম্পাদক—তিনি বেশ একটু অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক। নিজে যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মদের গালাগালি দিয়া তিনি যত আনন্দ পান, অন্য আর কিছু করিয়া ততটা পান না। রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অদ্ভুত। তিনি আমাদের পরাধীনতাটাকে টাইফয়েড-জাতীয় একটা ব্যাধি হিসাবে গণ্য করেন। বলেন, তাড়াহুড়া করিয়া লাভ নাই, নিজের প্রাণশক্তি-প্রভাবে ব্যাধি যদি সারিবার হয়, আপনিই সারিবে। আমাদের দেখা উচিত,

চিকিৎসার ছুতা করিয়া রাজনৈতিক নেতাগুলি যেন আমাদের সর্বনাশ না করেন। আর একটি বিচিত্র লোক সুরেন্দ্রনাথ সোম। বেঁটেখাটো মানুষটি, অত্যন্ত রোগা, মাইনাস ফাইভ চশমা, নিরামিষাশী, স্কুলে মাস্টারি করেন। যদিও মাত্র বি. এ. পাস, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হেন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা না জানেন। মদ এবং শিকার বিষয়ে তিনি তো বিশেষজ্ঞ। নিজে যদিও কখনও জীবনে মদ স্পর্শ করেন নাই, সিগারেট পর্যন্ত খান না, কিন্তু কোন্ মদে কত অ্যাল্কহল আছে, কি রকম গ্রেপ হইতে ভাল মদ প্রস্তুত হয়, সস্তা মদ এবং দামী মদের তফাত কি, কি রকম সেলারে মদ রাখা উচিত, মদের বোতলের কাচ অ্যাল্কালি-ফ্রী হইলে বা না হইলে কি ভাবে মদের গুণে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, মদের ব্যবসা কোন্ দেশে কি ভাবে চলে, সাহিত্যসৃষ্টির উপর মদের প্রভাব কি এবং তাহা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত—এ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। শিকার বিষয়েও তাই। ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, ফরাসী সাহিত্যেও লোকটির অগাধ অধিকার। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন এবং কদাচিৎ কখনও ভারী ওজনের প্রবন্ধ লেখেন। সুরেনবাবু 'ক্ষত্রিয়' কাগজটির প্রতি স্নেহশীল—সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা হিরণদার সহিত ঘনিষ্ঠতাবশত। যে জন্যই হোক, তিনি 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংশোধক হিসাবে। মাস্টার মানুষ, ভুল কিছুতেই তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। তিনি 'ক্ষত্রিয়ে'র ভুল তো সংশোধন করেনই, অন্য কোন কোন পত্রিকায় কি কি ভুল বাহির হইয়াছে তাহা শঙ্করকে আনিয়া দেন, এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের লেখনী হিংস্র হইয়া উঠে। শঙ্করের লেখনীতে যে এমন একটা হিংস্রতা ছিল, তাহা শঙ্কর নিজেও এতদিন জানিত না; নিজের এই তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-সমন্বিত নব রূপ সে নিজেই সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ছোন রায় এই আড্ডার আর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কখনও কবিতা লেখে না, কিন্তু মনে-প্রাণে কবি। মাথায় রুক্ষ

তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল, চোখে আকুল উতলা দৃষ্টি, মুখে শেলী কীট্‌স্ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ, পরনে আধময়লা ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডাল। প্রত্যহ সকালে বাজার করিতে যাইবার মুখে থলিটি হাতে করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেয়, কবিতা আওড়ায়, এক-একদিন ভাবের আবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলে। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে, অথচ উপার্জন কম, সেইজন্য দুর্দশাটা আরও বেশি। বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু একপাল ছেলে মেয়ে। দশটা পাঁচটা একটা আপিসে কেরানীগিরি করে, বৈকালে মনিহারী দোকানে গিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য লেখে, সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় টুইশনি করে, তবু কুলায় না। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের সহিত তাহার মতের মিল নাই, কিন্তু হিরণদাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। হিরণবাবুও তাহাকে স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে মাঝে মাঝে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে মদ খাওয়ান। শঙ্করেরও ছবিকে বড় ভাল লাগে! আরও অনেকে আড্ডায় আসে। দীপেন, জ্যোতিষদা, চঞ্চল, বরেন, নিপু, শ্যামল এবং আরও অনেকে; সকলেই যুবক, সকলেই সাহিত্য-রসিক। কেহ ধনীর সন্তান, কেহ চাকুরে, কেহ বেকার, কেহ বিজ্‌নেস করিতেছে। হিরণবাবু সকলেরই হিরণদা। শঙ্করও আজকাল হিরণবাবুকে হিরণদা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। হিরণদা যদিও এই আড্ডার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেকে কখনও জাহির করেন না। তিনি কেন্দ্রেই বাস করেন বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে। তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ মতামত আড্ডায় কাহারও অগোচর নাই, সকলেই তদনুসারে চলেনও; কিন্তু হিরণদা উগ্রভাবে নিজের দলপতিত্ব কখনও প্রকাশ করেন না। হিরণদার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবিয়া শঙ্কর অবাক হয়, লোকটার প্রতিভা যে কিরূপ, তাহা বোঝা যায় না। সাহিত্যচর্চা যে খেয়ালমাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানা বিষয়ে কৌতূহল, এবং 'ক্ষত্রিয়' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার বহুমুখী কৌতূহলের একটা মুখ মাত্র। শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ এই কাগজটা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঠিক সেই মনোভাব লইয়া

যে মনোভাব লইয়া দুষ্ট ছেলে দুষ্টামি করে। বঙ্গদেশরূপ মহারণ্যের নানা বৃক্ষে নানাজাতীয় পতঙ্গ নানারকম চক্র নির্মাণ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, প্রত্যেক চক্রে এক-একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দেখাই যাক না, কি রকম মজাটা হয়! এতদিন তিনি নিজেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এখন শঙ্করের মধ্যে একজন সক্ষম লোষ্ট্রনিক্ষেপক আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার হাতে এ কার্য ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে মন দিয়াছেন। একটা কুস্তির আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেখানে অনেকগুলি যুবক এবং কুস্তিগীর পালোয়ান জুটাইয়া বক্সিং, জুজুৎসু এবং শরীরচর্চার নানারূপ আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অশক্ত অসুস্থ বলিয়াই আমরা ভীরু দার্শনিক হইয়া পড়িতেছি। জীবনবৃক্ষের নির্মম সত্যগুলিকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কুস্তির আখড়াতেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত নিবদ্ধ নহে, আরও নানাদিকে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত। জন্তু-জানোয়ারের বিষয়ে ঝোঁক আছে। বাড়িতে শুধু কাবুলী বিড়াল এবং অ্যালসেশিয়ান কুকুর নয়, বাঘের বাচ্চাও পুষিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ, দিয়াশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ, পুরাতন শাল সংগ্রহ, সেকেলে বাসন সংগ্রহ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ কম নয়। কিরণবাবু বড়লোকের ছেলে, সর্বঘটবিহারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যই নিজের কিছু করিবার নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী সব কিছুতেই সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন। পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং বাধা দিবার কেহ নাই। যোগীনদাও নাকি এককালে এই ধরনের ছিলেন, একটা চাকরি জোটাতে আজকাল সব থামিয়া গিয়াছে। যোগেন রায়ের পরিচয় শঙ্কর পাইয়াছে। তিনি বিলাতী ডিগ্রী ও সুপারিশের জোরে একটি নামজাদা বিলাতী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন এবং বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। যখন কলিকাতায়

থাকেন না, তখন বীডন স্ট্রীটের বাড়িটা খালি পড়িয়া থাকে, বাড়ি ভাড়া দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। যোগীনদাও অবিবাহিত, রসিক, কিন্তু নিদারুণ মাতাল। আর একটি নূতন ধরনের লোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় হইয়াছে, ডাক্তার মুখার্জি। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই. এম. এস. অফিসার, বিলাতের এম. ডি., রিটায়ার্ড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল। এককালে হিরণবাবুর পিতৃবন্ধু ছিলেন, এখন হিরণের বন্ধু। এমন কি সিগার আদান-প্রদান চলে। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। বিদ্বান বহুদর্শী লোক, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নাই। গোঁফদাঁড়ি কামানো, ফরসা রঙ, ভারী মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, গায়ে ঢিলা গলাবন্ধ সাদা চায়না কোট, পরনে সাদা থান, মুখে প্রকাণ্ড সিগার এবং প্রশান্ত হাসি। মাঝে মাঝে যখন আড্ডায় আসেন, সমস্ত আড্ডাটা যেন ভরাট হইয়া উঠে। সাহিত্যরসিক, স্পষ্টবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তি।

এই নূতন সমাজে নূতন প্রেরণা লইয়া শঙ্কর নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থানও করিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে আকুল করিয়া তুলিতেছে, হিরণদার 'ডাম্বেল, মুগুর এবং বারবেল' পুস্তকের প্রুফ দেখা হইয়া গেলে সে কি করিবে, অর্থোপার্জনের স্থায়ী রকম কোন ব্যবস্থাই তো সে এখনও পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি তাহাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়েক দিন পূর্বে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর তিনি আসেন নাই। তিনি কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহাও শঙ্করের জানা নাই···সহসা অমিয়ার মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল, ভীরু সলজ্জ চোখ দুইটি। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, অমিয়ার কথা সে তো মোটেই ভাবিতেছিল না। এমন হয় কেন? ইহার নাম টেলিপ্যাথি? অমিয়ার মুখখানাই অসংলগ্নভাবে মনের ভিতর যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রুফে মনঃসংযোগ করিল। প্রুফগুলাতে কি অদ্ভুত ভুলই থাকে। সমস্ত [illegible] এবং সমস্ত 'থ' 'থ' হইয়া গিয়াছে।

যে ঘরে হিরণদার আড্ডা বসে, ঠিক তাহার পাশের ছোট ঘরটাতে (অর্থাৎ আনইউজ্‌ড বাথ-রুমটিতে) শঙ্কর নিজের জন্ত ছোট্ট একটি আপিসের মত করিয়া লইয়াছিল। হিরণদা একটি ছোট টেবিল, শেল্ফ এবং চেয়ার দিয়াছিলেন। এই ছোট ঘরটিতেই শঙ্কর পড়ে, লেখে, প্রুফ সংশোধন করে। ইহাই 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস। কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এতদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস হিরণদার টেবিলের ড্রয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে শঙ্কর আড্ডায় গিয়া যোগ দেয়। আড্ডা সাধারণত শুরু হয় বৈকাল হইতে এবং চলে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। সেদিন রবিবার, একটু সকাল সকালই আড্ডা শুরু হইয়াছে এবং পাঁচটা নাগাদ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষদার গলা-খাঁকারি, চঞ্চলের উচ্চহাস্য হইতেই তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। হিরণদা শঙ্করকে শুনাইয়া শুনাইয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন, অত চেঁচিয়ো নয়, শঙ্কর চ'টে যাবে, প্রুফ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ও।

শঙ্কর জানে, হিরণদার এই সতর্ক বাণীর অর্থ কি। অর্থ—উঠিয়া এস। শঙ্কর উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণদা বলিলেন, আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি সেই থেকে সবাইকে মানা করছি।

শঙ্কর হাসিয়া টুল টানিয়া উপবেশন করিল।

হিরণদা হাঁকিলেন, নবীন, এক কাপ চা।

ডাক্তার মুখার্জী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে উঠলে কেন সব? শঙ্কর, তোমার চাকরি ঠিক ক'রে এলুম, 'সংস্কারক' আপিসে প্রুফ-রীডার, মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে পাবে। আপাতত ওইতেই ঢুকে পড়—তারপর দেখা যাবে।

'সংস্কারক' কাগজে তাহার চাকরি হইয়াছে! শঙ্কর নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হীরালাল মজুমদার সম্পাদিত 'সংস্কারক' কাগজে! ইহা যে সে কল্পনাও করে নাই।

৩৮

কয়েক দিন পরে শঙ্কর, ভন্টু ও মৃন্ময় গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। খানিকক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, স্কুলে তো পড়লাম ভাই খুজবুজকে নিয়ে, এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

ভন্টুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দুমতীকে লাগছে কেমন?

উচ্ছ্বসিত ভন্টু বলিল, চমৎকার ভাই, ঠিক মাখন-লদ্‌কানো টোস্টের মত, বেশ নরম নরম অথচ মুচমুচে। বিড়্‌ডিকার তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তুই অমিয়াকে আনছিস কবে?

শিগগিরই আনব।

এসে ফেল্।

মৃন্ময় একটি কথাও বলে নাই, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ভন্টু ভাবিতেছিল ইন্দুমতীর কথা, তাহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা, তেল গহনা পাইয়া বউদিদির আনন্দের কথা। এতদিন দুঃখে কাটাইয়া বউদিদি এইবার বোধ হয় সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন।

শঙ্কর ভাবিতেছিল সাহিত্যের কথা। 'সংস্কারক' পত্রিকার সংস্পর্শে সে যখন আসিতে পারিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি! শেক্‌স্‌পীয়ার, দান্তে, টল্‌স্টয়, ডস্টয়েভ্‌স্‌কি··· মহিমান্বিত মূর্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল··· বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ··· এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা-বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥



বনফুল

রচনাবলী ০৪